উদ্ভিদ্-বিদ্যা

প্রথম খণ্ড

বলেন নন্দী, এম্. এস্-সি., পি. এইচ্-ডি. (কলিকাতা),
পি এইচ্-ডি. (সুইডেন)
অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮/১, চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীঅমিতাভ সেন
সেণ্ট্রাল এডুকেশান্যাল এণ্টারপ্রাইজেস্‌-এর পক্ষে
৫৪বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ — ১৯৫৯,

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ডিগ্রী (পাস) কোর্সের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী এই পুস্তকটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু বর্তমানে কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে এবং বিভিন্ন কলেজে পাঠদানরত বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিভাষার অপ্রতুলতা এবং অপরিচিতি হেতু হয়ত আশানুরূপ করিতে পারি নাই। কতদূর সফল হইয়াছি তাহা বিচারের ভার ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের উপর রহিল। তবে পুস্তকটির উন্নতির জন্য শিক্ষানুরাগী সকলের নিকট হইতেই সমালোচনা এবং সহায়তা আহ্বান করা হইতেছে।

সঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে বিষয়বস্তু বোধগম্য করিবার জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় (যেমন, মূল, কাণ্ড প্রভৃতি) সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে যাহাতে কোনও বিভ্রান্তি না হয় সেজন্য পুস্তকের সুরুতেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পরিশেষে প্রকাশক শ্রীঅমিতাভ সেন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনাকার্যে সহায়তাকারী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবীরেন দাশ (চিত্র-শিল্পী) সমেত অন্যান্য সবাইকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইতি—

কলিকাতা।

বলেন নন্দী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :

ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায় :

শৈবাল

ছত্রাক

উদ্ভিদ রোগবিদ্যা

ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস

তৃতীয় অধ্যায় :

ব্রায়োফাইটা

টেরিডোফাইটা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

উদ্ভিদবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা—যে বিজ্ঞানে গাছপালার বিষয় জানা যায়, তাহাকে উদ্ভিদবিদ্যা বলা হয়। পৃথিবীতে নানা প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদ অতি ক্ষুদ্র এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়। পৃথিবীর সকল স্থানেই উদ্ভিদ পাওয়া যায়; কেবল পাহাড়ের চূড়ায় উদ্ভিদ নাই বলিলেই চলে। মানুষের জ্ঞান উদ্ভিদবিদ্যা না পড়িলে সম্পূর্ণ হয় না। মানুষ উদ্ভিদের উপর খাদ্য, ঔষধ, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের জন্য নির্ভর করে। সবুজ উদ্ভিদ, মানুষ ও প্রাণীদের উপযুক্ত অক্সিজেন সৃষ্টি করিয়া বাতাস শ্বসনের উপযুক্ত করে। সবুজ উদ্ভিদ না থাকিলে, পৃথিবীতে প্রাণী থাকিত না।

উদ্ভিদ হইতে মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য পাওয়া যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ গমজাত খাদ্য খায়। ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধান্যই অধিক পরিমাণে খাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ সকল প্রকার সুস্বাদু ফল, মানুষের খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ (Vitamins) দান করে।

মানুষ কৃষির দ্বারা ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদন করিয়া জগতের খাদ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করে। কৃষিই মানুষের প্রধান জীবিকা। সবুজ উদ্ভিদ, জল, সূর্য কিরণ, বাতাস এবং মাটি ইত্যাদি সরল উপাদান হইতে জটিল জৈব পদার্থ তৈয়ারি করে। এই জৈব পদার্থই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ খাদ্য রূপে ব্যবহার করে।

মানুষের আর একটি আবশ্যকীয় জিনিষ হইল, "অগ্নিশক্তি"। এই অগ্নি উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। কয়লা, কাঠ, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম সবই উদ্ভিদজাত বস্তু। সুতরাং তাপ শক্তির জন্য উদ্ভিদই হইল আদিম কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার।

উদ্ভিদ হইতে তুলা ও তুলা হইতে সুতা পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া, শণ ইত্যাদি দড়ির জন্য ব্যবহার হয়।

উদ্ভিদ হইতে কাগজ তৈয়ারি হয় এবং কাগজ হইল সভ্য জগতের প্রতীক। দরজা, জানালা, আসবাবপত্র উদ্ভিদ জাত কাঠ হইতে তৈয়ারি হয়।

উদ্ভিদ হইতে বহু প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়। নাক্সভমিকা (nux vomica), কুইনাইন ইত্যাদি ঔষধ উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। অধুনা ক্লোরোমাইসিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, পেনিসিলিন ইত্যাদি ঔষধ নিম্নশ্রেণীর ছত্রাক হইতে পাওয়া যায়। ব্যাকটিরিয়া নামক উদ্ভিদ বহু রোগ সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদ মানুষকে আনন্দ দান করে। বাগানের পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্যবর্ধক ফুল করিবার প্রেরণা যোগায়। উদ্ভিদ নদ নদীর ধারে জন্মাইয়া জমির ক্ষয় রক্ষা করে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের আকার, কার্য, শারীর বৃত্ত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন বিভাগ করা হয়। যথা :—(১) **বাহিরের আকার**—(External morphology) যেমন পাতা, ফুল ইত্যাদি দেখিতে কিরূপ;

(২) **ভিতরের আকার**—(Internal structure)—**কোষ** (cell), **কলা** (tissue) ইত্যাদি;

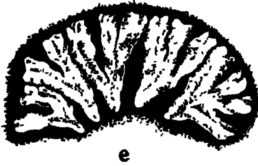
(৩) **শারীর বৃত্ত** (physiology)—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদির কাজ;

(৪) **শ্রেণী বিন্যাস** (Classification)—উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ও শ্রেণী বিভাগ ;
(৫) **বাস্তব্য বিদ্যা** (Ecology)—স্থলের উদ্ভিদ, জলের উদ্ভিদ অথবা মরুভূমির উদ্ভিদের বিশেষত্ব ;
(৬) **রোগ বিদ্যা** (Plant pathology) –উদ্ভিদের রোগ ও তাহার প্রতিকার ঃ ঐগুলি ছাড়া, অধুনা বিভিন্ন প্রশাখা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়, যথা অ্যালগোলজী (Algology)—সকল প্রকার শৈবাল ; মাইকোলজী (Mycology)—সকল প্রকার ছত্রাক ; এমব্রায়োলজী (Embryology)—ভ্রূণ সম্বন্ধে আলোচনা ; জেনেটিক্স (Genetics)—বংশগতি ; কোষতত্ত্ব (Cytology) ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগতের শ্রেণী বিভাগ (General classification of the plant kingdom)

পৃথিবীতে নানা প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদ এককোষী এবং বহু উদ্ভিদ বহুকোষী। উদ্ভিদের পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্বে ভাইরাস (virus) বোধ হয় সৃষ্টি হয়। ভাইরাস প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা রোগ ছড়ায়। ভাইরাসের মত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ হইল ব্যাকটিরিয়া। ব্যাকটিরিয়া নানা আকারের হয়। ব্যাকটিরিয়া এককোষী উদ্ভিদ। ব্যাকটিরিয়া গোলাকার, দণ্ডাকার বা সর্পিল আকারের হয়। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা বহু রোগ হয়, আবার বহু ব্যাকটিরিয়া উপকারও করে।

উদ্ভিদ জগতে প্রধান চারিটি শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণী—সমাঙ্গদেহী বা থ্যালোফাইটা—ইহাদের দেহ



ব্রায়োফাইটা রিকসিয়া



মারক্যানসিয়া a = মারক্যানসিয়া পুং, a_1 = এ্যানথেরিডিওফোর, a_2 = গেমাকাপ, b = স্ত্রী মারক্যানসিয়া, b_1 = আরচিগনিওফোর।

থ্যালাস্ দ্বারা তৈয়ারি অর্থাৎ ইহাদের মূল, পাতা বা কাণ্ড নাই। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ তিন প্রকারের ঃ যথা **শৈবাল** বা অ্যালগী (algae), ছত্রাক বা ফান্জাই (fungi), লাইকেন (lichen) ইত্যাদি।

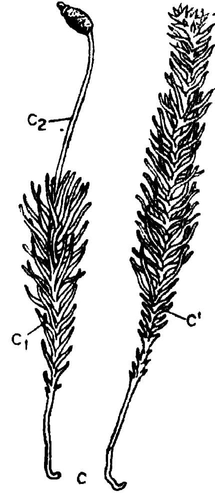
পৃথিবীতে প্রথম নিম্নশ্রেণীর সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ জন্মিয়াছিল, পরে **ব্রায়োফাইট** (Bryophyte) বা মস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। ব্রায়োফাইটের পরে জন্মায় ফার্ন বর্গ (Pteridophyte)—প্রসঙ্গত মস জাতীয় উদ্ভিদের দেহ সমাঙ্গদেহী ঃ যথা মারক্যানসিয়া (Marchantia), রিকসিয়া (Riccia) এবং মসের দেহ বেশ উন্নত কারণ মসের কাণ্ড ও পাতার মত অঙ্গ আছে কিন্তু মূল নাই, উহার পরিবর্তে রাইজয়েড (Rhizoid) থাকে।

ফার্ন বর্গে বেশ উন্নত দেহ পাওয়া যায়। ইহাদের কাণ্ড, পাতা ও মূল সবই আছে।

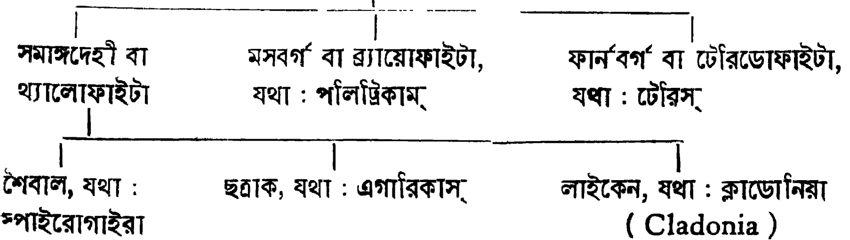
এই তিনটি শ্রেণী : যথা সমাঙ্গ দেহী (thallophyta), **মস বর্গ** (bryophyta) ও **ফার্ন বর্গ** (pteridophyta) বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাদের **স্পোর** (spore) দ্বারা বংশ বিস্তার হয়। স্পোর এককোষী দুই প্রাচীর যুক্ত অংশ। যে সকল উদ্ভিদ স্পোর দ্বারা বংশ বিস্তার করে তাহাদিগকে **ক্রিপ্‌টোগ্যাম** (cryptogam) বলে।

পৃথিবীতে বহু প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদ অতিক্ষুদ্র এবং **এককোষী** (unicellular) এবং কোন কোন উদ্ভিদ **বহুকোষী** (multicellular) এবং আকারে বিশাল। লিনিয়াস (Linnaeus—1707—1778) উদ্ভিদ জগতকে চব্বিশটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। ইহার মধ্যে **২৩টি শ্রেণী সপুষ্পক** (আজকাল ইহাকে সবীজ উদ্ভিদ বলে) এবং **২৪ শ্রেণীকে** অপুষ্পক বা **ক্রিপ্‌টোগ্যাম্‌স** বলেন। ক্রিপ্‌টোগ্যাম্‌স **স্পোর** (spore) দ্বারা বংশবিস্তার করে। স্পোর এককোষী এবং ইহার মধ্যে ভ্রূণ উদ্ভিদ থাকে না।

ক্রিপ্‌টোগ্যামস তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা **থ্যালোফাইটা** (thallophyta), **ব্রায়োফাইটা** (bryophyta) ও **টেরিডোফাইটা** (pteridophyta). **থ্যালোফাইটা**—ইহার দেহকে **সমাঙ্গদেহী** বা **থ্যালাস** (thallus) বলে। ইহাদের দেহে মূল, কাণ্ড ও পাতা থাকে না। ইহাদের দেহ এক বা বহুকোষ দ্বারা গঠিত। ইহারা উদ্ভিদ জগতের সর্বনিম্ন স্তর। ইহাদের তিনটি শ্রেণী (class) যথা **শৈবাল** বা **অ্যালগী** (algae), **ছত্রাক** বা **ফান্‌জাই** (fungi) এবং **লাইকেন** (lichen) ; **শৈবাল** নানা রঙের পাওয়া যায় এবং উহারা সালোকসংশ্লেষ করিয়া নিজ খাদ্য প্রস্তুত করে, যথা অসিলেটোরিয়া, কারা (chara), স্পাইরোগাইরা। ছত্রাক নিজখাদ্য সালোকসংশ্লেষ করিয়া তৈয়ারি করিতে পারে না, তাহারা **পরভোজী**। ছত্রাকের সবুজকণা বা ক্লোরোফিল নাই। লাইকেনের দেহ একটি শৈবাল ও ছত্রাক দ্বারা গঠিত।



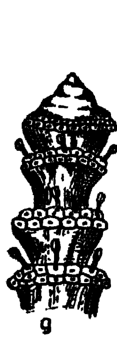
মস c = মস, c_2 = সিটা, c' = কাণ্ড।

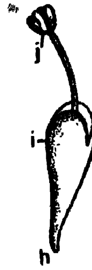


উচ্চ শ্রেণী উদ্ভিদ বীজদ্বারা বংশবিস্তার করে সুতরাং অধুনা ইহাদিগকে **সবীজ উদ্ভিদ** (spermatophyta) বলে। কেহ কেহ সবীজ উদ্ভিদকে **সপুষ্পক** বলেন। যাহাদের বীজ হয় না, তাঁহারা উহাদিগকে অপুষ্পক বা অবীজ বলেন।

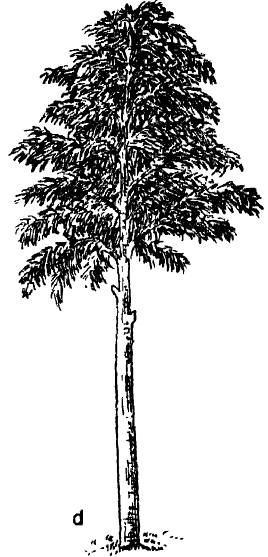
সবীজ উদ্ভিদের দুইটি বিভাগ—যথা : **গুপ্তবীজী** বা **অ্যানজিওস্পারম** (Angiosperm) ও **ব্যক্তবীজী** বা **জিমনস্পারম** (Gymnosperm)। অ্যানজিওস্পারমের বীজ ফলের মধ্যে থাকে, এইজন্য ইহাকে **আবৃত বীজ** বলে, যথা : আম, কাঁঠাল, বেল, কুমড়া, মটর ইত্যাদি। ব্যক্তবীজী বা জিমনস্পারমের বীজের উপর ফলের আবরণ থাকে না, এইজন্য ইহাদের ব্যক্তবীজী বা **নগ্নবীজ** বলে। পৃথিবীতে এক সময়ে (কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে) চারিদিকে জিমনস্পারম ছিল ; এখন তাহাদের বেশীর ভাগ পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়, যথা : পাইন, সাইকাস্, নিটাম (Gnetum) ইত্যাদি।





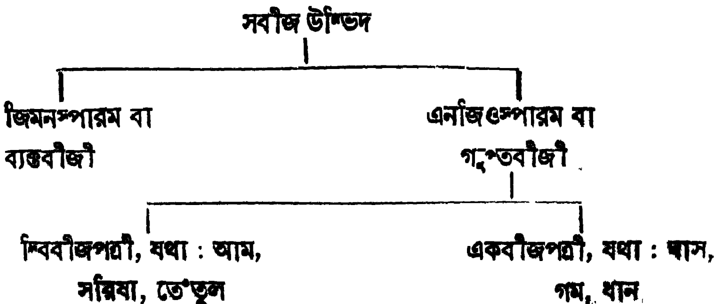


নিটাম ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ :
f=পাতা, কাণ্ড ও মঞ্জরী ; g=পুং পুষ্প মঞ্জরী ; h=পুং পুষ্প ; i=মঞ্জরীপত্র ; j=পুংকেশর ও পরাগধানী।



পাইনাস : d=ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ।

অ্যানজিওস্পারম বা **গুপ্তবীজী** উদ্ভিদ দুই প্রকারের যথা : **একবীজপত্রী** বা **মনোকটিলিডন** যাহাদের বীজে একটি মাত্র বীজপত্র বা কটিলিডন (cotyledon) থাকে যথা : ধান, গম, ভুট্টা, ঘাস, বাঁশ, সুপারি, নারিকেল, তাল ইত্যাদি। অপর প্রকারটি **দ্বিবীজপত্রী** যাহাদের বীজে দুইটি বীজ পত্র থাকে। যথা : আম, কুমড়া, লাউ, তেঁতুল, বট, নিম ইত্যাদি।



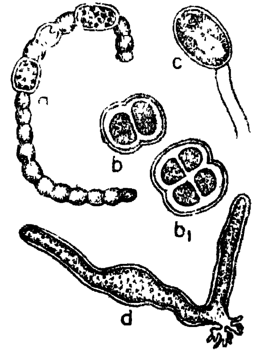
দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈবাল (Algae)

শৈবাল সমাঙ্গদেহী স্বভোজী (autophyte) উদ্ভিদ। ইহারা সচরাচর জলে থাকে। পুকুর, নদী, নালা ও সমুদ্রের জলে বাস করে। কোন কোন শৈবাল গাছের ছালে, পর্বতগাত্রে ও প্রাচীরের উপর থাকে। কোন কোন শৈবাল উচ্চ-শ্রেণী গাছের মধ্যে থাকে, উহাকে **অন্তর্বাসী** (endophyte) বলে।

শৈবালের দেহ অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক এককোষী হইতে বহুকোষী 20-30 মিটার দীর্ঘ (ল্যামিনেরিয়া—Laminaria) হইতে পারে। শৈবালের নিউক্লিয়াস প্রোকেরিওটিক বা আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত হইতে পারে, যথা নীলাভ সবুজ শৈবাল (Cyanophyceae) বা ইউকেরিওটিক বা আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত হয়, যথা স্পাইরো-গাইরা, কারা ইত্যাদি।

শৈবালের দেহ-কোষ প্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে। কোষ প্রাচীর দুইস্তর দ্বারা তৈয়ারি, বাহিরের স্তর জিলাটিনযুক্ত ও অনিবন্ধী (amorphous) এবং ভিতরের স্তর সূক্ষ্ম ও দৃঢ় তন্তু দ্বারা গঠিত। কোষ-প্রাচীর কার্বোহাইড্রেট জাতীয় সেলুলোজ, পেকটিন ও মিউসিলেজ দ্বারা তৈয়ারি। বহুক্ষেত্রে কোষ-প্রাচীরে প্রোটিনও থাকে। শৈবালের দেহ-কোষে একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস বা বহু নিউক্লিয়াস থাকে, যথা ভাউকেরিয়া। শৈবালের কোষে রঞ্জক পদার্থ ছড়ান থাকিতে পারে, অথবা প্লাসটিডের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই রঞ্জক পদার্থের ভিত্তিতে শৈবালের শ্রেণী বিভাগ হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্লাসটিডের সহিত যুক্ত দানাদার পাইরিনয়েড (pyrenoid) পাওয়া যায়। পাইরিনয়েড একটি প্রোটিনদানা যাহার চারিদিকে স্টার্চ আবরণ থাকে। সবুজ প্লাসটিড বা ক্লোরোপ্লাসটিডের নানা আকার হইতে পারে, যথা গোলাকার, তারকাকার, জালিকাকার, সর্পিলাকার ইত্যাদি।



কয়েক প্রকার শৈবাল.
a নসটক, b ও b_1—গ্লিওক্যাপসা, c—ক্ল্যামাইডোমনাস, d—ভাউকেরিয়া।

শৈবালের কোষে নানাপ্রকার খাদ্য সঞ্চিত থাকে, যথা শ্বেতসার, ল্যামিনেরিন, ম্যানিটল, ডায়াটমিন, স্নেহপদার্থ, তৈল, প্যারামাইলাম প্রভৃতি। কোষের মধ্যে ঐগুলি ছাড়া গলগি বডি, মাইটোকনড্রিয়ন (বহুবচনে mitochondria), গহ্বর, আইস্পট বা আলোকগ্রাহী বিন্দু থাকে।

শৈবালে তিন প্রকার বংশবিস্তার দেখা যায়, যথা অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন জনন (vegetative, asexual and sexual)। অযৌন পদ্ধতি **চলরেণু** (zoospore) এবং **অচলরেণু** (aplanospore) দ্বারা হইতে পারে। যৌন জনন বা বংশবিস্তার **আইসোগ্যামী** (isogamy), **অ্যানআইসোগ্যামী** (anisogamy) ও **উগ্যামী**

(oogamy) দ্বারা হয়। উচ্চ শ্রেণীর শৈবালের জনুক্রমে অযৌন ও যৌন জনুর আবর্তন (alternation of generations) দেখা যায় ; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর শৈবালে জনুক্রম পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। লিঙ্গধর শৈবাল (gametophyte) এবং রেণুধর শৈবাল (sporophyte) অসম-অঙ্গ সংস্থানযুক্ত (heteromorphic) বা সম-অঙ্গসংস্থানযুক্ত (isomorphic) দেখা যাইতে পারে।

শৈবাল—শ্রেণীবিভাগ (An outline classification of Algae with characters up to division) :—

ক্লাইস্টেনসেন ১৯৬২ সালে শৈবালের একটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তিনি যে সকল শৈবালের প্রোকেরিওটিক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ থাকে তাহাকে **প্রোকেরিওটা** (Procaryota) এবং যাহাদের ইউকেরিওটিক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ তাহাকে **ইউকেরিওটা** (Eucaryota) বলিয়াছেন। এই বিশেষত্বের সহিত ফ্লাজেলাম (বহুবচনে flagella) যুক্ত বা নাই এবং ক্লোরোফিল b আছে বা নাই, তাহাও বিশেষত্ব হিসাবে গণ্য করেন।

ক্লাইস্টেনসেনের শৈবালের শ্রেণীবিভাগ :

(ক) **প্রোকেরিওটা**	সায়েনোফাইটা	সায়েনোফাইসি (Cyanophyceae)
(খ) **ইউকেরিওটা**		
১। একনটা (ফ্লাজেলাম নাই)	রডোফাইটা	রডোফাইসি (Rhodophyceae)
২। কনটোফোরা (ফ্লাজেলাম থাকে)	ক্রোমোফাইটা (Chromophyta) Chlorophyll b নাই	ক্রিপটোফাইসি (Cryptophyceae)
		ডিনোফাইসি (Dinophyceae)
		হেপটোফাইসি (Haptophyceae)
		ব্যাসিলেরিওফাইসি (Bacillariophyceae)
		জ্যানথোফাইসি (Xanthophyceae)
		ফিওফাইসি (Phaeophyceae)
	ক্লোরোফাইটা Chlorophyll b থাকে	ইউগ্লিনোফাইসি (Eugleneophyceae)
		লক্সোফাইসি (Loxophyceae)
		ক্লোরোফাইসি (Chlorophyceae)

বহুকাল হইতে শৈবালের শ্রেণী বিভাগ ইহাদের দেহের রঙের (pigments) উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। রং ছাড়া, ফ্লাজেলাম, খাদ্য সঞ্চয় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, আন্তঃর্জাতিক উদ্ভিদ নামকরণের নিয়ম অনুযায়ী, শৈবালের ৮টি শ্রেণী। ইহার নামের শেষে ফাইটা (phyta) যুক্ত করা হয়। (১) **সায়েনোফাইটা** (Cyanophyta), (২) **ক্লোরোফাইটা** (Chlorophyta), (৩) **ইউগ্লিনোফাইটা** (Euglenophyta), (৪) **জ্যানথোফাইটা** (Xanthophyta), (৫) **ব্যাসিলেরিওফাইটা** (Bacillariophyta), (৬) **পাইরোফাইটা** (Pyrrophyta), (৭) **ফিওফাইটা** (Phaeophyta) ও (৮) **রডোফাইটা** (Rhodophyta)।

অধুনা নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ (divisions) বহু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী করিয়া থাকেন ঃ—

(১) সায়েনোফাইটা (মিকসোফাইটা বা ব্লুগ্রিন—নীলাভ-সবুজ—blue-green) শৈবাল।
(২) ক্লোরোফাইটা (সবুজ শৈবাল)
(৩) ইউগ্লিনোফাইটা
(৪) জ্যানথোফাইটা (সবুজ-হলুদযুক্ত)
(৫) ব্যাসিলেরিওফাইটা (ডায়াটম)
(৬) পাইরোফাইটা (অগ্নি শৈবাল—fire algae)
(৭) ফিওফাইটা (বাদামী শৈবাল)
(৮) রডোফাইটা (লাল শৈবাল)

শৈবাল শ্রেণীর বিশেষত্ব :—

১। **সায়েনোফাইটা** বা **মিকসোফাইটা** বা **নীলাভ সবুজ** (blue-green) শৈবাল—ইহাদের কোষের আকৃতি অত্যন্ত সরল, প্রোকেরিওটিক নিউক্লিয়াস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের প্রাচীর থাকে না এবং সবুজ কণাযুক্ত প্লাসটিড বা ক্রোমাটোফোর থাকে না। কোষের প্রোটোপ্লাস্ট দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত—(ক) কেন্দ্রে অবস্থিত রঞ্জক পদার্থবিহীন সেন্ট্রোপ্লাজম (centroplasm) বা "সেন্ট্রাল বডি" (central body) এবং (খ) প্রান্তে অবস্থিত রঞ্জক পদার্থযুক্ত ক্রোমোপ্লাজম (chromoplasm)। ক্রোমোপ্লাজমে রঞ্জক পদার্থ—ক্লোরোফিল a, জ্যানথোফিল, ফাইকোএরিথ্রিন, ফাইকোসায়ানিন, গ্লাইকোজেন (শ্বেতসার), সায়ানোফাইসিন (প্রোটীন) দানার আকারে থাকে। ইহার সেন্ট্রোপ্লাজমকে "প্রারম্ভিক নিউক্লিয়াস (incipient nucleus) বা নিউক্লিয়প্লাজম বলা হয়। ইহা বর্ণবিহীন জালিকায় প্রস্তুত এবং জালকের ফাঁকে জীনগত পদার্থ (genetic material) বা ক্রোমাটিন দানাগুলি থাকে।

ইহাদের গতিশীল কোষ একেবারেই থাকে না। ইহাদের জননক্রিয়া দুর্ঘটনাজনিত দেহবিভক্ত হইতে এবং অযৌন জনন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

২। **ক্লোরোফাইটা** (সবুজ শৈবাল)—কোষগুলি ইউকেরিওটিক। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মত সবুজকণা থাকে। স্টার্চ বা শ্বেতসার খাদ্যবস্তুরূপে সঞ্চিত থাকে।

ইহাদের যৌনজনন—আইসোগ্যামী, অ্যানআইসোগ্যামী ও উগ্যামী দ্বারা হয়। কখনও কখনও উদ্ভিদ দুইটি, কোন ক্ষেত্রে চারিটি বা বহু ফ্লাজেলাদ্বারা চলিয়া থাকে।

৩। **ইউগ্লিনোফাইটা**—ইহাদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে এবং ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড প্লাসটিডে অবস্থিত। কোষগুলি ইউকেরিওটিক। সঞ্চিত খাদ্য প্যারামাইলাম ও তৈল। প্যারামাইলাম এক প্রকার স্টার্চজাতীয় শ্বেতসার। দেহের আবরণ নাই এবং একটি, দুইটি বা কদাচিৎ তিনটি ফ্লাজেলা থাকে।

জননক্রিয়া—অযৌন ও দেহের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ দ্বারা হয়। একটিমাত্র প্রজাতিতে যৌন বংশবিস্তার দেখা যায়।

৪। **জ্যানথোফাইটা**—হলুদ ও সবুজ রং মিশ্রিত শৈবাল। ইহাদের বেশীর ভাগ মিঠাজলে পাওয়া যায়। দেহ এককোষী বা বহুকোষী হইতে পারে। কোষগুলি ইউকেরিওটিক। কোষপ্রাচীর পেকটিন দ্বারা তৈয়ারি. কদাচিৎ সেলুলোজ থাকে। কোষে চাকতির মত সবুজ প্লাসটিড থাকে। প্লাসটিড হলুদ ও সবুজ রং মিশ্রিত কিন্তু জ্যানথোফিল অধিক থাকে। পাইরিনয়েড থাকে না। তৈলজাতীয় খাদ্য সঞ্চিত হয়। স্টার্চদানা হয় না। দুইটি ফ্লাজেলাযুক্ত চলমান কোষ পাওয়া যায়। জননক্রিয়া অযৌন ফ্লাজেলামযুক্ত বা ফ্লাজেলামহীন স্পোর দ্বারা হয়।

৫। **ব্যাসিলেরিওফাইটা বা ডায়াটম** (Diatom)—ইহারা ডায়াটম নামে পরিচিত। ইহারা মিঠাজল, সমুদ্রজল, স্যাঁতসেঁতে বা ভিজামাটি, গাছের ছাল, পাহাড়ের গাত্রে জন্মায়। ইহারা এককোষী, ডিপলয়েড দেহযুক্ত এবং একক বা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। দেহ দুইটি অংশের দ্বারা নির্মিত এবং পরস্পর বাক্সের মত আবদ্ধ। কোষ প্রাচীর নানা রকমের কারুকার্য খচিত এবং পেকটিন ও উহার ভিতর সিলিকাদ্বারা তৈয়ারি। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ কোষের আকার এবং প্রাচীরের বৈশিষ্ট্যদ্বারা করা হয়। ডায়াটমের মৃত্যুর পর ইহাদের দেহ আবরণ হইতে ডায়াটমের মাটি (diatomaceous earth) পাওয়া যায়। ইহার বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। ইহারা একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং ইহাদের প্লাসটিডের ভিতর রং থাকে। সোনালি রঙের আবরণ সবুজ কণাকে আচ্ছাদিত করে। ইহাকে ডায়াটমিন (diatomin) বলে। তৈল-জাতীয় খাদ্যই প্রধানতঃ সঞ্চিত হয় এবং কিছু ভোলিউটিন (volutin) থাকে। কোষবিভাজন দ্বারা বংশবিস্তার সচরাচর হয়। বার বার কোষবিভাজনের ফলে আকারে ছোট হইলে অক্সোস্পোর (auxospore) নামক স্পোর জন্মায় এবং দেহের আকারের উন্নতি হয়। অক্সোস্পোর যৌন জনন ও অপুংজনি (parthenogenesis) সম্পন্ন করে।

৬। **পাইরোফাইটা**—ইহাদিগকে অগ্নি শৈবাল (fire algae) বলে। ইহারা এককোষী ও দুইটি ফ্লাজেলাযুক্ত। কোষের অবস্থা ইউকেরিওটিক। ডায়ানোজ্যানথিন নামক রং ও পারিডিন প্লাসটিডকে হরিদ্রা-সবুজ বা সোনালি-বাদামী করে। সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ ও তৈল। সচরাচর কোষবিভাজন দ্বারা বংশ বিস্তার হয় এবং কখন কখন জুস্পোর (zoospores) জন্মায়। যৌন বংশবিস্তার কয়েকটিমাত্র ক্ষেত্রে দেখা যায়।

৭। **ফিওফাইটা**—ইহারা বাদামী (brown) শৈবাল। ইহাদের পূর্ণাঙ্গ

নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ও প্লাসটিড থাকে। ইহাদের সবুজ প্লাসটিডের উপর ফিউকোজ্যানথিন (fucoxanthin) বা সোনালি-বাদামী রঙের আবরণ হয়। সঞ্চিত খাদ্যে সরল শর্করা, ম্যানিটল নামক কোহল (alcohol) এবং তৈল ও ল্যামিনেরিন থাকে। বংশবিস্তার আইসোগ্যামী বা উগ্যামী এবং দুইধারে ফ্লাজেলামযুক্ত যৌনকোষ দ্বারা হয়।

৮। **রডোফাইটা** বা লাল শৈবাল—কোষে সচরাচর একটি সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস থাকে। প্লাসটিডে সবুজকণা এবং লাল রঙের ফাইকোএরিথ্রিন (phycoerythrin) এবং নীল রঙের ফাইকোসাইনিন (phycocyanin) পাওয়া যায়। খাদ্য কোহল এবং ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ (floridean starch) রূপে জমা থাকে। ইহাদের কোষগুলি সাইটোপ্লাজম দ্বারা পরস্পরযুক্ত। ইহাদের ফ্লাজেলামযুক্ত যৌন কোষ একেবারেই হয় না। ইহাদের উগ্যামী দ্বারা যৌনবংশ বিস্তার হয়।

ব্যবহারিক জগতে শৈবালের প্রয়োজনীয়তা
(Economic uses of Algae)

১। প্রধানতঃ মাছ শৈবালকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। তেলাপিয়া মাছের চাষে সুতার ন্যায় শৈবাল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। মাছের সহিত বহু শৈবাল চাষ করিয়া পুকুর ও পুষ্করিণীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

৩। জলের বহু শৈবাল হইতে জলজ প্রাণী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধিলাভ করে। শৈবাল সালোকসংশ্লেষ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এই খাদ্য জলজ প্রাণী ব্যবহার করে। মাছের খাদ্য প্রধানতঃ শৈবাল এবং মাছ ভক্ষণ করিয়া বহুপ্রাণী এমনকি মানুষও ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

ডায়াটম শৈবাল হইতে তৈলজাতীয় খাদ্য ও ভোলিউটিন পাওয়া যায়। সবুজ শৈবাল শর্করা, তৈল সঞ্চিত করে। নীলাভ-সবুজ শৈবালে শর্করা ও গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়। ইউগ্লিনা হইতে প্রাপ্ত খাদ্য মাছ ব্যবহার করে।

৪। শৈবালের সাহায্যে নর্দমার আবর্জনার পচন ত্বরান্বিত করা হয়; কারণ শৈবাল সালোকসংশ্লেষ করিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং ঐ অক্সিজেন ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করিয়া নর্দমার আবর্জনা ভাঙিয়া শোধন কার্য করে।

৫। গ্রীষ্মকালে পুকুর, পুষ্করিণীর জলে বহু শৈবাল জন্মাইয়া জল দূষিত করে। দূষিত জলের উপর শৈবাল সবুজ বা নীলাভ সরের মত (scum) ভাসে এবং মাছের মত গন্ধ বাহির হয়। এই দূষিত জল পান করিলে নানা রোগ হয়। শহর অঞ্চলে যে সকল স্থানে জল রাখা হয়, সেই স্থানেও শৈবাল জন্মায়। শৈবালমুক্ত করিবার জন্য ক্লোরিন ইত্যাদি দ্বারা জল পরিষ্কার করা হয়।

৬। গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম শৈবালের সাহায্যে জন্মায়। কয়লা যেমন মাটির ভিতর জন্মাইয়াছে, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সামুদ্রিক পরিবেশে সামুদ্রিক শৈবালের সাহায্যে জন্মায়। সামুদ্রিক শৈবাল সালোকসংশ্লেষ করিয়া সৌরশক্তি দেহমধ্যে সংগ্রহ করে এবং

এই শৈবাল ভক্ষণ করিয়া সামুদ্রিক প্রাণী পুষ্ট হয়। জলের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে জৈব পদার্থ জলের সহিত স্তরে স্তরে জমিয়া গ্যাস ও তৈল সৃষ্টি করে। অবশ্য ইহা সমাধা হইতে কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায়। স্বাভাবিক গ্যাস হইল মিথেন (CH_4) এবং .মিথেন গ্যাস অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া (anaerobic bacteria) সৃষ্টি করে। গ্যাসের সহিত তৈল থাকে এবং জৈব পদার্থের উপর মিথেন মিলিত হইয়া তৈল জন্মায়। এই তৈল কাজে লাগান হয় এবং মটরগাড়ী, এরোপ্লেন, কল-কারখানায় সৌরশক্তি রূপান্তরিত হইয়া গতিশক্তি প্রদান করে।

৭। ক্লোরেলা নামক শৈবাল মহাকাশ গবেষণায় সাহায্য করে। জল মহাকাশে বহুদিন সংরক্ষিত হয় এবং জলের সহিত ক্লোরেলা রাখিলে উহার সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষের ফলে অক্সিজেন বাহির হইয়া জল ব্যবহার উপযোগী রাখে।

৮। শৈবালের সাহায্যে জলের মধ্যে চুনাপাথর জন্মায়। সমুদ্রের লাল শৈবাল স্তরে স্তরে চূণাপাথরের পর্বত তৈয়ারি করে।

৯। চীন দেশে ল্যামিনেরিয়া শৈবাল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত। পলিনেসিয়ায় "লিমু" নামক শৈবাল প্রাত্যহিক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম ইউরোপে "আইরিস মথা" নামক শৈবাল-দুধের সহিত ভেনিলা বা ফল দিয়া অতি সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ারি হয়। ইহাকে "ব্ল্যাংকম্যানজি" (blancmanges) বলে। মানুষ শৈবাল হইতে ভিটামিন A, B, C ও D, শ্বেতসার, শর্করা, বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, যেমন আয়োডিন ইত্যাদি পাইয়া থাকে। যাহারা সামুদ্রিক উদ্ভিদ ব্যবহার করে তাহাদের গয়টার (goitre) নামক রোগ হয় না। শৈবাল খাইলে কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় না। লেবুর রসের মত ক্লোরেলা খাইলে ভিটামিন C পাওয়া যায়।

১০। সার হিসাবে শৈবালের ব্যবহার—সামুদ্রিক শৈবাল বহু প্রাচীন কাল হইতেই ইউরোপে সার হিসাবে প্রচলিত আছে। আমেরিকার চাষীরা সামুদ্রিক শৈবালে পটাশ আছে জানিবার পূর্ব হইতেই ইহার ব্যবহার জানিতেন। আজকাল মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলায় ধানের চাষ করার জন্য নীলাভ-সবুজ শৈবাল সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

১১। পশুখাদ্যরূপে শৈবালের ব্যবহার—ইউরোপবাসীরা পশুখাদ্যরূপে শৈবাল ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আইসল্যান্ড ও বহু সমুদ্রোপকুলবর্তী দেশে গৃহপালিত পশুকে সামুদ্রিক শৈবাল, সমুদ্রের ভাটার সময় খাওয়ান হইত। এই সকল গৃহপালিত পশুকে সামুদ্রিক শৈবাল ভক্ষণ করাইলে দুধের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সামুদ্রিক শৈবাল নানাভাবে শুকাইয়া আমেরিকাতে মুরগী, ছাগল, গরু, শুকর ইত্যাদিকে খাইতে দেওয়া হয়।

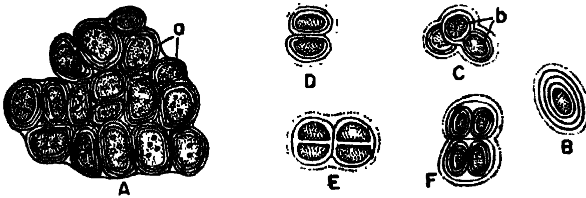
১২। ঔষধ হিসাবে শৈবালের ব্যবহার—বহু কাল হইতে চীন দেশে নানা রোগ নিরামক হিসাবে শৈবাল ব্যবহৃত হইত। সারগাসম ও ল্যামিনেরিয়া নামক শৈবাল গলগণ্ড ও নানা রোগে ব্যবহার হয়। আগরফাইট নামক শৈবাল হইতে আগর (agar) পাওয়া যায়। ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৮৮১ সালে রবার্ট কচ্ রসায়নাগারে ব্যাকটিরিয়া জন্মাইবার জন্য আগর ব্যবহার করেন। ইহা এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যক।

১৩। কারখানায় শৈবালের ব্যবহার—(ক) লাল রঙের শৈবাল হইতে আগর (agar) সংগ্রহ করা হয়। ঔষধ হিসাবে এবং গবেষণার জন্য আগর ব্যবহৃত হয়। সাবান তৈয়ারি, ফোটোগ্রাফী ফিলম্, কাগজের মসৃণতা ইত্যাদিতেও ইহার ব্যবহার আছে।
(খ) কেল্প তৈয়ারি—সামুদ্রিক শৈবাল পোড়াইয়া যে ভস্ম বা ছাই পাওয়া যায় তাহাতে সোডা ও পটাশ থাকে; ইহাকে কেল্প (kelp) বলে। বহু দেশে কেল্প মানুষ ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
(গ) আলজিন নামক পদার্থ বাদামী শৈবাল (brown algae) হইতে পাওয়া যায়। ইহা শৈবালের কোষ-প্রাচীরে থাকে। ইহার জল শোষণ করিবার ক্ষমতার জন্য আইসক্রীম তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। রং তৈয়ারি এবং পালিশেও ইহা ব্যবহৃত হয়।
(ঘ) ডায়াটমের মাটি—মৃত ডায়াটমের দেহ-প্রাচীর হইতে সিলিকা পাওয়া যায় এবং সমুদ্রের তলায় এই জীবাশ্ম স্তরে স্তরে সাজান থাকে। ডায়াটমের মাটি (diatomaceous earth) পরিশোধন (filtering) করিবার জন্য ব্যবহার হয়; রং ও ভার্নিসে ব্যবহার হয়; বয়লারের উপর আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার হয় যাহাতে তাপ সহজে বয়লার হইতে বাহির হইতে না পারে। ইহা ব্যতীত ডায়াটমের গুঁড়ার সাহায্যে ধাতু দ্রব্যাদি পালিশ করা হয় এবং দাঁতের মাজনেও ইহার ব্যবহার হয় দাঁতের পালিশের কাজে।
১৪। পরভোজী শৈবাল—চা গাছের উপর **সেফালিউরস** (Cephaleuros) **নামক** সবুজ শৈবাল জন্মাইয়া গাছের ক্ষতি করে। চাঁপা, রডোডেনড্রন গাছে এই পরভোজী শৈবাল জন্মায় ও ক্ষতি করে।

সায়েনোফাইটা বা নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা মিক্সোফাইসি
(Cyanophyta or Blue-green Algae or Myxophyceae)

গ্লিওকেপসা (Gleocapsa)

ইহা আর্দ্র পাহাড় গাত্রে বা ভিজা জমিতে এবং ফুল গাছের ভিজামাটির টবের উপর পাওয়া যায়। ইহারা এককোষী শৈবাল এবং কোষের উপর পুরু আবরণ থাকে।



গ্লিওকেপসা :
A—গ্লিওকেপসার উপনিবেশ, a=আবরণ ; B—একটি গ্লিওকেপসা ,
C—একাধিক গ্লিওকেপসা, b=আবরণ ; D, E, F—গ্লিওকেপসার বিভাজন।

কোষগুলি পিচ্ছিল মিউসিলেজ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কোষ বিভাজন করিয়া জনন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাদের ত্রিমুখী কোষ বিভাজন দেখা যায় (division in 3 planes)। শৈবালের মধ্যে ইহারাই খুব আদিম।

কখন কখনও গ্লিওকেপসা একত্রে থাকে (few celled colonies) এবং চারিদিকে মিউসিলেজ স্তরের আবরণের (lamellate mucilage envelopes) মধ্যে থাকিয়া উপনিবেশ (colony) তৈয়ারি করে। ভারতে নিম্নলিখিত প্রজাতির গ্লিওকেপ্‌সা পাওয়া যায়—**গ্লিওকেপ্‌সা এট্রেটা** (Gleocapsa atrata), **গ্লিওকেপ্‌সা পাঙ্কটেটা** (G. punctata), **গ্লিওকেপসা জিলেটিনোসা** (G. gelatinosa), **গ্লিওকেপসা মনটানা** (G. montana), **গ্লিওকেপসা রুপেসট্রিস** (G. rupestris), **গ্লিওকেপসা এরুজিনোসা** (G. aeruginosa), **গ্লিপকেপসা লুটিওফুসকা** (G. luteofusca), ইত্যাদি।

উদ্ভিদ দেহের গঠন—ইহা এককোষী সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। মাঝে মাঝে দুই-তিনটি কোষ একত্রে একটি আবরণের ভিতর থাকে এবং জিলাটিন বেষ্টিত উপনিবেশ (colony) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক কোষের কোষপ্রাচীর পৃথক, কিন্তু পরস্পর যুক্ত। আকারে গোলাকার এবং প্লোটোপ্লাষ্টের চতুর্দিকে পুরু জিলাটিনের স্তরীভূত (stratified) বা স্বচ্ছ (homogeneous) বা রঙীন কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তাহার ভিতরে সেলুলোজের কোষ প্রাচীর। কোষের ভিতর প্রোটোপ্লাষ্টের বাহিরের দিকে **ক্রোমোপ্লাজম নামক** অংশ এবং মধ্য স্থলে **সেনট্রাল বডি** বা **সেনট্রোপ্লাজম**। ক্রোমোপ্লাজমে রং, তৈল কণা এবং সায়েনোফাইসীয় স্টার্চ থাকে। ইহাদের কোষে গলগি বডি, মাইটোকনড্রিয়ন এবং এণ্ডোপ্লাজমের জাল থাকে না। ইহাদের কোষে ভ্যাকুওল নাই, কিন্তু কোষের মৃত্যুর পূর্বে ভ্যাকুওল থাকিতে পারে। ইহাদের প্রোটোপ্লাষ্টে জেলির মত (gel-like) ঘন প্রোটিন দানাকে **সায়নোফাইসিন** বলে। মধ্যস্থলের সেনট্রোপ্লাজম রংবিহীন ও স্বচ্ছ।

ক্রোমোপ্লাজমের মধ্যে সাধারণ অণুবীক্ষণে কোন অংশ পাওয়া যায় না কিন্তু অধুনা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জটিল ল্যামেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ল্যামেলার মধ্যে অন্য শৈবাল এবং উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়।

রং বা 'পিগমেণ্ট—ইহাদের ক্লোরোফিল a, b, ক্যারটিন, মিক্সোজ্যানথিন, মিক্সোজ্যানথোফিল, এনথ্যারাজ্যানথিন, c-ফাইকোসায়ানিন ও c-ফাইকোএরিথ্রিন নামক রং থাকে।

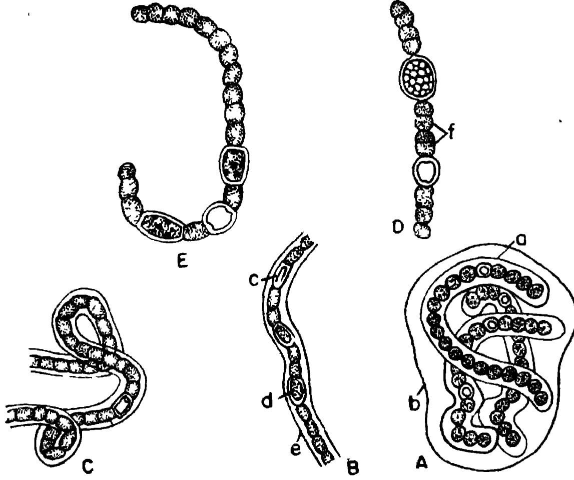
ইহাদের সেণ্ট্রোপ্লাজম অপেক্ষাকৃত ঘন অংশ এবং ইহাতে কেবল ক্রোমাটিন টুকরা পাওয়া যায়। ইহাদের নিউক্লিয়াসের প্রাচীর এবং নিউক্লিওলাস থাকে না, অর্থাৎ ইহাদের সাধারণ নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজোম নাই। এই ধরনের আদিম কোষকে প্রোকেরিওটিক কোষ বলে। সম্ভবতঃ ক্রোমাটিন সেণ্ট্রোপ্লাজমে ছড়ান থাকে। ক্রোমাটিনে DNA ; RNA ও প্রোটিন থাকে।

পুষ্টি—গ্লিওকেপসা সালোকসংশ্লেষ করিয়া খাদ্য তৈয়ারি করে ; ইহাদের সঞ্চিত খাদ্য সায়েনোফাইসিয়ান স্টার্চ ও প্রোটিন।

জনন—গ্লিওকেপসা কেবলমাত্র অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে। কোষ বিভাজন দ্বারা জনন হয়। প্রথমে ক্রোমাটিন দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং মধ্যস্থল ভাগ হইয়া দুইটি অপত্য গ্লিওকেপসা সৃষ্টি করে। ইহাদের গাত্র হইতে জিলাটিনের আবরণ (sheath) তৈয়ারি হইয়া দুইটি গ্লিওকেপসা জন্মায়। ইহাদের কোন যৌন জনন দেখা যায় না।

নসটক (Nostoc)

নসটক সায়েনোফাইটা দলভুক্ত শৈবাল। ইহারা সায়েনোফাইসি শ্রেণীর এবং নসটকেসি ফ্যামিলিভুক্ত। ইহাদের জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে জলের মধ্যে থাকে। অনেকগুলি নসটকের সুতা একত্রে জেলির মত উপনিবেশ (colony) সৃষ্টি করে। প্রথমে আকারে ছোট থাকে এবং পরে বেশ বড় আকার



নসটক

A—কয়েকটি নসটকের সূত্র, b=উহাদের আবরণ, a=একটি নসটকের আবরণ; B—নসটক সুতার অংশ, e=আবরণ, d—একাইনেট, c=হেটেরোসিস্ট; C—আবরণ ও হেটেরোসিস্টসহ জড়ান নসটক-সূত্র; D-E—সাধারণ কোষসহ একাইনেট ও হেটেরোসিস্ট, f=সাধারণ কোষ।

ধারণ করে। সূত্রগুলি ফাঁপা। একত্রে কঠিন আকার ধারণ করে। কতকগুলি প্রজাতি অন্য উদ্ভিদের দেহে বাস করে। ইহাদিগকে অন্তর্বাসী (endophyte) বলে, যেমন **এন্থোসেরস** (Anthoceros), **সাইকাস** (Cycas) বা **লেমনা** (Lemna) নামক উদ্ভিদের দেহে বাস করে। কিছু প্রজাতি পৃথিবীর কোন কোন স্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি ভারতীয় প্রজাতির নাম দেওয়া হইল—**নসটক কমিউন** (Nostoc commune), **নসটক গ্রিগেরিয়াম** (N. gregarium), **নসটক স্ফিরিয়াম** (N. spherium), **নসটক পেলুডোসাম** (N. paludosum), **নসটক এমপ্লিসিমাম** (N. amplissimum), ইত্যাদি।

দেহের গঠন—ইহারা সমাঙ্গদেহী শাখাহীন এবং জিলাটিনের আবরণযুক্ত। একাধিক সূত্র জিলাটিনের আবরণের ভিতর থাকে। সূত্রের প্রত্যেক কোষ গোলাকার বা পিপার মত। প্রত্যেক কোষেই অন্যান্য মিকসোফাইটার মত ক্রোমোপ্লাজম ও সেনট্রোপ্লাজম থাকে। ইহাদের কোষে অন্য সায়েনোফাইটার মত গলাগ বডি, মাইটোকনড্রিয়ন ও এন্ডোপ্লাজমীয় রেটিকিউলাম বা জালিকা থাকে না। প্রোটোপ্লাস্টের

বাহিরের দিকে ক্রোমোপ্লাজম ও ভিতর দিকে সেনট্রোপ্লাজম থাকে। প্রোটোপ্লাস্ট জেলির মত ঘন এবং ইহাতে সায়েনোফাইসিন নামক প্রোটিন দানা থাকে।

ইহাদের রঞ্জক পদার্থ বা রং নিম্নলিখিত, ক্লোরোফিল a, b, ক্যারোটিন, মিক্সোজ্যানথিন, মিক্সোজ্যানথোফিল, এনথেরোজ্যানথিন, আপানিসিন, ফ্লেবাসিন, লিউটিন, জিয়াজ্যানথিন, c-ফাইকোসায়ানিন, c-ফাইকোএরিথিন। এই সকল রঙের জন্য এই উদ্ভিদ নীলাভ-সবুজ। কোষের প্রাচীর স্তরীভূত মিউসিলেজ দ্বারা বেষ্টিত। সেনট্রোপ্লাজমে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না অর্থাৎ ইহা প্রোকেরিওটিক। ইহার নিউক্লিয়াস প্রাচীর ও নিউক্লিওলাস থাকে না। ইহাকে নিউক্লিওপ্লাজম বা সুপ্ত নিউক্লিয়াস (incipient nucleus) বলে। ইহার বর্ণহীন জালিকার মধ্যে ক্রোমাটিন দানা অবস্থিত। ক্রোমাটিনে DNA, RNA ও প্রোটিন থাকে।

পুষ্টি—সালোকসংশ্লেষ করিয়া ইহার পুষ্টি হয়। ইহার সঞ্চিত খাদ্য হইল সায়েনোফাইসিয়ান স্টার্চ ও কিছু প্রোটিন।

জনন—জনন তিন প্রকার—সূত্র ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক অংশ হইতে কোষবিভাজন করিয়া নূতন সূত্র সৃষ্টি হয়।

একাইনেটে নামক অংশ বংশ বিস্তার করে। একাইনেটে সাধারণ কোষ রূপান্তরিত হইয়া জন্মায়। এই স্পোর সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া পরে নূতন সূত্র সৃষ্টি করে। অবশ্য মাতৃ-সূত্র পৃথক হইবার পরেই ইহা সম্ভব হয়। একাইনেটে গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং সাধারণ কোষ অপেক্ষা আকারে বড়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্য থাকে। ইহাদের জননক্রিয়া **হরমোগনিয়ার** (hormogonia) দ্বারাও হয়। ইহাদের সূত্রে **হেটেরোসিস্ট** নামক কোষ জন্মায়। হেটেরোসিস্টগুলি যখন পৃথক হইয়া যায় তখন দেহ-সূত্রটি খণ্ডিত হইয়া যায় এবং এইপ্রকার এক একটি খণ্ড সূত্রকে হরমোগনিয়া বলে। হরমোগনিয়াগুলি পৃথক হইয়া যায় এবং নূতন নসটক সৃষ্টি করে। হেটেরোসিস্ট সূত্রের মাঝে মাঝে জন্মাইতে পারে (intercalary), আবার সূত্রের প্রান্তেও জন্মাইতে পারে। কিছুকাল পূর্বে বিভাজিত হইয়াছে—এইপ্রকার কোষ হইতেই হেটেরোসিস্ট জন্মলাভ করে। ইহাদের প্রাচীর দ্বিস্তর-বিশিষ্ট এবং অন্তর হলুদাভ তরল পদার্থে পূর্ণ। ইহাদের কোষ প্রাচীরের দুই প্রান্তে বোতামের মত দুইটি পোলার নডিউল থাকে।

৮৴ ক্লোরোফাইটা (Chlorophyta)

ইহা শৈবালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গোষ্ঠী। ইহাদের সবুজ রং ও ইউকেরিওটিক নিউক্লিয়াস উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মত; সবুজ প্লাসটিডের ভিতর ক্লোরোফিল থাকে।

✓ ক্ল্যামাইডোমনাস (Chlamydomonas)

ইহা ক্লোরোফাইসি শ্রেণীভুক্ত সবুজ শৈবাল। ইহার জেনাস ক্ল্যামাইডোমনাস। ইহা অতি প্রাচীন সবুজ উদ্ভিদ—যাহা এখনও জীবিত এবং পুকুর, ডোবার জল ও ভিজা মাটিতে পাওয়া যায়; যে স্থানে জন্মায় সেই স্থান প্রায় সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

কয়েকটি ভারতীয় প্রজাতি—**ক্ল্যামাইডোমনাস এলাকটোগামা** (Chlamydomonas alactogama), **ক্ল্যামাইডোমনাস গ্লিসগামা** (C. gloesgama), **ক্ল্যামাইডোমনাস ইনটারমিডিয়া** (C. intermedia) ও **ক্ল্যামাইডোমনাস রেনহার্ডাই** (C. reinpardi)।

গঠন—ইহা গোলাকার, নাসপাতির মত অথবা ডিম্বাকার হয়। ইহা এককোষী। ইহার কোষপ্রাচীর সেলুলোজের এবং কোন কোন সময়ে জিলাটিনের বহিরাবরণ থাকে। ইহার প্রোটোপ্লাষ্টের সম্মুখ দিকে দুইটি ফ্ল্যাজেলা (flagella) থাকে। সাইটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস, একটি পেয়ালার মত ক্লোরোপ্লাষ্ট এবং ক্লোরোপ্লাষ্টের মধ্যে পাইরিনয়েড (pyrenoid) থাকে। ফ্ল্যাজেলার নিচে সংকোচী ভ্যাকুওল (contractile vacuole) থাকে। সামনের দিকে একটি আলোকগ্রাহী বিন্দু (eye spot) দেখা যায়।

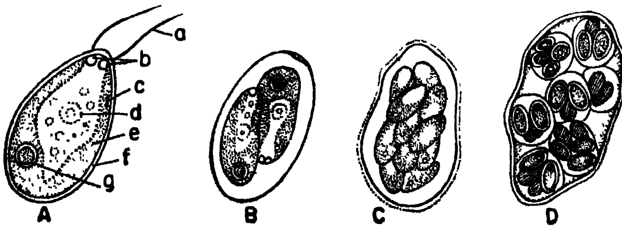
জনন (Reproduction) :—

ইহাদের অযৌন ও যৌন দুই প্রকারেরই জনন হয়।

জুস্পোর গঠন—যখন অবস্থা অনুকূল তখন জুস্পোর জন্মায়। জুস্পোর জন্মাইবার সময় ফ্ল্যাজেলাম ত্যাগ করে বা ভিতরে গ্রহণ করে। সংকোচী ভ্যাকুওল অদৃশ্য হয় এবং প্রোটোপ্লাষ্ট দৈর্ঘ্যচ্ছেদ করে। প্রত্যেক অপত্য প্রোটোপ্লাষ্ট পুনরায় ভাগ হয় এবং কখন কখন তিনবার ভাগ হয়। প্রত্যেক বিভাজনের পূর্বে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক কোষ হইতে ২—১৬টি অপত্য কোষ জন্মায়। প্রত্যেকটি প্রাচীর গঠন করে এবং দুইটি ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি করে। এবার সংকোচী ভ্যাকুওল ও সবুজকণা দেখা দেয় এবং মাতৃকোষের ভিতর ২—১৬টি **জুস্পোর** বা **সয়ার্মস্পোর** (swarmspores) জন্মায়। শেষে মাতৃকোষের প্রাচীর ফাটিয়া জুস্পোর বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেকটি হইতে নূতন ক্ল্যামাইডোমনাসের সৃষ্টি হয়।

এপ্লেনোস্পোর (aplanospore)—শুষ্ক অবস্থা হইলে (উইলি, ১৯৩০) জুস্পোর বাহির না হইয়া এপ্লেনোস্পোরে পরিণত হয়। ইহারা অনুকূল অবস্থায় আসিলে সরাসরি অঙ্কুরিত হইতে পারে অথবা জুস্পোর তৈয়ারি করে। ইহা **ক্ল্যামাইডোমনাস কডেটায়** দেখা গিয়াছে।

প্যালমেলা অবস্থা—যখন পুকুর শুকাইতে থাকে অথবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থায় অপত্য কোষগুলি মাতৃকোষ হইতে জন্মাইয়া ফ্ল্যাজেলাম সৃষ্টি করে না এবং



ক্ল্যামাইডোমনাস :
A—ক্ল্যামাইডোমনাস, a=ফ্ল্যাজেলাম b=সংকোচী গহ্বর, c—আইস্পট বা আলোকগ্রাহী বিন্দু, d=নিউক্লিয়াস, e=ক্লোরোপ্লাস্ট, f=প্রাচীর, g=পাইরিনয়েড ; B—অপত্য কোষ ; C—অনেকগুলি অপত্য ; D—অপত্য কোষ (প্যালমেলা অবস্থা)।

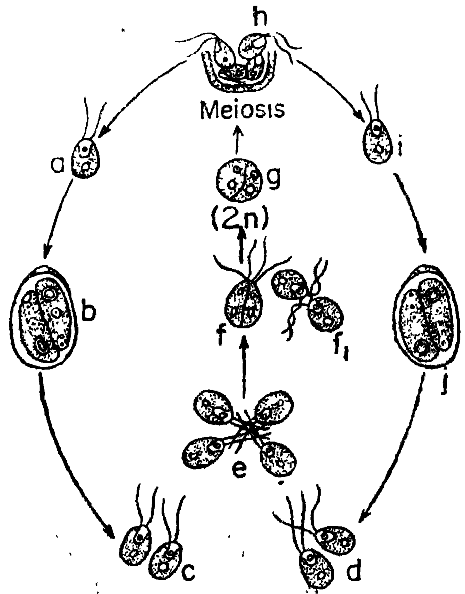
মাতৃকোষ প্রাচীর মিউসিলেজে পরিণত হয়। বহু অপত্য কোষ চারিটি ভাগ করে এবং জেলির মত জিনিসে আবদ্ধ থাকে। এইরূপে শত শত কোষের কলোনীকে প্যালমেলা অবস্থা বলে। প্রাচীন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা ইহাকে প্যালমেলা নামক শৈবাল মনে করিয়া

প্যালমেলা নামটি দিয়াছিলেন। প্যালমেলা **অবস্থা** সাময়িক, কারণ শীঘ্রই ইহারা ফ্লাজেলাম সৃষ্টি করে এবং চলাফেরা আরম্ভ করে। কখন কখন প্যালমেলা অবস্থার কোষ পুরুপ্রাচীর সৃষ্টি করিয়া **হিপনোস্পোরে** (hypnospore) পরিণত হয়। ইহার ভিতর হিমাটোক্রোম নামক লাল রং জন্মাইয়া রঙীন হয়।

যৌন জনন—ক্ল্যামাইডোমনাসে শৈবালের সকল প্রকার যৌন-জননের ইভোলিউসন (sexual evolution) দেখা যায়। ইহাদের **আইসোগ্যামী** (isogamy), **অ্যানআইসোগ্যামী** (anisogamy) এবং **উগ্যামী** (oogamy) তিন প্রকার জননই দেয়া যায়। যৌন জননের সময় কোষের প্রোটোপ্লাষ্ট ১৬, ৩২ এমনকি ৬৪টি দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত **গ্যামিট** তৈয়ারি করে। স্মিথের মতে (1955) সাধারণ কোষই গ্যামিটের কাজ করে। সচরাচর গ্যামিটের প্রাচীর থাকে না।। গ্যামিটগুলি আকারে ও প্রকৃতিতে সমান বলিয়া এই মিলনকে **আইসোগ্যামী** বলে।

কোন কোন প্রজাতির গ্যামিট আটটি বড় ম্যাক্রোগ্যামিট এবং ১৬টি ছোট মাইক্রোগ্যামিট সৃষ্টি করে। ইহার মিলনকে **অ্যানআইসোগ্যামী** বলে।

ক্ল্যামাইডোমনাস কক্‌সিফেরা ও **ক্ল্যামাইডোমনাস উগোনাম** প্রজাতিতে **উগ্যামী** দেখা যায়। স্ত্রীকোষটি উগোনিয়ামে পরিণত হয় এবং ইহার ভিতর একটি ম্যাক্রোগ্যামিট বা ডিম্বাণু (egg) সৃষ্টি হয় এবং পুংকোষটি এনথেরিডিয়ামে পরিণত হয়। ইহার ভিতর ৮, ১৬ বা ৩২টি ছোট, গোলাকার, দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুংজননকোষ তৈয়ারি হয়। ডিম্বাণুর চারিদিকে অনেকগুলি পুংজননকোষ আসে। নিষেকের পর ফ্ল্যাজেলাম অদৃশ্য হইতে পারে অথবা ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জাইগোট ১৫ দিন পর্যন্ত থাকিতে পারে। ক্ল্যামাইডোমনাস সহবাসী বা ভিন্নবাসী হইতে পারে (homothallic or heterothallic) এবং ভিন্নবাসী হইলে পৃথক ক্ল্যামাইডোমনাসের গ্যামিটের মিলন হয়। মিলনের ফলে জাইগোট পুরু বা মোটা প্রাচীর তৈয়ারি করে। ইহার রং লাল কারণ ক্লোরোফিলের উপর হিমাটোক্রোম দেখা দেয় এবং ভিতরে



ক্ল্যামাইডোমনাসের জীবনচক্র : a এবং i=দেহজ কোষ ; b এবং j=কোষবিভাজন : c এবং d=গ্যামিট ; e, f এবং f_1 – মিলনের বিভিন্ন অবস্থা ; g—জাইগোট ($2n$) ; h=অপত্য জুস্পোর।

শ্বেতসার তৈলে পরিণত হয়। জাইগোট অঙ্কুরিত হইবার সময় ইহার নিউক্লিয়াস দুইবার ভাগ হইয়া চারিটি অংশ সৃষ্টি করে। ইহারা দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর

পরিণত হয়। জুস্পোর সৃষ্টি হয় মিয়োসিস বিভাজন পদ্ধতিতে। সুতরাং ইহারা হ্যাপলয়েড (n) এবং জাইগোট ডিপলয়েড ($2n$)।

ইহার জীবনচক্রে প্রধান হইল এককোষী হ্যাপলয়েড (n) অবস্থা এবং গ্যামেট মিলনের ফলে জাইগোট হইল ডিপলয়েড ($2n$) অবস্থা। এই প্রকার জীবনচক্রের অধিকাংশ সময়ই উদ্ভিদ-কোষটি হ্যাপলয়েড থাকে বলিয়া ইহাদের হ্যাপলোবায়নটিক জীবনক্রম বলা হয়।

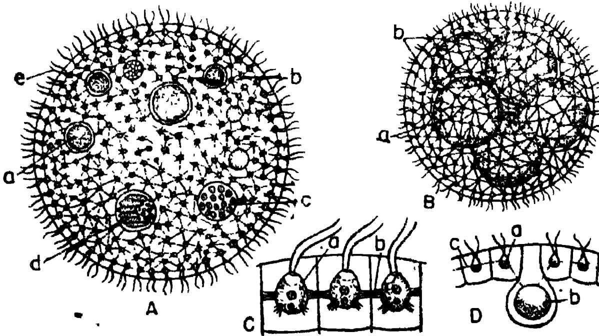
ভলভক্স (Volvox)

ইহারা ক্লোরোফাইসি শ্রেণীভুক্ত এবং ভলভকেসি ফ্যামিলি অন্তর্গত।

ভলভক্স পুষ্করিণীর মিঠা জলে প্রচুর পাওয়া যায়।

ভারতে **ভলভক্স গ্লোবেটর** (Volvox globator), **ভলভক্স অরিয়াস** (V. aureus), **ভলভক্স আফ্রিকেনাস** (V. africanus) ও **ভলভক্স প্রলিফিকাস** (V. prolificus) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ দেহের গঠন—শৈবালগুলি একত্রে সিনোবিয়াম (coenobium) আকারে সাঁতার দেয়। সিনোবিয়াম ফাঁপা গোলাকার বা ডিম্বাকার বহু ভলভক্সের চলমান কোষের বৃত্তাকার সমাবেশ বা সমষ্টি। ইহারা একত্রে আয়তনে একটি আলপিনের মাথার মত। প্রায় সহস্রাধিক ভলভক্স একটি সিনোবিয়ামের চতুর্দিকে সাজান থাকে এবং পরস্পর পিচ্ছিল মিউকাসের আবরণ বা শিদ (sheath) দ্বারা আবৃত থাকে। সিনোবিয়ামের কোষগুলি সরু সাইটোপ্লাজমের সুতার দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রত্যেক



ভলভক্স

A—পূর্ণাঙ্গ সিনোবিয়াম, a=কোষ, b=গনিডিয়া, c=শুক্রাণু, d=সাইটোপ্লাজম সুতা ; B—অপত্য ; C-D—সিনোবিয়ামের অংশ, a=কোষ, b=গনিডিয়াম।

কোষে সেলুলজের প্রাচীর এবং পুরু মিউকাসের আবরণ থাকে। ইহা প্রায় ডিম্বাকার, মধ্যস্থলে একটি নিউক্লিয়াস, একটি কাপের বা তারকার মত সবুজ প্লাসটিড এবং উহার সহিত একটি বা একাধিক পাইরিনয়েড থাকে। দুইটি করিয়া ফ্লাজেলা সিনোবিয়ামের প্রত্যেক কোষের উপরদিকে থাকে। প্রতি কোষে দুইটি বা ছয়টি সংকোচী ভ্যাকুওল এবং লাল বা বাদামী আলোকগ্রাহী বিন্দু (eye spot) সামনের দিকে অবস্থিত। ইহা আলোক দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ফ্লাজেলামের চলন নিয়ন্ত্রণ করে। সংকোচী গহ্বর প্রসারণ ও

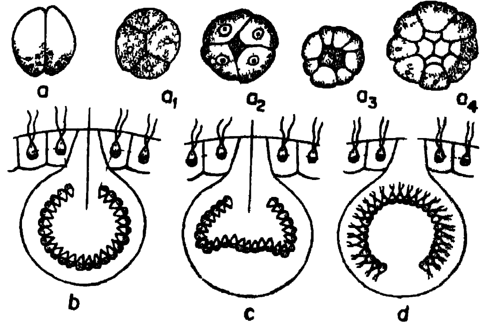
সংকোচন দ্বারা রেচন ও শ্বসনে সাহায্য করে। জলে ফ্ল্যাজেলামগুলি একত্রে চলিয়া আবর্ত সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ গোলকের ন্যায় সিনোবিয়াম জলে ঘুরিতে থাকে।

পুষ্টি—ভলভক্স সালোকসংশ্লেষ করে। শ্বেতসার সঞ্চিত খাদ্যরূপে থাকে।

জনন—অযৌন ও যৌন দুইই হয়।

অযৌন জনন—সিনোবিয়ামের কয়েকটি কোষ আকারে বড় হয় এবং ফ্ল্যাজেলাম ত্যাগ করে এবং প্রাচীর বেশ পুরু হয়। এই অযৌন স্পোরকে **গনীডিয়া** (gonidia, একবচনে gonidium) বলে। গনিডিয়াম বার বার বিভাজিত হইয়া, একটি নূতন কলোনী সৃষ্টি করে। একই সময়ে অনেকগুলি গনিডিয়া বিভাজিত হইয়া বেশ কয়েকটি কলোনী তৈয়ারি হয়। নূতন সিনোবিয়াম একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে পারে। এই ছিদ্রকে **ফিয়ালোপোর** (phialopore) বলে। অপত্য বা নূতন সিনোবিয়াম বাহির হইতে পারে কিংবা মাতৃ সিনোবিয়ামে থাকিতে পারে।

যৌন জনন—ইহা **উগ্যামী** (oogamy) দ্বারা হয়। ইহারা **সহবাসী** (homothallic) বা **ভিন্নবাসী** (heterothallic) দুইই হইতে পারে। যদি একই উদ্ভিদের মাতৃকোষ হইতে উৎপন্ন জনন কোষ (gamete) মিলিত হয়, তাহাকে সহবাসী বলে। যদি ভিন্ন উদ্ভিদের মাতৃকোষ হইতে উৎপন্ন জনন কোষ মিলিত হয়, তাহাকে ভিন্নবাসী বলে। সিনোবিয়ামের ভিতর হইতে অল্প সংখ্যায় জনন কোষ সৃষ্টি হয়। একটি গতিশীল ফ্ল্যাজেলামযুক্ত পুংজনন কোষ বা এনথেরোজয়েড একটি স্ত্রীজনন কোষের সহিত মিলিত হয়। জনন কোষগুলি যে কোন কোষ হইতে জন্মায়। স্ত্রীজনন কোষ বা ডিম্বাণু বা এগ্ (egg) মাতৃকোষ বা উগোনিয়ামের ভিতর এককভাবে জন্মায়। ইহা আকারে বড়। পুংজনন কোষের ভিতর বিভাজন হইয়া ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮, আকারে ছোট, হরিদ্রাভ, দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত পুংজনন কোষ বা এনথেরোজয়েড জন্মায়। কলোনীর মধ্যে পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষ একই সিনোবিয়ামে জন্মাইতে পারে, অর্থাৎ সহবাসী (monoecious) বা ভিন্নকলোনীতে পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজনন কোষ জন্মায় (dioecious)। সুপক্ক এনথেরোজয়েড কলোনী হইতে বাহির হইয়া সাঁতার কাটে এবং ডিম্বাণুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুর জিলাটিনের আবরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। এই মিলনকে নিষেক বলে। নিষেকের ফলে জাইগোট তৈয়ারি হয়। এই জাইগোটকে **উস্পোর** (oospore) বলে। জাইগোট মোটা প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া, কিছুকাল কলোনীতে থাকে। পরে কলোনী ভাঙ্গিয়া গেলে, পুকুরের তলায় কিছুকাল থাকিয়া, জাইগোট হইতে



ভলভক্স.
a, a_1, a_2, a_3, a_4 —২, ৪, ৮ ও ১৬ কোষ হইতে অপত্য সিনোবিয়াম ; b, c, d = ভলভক্সের সৃষ্টি ও ফ্ল্যাজেলামের উৎপত্তি।

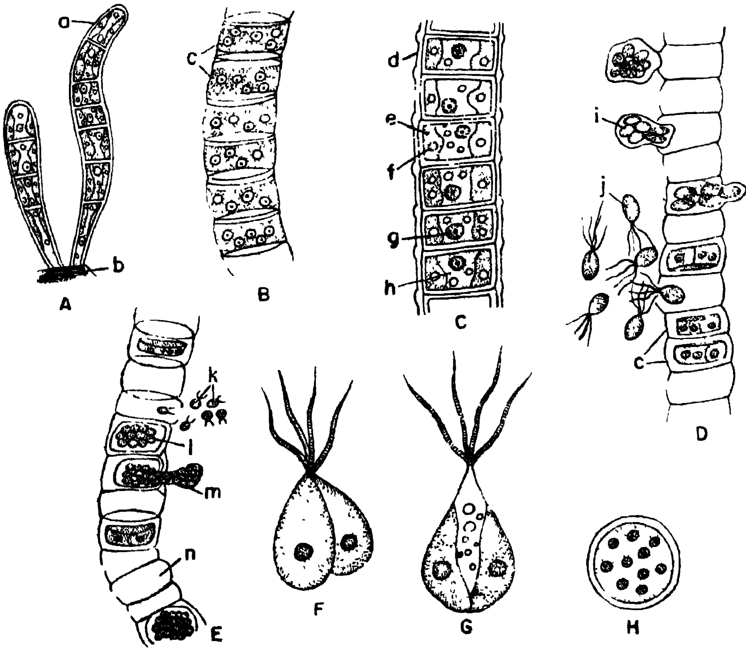
প্রোটোপ্লাষ্ট বাহির হয় এবং কোষ বিভাজন দ্বারা নূতন কলোনী জন্মায় ; জাইগোটের মধ্যে মিয়োসিস হইয়া একটি মাত্র জুস্পোর (zoospore) জন্মায়। এই জুস্পোরের প্রোটোপ্লাষ্ট হইতে নূতন কলোনীর সৃষ্টি হয়।

ইউলোথ্রিক্স (Ulothrix)

ইউলোথ্রিক্স—ক্লোরোফাইটা দলভুক্ত এবং ক্লোরোফাইসি শ্রেণী, ফ্যামিলি ইউলোট্রিকেসি, জেনাস ইউলোথ্রিক্স।

ইউলোথ্রিক্স প্রবহমান ঠাণ্ডা, মিঠা জলে পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রজাতি সামুদ্রিক। ইহারা সূত্রাকার এবং বহুকোষী সবুজ শৈবাল।

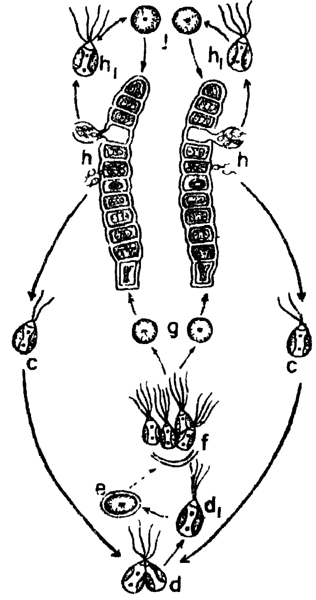
ভারতীয় **ইউলোথ্রিক্স—ইউলোথ্রিক্স একোয়ালিস** (Ulothrix acqualis), **ই. অসিলেরিনা** (U. oscillarina), **ই ভেরিএবিলিস** (U. variabilis), **ই. জোনেটা** (U. zonata), **ই. টেনেরিমা** (U. tenerrima) ইত্যাদি।



ইউলোথ্রিক্স :
A—a = ইউলোথ্রিক্সের অগ্রকোষ, b = হোল্ডফাষ্ট ; B—সাধারণ কোষ, C—d = কোষ-প্রাচীর, e = ক্লোরোপ্লাষ্ট, f = পাইরিনয়েড, g = নিউক্লিয়াস, h = সাইটোপ্লাজম ; D—i, j = জুস্পোর ; E—গ্যামিটানজিয়াম হইতে গ্যামিট, n = গ্যামিট বাহির হইয়াছে, k = গ্যামিট ; F, G—মিলন ; H—জাইগোট।

উদ্ভিদ দেহের গঠন—ইউলোথ্রিক্স, শাখাবিহীন বহুকোষী সূত্র। সূত্রটি অগ্র ও পশ্চাৎ অংশে বিভেদিত থাকে। সূত্রগুলি একই সারিতে বিন্যস্ত এবং কতকগুলি

বেলনাকার অথবা পিপাকৃতি কোষ দ্বারা গঠিত। সূত্রের পশ্চাতের কোষটি বর্ণহীন, দীর্ঘ এবং ইহাই কোন বস্তুর সহিত সূত্রকে আবদ্ধ রাখে। এই কোষকে **বন্ধক বা হোল্ডফাস্ট** (holdfast) বলে। প্রত্যেক কোষের কোষ-প্রাচীর পুরু বা পাতলা কোষ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কোষ-প্রাচীর পাতলা অথবা স্তরীভূত। পার্শ্বীয় কোষ-প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে। ভিতরের স্তর দুইটি সেলুলোজ এবং বাহিরের স্তরটি পেকটোজ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষে একটি নিউক্লিয়াস এবং ফিতার মত ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের উপর এক বা একাধিক পাইরিনয়েড থাকে। পরিণত কোষের ভ্যাকুওলগুলি একত্রিত হইয়া কেন্দ্রে থাকে এবং সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে। ইহাকে প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল (Primordial utricle) বলে। প্রোটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়নগুলি, গলগি বডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি অঙ্গাণুও (organelles) থাকে।



ইউলোথ্রিক্সের জীবনচক্র :
j=নিশ্চল জুস্পোর, h=জুস্পোর,
c=গ্যামিট, d=আইসোগ্যামী,
e=জাইগোট, f=জুস্পোর,
g=সুপ্ত জুস্পোর।

বৃদ্ধি—ইউলোথ্রিক্স শৈবালের বৃদ্ধি দেহকোষ বিভাজন দ্বারা ঘটে। দেহের মধ্যবর্তী কোষগুলি বিভাজিত হইয়া দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়।

পুষ্টি—এই শৈবাল সালোকসংশ্লেষ করিয়া শর্করা ও শ্বেতসার তৈয়ারি করে।

চলন—ইহাদের চলনশক্তি নাই, জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

জনন—ইহাদের তিন প্রকার জননক্রিয়া দেখা যায়—**অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন**।

অঙ্গজ জনন—সূত্রগুলি যে কোন কারণে কয়েকটি খণ্ডে (fragmentation) বিভক্ত হইতে পারে। খণ্ডাংশগুলি পরে কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় এক একটি পূর্ণাঙ্গ শৈবাল সৃষ্টি করে।

অযৌন চলরেণু (Swarmer)—এই শৈবাল দুই প্রকার চলরেণু বা সোয়ারমার সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা **ইউলোথ্রিক্স জোনেটা** নামক প্রজাতিতে পাওয়া যায়।

(ক) **ম্যাক্রোজুস্পোর** (Macrozoospore)—ইহারা আকারে অন্য জুস্পোর অপেক্ষা বড় এবং চারিটি ফ্লাজেলামযুক্ত। ইহারা সূত্রের যে কোন কোষ হইতে জন্মায় কেবল শেষের (প্রান্তের) কোষ হইতে হয় না। কোষের প্রোটোপ্লাস্ট ২, ৪, ৬ ভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেকটি জুস্পোর তৈয়ারি করে।

(খ) **মাইক্রোজুস্পোর**—এই জুস্পোর আকারে ছোট এবং দুইটি বা চারিটি ফ্লাজেলামযুক্ত হয়। ইহারা প্রত্যেক কোষে সংখ্যায় বেশী জন্মায়। ইহারা ম্যাকরোজুস্পোরকারী সূত্রে বা পৃথক সূত্রে জন্মাইতে পারে। প্রত্যেক কোষে ৮, ১৬,

৩২টি মাইক্রোজ়ুস্পোর জন্মাইতে পারে। জুস্পোরের আকার একই প্রকার, কেবল বড় বা ছোট। প্রত্যেকটি নাশপাতির মত এবং একদিক মোটা এবং অপর দিক সরু। নিচের দিকে একটি সবুজ, বড় প্লাসটিড ও নিউক্লিয়াস থাকে এবং উপর দিকে স্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজম। প্রত্যেক জুস্পোরে দুইটি সংকোচী ভ্যাকুওল থাকে। সরু দিকে বা উপর দিকে দুইটি বা চারিটি সিলিয়াম (বহুবচনে cilia) ও আলোকগ্রাহী বিন্দু থাকে। আলোকগ্রাহী বিন্দুর দ্বারা আলোকের তীব্রতা স্থির করে।

এপ্লেনোস্পোর বা হিপনোস্পোর—যখন জলের অভাব হয় তখন জুস্পোর না জন্মিয়া অচল, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এপ্লেনোস্পোর জন্মায়। এপ্লেনোস্পোর অংকুরিত হইয়া নূতন সূত্র সৃষ্টি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাষ্ট একটিমাত্র মোটা প্রাচীরযুক্ত এপ্লেনোস্পোর তৈয়ারি করে, ইহাকে হিপনোস্পোর বলে। জুস্পোরগুলি মাতৃকোষ ভাঙ্গিলে জলে বাহির হইয়া সাঁতার কাটিতে থাকে। ইহারা উজ্জ্বল আলোকবিরোধী। জুস্পোর অংকুরিত হইয়া নিচের কোষের দ্বারা কোন আশ্রয় পদার্থে আবদ্ধ হয়। নিচের কোষটিকে **বন্ধক বা হোল্ডফাস্ট** বা **হেপটেরা** বলে। কোষ বিভাজিত হইয়া একটি নূতন ইউলোথিক্স জন্মায়।

একাইনেটে (Akinete)—পুকুরের জল শুকাইলে সূত্র ভাঙিয়া কতকগুলি মোটা প্রাচীরের একাইনেটে সৃষ্টি করে। ইহারা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে এবং জল পাইলে বা অনুকূল অবস্থা হইলে পুরু প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং নূতন সূত্র জন্মায়।

প্যামেলা অবস্থা —জল শুকাইলে পুকুরের ধারে ইউলোথিক্স কোষগুলি সকল দিকে বিভক্ত হইয়া কলোনী সৃষ্টি করে। ইহার উপর মিউসিলেজের আবরণ জন্মায় এবং ইহা শৈবালটিকে শুকাইতে দেয় না। জল পাইলে কলোনীর প্রত্যেক কোষ জুস্পোর হইয়া নূতন সূত্র সৃষ্টি করে। এই অবস্থাকে প্যামেলা বলে।

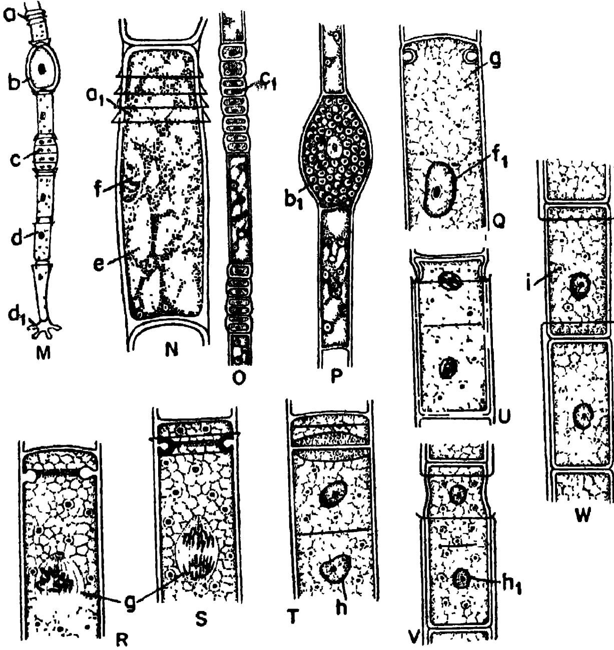
যৌন জনন –ইহা **আইসোগ্যামী** (Isogamy) দ্বারা হয়। দুইটি জননকোষ একই প্রকার এবং দেখিতে ছোট জুস্পোরের মত। সূত্রের একটি কোষের নিউক্লিয়াসও সাইটো-প্লাজম ৮, ১৬, ৩২, ৬৪টি জননকোষ তৈয়ারি করিতে পারে। এই জননকোষগুলি আকারে একই প্রকারের বলিয়া আইজোগ্যামিট বলে এবং দুইটি আইজোগ্যামিটের মিলনকে আইজোগ্যামী (Isogamy) বলে। গ্যামিটগুলি দুই সিলিয়ামযুক্ত এবং মাতৃকোষ ফাটিয়া বা ভাঙিয়া গ্যামিটগুলি বাহির হয় ও জলে সাঁতার কাটিতে থাকে। ইহারা **হেটেরোথালিক** অর্থাৎ একটি সূত্রের গ্যামিট অপর একটি সূত্রের গ্যামিটের সহিত মিলিত হয়। দুইটি গ্যামিট মিলিত হইয়া একটি **জাইগোট** বা **জাইগোস্পোর** সৃষ্টি করে। ইহা প্রথমে চারিটি সিলিয়ামযুক্ত থাকে এবং জলে সাঁতার কাটে। পরে সিলিয়ামগুলি লুপ্ত হয় এবং চারিদিকে পুরু আবরণ সৃষ্টি করিয়া বিশ্রাম করে। পাঁচ হইতে নয় মাস পরে, জাইগোট অংকুরিত হয়। ইহার ভিতর জাইগোট নিউক্লিয়াস মিয়োসিস করিয়া চারিটি হইতে ষোলটি পর্যন্ত জুস্পোর বা এপ্লেনোস্পোর তৈয়ারি করে। প্রত্যেকটি স্পোর হইতে একটি নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। শৈবালটি "n" বা হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় থাকে। জাইগোট "2n" বা ডিপ্লয়েড অবস্থায় থাকে।

ইউলোথিক্স শৈবালের সূত্রটি গ্যামিটোফাইট (n) এবং জাইগোটটি (2n) ডিপ্লয়েড। ইহার জীবন-চক্র উন্নত উদ্ভিদের মত নহে।

ইডোগোনিয়াম (Oedogonium)

ইডোগোনিয়াম ক্লোরোফাইটা দলভুক্ত, ক্লোরোফাইসি শ্রেণীর, ইডোগোনিয়েলিস বিভাগ এবং ইডোগোনিয়েসি ফ্যামিলির অন্তর্গত।

ইডোগোনিয়াম পুকুরের মিঠা জলের সবুজ শৈবাল, সূত্রাকার এবং জলে নিমজ্জিত থাকে। সকল প্রজাতিই কোন বস্তুতে জীবনের প্রথম অবস্থায় আবদ্ধ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শৈবাল-সূত্র পৃথক হইয়া জলে ভাসিতে থাকে। কয়েকটি প্রজাতি অন্য উদ্ভিদের উপর এপিফাইট রূপে বাস করে।



M=ইডোগোনিয়াম, a=ক্যাপ কোষ, b=উগোনিয়াম, c=এনথেরিডিয়াম, d=সাধারণ কোষ, d_1=হোল্ডফাস্ট ; N—a_1=ক্যাপ, f=নিউক্লিয়াস, e=পাইরিনয়েড ; O—c_1=এনথেরিডিয়াম : P=উগোনিয়াম ; Q—f_1=নিউক্লিয়াস, g=সাইটোপ্লাজম ; R, S, T, U, V, W—নিউক্লিয়াস ও কোষ-বিভাজন।

ভারতীয় প্রজাতিগুলি হইল—**ইডোগোনিয়াম এরিওলেটাম** (Oedogonium areolatum), **ই. আরমিজেরাম** (O. armigerum), **ই. এলিগ্যানস** (O. elegans), **ই. কেলভাম** (O. calvum), **ই. গ্ল্যাবরাম** (O. glabrum), ইত্যাদি।

দেহের গঠন—ইহারা সমাঙ্গদেহী এবং কতকগুলি বেলনাকার কোষ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সূত্র তৈয়ারি করে। উপর প্রান্ত ও নিচের প্রান্ত দেখিতে পৃথক। নিচের প্রান্তের কোষটি বন্ধক বা হোল্ডফাস্টে পরিণত হইয়া সূত্রকে কোন বস্তুর সহিত জলের মধ্যে আবদ্ধ করে। উপর প্রান্তের কোষটি উত্তল। কোষ-প্রাচীর—যদিও দেখিতে সমরূপ

কিন্তু ইহার তিনটি স্তর থাকে—(১) ভিতরের সেলুলোজের স্তর প্রোটোপ্লাষ্টের সহিত যুক্ত থাকে, (২) মাঝে পেকটোজের স্তর এবং (৩) বাহিরে কাইটিন স্তর। সর্বনিম্ন কোষে বাহিরের স্তর নাই। প্রায় প্রত্যেক কোষে উপর দিকে টুপির মত রেখা বা ডোরা থাকে, ইহাকে **এপিক্যাল ক্যাপ** (apical cap) বলে। সুতরাং মাঝের কোষগুলিতেও অগ্রপশ্চাৎ অংশ দেখা যায়। কোষ-প্রাচীরের নিকটে প্রত্যেক কোষে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস আকারে বড় এবং ইহাতে এক বা একাধিক নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়াসের জালিকা পাওয়া যায়। ইহার সবুজ প্লাসটিড অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং জালিকা আকারে সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে। এই জালিকার মধ্যে বহু পাইরিনয়েড থাকে। প্রত্যেক পাইরিনয়েডের চারিদিকে শ্বেতসারের আবরণ দেখা যায়। স্টার্চদানা ক্লোরোপ্লাষ্টের জালিকার মধ্যে জমা হইতে পারে ; ইহাকে **ষ্ট্রোমাস্টার্চ** (stroma starch) বলে।

সূত্রের কোষগুলি বিভাজিত হইয়া ইহাকে দীর্ঘায়িত করে। কেবল সর্বনিম্ন কোষের বিভাজন হয় না। কোষ বিভাজনের সময়ে কোষের উপরিভাগে ভিতরের প্রাচীরের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া গোলাকার স্ফীতি দেখা দেয়, এবং নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রণালীতে বিভক্ত হয়। অতঃপর কোষের সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। প্রথমোক্ত বিভাজনকে কেরিওকাইনেসিস এবং পরেরটিকে সাইটোকাইনেসিস বলে। অপত্য কোষ দীর্ঘ হইয়া মাতৃকোষের আকার পাইয়া থাকে। বিভাজনের পর বিভাজিত কোষের উপরিভাগে প্রাচীরের কিয়দংশ থাকিয়া যায় ; উহাকে "এপিকাল ক্যাপ" বা অগ্রকোষ বলা হয়। ইডোগনিয়াম-সূত্রের মধ্যস্থান হইতে কোষ বিভাজন হয় (intercalary), অর্থাৎ অগ্র বা পশ্চাৎ হইতে নহে। কোষে টুপির মত "ক্যাপ কোষ" (cap cells) ইহাদের বৈশিষ্ট্য। "এপিকাল ক্যাপ"-এর সংখ্যা দেখিয়া একটি কোষ কতবার বিভাজিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা যায়।

জনন -তিন প্রকার জননক্রিয়া দেখা যায়—(১) **অঙ্গজ**, (২) **অযৌন** ও (৩) **যৌন**। অযৌন জনন গ্রীষ্মকালে অনুকূল অবস্থায় হয়। যৌন জনন পদ্ধতি প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ জলের অভাব ইত্যাদিতে হয় এবং শৈবাল জাইগোট অবস্থায় প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে।

অঙ্গজ জনন—সাধারণত ইহাদের সূত্র কোন দুর্ঘটনায় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া নূতন শৈবাল সৃষ্টি হয়। যে সকল প্রজাতি জলে ভাসিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বংশ বিস্তার দেখা যায়। যে সকল প্রজাতি সারাজীবন আবদ্ধ থাকে তাহাদের সচরাচর এইভাবে সূত্র ভাঙ্গিয়া (fragmentation) বংশ বিস্তার হয় না।

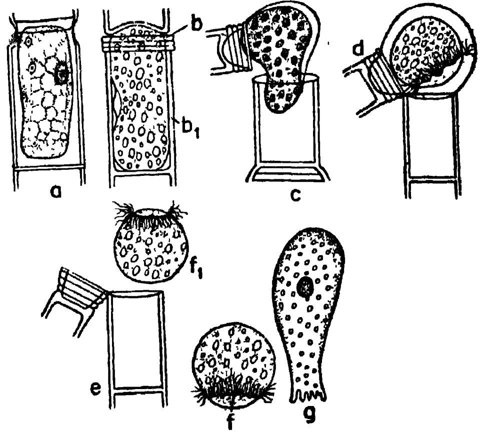
অযৌন জনন—ইহা জুস্পোর ও একাইনেটে দ্বারা হয়। জলে অতিরিক্ত CO_2 থাকিলে জুস্পোর জন্মায়। উপর প্রান্ত ও নিচের প্রান্তের কোষ ব্যতিরেকে, সকল টুপিযুক্ত (apical cap) কোষ জুস্পোর থলিরূপে (Zoosporangium) কাজ করে। এই থলির মধ্যে বহু সিলিয়াযুক্ত একটি জুস্পোর জন্মায়। জুস্পোর তৈয়ারির সময় কোষের সাইটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয় এবং ইহার সামনের দিকে কিছুটা স্বচ্ছ অংশ থাকে। স্বচ্ছ অংশের চারিদিকে ফ্লাজেলামগুলি জন্মায়। মাতৃকোষটিকে জুস্পোরানজিয়াম

বলা হয় এবং ইহা হইতে একটি ডিম্বাকার বহু ফ্লাজেলামযুক্ত জুস্পোর বাহির হয়। জুস্পোর কিছুকাল জলে সাঁতার কাটে এবং পরে স্বচ্ছ দিকটি কোন স্থানে আবদ্ধ হয় এবং কোষ বিভাজন করিয়া নূতন সূত্র সৃষ্টি করে।

একাইনেটে—প্রতিকূল অবস্থা হইলে কোষের মধ্যে একটি একাইনেটে জন্মায় (রণধোয়া ১৯৭৩ সালে বাহির করেন)। অনুকূল অবস্থায় একাইনেটে হইতে সরাসরি নূতন সূত্র তৈয়ারি হয় (স্টল ১৮৯১)।

যৌন জনন—যৌন জনন উগ্যামী দ্বারা হয়। ইহা বেশীর ভাগ স্থির জলে হয়। পুংজনন অঙ্গকে অ্যানথেরিডিয়াম (antheridium) ও **স্ত্রীজনন অঙ্গকে উগোনিয়াম** (oogonium) বলে। যৌন জনন দুই রকমের—(১) **ম্যাক্র্যানড্রাস** (macrandrous) এবং (২) **ন্যানানড্রাস** (nannandrous)।

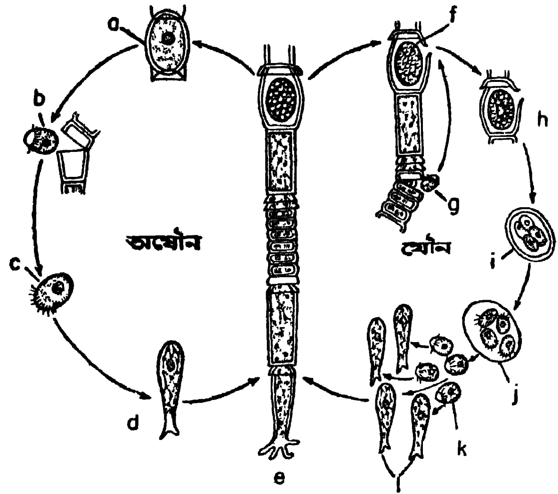
ম্যাক্র্যানড্রাস—সাধারণ সূত্রে অ্যানথেরিডিয়াম জন্মাইলে তাহাকে **ম্যাক্র্যানড্রাস** বলে। ইহা যে সূত্রে উগোনিয়াম জন্মায় তাহাতে হইলে **মনিসাস** (monecious) অথবা সহবাসী এবং পৃথক সূত্রে পুংজনন অঙ্গ (antheridium) ও স্ত্রীজনন অঙ্গ (oogonium) জন্মাইলে তাহাকে **ডায়িসাস** (dioecious) বা ভিন্নবাসী বলে। প্রায় অর্ধেকের উপর প্রজাতি **মনিসাস**। ম্যাক্র্যানড্রাস সূত্র সহবাসী (monoecious) বা ভিন্নবাসী (dioecious) উভয় ক্ষেত্রেই অ্যানথেরিডিয়া সূত্রের মাঝে (intercalary) বা প্রান্তে (terminal) জন্মাইতে পারে। অ্যানথেরিডিয়াম মাতৃকোষ সাধারণ কোষের মত বিভাজিত হয়। উপরের কোষটি আকারে ছোট এবং ইহা অ্যানথেরিডিয়াম এবং নিচের কোষ বিভাজিত হইয়া ২ হইতে ৪০টি অ্যানথেরিডিয়াম সৃষ্টি করিতে পারে। প্রত্যেক অ্যানথেরিডিয়াম বিভক্ত হইয়া দুইটি পুংজনন কোষ বা স্পার্ম (sperm) জন্মায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি করিয়া পুংজনন কোষ হয়। পুংজনন কোষ দেখিতে জুস্পোরের মত কিন্তু আকারে ছোট এবং ক্লোরোফিল অল্প থাকে। পুংজনন কোষ, মাতৃকোষ হইতে একটি আবরণের সহিত জলে বাহির হয়।



ইডোগোনিয়াম : a=জুস্পোরানজিয়াম, b=ক্যাপ, b_1=জুস্পোরানজিয়াম, c, d, e=জুস্পোর বাহির হইতেছে, f_1, f, g=অঙ্কুরিত জুস্পোর।

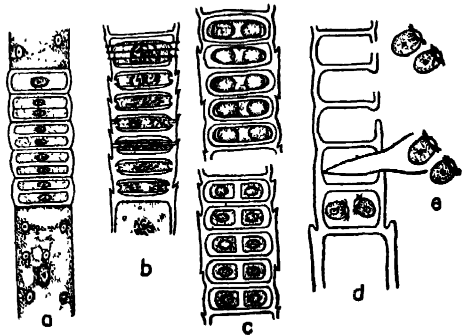
ন্যানানড্রাস প্রজাতিতে অ্যানথেরিডিয়ামছোট পুং(dwarf male) ইডোগোনিয়ামের উপর জন্মায়। ইহাকে **ন্যানানড্রিয়াম** (nannandrium) বলে। ন্যানানড্রিয়াম বিশেষ ধরনের জুস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া জন্মায়। ইহাকে **অ্যান্ড্রোস্পোর** (androspore) বলে। অ্যান্ড্রোস্পোর দেখিতে জুস্পোরের মত কিন্তু আকারে ছোট ও হলুদ রঙের। যে

সূত্রে উগোনিয়া জন্মায়, সেই সূত্রে এন্ড্রোস্পোর জন্মাইতে পারে, অথবা ভিন্ন সূত্রে জন্মায়। একই সূত্রে জন্মাইলে তাহাকে **জাইন্যানড্রোস্পোর** এবং এই প্রজাতিকে **জাইন্যানড্রোস্পোরাস** বলে। পৃথক সূত্রে জন্মাইলে **ইডিওএন্ড্রোস্পোর** এবং প্রজাতিকে **ইডিওএন্ড্রো-স্পোরাস** বলা হয়।



ইডোগোনিয়ামের জীবন-চক্র : a=জুস্পোরানজিয়াম, b=জুস্পোর বাহির হইল, c=জুস্পোর, d=অংকুরিত, e=নূতন সূত্র, f=ডিম্বাণু, g=শুক্রাণু, h=নিষেক, i=মায়োসিস, j=জুস্পোর, k=অংকুরিত।

এন্ড্রোস্পোর্যানজিয়া অ্যানথেরিডিয়ামের মত, কিন্তু মাতৃকোষটি অসমানভাবে (unequal) বিভক্ত হয়। প্রতি এন্ড্রোস্পোর্যানজিয়ামে কেবল একটি এন্ড্রোস্পোর জন্মায়। আকারে ইহা জুস্পোর ও পুংজনন কোষের মাঝামাঝি হয়। এন্ড্রোস্পোরের বাহিরে আবরণ থাকে। এন্ড্রোস্পোর বাহির হইলে আবরণমুক্ত হয় এবং চারিদিকে সাঁতার কাটিয়া একটি উগোনিয়াম বা স্ত্রী সূত্রের উপর অংকুরিত হয়। ইহা হইতে একটি পুংসূত্র (dwarf male) বা ছোট সূত্র জন্মায়। ইহার নিচের প্রান্তে একটি কোষ থাকে (holdfast), এবং এক বা একাধিক অ্যানথেরিডিয়াম জন্মায়। অ্যানথেরিডিয়াম হইতে দুইটি পুংজনন কোষ বা এনথেরোজয়েড তৈয়ারি হয়। প্রত্যেক পুংজনন কোষের উপর দিকে অনেকগুলি ফ্লাজেলাম থাকে। মাতৃকোষ ফাটিয়া পুংজনন কোষগুলি বাহির হয়। উগোনিয়াম একই নিয়মে সকল প্রজাতিতে সৃষ্টি হয়। একটি কোষ বিভাজিত হইয়া উগোনিয়াম-মাতৃকোষ তৈয়ারি করে।

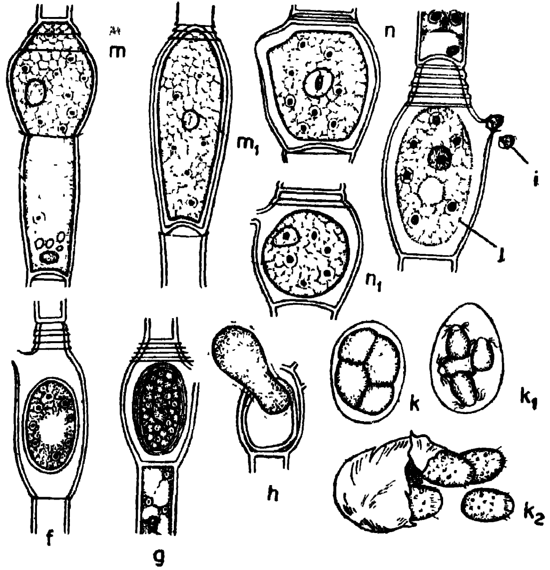


ইডোগোনিয়াম-শুক্রাণু : a=অ্যানথেরিডিয়াম, b=শুক্রাণু সৃষ্টি, c, d=শুক্রাণু বাহির হইল।

ইহা সূত্রের মধ্যস্থলে বা উপর প্রান্তে জন্মায়। বিভাজিত উপরের কোষটি হইতে উগোনিয়াম সৃষ্টি হয় এবং নিচের কোষকে সাহায্যকারী কোষ বা **সাফালটারী কোষ** (suffultory cell) বলে। প্রত্যেক উগোনিয়াম ডিম্বাকার বা গোলাকার

হয় এবং একটি স্ত্রীজনন কোষ বা উস্ফীয়ার (oosphere) তৈয়ারি করে। উস্ফীয়ারে প্রচুর ক্লোরোফিল থাকে। নিষেকের (fertilization) পূর্বে ডিম্বাণু প্রাচীর হইতে কিছুটা পৃথক হয় এবং একটি স্বচ্ছগ্রাহী অংশ (hyaline recepti.e spot) সৃষ্টি করে। নিষেকের পূর্বে একটি গর্তের মত উগোনিয়ামের প্রাচীরে দেখা দেয় এবং কিছুটা প্রোটোপ্লাজম একটি পিচ্ছিল পথ সৃষ্টি করে। গ্রাহী অংশের মধ্যে পুংজনন কোষ প্রবেশ করে।

পুংজনন কোষ ডিম্বাণুর সহিত মিলিতে প্রায় দুই মিনিটের মত সময় লাগে। নিষেকের ফলে উস্পোর বা জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট একটি পুরু প্রাচীর তৈয়ারি করে। জাইগোটের প্রাচীরে দুই-তিনটি স্তর থাকে এবং ইহার রং লাল। প্রথমে জাইগোট সবুজ হয় এবং পরে ইহা বাদামী বা লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয় এবং ইহার ভিতর লাল তৈলকণা দেখা যায়। উগোনিয়ামের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং উস্পোর বা জাইগোট বাহির হয়। জাইগোট প্রায় এক বৎসর বিশ্রাম করে এবং পরে অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়। বিশ্রামকারী জাইগোট বিশ্রামকারী স্পোরের (resting spore) মত কাজ করে। ইহাতে শৈবালটি প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে। জাইগোট অঙ্কুরিত হইবার সময় পুনরায় সবুজ হয় এবং নিউক্লিয়াসটি মিয়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া প্রথমে দুই এবং পরে চারিটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ইহার পর সাইটোপ্লাজম ভাগ হইয়া চারিটি জুস্পোর তৈয়ারি হয়। জুস্পোর বাহিরে আসিবার সময় একটি পাতলা আবরণের (vesicle) মধ্যে থাকে। জলের মধ্যে জুস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া নূতন সূত্র তৈয়ারি করে।



ইডোগোনিয়াম-ডিম্বাণু : f—m = উগোনিয়াম, g = উহার মাতৃকোষ, h = উস্পোর, i = শুক্রাণু, j = ডিম্বাণু, k_1, k_2 = জুস্পোর।

১৯৩১ সালে ম্যোন্স (Moinx) দেখিয়াছেন চারিটি জুস্পোরের দুইটি হইতে পুং সূত্র (male filament) এবং দুইটি হইতে স্ত্রী সূত্র (female filament) জন্মায়।

জীবন-চক্র
Alternation of generations

ইডোগোনিয়ামের জীবন-চক্রে জাইগোটটি কেবলমাত্র ডিপ্লয়েড অবস্থা দেখায়, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়েই শৈবালটি হ্যাপ্লয়েড। ইহার হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ-দেহ অন্যান্য শৈবালের তুলনায় বেশ উন্নত।

ভিন্নবাসী জীবন-চক্র : a = সূত্র, b = কোষ, c ও c_1 = এন্ড্রোস্পোরানজিয়া, p = জুস্পোর, q = জুস্পোর, r = অঙ্কুর, d = এন্ড্রোস্পোর, e = উগোনিয়াম, e_1 = ছোট পুংসূত্র, f = উস্পোর, g = মায়োসিস, h = জুস্পোর, i = অঙ্কুর, j = সূত্র, m = জুস্পোর, n = সূত্র।

ইডোগনিয়ামের জীবন-চক্রের বৈশিষ্ট্য

১। শৈবালের দেহের কোষগুলি প্রায় একই প্রকারের এবং সাধারণ কোষ হইতে এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়া জন্মায়।

২। কোষ বিভাজন ও টুপিযুক্ত কোষ (cap cells) ইহার বৈশিষ্ট্য।

৩। জুস্পোর ও পুংজনন কোষ বহু সিলিয়ামযুক্ত।

৪। গ্যামিটগুলি দুই রকমের (heterogametes)।

৫। জুস্পোর হইতে নূতন সূত্র সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় কিন্তু উস্পোর বিশ্রাম করে।

৬। উস্পোর মিয়োসিস প্রণালিতে বিভক্ত হইয়া জুস্পোর সৃষ্টি করে।

৭। ন্যানানড্রাস প্রজাতিতে এন্ড্রোস্পোর হইতে ছোট পুং সূত্র জন্মায়।

ইডোগোনিয়ামের বিভিন্ন প্রকার জীবন-চক্র

(১) ম্যাক্র্যানড্রাস সহবাসী (monoecious) প্রজাতি

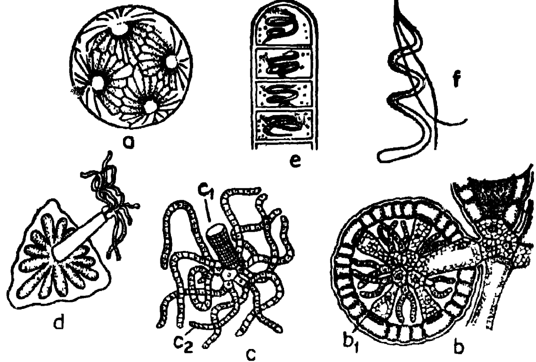
(২) ম্যাক্র্যানড্রাস ভিন্নবাসী (dioecious) প্রজাতি

(৩) ন্যানান্‌ড্রাস প্রজাতি

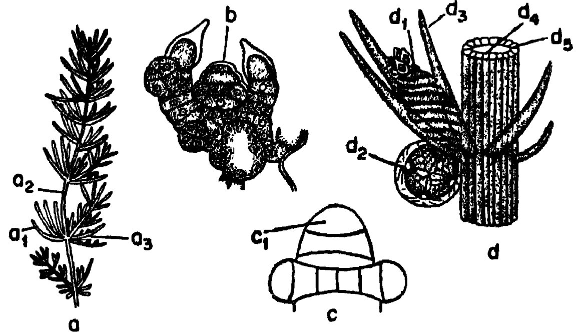
কারা (Chara)

কারা ক্লোরোফাইটা দলভুক্ত এবং ইহা ক্লেরোফাইসি শ্রেণীর অন্তর্গত। কারার ফ্যামিলি (family) কেরেসি (characeae) এবং জেনাস কারা।

কারা পুকুর, হ্রদ ও অল্প স্রোতের নদীর নিচে রাইজয়েড দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উদ্ভিদ-দেহ প্রায় ২০—৩০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ এবং আকারে সরু (slender)। প্রধান কাণ্ড, পর্ব ও পর্ব-মধ্যে বিভক্ত এবং কতকগুলি ছোট শাখা বৃত্তাকারে পর্বের চতুর্দিকে সাজান থাকে। এই সকল পার্শ্বের শাখাকে অনেকে পাতা বলে। ছোট শাখা পাতার কক্ষে জন্মাইতে পারে। পর্বমধ্যের কেন্দ্রে একটি দীর্ঘ বেলনাকার (cylindrical) কোষ থাকে, এবং ইহার চারিদিকে সরু ও দীর্ঘ কোষগুলি পর্ব হইতে উঠিয়া আবরণ সৃষ্টি করে। ইহাকে কর্টেক্স (cortex) বলে। দৈর্ঘ্যচ্ছেদ করিলে এই কর্টেক্স স্পষ্ট বুঝা যায়। এই শৈবালের উপর ক্যালসিয়াম কারবনেটের আস্তরণের জন্য দেহত্বক রুক্ষ হয় এবং তাহার জন্য ইহাকে ষ্টোনওয়ার্ট (stone-wort) বলে। বহুকোষী রাইজয়েডগুলিতে পর্ব থাকে না। রাইজয়েড শৈবালকে মাটি হইতে রসশোষণ ও মাটির সহিত আবদ্ধ করিতে সাহায্য করে।

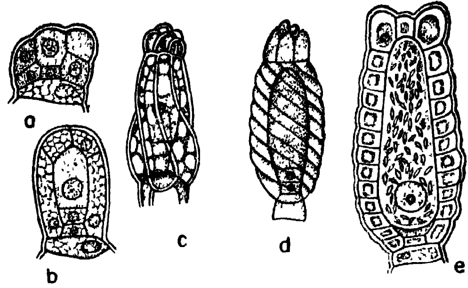


কারা. a = গ্নবিউলের সিল্ডকোষ, b_1 ও b = গ্নবিউলের ম্যানুব্রিয়াম সূত্র, c_1 ও c = ম্যানুব্রিয়াম, c_2 = এন্থেরিডিয়াল সূত্র, d = ম্যানুব্রিয়াম, e = এনথেরোজয়েড, f = সুপক্ব এনথারোজয়েড।



কারা—পুং ও স্ত্রী : a = কারা, a_1 = পাতা, a_2 = প্রধান কাণ্ড (axis), a_3 = পর্ব, b = অগ্রকোষ, c_1 ও c = দৈর্ঘ্যচ্ছেদ, অগ্রকোষ, d = কারা, d_1 = নিউকিউল (স্ত্রী), d_2 = গ্লবিউল (পুং), d_3 = পাতা, d_4 = কেন্দ্রকোষ, d_5 = সরুকোষ

অগ্রকোষ (apical cell) ও পর্বের কোষগুলিতে একটি নিউক্লিয়াস, ঘন সাইটোপ্লাজম, ডিস্ক বা চাকতির মত সবুজ প্লাসটিড ও নগণ্য ভ্যাকুওল থাকে। ইহাদের পাইরিনয়েড নাই। পর্বমধ্যের দীর্ঘ কোষগুলিতে বহু নিউক্লিয়াস (multinucleate) ও সাইটোপ্লাজমে ছোট ছোট সবুজ প্লাসটিড ও একটি বড় ভ্যাকুওল কেন্দ্রস্থলে পাওয়া যায়। সাইটোপ্লাজমের ভিতরের স্তরে ইহার চলন (movement) দেখা যায়।



কারার নিউকিউল:
a, b, c, d, e = নিউকিউল ধীরে ধীরে সৃষ্টি হইতেছে।

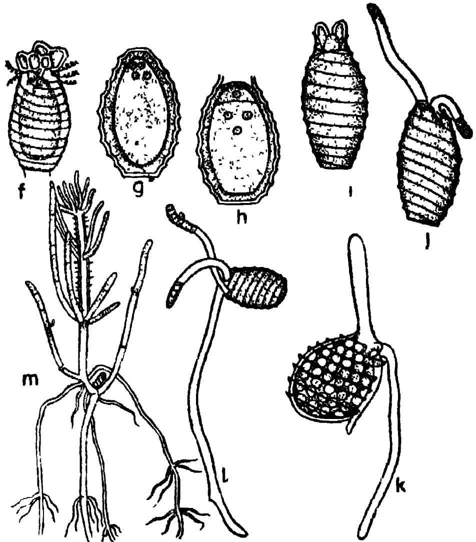
কাণ্ডের অগ্রভাগ ও শাখার অগ্রভাগের গম্বুজের (dome-shaped) মত কোষের সাহায্যে ইহার বৃদ্ধি হয়। ইহা সমান্তরালভাবে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক খণ্ড প্রস্থ-বিভাজন করিয়া উপর দিকে একটি পর্বের প্রথম কোষ (nodal initial cell) যাহা বার বার বিভক্ত হইয়া পর্ব সৃষ্টি করে এবং একটি নিচের দিকে পর্বমধ্য সৃষ্টিকারী দুই দিক উত্তল (biconvex) কোষ উৎপন্ন হয়, যেটি দীর্ঘ হইয়া পর্বমধ্য কোষ তৈয়ারি করে।

কয়েকটি ভারতীয় প্রজাতির কারা—**কারা ব্রাকিপাস** (Chara brachypus), **কারা বেনথামি** (C. benthamii), **কারা ব্রাউনি** (C. braunii), **কারা ফ্রেজিলিস** (C. fragilis), **কারা জাইলেনিকা** (C. zeylanica)।

জনন—

কারা **অঙ্গজ** ও **যৌন** উভয় প্রণালিতেই বংশ বিস্তার করে।

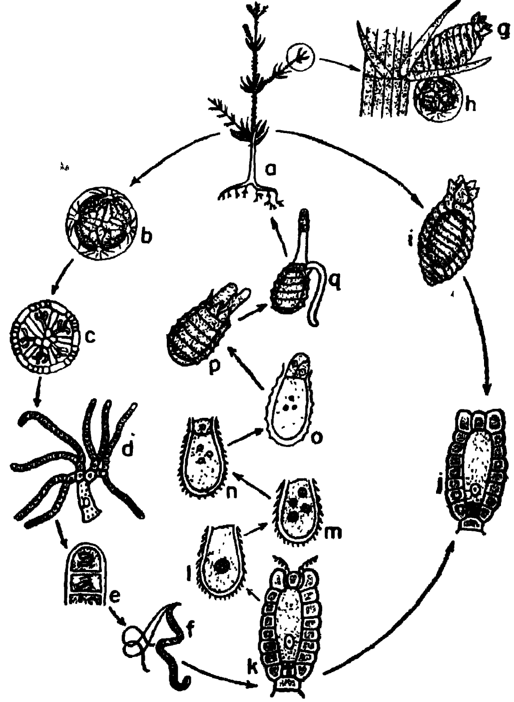
অঙ্গজ জনন—এই প্রকার জনন প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সচরাচর নিম্নলিখিত উপায়ে হইয়া থাকে—(১) **এমাইলেজ** তারকা (amylase star); ইহা তারকার ন্যায় কোষের সমষ্টি এবং স্টার্চদানা পূর্ণ থাকে। ইহা উদ্ভিদ দেহের নিচের দিকের পর্বমধ্যে জন্মায়। (২) **বুলবিল** (bulbils); হইা



f = নিউকিউল ও অ্যানথেরোজয়েড, g = হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, h = বেসাল কোষ, i = উস্পোর অঙ্কুরিত, j = উস্পোর হইতে নূতন কারা, l ও m = নূতন অপত্য কারা।

রাইজয়েডের উপর জন্মায় এবং (৩) **প্রোটোনিমার** মত অংশ ; ইহা পর্ব হইতে জন্মায়। এই সকল অঙ্গ হইতে নূতন কারা সৃষ্টি হয়।

যৌন জননকে উগ্যামী বলে। পুংজনন অঙ্গকে **গ্লোবিউল** (globule) বলে এবং স্ত্রীজনন যন্ত্রকে **নিউকিউল** (nucule) বলে। কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া, ইহারা সহবাসী বা হমোথ্যালিক (homothallic) এবং গ্লোবিউল ও নিউকিউল পর্বে জন্মায়। নিউকিউল উপর দিকে এবং গ্লোবিউল নিম্নে থাকে। সুপক্ক গ্লবিউল আকারে গোলাকার ও বেশ বড় এবং বৃন্তযুক্ত। ইহা উজ্জ্বল হলুদ বা লাল বর্ণের। ইহার প্রাচীর আটটি বাঁকা প্লেট দিয়া তৈয়ারি এবং দেখিতে প্রায়-কোষকলার (pseudocellular) মত। প্লেটের কোষগুলিকে **শীল্ড কোষ** (shield cells) বলে। পাকিলে এই কোষগুলিতে এক প্রকার কমলা রঙের তরল বস্তু থাকে। নিচের পেডিসেল হইতে গ্লবিউলের ভিতর একটি লম্বা অংশ পাঠায়। প্রত্যেক শীল্ড কোষের মধ্যে একটি কোষকে **ম্যানুব্রিয়াম** বলে। ম্যানুব্রিয়ামের দূরবর্তী প্রান্তীয় এক বা একাধিক কোষকে ক্যাপিচুলা বা মস্তক কোষ (head cells) বলে। প্রত্যেক ক্যাপিচুলা হইতে ছয়টি সেকেণ্ডারী ক্যাপিচুলা তৈয়ারি হয়। প্রত্যেক সেকেণ্ডারী ক্যাপিচুলা হইতে ২-৪ প্রান্তিক (terminal) কোষ সৃষ্টি হয়। প্রান্তিক কোষ হইতে ২-৪টি চাবুকের মত অ্যানথেরিডিয়াল সূত্র (antheridial filaments) চিমটার (forked) আকারে বাহির হয়। অ্যানথেরিডিয়াল সূত্র ২৫ হইতে ২০০ কোষ দ্বারা গঠিত। এই সকল অ্যানথেরিডিয়াল সূত্র ম্যানুব্রিয়ামের মধ্যে পাকান অবস্থায় থাকে এবং গ্লবিউলটি ইহাদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। অ্যানথেরিডিয়াম বা স্পারমেটোজেনাস সূত্রের প্রত্যেক কোষ হইতে একটি পুংজনন কোষ বা স্পারম জন্মায়। প্রত্যেক কোষ অ্যানথেরিডিয়ামের মত কাজ করে। অনেকে অ্যানথেরিডিয়াল সূত্রগুলিকে অ্যানথেরিডিয়াম



কারার যৌন জীবন-চক্র : a—কারা (n), b=গ্লবিউল (n), c=গ্লবিউলের ছেদ, d=অ্যানথেরিডিয়াল সূত্র (n), e=অ্যানথেরিডিয়াল সূত্রকোষ (n), f=শুক্রাণু (n), g=নিউকিউল, h=গ্লবিউল, i=নিউকিউল (n), j=নিউকিউলের ছেদ, k=নিষেক, l=জাইগোট (2n), m=মিয়োসিস, n=অঙ্কুরিত জাইগোট (n), o=রাইজয়েড ও প্রোটোনিমা (n), p ও q=নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি।

বলেন এবং উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের বহুকোষী অ্যানথেরিডিয়ামের মত মনে করেন। অ্যানথেরিডিয়ামের মধ্যে প্রায় ২০,০০০-৫০,০০০ পুংজনন কোষ বা স্পারম জন্মায়। প্রত্যেক পুংজনন কোষ সাঁপলাকারে পাকান এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের সুতা বা ফিতাযুক্ত। ইহার দুইটি ব্লেফারোপ্লাষ্ট ও দুইটি ফ্লাজেলাম। পুংজনন কোষগুলি ব্রায়োফাইটার পুংজনন কোষের মত।

পুংজনন কোষ পাকিলে গ্লবিউলের শীল্ড কোষগুলি পৃথক হয়, ইহার ফলে ক্যাপিচুলার উপরের অ্যানথেরিডিয়াল সূত্রগুলি বাহির হইয়া পড়ে। ইহার পর একটি গর্ত দিয়া পুংজনন কোষগুলি বাহির হইয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা প্রাতঃকালে বাহির হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সাঁতার কাটে।

নিউকিউল—পর্বের নিম্নকোষ বিভক্ত হইয়া তিনটি কোষ সৃষ্টি হয়। সর্বনিম্ন কোষটি বড় হইয়া **পেডিসেল** কোষ হয়। সর্বোপরি কোষটি **উগোনিয়াম মাতৃকোষ** এবং ইহা বিভক্ত হইয়া একটি ছোট বৃন্ত কোষ এবং উহার উপরে **উগোনিয়াম**। উগোনিয়ামের ভিতরের প্রোটোপ্লাষ্ট একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত **ডিম্বাণু** বা **ওভাম** বা **উস্ফীয়ার** তৈয়ারি করে। নিষেকের পূর্বে ওভাম বড় বড় স্টার্চদানায় পূর্ণ হয়। পূর্ববর্ণিত মধ্যকোষটি বিভক্ত হইয়া পাঁচটি কোষ সৃষ্ট হয় যাহারা কেন্দ্রের একটি কোষকে ঘিরিয়া থাকে। এই সকল কোষ বড় হইয়া উগোনিয়াম মাতৃকোষকে আবরণের মত আচ্ছাদন করে। পরে এই সকল কোষের প্রস্থ-বিভাজন হয় এবং দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয়। নিচের কোষের সারিকে টিউব কোষ বলে এবং ইহারা সাঁপল আকারে উগোনিয়ামকে বেষ্টন করে। পূর্ব-বর্ণিত উপরের কোষ সারি হইতে মুকুট বা করোনা তৈয়ারি হয়। পাকিলে বেষ্টনকারী আবরণের মধ্যে পাঁচটি ছিদ্র দেখা দেয়, ইহারা এংগুলার ছিদ্র (angular openings)।

ইহার পর **নিষেক**। সাঁতার কাটিতে কাটিতে পুংজনন কোষগুলি এংগুলার ছিদ্র দিয়া নিউকিউলে প্রবেশ করে। একটি মাত্র পুংজনন কোষ জিলাটিন প্রাচীরের মধ্য দিয়া উগোনিয়মে প্রবেশ করে। ইহার পর পুংজনন কোষ ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু পুরু প্রাচীর তৈয়ারি করে এবং ইহাকে উস্পোর বলে। উস্পোর পাকিবার সময় টিউব কোষগুলি মোটা হইয়া প্রাচীরের ন্যায় রক্ষা করে। উস্পোর পুকুরের তলদেশে পড়িয়া কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করে।

উস্পোর অঙ্কুরিত হইবার সময় মিয়োসিস প্রণালিতে বিভাজিত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। ইহার পর অসমান বিভাজন করিয়া দূরবর্তী কোষে একটি নিউক্লিয়াস এবং নিচেরটি তিনটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়। দূরবর্তী কোষটি বিভাজিত হইয়া দুইটি কোষ সৃষ্টি করে। একটি কোষ রাইজয়েড় সৃষ্টিকারী (rhizoidal initial) এবং অপরটি প্রোটোনেমা সৃষ্টিকারী (protonemal initial)। নিচের কোষের নিউক্লিয়াসগুলি ভাঙ্গিয়া অবলুপ্ত হইয়া যায়। রাইজয়েড সৃষ্টিকারী কোষ হইতে রাইজয়েড জন্মায় এবং ইহাতে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। পর্ব হইতে সেকেণ্ডারী রাইজয়েড জন্মায়। প্রোটোনেমা সৃষ্টিকারী কোষ হইতে প্রাইমারী প্রোটোনেমা জন্মায়। ইহার পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। প্রোটোনেমা হইতে 'কারা-শৈবাল' সৃষ্টি হয়। ইহার জীবনচক্রে উদ্ভিদদেহ গ্যামিটোফাইট এবং জাইগোট স্পোরোফাইট দশা প্রদর্শন করে।

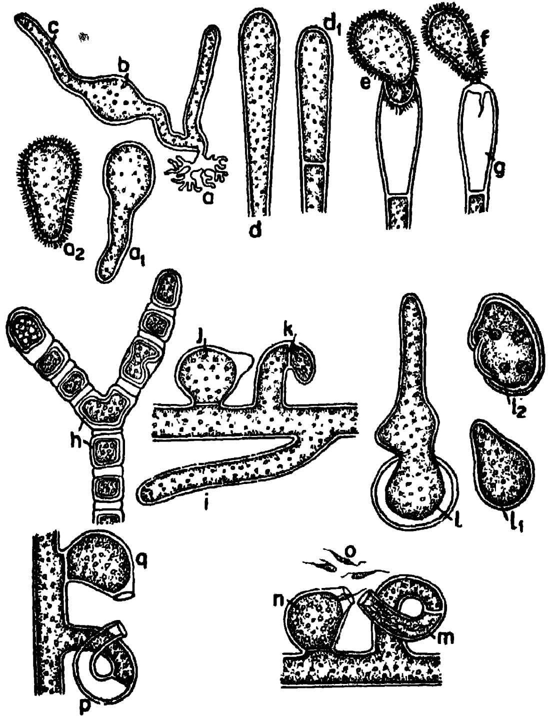
ভাউচেরিয়া (Vaucheria)

ইহা ক্লোরোফাইসি শ্রেণীভুক্ত শৈবাল। ইহার অর্ডার সাইফোনেলিস, ফ্যামিলি ভাউচেরিয়েসি এবং জেনাস ভাউচেরিয়া।

ইহাদের ৩৫টি প্রজাতির মধ্যে কেবল তিন-চারিটি সমুদ্রে বাস করে। ইহারা মিঠা জল বা মাটির উপর থাকে। বর্ষাকালে ভিজা মাটি বা ফুল গাছের টবের উপর সবুজ সুতার জালের মত দেখা যায়। ইহারা **ভাউচেরিয়া সেসেলিস** ও **ভাউচেরিয়া হামেটা** নামে পরিচিত ডাঙ্গার শৈবাল।

ভারতীয় প্রজাতি—**ভাউচেরিয়া স্পারমা, ভাউচেরিয়া এম্ফিবিয়া, ভাউচেরিয়া আনসিনেটা** ও **ভাউচেরিয়া জেমিনেটা**।

উদ্ভিদ-দেহ—ইহাদের উদ্ভিদ-দেহ কয়েক ক্ষেত্রে তিন-চার সেণ্টিমিটার দীর্ঘ, নলাকার, অল্প শাখাযুক্ত সমাঙ্গদেহী সূত্র দ্বারা গঠিত। ইহাদের কোষের মধ্যবর্তী প্রাচীর থাকে না। ভূমির উপর হ্যাপটেরন নামক সবুজ-কণাহীন রাইজয়েডের মত কোষ থাকে এবং ইহা বাদামী রঙের হইতে পারে। ইহাদের অগ্রভাগ বৃদ্ধিলাভ করিয়া সূত্র দীর্ঘ হয়।



ভাউচেরিয়া : a = সূত্রের রাইজয়েড, b = প্রোটোপ্লাস্ট, c = প্রাচীর, d = জুস্পোরানজিয়াম, e = জুস্পোর, f = ফ্লাজেলামযুক্ত জুস্পোর, g = খালি জুস্পোরানজিয়াম, h = সিস্ট, i = শাখা, k = এনথেরিডিয়াম, j = উগোনিয়াম, m = শুক্রাণু, n = ডিম্বাণুর নিষেক, p = অ্যানথেরিডিয়াম, q = উস্পোর, l, l_1, l_2 = উস্পোর অঙ্কুরিত হইতেছে।

ইহাদের কোষ-প্রাচীরে দুইটি স্তর থাকে। বাহিরের স্তরটি পেকটিনের এবং ভিতরের স্তরটি সেলুলোজ দ্বারা তৈয়ারি। কোষ-প্রাচীর পাতলা, কখন কখন চূর্ণ-জাতীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। বহু নিউক্লিয়াস ও চাকতির মত সবুজ প্লাসটিড সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে। মাঝে বড় ভ্যাকুওল বর্তমান এবং এই ভ্যাকুওল সমগ্র থ্যালেসে (thallus) বিস্তৃত। ইহাদের দেহের

মাঝে কোন প্রাচীর নাই ; কেবলমাত্র জনন অঙ্গ জন্মাইলে প্রাচীর দ্বারা পৃথক হয় অথবা থ্যালাসের ক্ষতস্থান প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ হয়। এই প্রকার দেহকে **সিনোসাইট** (coenocyte) বলে। খাদ্য তৈলকণারূপে সঞ্চিত হয়। ইহাদের পাইরিনয়েড থাকে না।

জনন-ক্রিয়া

অঙ্গজ জনন—সূত্র ভাঙ্গিয়া টুকরাগুলি নূতন সূত্রে (fragmentation) পরিণত হয়।

অযৌন জনন—বাসস্থানের উপর ইহার প্রকার নির্ভর করে। বহু ফ্লাজেলামযুক্ত **সিনজুস্পোর** (Synzoospore) নামক যৌগ জুস্পোর দ্বারা ইহাদের অযৌন জনন হয়। ইহাদের একটিমাত্র করিয়া জুস্পোর স্পোরানজিয়ামে জন্মায়। একটি ঋজু বা খাড়া শাখার শেষ প্রান্তে স্পোরানজিয়াম জন্মায় এবং বহু নিউক্লিয়াস ও সবুজ প্লাসটিড থাকে। একটি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া ইহা পৃথক হয়। নিউক্লিয়াসগুলি প্রান্তে চলিয়া যায় এবং প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের নিকট হইতে দুইটি ফ্লাজেলাম সৃষ্ট হয়। স্পোরানজিয়ামের উপর একটি গর্ত দেখা দেয়। এই গর্ত দিয়া জুস্পোর ভোরের বেলা বাহির হইয়া যায়। বহু ফ্লাজেলাম এবং বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত জুস্পোরকে সিনজুস্পোর বলে। জুস্পোর বাহির হইয়া ১৫-৩০ মিনিট বিচরণ করে এবং পরে স্থির হইয়া যায়। ফ্লাজেলাম ভিতরে গ্রহণ করে এবং একটি মোটা আবরণ জন্মায়। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুর বাহির হয় এবং এক বা তিনটি নল বাহির হয় এবং দীর্ঘ হইতে থাকে। একটি বর্ণহীন হোল্ডফাস্টের দ্বারা কোন স্থানে আবদ্ধ হয়। জলের ভাউচেরিয়া জুস্পোর দ্বারা বংশ বিস্তার করে।

এপ্লানোস্পোর—স্থলজ ভাউচেরিয়ার স্পোরানজিয়ামের সমগ্র অংশ একটি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত এপ্লোনোস্পোর তৈয়ারি করে। ইহা হইতে ভাউচেরিয়া-সূত্র জন্মায়। ইহা **ভাউচেরিয়া আনীসনেটা** ও **ভাউচেরিয়া জেমিনেটা** প্রজাতিতে পাওয়া যায়।

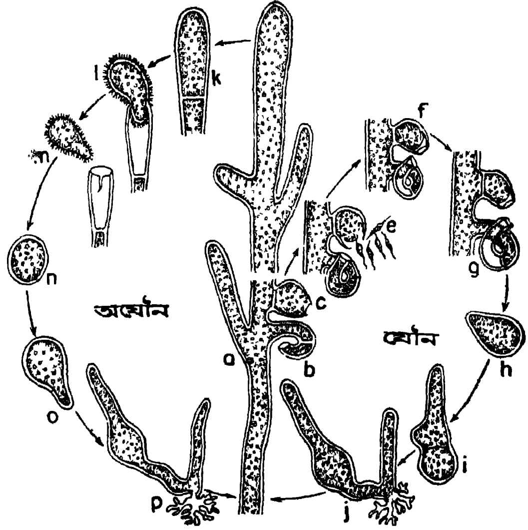
হিপনোস্পোর—কোন কোন পরিবেশে ভাউচেরিয়ার সূত্র মাঝের প্রাচীর (septa) তৈয়ারি করে। প্রত্যেক খণ্ড বাহিরে মোটা প্রাচীর তৈয়ারি করে। এই সকল খণ্ডকে হিপনোস্পোর বলে। ইহা হইতে সরাসরি অঙ্কুরিত হইয়া নূতন শৈবাল জন্মায় অথবা কতকগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত **সিস্ট** (cyst) সৃষ্টি করে। ইহাকে গংগ্রোসিরা (Gongrosira) অবস্থা বলে। ইহা অপর একটি শৈবালের মত দেখিতে বলিয়া অনুরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। সিস্ট গর্ত দিয়া বাহির হয় এবং অ্যামিবার মত চলাফেরা করিয়া একটি নূতন সূত্রে পরিণত হয়।

যৌন জনন—ইহাদের জনন পদ্ধতিকে **উগ্যামী** (oogamy) বলে। ইহা একটি স্বয়ংচল পুংজনন কোষ (motile sperm) ও নিশ্চল ডিম্বাণুর মিলনের ফলে হয়। মিঠা জলের সকল প্রজাতি সহবাসী (monoecious বা homothallic) এবং কয়েকটি সামুদ্রিক ভাউচেরিয়া ভিন্নবাসী (dioecious বা heterothallic), যথা, **ভাউচেরিয়া ডাইকোটমা** (V. dichotoma)।

জনন-অঙ্গ আলোকিত ভিজা মাটি বা স্থির জলে জন্মায়। স্রোতযুক্ত নদীতে ইহারা কদাচিত জন্মায়। অ্যানথেরিডিয়াম ও উগোনিয়াম একই সূত্রে পাশাপাশি জন্মায় (**ভাউচেরিয়া সেসেলিস**) অথবা সূত্রের ভিন্ন শাখার উপর জন্মায়।

অ্যানথেরিডিয়াম সূত্রের ধারে ধারে জন্মিতে পারে অথবা শাখা সূত্রের প্রান্ত দেশে। প্রথমে বহু নিউক্লিয়াস ও সবুজ প্লাসটিড সাইটোপ্লাজমে থাকে। পাকিলে ইহা বাঁকিয়া যায় এবং একটি প্রাচীর দিয়া অগ্রভাগটি অ্যানথিরিডিয়াম সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়াসগুলি কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত দুইটি ফ্লাজেলামের সহিত পুংজনন কোষ জন্মায়। পূর্বে বলা হইত দুইটি সিলিয়াম দুই ধারে থাকে; কিন্তু এখন জানা গিয়াছে সিলিয়াম দুইটি প্রান্তে থাকে এবং আকারে সমান দীর্ঘ (গ্রস ১৯৩৭)।

পুংজনন কোষগুলি ভোরের বেলা বাহির হইয়া পড়ে। উগোনিয়াম, অ্যানথেরিডিয়াম নিচের দিকে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস লইয়া তৈয়ারি হয়। সূত্রের ধার হইতে "ওয়ানডারপ্লাজম" উগোনিয়ামে যায় এবং আকারে বড় হয়। উগোনিয়াম গোলাকার ধারণ করে এবং একধারে একটি ঠোঁটের মত অংশ থাকে। উগোনিয়াম পাকিলে উহাতে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে এবং অপর নিউক্লিয়াসগুলি ভাঙ্গিয়া অবলুপ্ত হইয়া যায়। উগোনিয়ামের ঠোঁটের মত অংশ "রিসেপটিভ" বা প্রবেশের উপযুক্ত হয়। উগোনিয়ামে একটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।



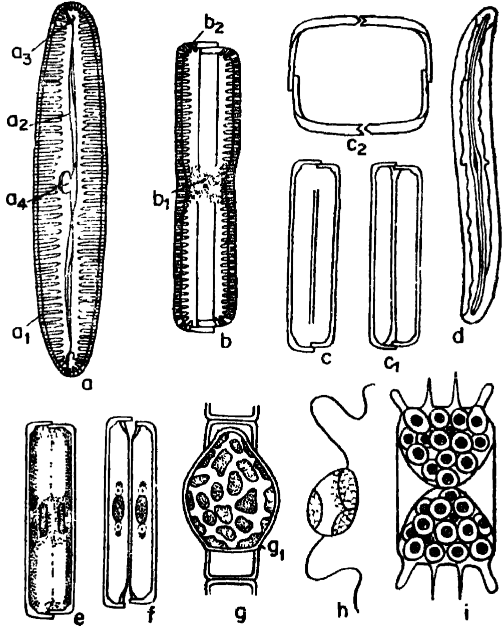
ভাউচেরিয়া : a = ভাউচেরিয়ার সূত্র, b = অ্যানথেরিডিয়াম, c = উগোনিয়াম, e = নিষেক, f = উস্পোর, g = অঙ্কুরিত উস্পোর, h = উস্পোর, i = মিয়োসিস, j = নূতন সূত্র, k = স্পোরানজিয়াম, l = জুস্পোর, o, p = নূতন ভাউচেরিয়া, n = জুস্পোর, m = অঙ্কুরিত, l, k = সূত্র।

দিবালোকের পূর্বে ভোরের বেলা পুংজনন কোষগুলি বাহির হইয়া নিষেক করে। উগোনিয়ামের ওষ্ঠের নিকট অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং অনেকগুলি পুংজনন কোষ প্রবেশ করে; কিন্তু কেবল একটি স্পার্ম ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। মিলন বা নিষেকের ফলে উস্পোর জন্মায়। উস্পোর বা জাইগোট পুরু প্রাচীর তৈয়ারি করে। প্রাচীরে ৩ হইতে ৬টি স্তর থাকিতে পারে এবং ভিতর তৈলকণাপূর্ণ হয়। ঘন সবুজ জাইগোট বর্ণ পরিবর্তন করিয়া ঘন বাদামী রঙে পরিণত হয়। জাইগোট কয়েক মাস বিশ্রাম করে। এই সময় শুষ্ক পরিবেশ ক্ষতি করিতে পারে না। জাইগোট সম্ভবত মিয়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হয় এবং নূতন সূত্র সৃষ্টি করে।

✓ব্যাসিলেরিওফাইসি (Bacillariophyceae)

ইহারা ক্রাইজোফাইটা দলভুক্ত। ইহাদিগকে ডায়াটম (diatoms) বলে। ফ্রিটস্চ (Fritsch), ম্যাকলিন (Maclean) ও কুক (১৯৫৬) ইহাদিগকে শৈবালের একটি

পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ব্যাসিলেরিওফাইসি (ডায়াটম) এককোষী শৈবাল এবং ইহারা নানা আকারের হইতে পারে। ইহারা মিঠা ও সমুদ্রের জলে বাস করে। অনেক ক্ষেত্রে পুকুর অথবা ডোবার উপর হলুদ রঙের সরের (scum) মত কাদার উপর ভাসে। সমুদ্র-জলে ভাসমান ডায়াটমকে ফাইটোপ্লাঙ্কটন (phyto-plankton) বলে। বহু-ক্ষেত্রে সংখ্যায় ইহারা এত বেশী থাকে যে জল উহাদের বর্ণে রূপান্তরিত হয়। এক কিউবিক মিটার জলে প্রায় 35,500,000 ডায়াটম থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহারা মৃত-জীবী এবং কখন কখন অন্য শৈবাল বা উদ্ভিদের উপর পরাশ্রয়ীভাবে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাটির উপর জন্মায়।



ডায়াটম : a = ডায়াটম কোষ, a_2 = র‍্যাফি, a_3 = প্রান্তের নডিউল, a_4 = কেন্দ্রের নডিউল, b_2 ও b = দুইটি ভাল্ভ, b_1 = নিউক্লিয়াস, c = বিভাজন, d = ডায়াটমের কোষ, e ও f = দুইটি বিভাজিত ডায়াটম, g ও g_1 = ক্রোম্যাটোফোর, h = অক্সোস্পোর, i = মাইক্রোস্পোর।

ডায়াটম জলে এককভাবে অথবা কলোনী করিয়া দল-বদ্ধভাবে বাস করে।

কতকগুলি ভারতীয় ডায়াটম—পিনুলেরিয়া গ্রেসিলয়ডিস (Pinnularia graciloides), **সিমবেলা এফিনিস** (Cymbella affinis), **ইউনটিয়া পেকটিনেলিস** (Eunotia pectinalis), **নেভিকিউলা ক্রিপটোকেফালয়ডিস** (Navicula cryptocephaloides), **নিডিয়াম গ্রেসাইল** (Neidium gracile)।

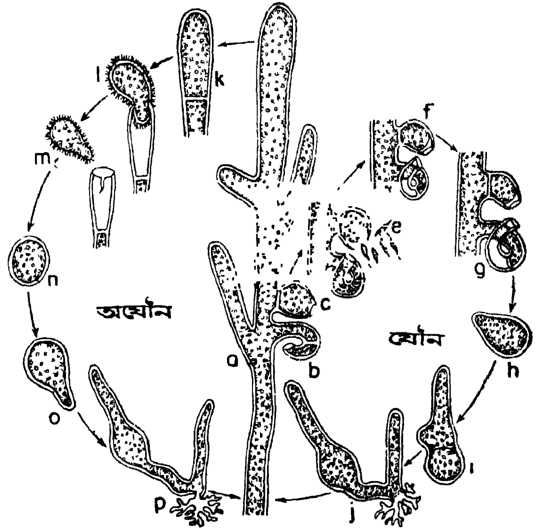
শ্রেণীবিভাগ

আকারের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাসিলেরিওফাইসিকে দুইটি অর্ডারে বিভক্ত করা হয়—I. অর্ডার—সেন্ট্রেলেস (Centrales), II. অর্ডার—পিনেলস (Pennales)।

সেন্ট্রেলেস—ইহাদের ভাল্ভ (valves) গোলাকার, বহুভুজী (polygonal), অনিয়মিত এবং কোষ-প্রাচীর নানা কারুকার্যযুক্ত। কারুকার্যকেন্দ্র হইতে বৃত্তাকার (concentric) অথবা অরীয় (radial) প্রকারে সজ্জিত, প্রটোপ্লাস্টে বহু সবুজ কণাযুক্ত ক্রোমাটোফোর, স্টেটোস্পোর বা মাইক্রোস্পোর জন্মায়। উগ্যামী দ্বারা অক্টোস্পোরও পাওয়া যায়।

অ্যানথেরিডিয়াম সূত্রের ধারে ধারে জন্মিতে পারে অথবা শাখা সূত্রের প্রান্ত দেশে। প্রথমে বহু নিউক্লিয়াস ও সবুজ প্লাসটিড সাইটোপ্লাজমে থাকে। পাকিলে ইহা বাঁকিয়া যায় এবং একটি প্রাচীর দিয়া অগ্রভাগটি অ্যানথিরিডিয়াম সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়াসগুলি কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত দুইটি ফ্লাজেলামের সহিত পুংজনন কোষ জন্মায়। পূর্বে বলা হইত দুইটি সিলিয়াম দুই ধারে থাকে; কিন্তু এখন জানা গিয়াছে সিলিয়াম দুইটি প্রান্তে থাকে এবং আকারে সমান দীর্ঘ (গ্রস ১৯৩৭)।

পুংজনন কোষগুলি ভোরের বেলা বাহির হইয়া পড়ে। উগোনিয়াম, অ্যানথেরিডিয়াম নিচের দিকে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস লইয়া তৈয়ারি হয়। সূত্রের ধার হইতে "ওয়ানডারপ্লাজম" উগোনিয়ামে যায় এবং আকারে বড় হয়। উগোনিয়াম গোলাকার ধারণ করে এবং একধারে একটি ঠোঁটের মত অংশ থাকে। উগোনিয়াম পাকিলে উহাতে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে এবং অপর নিউক্লিয়াসগুলি ভাঙ্গিয়া অবলুপ্ত হইয়া যায়। উগোনিয়ামের ঠোঁটের মত অংশ "রিসেপটিভ" বা প্রবেশের উপযুক্ত হয়। উগোনিয়ামে একটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।



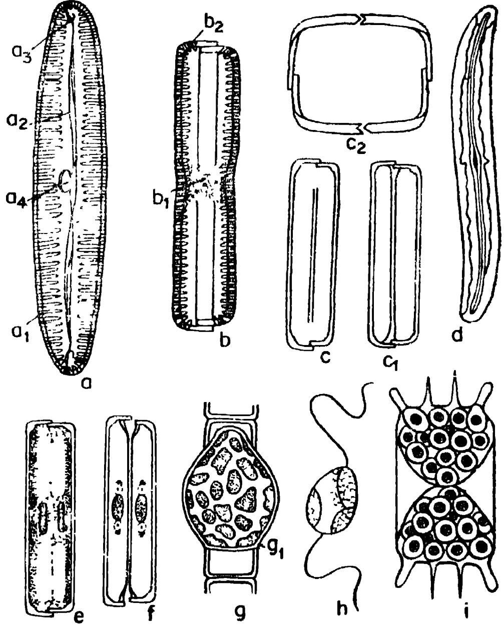
ভাউচেরিয়া. a = ভাউচেরিয়ার সূত্র, b = অ্যানথেরিডিয়াম, c = উগোনিয়াম, e = নিষেক, f = উস্পোর, g = অঙ্কুরিত উস্পোর, h = উস্পোর, i = মিয়োসিস, j = নূতন সূত্র, k = স্পোরানজিয়াম, l = জুস্পোর, o, p = নূতন ভাউচেরিয়া, n = জুস্পোর, m = অঙ্কুরিত, l, k = সূত্র।

দিবালোকের পূর্বে ভোরের বেলা পুংজনন কোষগুলি বাহির হইয়া নিষেক করে। উগোনিয়ামের ওষ্ঠের নিকট অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং অনেকগুলি পুংজনন কোষ প্রবেশ করে; কিন্তু কেবল একটি স্পার্ম ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। মিলন বা নিষেকের ফলে উস্পোর জন্মায়। উস্পোর বা জাইগোট পুরু প্রাচীর তৈয়ারি করে। প্রাচীরে ৩ হইতে ৬টি স্তর থাকিতে পারে এবং ভিতর তৈলকণাপূর্ণ হয়। ঘন সবুজ জাইগোট বর্ণ পরিবর্তন করিয়া ঘন বাদামী রঙে পরিণত হয়। জাইগোট কয়েক মাস বিশ্রাম করে। এই সময় শুষ্ক পরিবেশ ক্ষতি করিতে পারে না। জাইগোট সম্ভবত মিয়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হয় এবং নূতন সূত্র সৃষ্টি করে।

✓ব্যাসিলেরিওফাইসি (Bacillariophyceae)

ইহারা ক্রাইজোফাইটা দলভুক্ত। ইহাদিগকে ডায়াটম (diatoms) বলে। ফ্রিটস্চ (Fritsch), ম্যাকলিন (Maclean) ও কুক (১৯৫৬) ইহাদিগকে শৈবালের একটি

পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ব্যাসিলেরিওফাইসি (ডায়াটম) এককোষী শৈবাল এবং ইহারা নানা আকারের হইতে পারে। ইহারা মিঠা ও সমুদ্রের জলে বাস করে। অনেক ক্ষেত্রে পুকুর অথবা ডোবার উপর হলুদ রঙের সরের (scum) মত কাদার উপর ভাসে। সমুদ্র-জলে ভাসমান ডায়াটমকে ফাইটোপ্লাংকটন (phyto-plankton) বলে। বহু-ক্ষেত্রে সংখ্যায় ইহারা এত বেশী থাকে যে জল উহাদের বর্ণে রূপান্তরিত হয়। এক কিউবিক মিটার জলে প্রায় 35,500,000 ডায়াটম থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহারা মৃত-জীবী এবং কখন কখন অন্য শৈবাল বা উদ্ভিদের উপর পরাশ্রয়ীভাবে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাটির উপর জন্মায়।



ডায়াটম · a = ডায়াটম কোষ, a_2 = র‍্যাফি, a_3 = প্রান্তের নডিউল, a_4 = কেন্দ্রের নডিউল, b_2 ও b = দুইটি ভাল্ভ, b_1 = নিউক্লিয়াস, c = বিভাজন, d = ডায়াটমের কোষ, e ও f = দুইটি বিভাজিত ডায়াটম, g ও g_1 = ক্রোম্যাটোফোর, h = অক্সোস্পোর, i = মাইক্রোস্পোর।

ডায়াটম জলে এককভাবে অথবা কলোনী করিয়া দলবদ্ধভাবে বাস করে।

কতকগুলি ভারতীয় ডায়াটম—পিনুলেরিয়া গ্রেসিলয়ডিস (Pinnularia graciloides), **সিমবেলা এফিনিস** (Cymbella affinis), **ইউনটিয়া পেকটিনেলিস** (Eunotia pectinalis), **নেভীকিউলা ক্রিপটোকেফালয়ডিস** (Navicula cryptocephaloides), **নিডিয়াম গ্রেসাইল** (Neidium gracile)।

শ্রেণীবিভাগ

আকারের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাসিলেরিওফাইসিকে দুইটি অর্ডারে বিভক্ত করা হয়—I. অর্ডার—সেণ্ট্রেলেস (Centrales), II. অর্ডার—পিনেলস (Pennales)।

সেণ্ট্রেলেস—ইহাদের ভাল্ভ (valves) গোলাকার, বহুভূজী (polygonal), অনিয়মিত এবং কোষ-প্রাচীর নানা কারুকার্যযুক্ত। কারুকার্যকেন্দ্র হইতে বৃত্তাকার (concentric) অথবা অরীয় (radial) প্রকারে সজ্জিত, প্রটোপ্লাস্টে বহু সবুজ কণাযুক্ত ক্রোমাটোফোর, স্টেটোস্পোর বা মাইক্রোস্পোর জন্মায়। উগ্যামী দ্বারা অক্টোস্পোরও পাওয়া যায়।

পিনেলস—ভাল্ভ দ্বিপার্শ্বিকভাবে প্রতিসম ; প্রাচীরের কারুকার্য মধ্য রেখা হইতে দ্বিপার্শ্বিক। প্রটোপ্লাষ্টে একটি বা দুইটি ক্রোম্যাটোফোর থাকে কিন্তু ষ্টেটোস্পোর বা মাইক্রোস্পোর জন্মায় না। আইজোগ্যামী দ্বারা অক্সোস্পোর সৃষ্টি হয়।

ডায়াটমের দেহ—ইহারা এক-কোষী শৈবাল, কখন কখন একত্রে কলোনী তৈয়ারি করে। প্রত্যেক ডায়াটমের কোষকে **ফ্রাসটিউল** (frustule) বলে এবং দেহটি দুইটি ভাল্ভ দ্বারা গঠিত ; একটি অপরটির ভিতর একজোড়া "পেট্রি ডিস" নামক কাঁচ পাত্রের ন্যায় আবদ্ধ থাকে। বাহিরের ভাল্ভকে **এপিথেকা** (epitheca) ও ভিতরের ভাল্ভকে **হাইপোথেকা** (hypotheca) বলে। ইহাদের কোষটিকে যে কোন একপ্রান্ত হইতে দেখিলে কেবল এপিথেকা অথবা হাইপোথেকা দেখা যায়—ইহাকে "ভাল্ভ ভিউ" (valve-view) এবং পার্শ্বদিক হইতে দেখিলে দুইটি ভাল্ভের জোড়ার মুখ দেখা যায়—উহাকে "গার্ডেল ভিউ" (girdle-view) বলে। দুইটি প্রাচীরই সিলিকা এবং পেকটিনযুক্ত ; কিন্তু ইহাতে সেলুলোজের রাসায়নিক প্রকৃতি পাওয়া যায় না। সিলিকার আবরণে এরিওলা নামক ছোট ছোট বিন্দু থাকে। এই সকল এরিওলা (areola) হইতে মিউসিলেজ বাহির হয়। ইহাদের কারুকার্য কেন্দ্রীয় হইলে তাহাকে **সেনট্রিক ডায়াটম** (centric diatom) এবং দ্বিপার্শ্বিকভাবে প্রতিসম অথবা অনিয়মিত হইলে **পিনেট ডায়াটম** (pennate diatom) বলে। কোষ-প্রাচীরের ভিতরে সাইটোপ্লাজমের স্তর পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে—ইহাকে প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্রিকল (primordial utricle) বলে। ভিতরে একটি বড় ভ্যাকুওল, এক বা একাধিক ক্রোম্যোটোফোর এবং একটি বা কয়েকটি পাইরিনয়েড থাকে। ইহার ভিতর একটি গোলাকার বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসটি প্রাচীরের দিকে থাকে অথবা কেন্দ্রে ফিতার ন্যায় সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

ক্রোম্যাটোফোর সোনালি-বাদামী রঙের এবং আকার এক এক প্রজাতিতে এক এক রকমের। এই রং একটি বিশেষ ডায়াটমিন্ রঙের জন্য এবং ইহা সালোক-সংশ্লেষকারী ক্লোরোফিল এবং ক্যারাটিনয়েড রঙের উপর আবরণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তৈল-কণা খাদ্যরূপে সাইটোপ্লাজম অথবা ক্রোমেটোফোরে জমা থাকে।

জনন ক্রিয়া

অঙ্গজ জনন—ইহা কোষ বিভাজন দ্বারা হয়। বিভাজনের সময় প্রোটোপ্লাষ্ট বড় হয় এবং ফ্লাসটুলের দুইটি ভাল্ভ সামান্য পৃথক হয়। ইহার পর মাইটোসিস প্রণালীতে প্রথমে নিউক্লিয়াস এবং পরে সাইটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উহাদের দ্বারা দুইটি অপত্য ডায়াটম সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অপত্য ডায়াটমের একটি পূর্বের ভাল্ভ থাকে এবং অপরদিকে একটি নূতন প্রাচীর বা ভাল্ভ তৈয়ারি হয়। এই কারণে প্রতি ডায়াটমের দুইটি ভাল্ভ দুই প্রকারে সৃষ্টি হয় এবং অপত্য কোষ দুইটিই নিজ নিজ হাইপোথেকা গঠন করে। প্রত্যেক বিভাজন দ্বারা ডায়াটমের আকার ক্রমাগত ছোট হইতে থাকে। এই আকার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার জননকার্য হয় যাহার দ্বারা পূর্বের আয়তন ফিরিয়া আসে। ইহাকে অক্সোস্পোর বলে।

সেনট্রিক অথবা পিনলেস উভয় প্রকার ডায়াটমেই অক্সোস্পোর তৈয়ারি হয়। **সাধারণতঃ** পিনেলিস গোষ্ঠীতে ইহা চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়, যথা—

১। দুইটি ছোট কোষ মিলিত হইয়া একটি অক্সোস্পোর উৎপন্ন হয়।

২। দুইটি ছোট কোষ মিলিত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করে এবং দুইটি অক্সোস্পোর সৃষ্ট হয়।

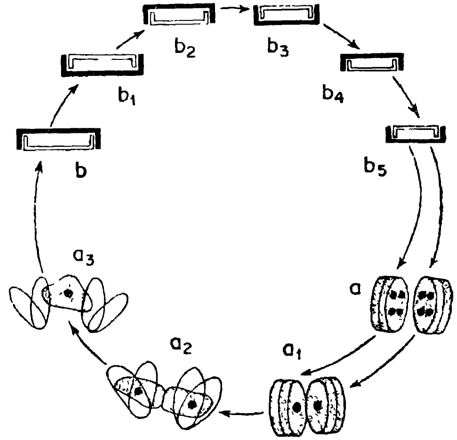
৩। একটি ছোট কোষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া একটি অক্সোস্পোর গঠন করে।

৪। একটি ছোট কোষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিভক্ত হয় এবং দুইটি অক্সোস্পোর তৈয়ারি করে।

সেনট্রিক ডায়াটমে সাধারণ কোষে **অক্সোস্পোর** জন্মায়। ইহা জন্মাইবার সময় ফ্রাসটুলের দুইটি ভাল্ভ পৃথক হয় এবং প্রোটোপ্লাষ্ট প্রায় তিনগুণ বড় হয়। ইহার প্রোটোপ্লাষ্ট বাহিরে দুইটি সিলিকাযুক্ত অংশ তৈয়ারি করে। প্রোটোপ্লাষ্ট বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ তৈয়ারি করে এবং ইহারাও বিভক্ত হইতে পারে। এই কোষগুলি সাধারণ কোষ অপেক্ষা বড়।

সামুদ্রিক সেনট্রিক ডায়াটমে প্রোটোপ্লাষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া প্রাচীর হইতে সরিয়া আসে এবং একটি পুরু নূতন কোষ-প্রাচীর সৃষ্ট হয়। ইহাকে **ষ্টেটোস্পোর** বা **এন্ডোস্পোর** বা **সিষ্ট** (statospore or endospore or cyst) বলে।

যৌন জনন—অক্সোস্পোর যৌন পদ্ধতি দ্বারাও হইতে পারে। বহু ক্ষেত্রে মিয়োসিস দ্বারা 4 হইতে 128টি 'মাইক্রোস্পোর' জন্মায়। ইহাদিগকে আইজোগ্যামিট (Isogamete) এবং পুংজনন গ্যামিটও বলে। পুংজনন কোষ উৎপন্ন হইয়া জলে বাহির হইয়া একটি হ্যাপ্লয়েড মাতৃকোষে বা ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহার দ্বারা একটি জাইগোট হয় এবং জাইগোটটি একটি **অক্সোস্পোরে** পরিণত হয়। সেনট্রিক ডায়াটমের একটি প্রজাতিতে নিউক্লিয়াস মিয়োসিস দ্বারা চারিটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে দুইটি নিউক্লিয়াস ভাঙ্গিয়া যায় এবং অপর দুইটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড **জাইগোট** তৈয়ারি করে। জাইগোট বৃদ্ধি লাভ করিয়া **অক্সোস্পোরে** পরিণত হয়।



ডায়াটমের জীবন-চক্র : a = চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, a_1 = একটি ব্যতীত অপর তিনটি নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়, a_2 = গ্যামিটের মিলন, a_3 = জাইগোট (অক্সোস্পোর) ডিপ্লয়েড, b, b_1, b_2, b_3, b_4 ও b_5 = ধীরে ধীরে কোষের আয়তন হ্রাস।

পিনেট ডায়াটমে বহু প্রকারের অক্সোস্পোর তৈয়ারি হয়। কয়েক ক্ষেত্রে দুইটি ডায়াটম একটি আবরণ তৈয়ারি করে। প্রত্যেকটি কোষ মিয়োসিস করিয়া চারিটি নিউক্লিয়াস জন্মায়। ইহাদের মধ্যে তিনটি নিউক্লিয়াস ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহু ক্ষেত্রে প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের দুইটি নিউক্লিয়াসের একটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অপরটি বিভক্ত

হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে ; কিন্তু ইহাদের একটি পুনর্বার ভাঙ্গিয়া যায়। দুইটি ক্ষেত্রেই হ্যাপ্লয়েড প্রোটোপ্লাষ্ট মিলিত হইয়া জাইগোট সৃষ্টি করে এবং ইহার প্রথমে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে। জাইগোটের নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থা পায়। জাইগোট বড় হইয়া অক্সোস্পোরে পরিণত হয়।

কয়েকটি প্রজাতিতে দুইটি কোষ মিলিত হইয়া দুইটি অক্সোস্পোর তৈয়ারি করে।

কোন কোন প্রজাতিতে প্রত্যেক কোষ মিয়োসিস দ্বারা চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। দুইটি নিউক্লিয়াস ভাঙ্গিয়া যায় এবং দুইটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস অপর কোষের দুইটি গ্যামিট (হ্যাপ্লয়েড) নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। এই সকল গ্যামিট আকারে সমান বা অসমান হয় এবং অ্যামিবয়েড হইতে পারে। অসমান গ্যামিটের ছোটটি গতিশীল এবং অপরটি স্থির ও আকারে বড়। দুইটি গ্যামিট মিলিত হইয়া জাইগোট তৈয়ারি করে এবং জাইগোট দুইটি অক্সোস্পোরে পরিণত হয়।

কয়েক ক্ষেত্রে একটি ফ্রাসটিউল একটি অক্সোস্পোর সৃষ্টি করে। একটি প্রজাতিতে নিউক্লিয়াস মিয়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। ইহাদের মধ্যে দুইটি আংশিকভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং অপর দুইটি গ্যামিট তৈয়ারি করে। প্রত্যেকটিতে একটি সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস ও একটি ভগ্ন নিউক্লিয়াস থাকে। গ্যামিট দুইটি মিলিত হইয়া জাইগোট হয় এবং ইহা অক্সোস্পোরে পরিণত হয়।

কদাচিৎ দুইটি কোষ একত্রিত হয়, কিন্তু মিলন বা কনজুগেশন হয় না। ইহারা দুইটি অক্সোস্পোর অপুংজনি দ্বারা তৈয়ারি করে।

অক্সোস্পোর যে ভাবেই জন্মাক,—দৈর্ঘ্য বিভাজন করিয়া দুইটি সাধারণ কোষ সৃষ্টি করে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা :—

কোটি কোটি ডায়াটমের মৃত অংশ সমুদ্রতলে জমিয়া ডায়াটমের মাটি তৈয়ারি করে। ডায়াটমের মাটি (diatomaceous earth) নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

১। ইহা পরিস্রাবণে (filtering) ব্যবহৃত হয়।

২। বয়লারের তাপ রক্ষার জন্য ব্যবহার হয়।

৩। ব্লাষ্ট ফার্নেসের ভিতরের দেওয়াল নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪। সিমেণ্ট-এর মত ব্যবহার হয়।

৫। ধাতব পদার্থ পালিশ করা হয়।

৬। দাঁতের মাজন তৈয়ারি করা হয়।

৭। তরল নাইট্রোগ্লিসারিণ শোষণ করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৮। জাহাজ রং করিবার জন্য ইহা মিশ্রিত হয় এবং শহরের রাস্তার পথপ্রদর্শক দাগ দেওয়ার কাজে ইহার ব্যবহার আছে।

ফিওফাইটা (Phaeophyta)

ইহারা বাদামি রঙের শৈবাল ; কয়েকটি প্রজাতি মিঠা জলে বাস করে, কিন্তু অধিকাংশই সমুদ্রের বাসিন্দা। সুমেরু ও দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রে প্রচুর পাওয়া যায়। সচরাচর পাথর

অথবা সমুদ্রের নিচে কোন বস্তুতে ইহারা আবদ্ধ থাকে। ইহাদের দেহ এককোষী হইতে প্রায় একশত মিটার দীর্ঘ হইতে পারে। থ্যালাসের বৃদ্ধি অগ্র-ভাজক কলা (apical meristem) বা মধ্যবর্তী-ভাজক কলার (intercalary meristem) দ্বারা হয়। ইহাদের কোষ-প্রাচীর দুইটি স্তরে তৈয়ারি —বাহিরের স্তর পেকটিন ও অলজিন মিশ্রিত বস্তু এবং ভিতরের স্তরটি সেলুলোজ। অলজিন একপ্রকার কোলয়েড (colloid), এবং ইহা আঠা (adhesive) ও কৃত্রিম রেশম তৈয়ারি করিতে ব্যবহার হয়। কোষে একটি নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাস্টের ভিতর কয়েকটি ক্রোম্যাটোফোর থাকে। ইহাদের ক্রোম্যাটোফোরে ক্লোরোফিল a, ক্লোরোফিল b, ক্যারোটিন ও জ্যানথোফিল পাওয়া যায়, এবং ইহাদের উপর বাদামি ফিউকোজ্যানথিনের (fucozanthin) আবরণ থাকে। ইহাদের সঞ্চিত খাদ্য ল্যামিনেরিন (laminarin) ডেক্সট্রিনের ন্যায় পলিসাকারাইড।

ইহাদের অঙ্গজ জনন, অযৌন ও যৌন জনন হইয়া থাকে।

এক্টোকারপাস (Ectocarpus)

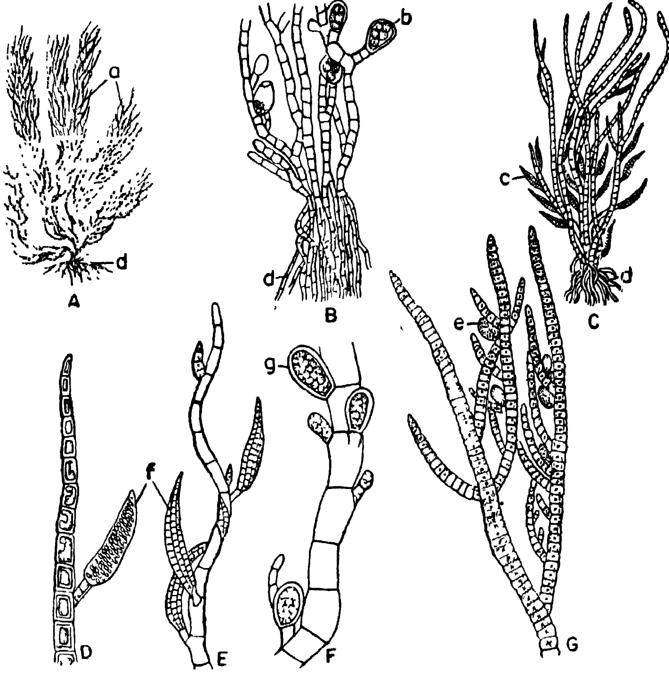
ইহা ফিওফাইসি শ্রেণীভুক্ত বাদামি সূত্রাকার শৈবাল। ইহারা সমুদ্রজলে বাস করে। ইহাদের জীবন-চক্রে বহুকোষী রেণুধর উদ্ভিদের (sporophytic generation) বহুকোষী লিঙ্গধর উদ্ভিদের (gametophytic generation) সহিত পর্যায়ন্বিত, সমাঙ্গদেহী জনুঃক্রম (isomorphic alternaton of generations) দেখা যায়। ইহাদের দেহ বহুশাখায় বিভক্ত এবং কোন বস্তুর সহিত জলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। উপরদিকে বহু শাখাসূত্র একত্রে থাকে। উপর দিকে শাখার কোষগুলি সরু হইয়া যায়। কয়েকটি প্রজাতিতে প্রধান শাখাগুলির উপর আবরণ রাইজয়েডের শাখা দ্বারা সৃষ্ট হয়। প্রত্যেক কোষের প্রোটোপ্লাস্টে একটি নিউক্লিয়াস এবং বহু চাকতির মত ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

জনন

এক্টোকারপাসে অযৌন ও যৌন জনন দেখা যায়।

অযৌন জনন—দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর দ্বারা অযৌন জনন হয়। জুস্পোর এক কুঠরীযুক্ত (unilocular) অথবা বহু কুঠরীযুক্ত (plurilocular) স্পোরানজিয়ামে জন্মায়। এক্টোকারপাসের অযৌন উদ্ভিদের (diploid) প্রান্তে অথবা পার্শ্বশাখায় স্পোরানজিয়াম পাওয়া যায়। একটি শাখার প্রান্তের কোষটি বড় হইয়া ডিম্বাকার হয়। ইহা এককুঠরী স্পোরানজিয়ামে পরিণত হয়। ইহার নিউক্লিয়াস প্রথমে মিয়োসিস দ্বারা বিভক্ত হয় এবং পরে মাইটোসিস দ্বারা বিভক্ত হইয়া ৩২-৬৪ নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হইয়া একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত জুস্পোর তৈয়ারি করে। এক কুঠরী স্পোরানজিয়ামের (unilocular sporangium) মত বহুকুঠরী স্পোরানজিয়াম (plurilocular sporangium or neutral sporangium) শাখার প্রান্তে জন্মায়। আকারে বড় ও ডিম্বাকার। ইহার ভিতর প্রান্ত কোষটি বারবার বিভক্ত হয় এবং একসারিতে ৬ হইতে ১২টি কোষ জন্মায়। ইহার পর সকল কোষ বিভক্ত হয়। ইহার ফলে কয়েক শত কোষ

জন্মায়। নিউক্লিয়াসগুলি কিছু সাইটোপ্লাজম সংগ্রহ করিয়া দুই ফ্ল্যাজেলামযুক্ত নিউট্রাল (neutral) জুস্পোর তৈয়ারি করে। এই সকল জুস্পোর ডিপ্লয়েড (2n), কারণ ইহার মধ্যে ইউনিলকিউলার স্পোরানজিয়ামের মত মিয়োসিস হয় নাই।



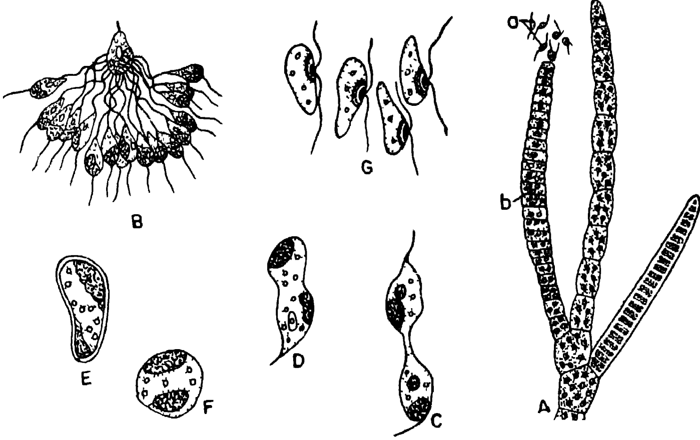
এক্টোকারপাস : A—এক্টোকারপাস, a—উপরের সূত্র, d—শায়িত সূত্র ; B—এককুঠরী স্পোরানজিয়াম, d—সূত্র ; C—বহুকুঠরী স্পোরানজিয়াম ; D, E প্লুরিলকিউলার গ্যামিটানজিয়াম ; F—এককুঠরী স্পোরানজিয়াম ; G—e—এককুঠরী স্পোরানজিয়াম।

সুপক্ক হইলে বাহির হইয়া **অযৌন** (2n) উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। ডিপ্লয়েড জুস্পোর কেবল রেণুধর (sporophyte) উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

যৌন জনন—আইজোগ্যামাস, এনাইজোগ্যামাস অথবা উগ্যামাস হইতে পারে। গ্যামিটগুলি দুইটি ফ্ল্যাজেলামযুক্ত এবং স্বয়ংচল (motile) এবং ইহার (n) হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের প্লুরিলকিউলার গ্যামিটেনজিয়ায় জন্মায়। গ্যামিটেনজিয়ার ভিতর কয়েক শত দুইটি ফ্ল্যাজেলামযুক্ত গ্যামিট জন্মায়। গ্যামিটগুলি প্রান্তছিদ্র বা পার্শ্বছিদ্র দিয়া জলে যায়। এক্টোকারপাসের অধিকাংশ প্রজাতি আইজোগ্যামাস ও সহবাসী (isogamous and monoecious) এবং দুইটি গ্যামিট মিলিত হইয়া একটি জাইগোস্পোর তৈয়ারি করে।

কয়েকটি প্রজাতিতে—যথা, **এক্টোকারপাস সিকানডাস** (Ectocarpus secundus)-এর গ্যামিটগুলি অসমান এবং যদিও দুইটি ফ্ল্যাজেলামযুক্ত উহারা দুই প্রকার প্লুরিলকিউলার গ্যামিটানজিয়ায় জন্মায়। ইহাকে এনিজোগ্যামী বলে।

কয়েকটি প্রজাতিতে আকারে বড় মেগাগ্যামিটানজিয়া এবং আকারে ছোট মাইক্রোগ্যামিটানজিয়া পাওয়া যায়। ইহারা সম্ভবত এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়ার মত। ইহারা পুংজনন কোষ ও ডিম্বাণু (eggs) তৈয়ারি করে। পুংজনন ও ডিম্বাণুর মিলনে জাইগোট হয়। জাইগোট অংকুরিত হইয়া ডিপ্লয়েড (2n) বা রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এক্টোকারপাসের জীবন-চক্রে জনুঃক্রম দেখা যায়। লিঙ্গধর উদ্ভিদ (n) পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি করে এবং রেণুধর (2n) উদ্ভিদে জুস্পোর পাওয়া যায়। ইহাদের লিঙ্গধর এবং রেণুধর উদ্ভিদ আকৃতিগতভাবে সমাঙ্গদেহী বলিয়া এই প্রকার জনুঃক্রমকে **আইজোমরফিক অল্টারনেশান অফ জেনারেশন** (Isomorphic alternation of generations) বা **পর্যায়ক্রমিত সমাঙ্গদেহী জনুঃক্রম** বলা হয়। রেণুধর উদ্ভিদটি শীতকালে এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদটি গ্রীষ্মকালে দেখা যায় বলিয়া ইহাদের জীবন-চক্রে তাপামাত্রার পরিবর্তনই জনুঃক্রমের বিভিন্ন দশাকে প্রভাবিত করে বলিয়া অনুমান করা হয়।



এক্টোকারপাস : A—a—গ্যামিট বাহির হইল, b—প্লুরিলকিউলার গ্যামিটানজিয়াম ; B—বহু গ্যামিট ; C, D, E ও F—গ্যামিটের মিলন ; G—জুস্পোর।

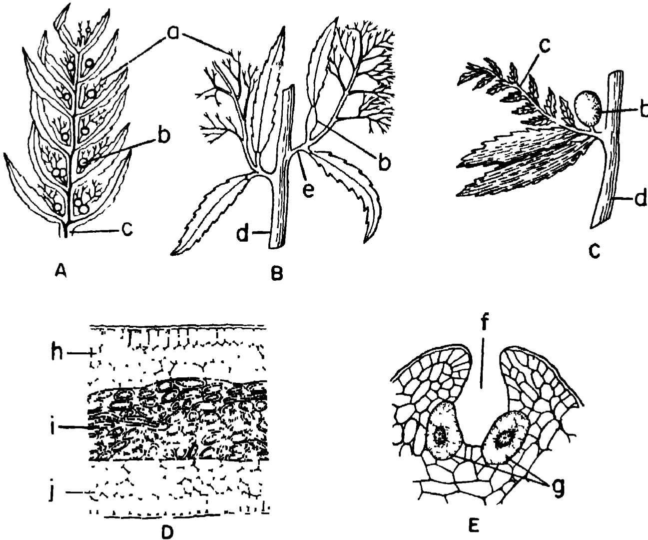
ভারতীয় প্রজাতি—**এক্টোকারপাস এনহালি** (Ectocarpus enhali) **এক্টোকারপাস এরেবিকাস** (E. arabicus), **এক্টোকারপাস জেমিনিফ্রুকটাস** (E. geminifructus)।

সারগাসম (Sargassum)

এই শৈবাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্রে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহাকে 'গাল্ফ উইড' (Gulf weed) বলা হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রতটে পাথরে আবদ্ধ অবস্থায় ইহারা জন্মায়। ইহা দেখিতে সবীজ উদ্ভিদের দেহের ন্যায়, কারণ ইহাদের কান্ড ও পাতার ন্যায় ফলক থাকে। ইহার রেণুধর উদ্ভিদের নিচের দিকে প্যারেনকাইমা দ্বারা তৈয়ারি কঠিন অংশ ইহতে কান্ডের মত অংশ জন্মায় এবং ইহার উপর একান্তর (alternate) শাখা বহন করে। শাখার উপর পাতার মত অংশ

থাকে। প্রশাখাগুলি বাতাসপূর্ণ ব্লাডারে পরিণত হয়। প্রশাখার তৃতীয় পর্যায়ে আঙুলের মত **আধার** বা **রিসেপটেকল** (receptacle) জন্মায়। রিসেপটেকলের মধ্যে কলসীর মত **কনসেপটেকল** (conceptacle) থাকে। কোন কোন সারগাসম প্রজাতি জলে ভাসমান এবং টুকরা টুকরা ভাঙ্গিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ইহার দেহ ফিউকাসের মত এবং বাহিরের দিকে দীর্ঘ থামের মত কোষে প্রচুর প্লাসটিড থাকে। ইহার দ্বারা সালোকসংশ্লেষ হয়। বাহিরের স্তরের ভিতরে কর্টেক্স এবং কোষ-প্রাচীর জিলাটিনে পরিণত হয়। ইহাতে খাদ্য সঞ্চিত হয়। মধ্যস্থলে মজ্জা বা মেডুলা এবং ইহা খাদ্য সরবরাহ করে। দেহের বৃদ্ধি অগ্রভাগে ত্রিকোণাকার কোষের দ্বারা হয়। ভারতে দুইটি প্রজাতি পাওয়া যায় **সারগাসম কেরিওফাইলাম** ও **সারগাসম ডুপলিকেটাম**।



সারগাসম : A—a = রিসেপটেকল, b = বায়ুথলি, c = পার্শ্বশাখা ; B—b = ব
পার্শ্বশাখা ; C—b = বায়ুথলি, d = প্রধান অক্ষ ; D—থ্যালাসের ছেদ, h = কর্টেক্স, i = মেডুলা, j = কর্টেক্স ; E—g = উগোনিয়া, f = অষ্টিয়োল।

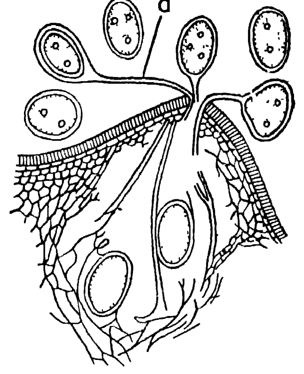
জনন

ইহার দেহ ভাঙ্গিয়া (fragmentation) টুকরা হইতে নূতন থ্যালাস জন্মায়। এই প্রকার অঙ্গজ জনন ছাড়াও প্রাক্তন থ্যালাস বৃদ্ধিলাভ করিয়া নূতন সারগাসম জন্মায়।

যৌন জনন—আধার বা রিসেপটেকলের ভিতরে ফ্ল্যাসকের মত কনসেপটেকলে **এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়া** পাওয়া যায়। কিছু প্রজাতি সহবাসী আর কিছু ভিন্নবাসী। সহবাসী একই কনসেপটেকলের মধ্যে এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়া পাওয়া যায় অথবা ভিন্ন ভিন্ন কনসেপটেকলে এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়া থাকে। ভিন্নবাসী প্রজাতিতে পুং উদ্ভিদ ও স্ত্রী উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

কনসেপটেকল জন্মাইবার প্রাথমিক অবস্থায় প্রায় একই রকম, প্রাথমিক কোষ বিভাজিত হইয়া কনসেপটেকল সৃষ্টি করে।

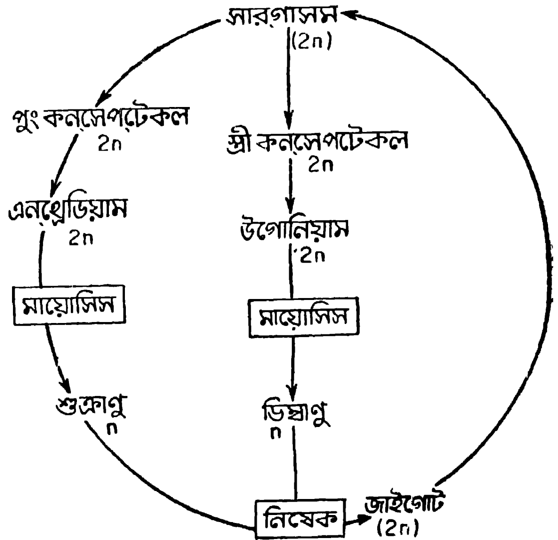
অনেকগুলি এনথেরিডিয়াম প্রত্যেক কনসেপটেকলে থাকে। ইহার ভিতরের শাখাযুক্ত প্যারাফাইসেসের উপর একগোছা এনথেরিডিয়াম জন্মায়। এনথেরিডিয়াম পাকিলে আকারে গোলাকার হয় এবং মিউসিলেজযুক্ত প্রাচীর থাকে। ইহার মধ্যে ৬৪টি দুইটি ফ্ল্যাজেলামযুক্ত ডিম্বাকার শুক্রাণু থাকে। মায়োসিস দ্বারা শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। শুক্রাণুগুলি সমুদ্রজলে বাহির হইয়া যায়। উগোনিয়ার বৃন্ত থাকে না এবং সরাসরি কনসেপটেকলের প্রাচীরে জন্মায়। একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত উগোনিয়াম ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। ইহার নিউক্লিয়াস মায়োসিস প্রণালিতে বিভাজিত হইয়া ৮টি নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। ইহার প্রথম বিভাজন মায়োসিস এবং সর্বমোট তিন বার বিভক্ত হইয়া ৮টি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় ; কিন্তু একটি নিউক্লিয়াস ব্যতীত অপর ৭টি বিনষ্ট হয়। একটি ডিম্বাণু (ovum) উগোনিয়ামে থাকে। ডিম্বাণু কনেসেপটেকল হইতে অস্টিওলের দ্বারা বাহির হয় এবং দীর্ঘ বৃন্ত দ্বারা আবদ্ধ থাকে।



সারগাসম . a = উগোনিয়া বৃন্তের দ্বারা কনেসেপটেকলের সহিত আবদ্ধ।

শুক্রাণুগুলি সমুদ্র জলে উগোনিয়ামের চারিদিকে থাকে। শুক্রাণু ফ্ল্যাজেলামের সাহায্যে উগোনিয়ামে আবদ্ধ হয়। একটি শুক্রাণু উগোনিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। নিষেক উগোনিয়ামের ভিতরে হয়।

নিষেকের পর জাইগোট উগোনিয়ামের ভিতরেই বিভাজিত হইতে থাকে। ইহা ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা। ইহার পর জাইগোট বাহির হয় এবং উগোনিয়ামের প্রাচীরস্থ জিলাটিনের সাহায্যে কোন কঠিন বস্তুর উপর আবদ্ধ হয়। এইবার ইহা প্রস্থ-বিভাজন করিয়া, উপরের অংশ হইতে পাতা, কাণ্ডযুক্ত থ্যালাস ও নিচের কোষ হইতে রাইজয়েড জন্মায়। উদ্ভিদটি ডিপ্লয়েড (2n)।



সারগাসমের জীবন-চক্র

সারগাসমের জীবন-চক্রে উন্নত অবস্থা দেখা যায়। উদ্ভিদটি ডিপলয়েড ও উন্নত কলা সৃষ্টি করিয়া কাণ্ডের মত ও পাতার মত দেহ সৃষ্টি করে।

ইহার গ্যামিট বা জনন-কোষ মায়োসিস দ্বারা তৈয়ারি হয়। ইহার হ্যাপ্লয়েড অবস্থা কেবল জনন-কোষে পাওয়া যায়।

ফিউকাস (Fucus)

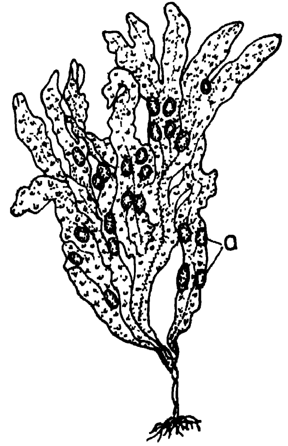
ফিউকাস ফিওফাইটার অন্তর্গত বাদামি শৈবাল।

ইহা সামুদ্রিক ও শীতপ্রধান এবং উত্তর মেরুর তটে বাস করে। ইহারা পাথরের সহিত সচরাচর আবদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে পাহাড়ের আগাছা (rock weeds) বলে। ইহাদের দেহ প্যারেনকাইমা নির্মিত দ্বিভাজিত ফ্রন্ড (dichotomously branched frond) এবং দেখিতে ফিতার মত (ribbon-like)। কাণ্ডের মত স্টাইপ (stipe) এবং নিচের দিকে আবদ্ধ হইবার হোল্ডফাস্ট বা হেপটেরা (haptera) থাকে। সমুদ্র জলের নিচে পাথরে উদ্ভিদটি আবদ্ধ থাকে। ইহার দেহের থ্যালাস বাতাসপূর্ণ থলির দ্বারা জলে ভাসে। থ্যালাসের অগ্রভাগ রিসেপটেকল (receptacle) সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যশিরা থাকে না। ইহার উপর ছোট ছোট অভিক্ষিপ্ত (projection) অংশের উপর গর্ত থাকে এবং গর্তের ভিতর কনসেপটেকল (conceptacle)।

ইহার দেহ ডিপলয়েড (2n) এবং সহবাসী বা ভিন্নবাসী (monoecious or dioecious) হয়। কোন কোন প্রজাতির দেহের চ্যাপ্টা থ্যালাসের মধ্যস্থানে একটি মধ্যশিরা থাকে ; এই মধ্যশিরা কলাগুলি স্থূলাকার হইয়া জন্মায়।

ইহার দেহের বৃদ্ধি অগ্রস্থকোষের দ্বি-বিভাজন (dichotomously branched) দ্বারা হয়। অগ্রকোষটি সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং এই নূতন কোষ অপত্যশাখার অগ্রকোষ হইয়া বৃদ্ধিলাভ করে।

থ্যালাসের গঠন – ইহার প্রস্থচ্ছেদ লইলে তিনটি স্তর দেখা যায়।



ফিউকাস : a বাতাসের থলি।

(১) উপরের স্তরটি এপিডারমিস এবং ইহা ছোট চতুর্ভুজ কোষ দ্বারা তৈয়ারি। এই কোষগুলি মেরিস্টেমেটিক (meristematic) এবং বিভাজন করিয়া নূতন কর্টেক্সের কোষ তৈয়ারি করে। এপিডারমিসে প্লাসটিড থাকে এবং ইহা সালোকসংশ্লেষ করে। ইহার সবুজ কণার উপর বাদামি কণা থাকে।

(২) এপিডারমিসের ভিতরদিকে কয়েকটি স্তরের কর্টেক্স। কর্টেক্স প্যারেনকাইমা-দ্বারা তৈয়ারি এবং ইহার ভিতর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। সঞ্চিত খাদ্য পলিসাকারাইড দলের ল্যামিনারিন রূপে জমা থাকে।

(৩) মধ্যকার অংশ পিথ। ইহা সূতার মত কোষ দ্বারা গঠিত। এই সকল কোষ দ্বারা খাদ্য ও জল পরিবাহিত হয়।

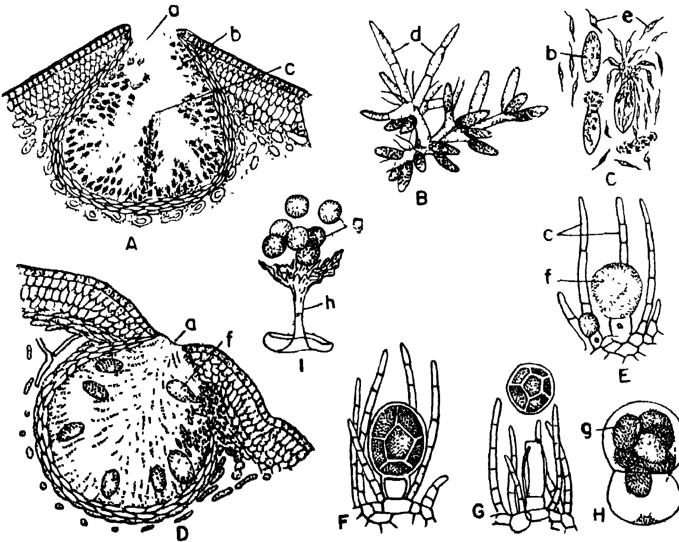
জনন :

ইহাদের অস্থানিক শাখার দ্বারা অঙ্গজ জনন হয়। স্টাইপের নিচের দিকে অস্থানিক শাখা জন্মায়। শাখাগুলি পৃথক হইয়া নূতন ফিউকাস সৃষ্টি করে।

কখন কখন পুরাতন অংশ মরিয়া যায় এবং শাখাগুলি পৃথক হইয়া নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাকে টুকরা টুকরা (fragmentation) জনন বলে।

যৌন জনন—ইহাদের উগ্যামী পদ্ধতিতে জনন হয়। যদিও থ্যালাস রেণুধর (sporophyte), তথাপি ইহারা গ্যামিটানজিয়া সৃষ্টি করে এবং এনথেরিডিয়াম ও উগোনিয়াম জন্মায়। এইগুলি গোলাকার থলির মধ্যে থাকে এবং থলিকে **কনসেপটেকল** (conceptacle) বলে। পাকিলে কনসেপটেকলের উপরে শাখাগুলি ফুলিয়া উঠে। কনসেপটেকল গোলাকার এবং উপরদিকে অস্টিওল (ostiole) নামক গর্ত থাকে। ইহার ভিতরে বহুকোষী রোম থাকে; ইহাদিগকে প্যারাফাইসেস (paraphyses) বলে। অস্টিওলের ভিতর হইতে রোম বাহির হইতে পারে; এই তুলার মত রোমগুলিকে পেরিফাইসেস (periphyses) বলে।

সাধারণ পূর্বদেশীয় **ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস** (Fucus vesiculosus) ভিন্নবাসী (heterothallic), কারণ কয়েকটি থ্যালাস কেবল এনথেরিডিয়া এবং অপরগুলিতে



ফিউকাস : A—a—অস্টিওল, b—এনথেরিডিয়া, c—প্যারাফাইসেস ; B—এনথেরিডিয়া, d—রোম ; C—b—এনথেরিডিয়া, e- শুক্রাণু ; D—f— উগোনিয়া ; E— উগোনিয়া, c—প্যারাফাইসেস ; F—বহু ডিম্বাণু ; G—ডিম্বাণু বাহির হইল ; H—g - ডিম্বাণু।

কেবল উগোনিয়া জন্মায়। কোন কোন প্রজাতিতে একই কনসেপটেকলে এনথেরিডিয়া ও উগোনিয়া জন্মায়। এনথেরিডিয়া প্রথমে গোলাকার হয়। প্রত্যেক একটি নিউক্লিয়াস-যুক্ত গোলাকার কোষ বিভাজিত হয় এবং ৬৪টি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। ইহাদের সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের বিভাজন মিয়োসিস প্রণালীতে হয়। প্রত্যেক নিউক্লিয়াস কিছু সাইটোপ্লাজম সংগ্রহ করে এবং নাসপাতির মত হয়। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি অসমান ফ্ল্যাজেলাম থাকে। পাকিবার পর এনথেরোজয়েডগুলি এনথেরিডিয়াম ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং ইহাদের উপর কিছুটা মিউসিলেজ প্যারাফাইসেস দ্বারা সৃষ্টি হয়।

ভাটার সময় ফিউকাস কিছুটা সঙ্কুচিত হয় এবং গ্যামিটগুলি অস্টিওল হইতে বাহির হইয়া পড়ে। জোয়ারের সময় শুক্রাণুগুলি জলে ভাসিয়া নিষেক করে।

উগোনিয়াম স্ত্রী-কনসেপটেকলে অথবা মিশ্রিত কনসেপটেকলে জন্মায়। কনসেপটেকলের প্রাচীর হইতে একটি অংশ বৃদ্ধি লাভ করে। এই অংশ দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং উপর ভাগটি উগোনিয়াম ও নিচের অংশটি বৃন্তকোষ (stalk cell) তৈয়ারি করে। প্রথমে উগোনিয়ামে একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং ইহা তিনবার বিভক্ত হইয়া আটটি অপত্য নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। ইহাদের প্রথম বিভাজন সর্বদা মিয়োসিস প্রণালীতে হয়। ইহার প্রত্যেক নিউক্লিয়াস কিছু সাইটোপ্লাজম সংগ্রহ করিয়া আটটি এককোষী ডিম্বাণু সৃষ্টি করে। উগোনিয়ামে দুইটি স্তরযুক্ত প্রাচীর থাকে। ডিম্বাণু পাকিলে বাহিরের প্রাচীর ফাটিয়া যায়। উপরোক্ত ৮টি ডিম্বাণু অস্টিওল হইতে বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষে ডিম্বাণুগুলি ভিতরের প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রজলে যায় এবং জলে নিষেক হয়। দেহের বাহিরে নিষেক সম্ভব হয়, কারণ শুক্রাণু সংখ্যায় বহু জন্মায় এবং ডিম্বাণু হইতে এক প্রকার গন্ধ বাহির হইয়া শুক্রাণু আকর্ষণ করে। নিষেকের ফলে জাইগোট হয়। জাইগোট বিশ্রাম করে না। জাইগোট শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

জীবন-চক্র :

ফিউকাসের জীবন-চক্রে নিয়মিত জনুঃক্রম দেখা যায় না। ফিউকাসের থ্যালাসটি রেণুধর (sporophyte) ও ডিপ্লয়েড (2n) ; কিন্তু উগোনিয়াম ও এনথিরিডিয়ামের ভিতর মিয়োসিস হইয়া শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জন্মায়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হইল হ্যাপলয়েড (n) এবং নিষেকের ফলে জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n)। জাইগোট রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

রডোফাইটা (Rhodophyta)

প্রায় ৪০০ গণ এবং ৩৫০০ প্রজাতি লইয়া সুবৃৎ শৈবাল গোষ্ঠী **রডোফাইটা** গঠিত। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ২০টির মত প্রজাতি মিঠা জলে বাস করে এবং বাকী অধিকাংশই সামুদ্রিক। উভয় মেরু সমেত প্রায় সমস্ত সমুদ্রেই ইহাদের দেখা যায়। অধিকাংশ সামুদ্রিক প্রজাতিই জলের তলায় পাহাড়ের গাত্রে অথবা অন্য কোন বস্তুর সহিত নিবদ্ধ থাকে। সবুজ বর্ণের উপস্থিতিতে অধিকাংশ শৈবালই আত্মনির্ভর, কিন্তু কয়েকটি পরাশ্রয়ী অথবা পরভোজী প্রজাতিও দেখা যায়।

রডোফাইটা বা **লালবর্ণের শৈবাল** নামটি ইহাদের দেহস্থিত বিশেষ লালবর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিশেষ উজ্জ্বল লালবর্ণটির নাম **ফাইকোএরিথ্রিন** (Phycoerythrin) এবং ইহা কোষস্থিত অন্যান্য বর্ণকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহা ব্যতীত **ফাইকোসায়ানিন** (Phycocyanin) নামক একটি নীলাভ-সবুজ বর্ণ এবং ফিউকোজ্যানথিন (fucoxanthin) নামক অপর আরেকটি বর্ণও ইহাদের কোষে পাওয়া যায়।

আকৃতিগতভাবে ইহাদের দেহ ফিওফাইটা (Phaeophyta) অপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষুদ্র। ইহারা অধিকাংশই বহুকোষী এবং সচরাচর ৩০ সেন্টিমিটার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে

লম্বা হয় না। ইহাদের দেহ শাখাযুক্ত অথবা শাখাহীন সাইফনের ন্যায় (siphon-like) সূত্র অথবা চ্যাপ্টা হইতে পালকের ন্যায় (feathery), ফিতার ন্যায় (ribbon-like) অথবা কাণ্ড, পাতা, ধারক (holdfast) যুক্ত উন্নতমানের থ্যালাস ইত্যাদি হইতে পারে।

এই গোষ্ঠীভুক্ত শৈবালের কোষগুলি ইউকেরিওটিক (Eukaryotic)। কোষে সঞ্চিত খাদ্যরূপে নগ্ন পাইরিনয়েড (naked pyrenoid) পাওয়া যায়। এইপ্রকার পাইরিনয়েডের বাহিরে শর্করাজাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে না, কেবল মধ্যস্থলে প্রোটিন থাকে। সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভূত খাদ্য **ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ** (Floridean starch) নামক এক বিশেষ ধরনের শ্বেতসাররূপে সঞ্চিত থাকে। কোষ-প্রাচীর ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়ায় পাশ্ববর্তী কোষগুলির মধ্যে সাইটোপ্লাসমীয় সংযুক্তি থাকে, ইহাকে প্লাসমোডেসমাটা (Plasmodesmata) বলা হয়।

ইহাদের কোন চলরেণু নাই। অযৌন জনন বিভিন্ন প্রকার অ-চলরেণুর মাধ্যমে হইয়া থাকে—যথা, নিউট্রাল স্পোর (Neutral spore), কার্পোস্পোর (Carpospore), মনোস্পোর (Monospore), প্যারাস্পোর (Paraspore), টেট্রাস্পোর (Tetraspore), ইত্যাদি। ইহাদের যৌন জনন স্পারমাসিয়া (Spermatia) এবং কার্পোগনিয়ার (Carpogonia) সাহায্যে উগ্যামাস (Oogamous) প্রক্রিয়ায় হইয়া থাকে।

পলিসাইফোনিয়া (Polysiphonia)

ইহা **রডোফাইটা** দলভুক্ত **রডোফাইসি** ফ্যামিলির অন্তর্গত লাল শৈবাল। ইহা আমেরিকা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতটে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলেও ইহাদের পাওয়া যায়।

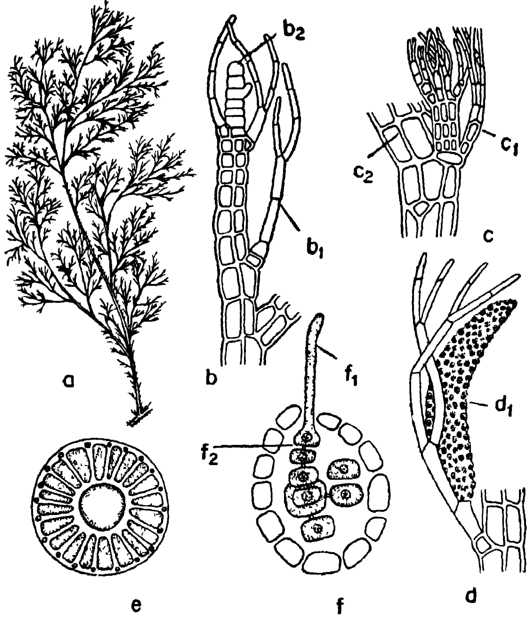
কয়েকটি ভারতীয় প্রজাতি - **পলিসাইফোনিয়া প্লাটিকারপা** (*Palysiphonia platycarpa*), **পলিসাইফোনিয়া আনগুইফরমিস** (P. unguiformis), **পলিসাইফোনিয়া সারটুলেরিআইডিস** (P. sertularioides)

দেহের গঠন—ইহারা কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ সমাঙ্গদেহী থ্যালাস। প্রত্যেক থ্যালাস কয়েকটি যুক্তসূত্র বা সাইফন দ্বারা তৈয়ারি। এই কারণেই শৈবালটির নামকরণ পলিসাইফোনিয়া হইয়াছে। ইহাদের দেহের নিচের দিকে রাইজয়েড এবং রাইজয়েডের উপরিভাগে **হোল্ডফাস্ট** থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায় রাইজয়েড থ্যালাসের নিচের দিকে বাহির হইয়া শৈবালকে আবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধির সময় থ্যালাস হইতে সর্পিল আকারে দ্বিবিভাজিত সূত্রশাখা বাহির হয়। শাখার অগ্রভাগ সরু হয়। ইহাকে **ট্রাইকোব্লাস্ট** (trichoblast) বলে। ইহা একসারি কোষদ্বারা তৈয়ারি। কোন কোন প্রজাতির পুরানো অংশের চারিদিকে ছোট ছোট কোষের কর্টেক্স তৈয়ারি হয়। ট্রাইকোব্লাস্ট কোষের একটি নিউক্লিয়াস, বর্ণহীন সাইটোপ্লাজম অথবা সামান্য বর্ণযুক্ত ক্রোম্যাটোফোর থাকে।

জনন—পলিসাইফোনিয়ার জনন দুইপ্রকার— অযৌন ও যৌন।

অধিকাংশ পলিসাইফোনিয়া ভিন্নবাসী (heterothallic); ইহাদের পুং অঙ্গকে

স্পারমাটানজিয়া (spermatangia) বলে। স্পারমাটানজিয়া মাতৃকোষ হইতে অনেকগুলি স্পারমাটানজিয়া উর্বর ট্রাইকোব্লাস্ট হইতে জন্মায়। ইহারা পুংথ্যালাসের অগ্রভাগে থাকে। স্পারমাটানজিয়া মাতৃকোষ হইতে ২ হইতে ৪টি স্পারমাটানজিয়াম সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক স্পারমাটানজিয়াম এককোষী এবং প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া স্পারমাটিয়াম থাকে। পরিপক্ক হইলে স্পারমাটানজিয়াম ফাটিয়া একটি এককোষী স্পারমাটিয়াম বাহির হয়। ইহা জলে ভাসিতে ভাসিতে কারপোগোনিয়ামে পেঁছায়। স্ত্রী-লিঙ্গধর থ্যালাসের উর্বর ট্রাইকোব্লাস্ট স্ত্রীজনন অঙ্গ বহন করে। এই সকল ট্রাইকোব্লাস্ট আকারে ছোট। স্ত্রী-অঙ্গকে কারপোগনিয়াম (carpogonium) বলে। কারপোগোনিয়াম শাখা চারিটি কোষ দ্বারা তৈয়ারি, আকারে বাঁকা এবং অগ্রের কোষটি কারপোগোনিয়ামে পরিণত হয়। একটি নিকটের কোষকে অক্সিলিয়ারি কোষ (auxilliary cell) বলে।

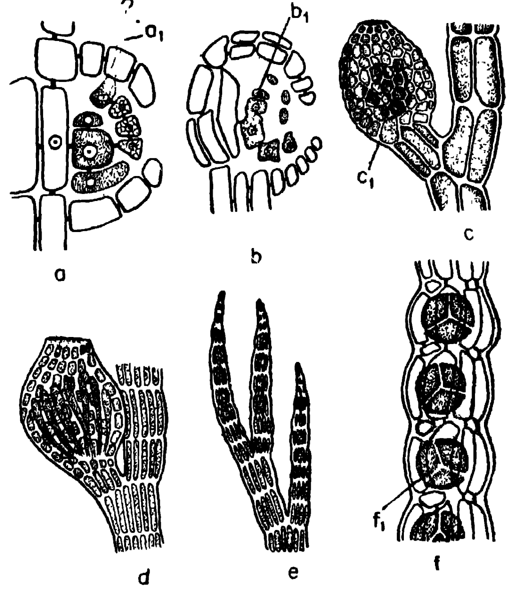


পলিসাইফোনিয়া :

a=পলিসাইফোনিয়া, b=উদ্ভিদের অগ্রকোষ (b_2), b_1=ট্রাইকোব্লাস্ট, c=পলিসাইফোনিয়ার শাখা (c_2), c_1=ট্রাইকোব্লাস্ট, d ও d_1=স্পারমাটানজিয়া, e=উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদ, f=কারপোগোনিয়াম, f_1=ট্রাইকোজাইনি, f_2=কারপোগোনিয়াম।

কারপোগোনিয়ামে একটি বড় এক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ নিচের দিকে থাকে এবং ইহার উপর **ট্রাইকোগাইনি (trichogyne)** অবস্থিত। নিষেকের সময় স্পারমেটিয়াম ট্রাইকোগাইনিতে আবদ্ধ হয়। ইহার নিউক্লিয়াস প্রথমে ট্রাইকোগাইনি ও পরে নিচে চলিয়া যায়। এইবার ইহা (নিউক্লিয়াস) কারপোগোনিয়ামের নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। ইতিমধ্যে অক্সিলিয়ারি কোষ নলের মত কারপোগোনিয়ামে যুক্ত হয়। নিষেকের ফলে জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা লাভ করে। নিষেকের পর জাইগোট-নিউক্লিয়াস অকিসিলিয়ারি কোষে যায় এবং মাইটোসিস প্রণালীতে কয়েকবার বিভক্ত হয়। ইহার ফলে অনেকগুলি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ও অনেকগুলি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সাহায্যকারী বা বন্ধ্যা কোষের মিলনের ফলে দেখা যায়। 'এইগুলি খাদ্যের সহিত সাইটোপ্লাজমে আবদ্ধ হয়। ইহা হইতে অনেক বহুকোষী সূত্র জন্মায় এবং ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসগুলি তাহাদের মধ্যে যায়। এই সকল সূত্রকে গনিমোব্লাস্ট সূত্র বলে। প্রত্যেক সূত্রের অগ্রভাগে একটি কারপোস্পোরানজিয়ামে একটি

কারপোস্পোর থাকে। কারপোস্পোরে ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস দেখা যায়। কারপোস্পোর জন্মাইবার সময় হ্যাপলয়েড সূত্র বড় হইয়া কারপোস্পোর সূত্রগুলিকে আবরণের মত ঢাকিয়া দেয়। আবরণ সৃষ্টিকারী সূত্রগুলি হ্যাপ্লয়েড ; কিন্তু ভিতরের কারপোস্পোর ডিপ্লয়েড। এই সম্পূর্ণ অংশটিই **সিসটোকার্প** (cystocarp)। কারপোস্পোর পরিপক্কতা লাভের পর সিসটোকার্প হইতে বাহির হইয়া যায়। কারপোস্পোর অংকুরিত হইয়া রেণুধর (sporophytic) শৈবাল সৃষ্টি করে। ইহাকে টেটরাস্পোরযুক্ত বা টেটরাস্পোরোফাইট বলে। যে শৈবাল ডিপলয়েড কারপোস্পোর হইতে জন্মায় তাহা রেণুধর ও ডিপ্লয়েড।

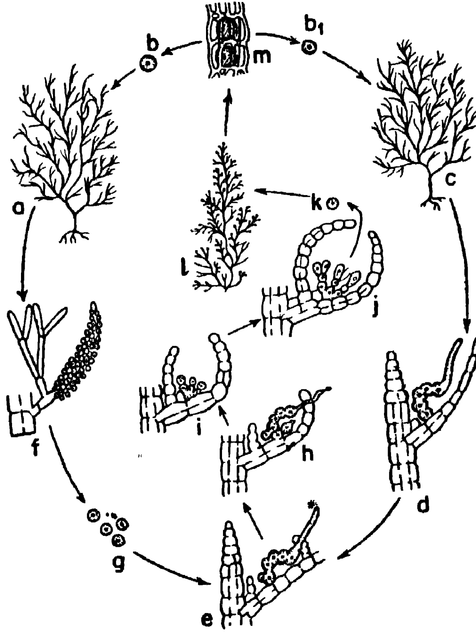


পলিসাইফোনিয়া (২) :
a = নিষেকের পর, a_1 = ট্রাইকোজাইনি, b_1 ও b = গনিমোব্লাস্ট c = সিস্টোকার্প (সুপক্ক), d = সিস্টোকার্প, e = টেটরাস্পোরানজিযা বহনকারী পলিসাইফোনিয়া, f ও f_1 = ট্রেটরাস্পোরানজিয়া ও ট্রেটারাস্পোর।

টেটরাস্পোর হইতে শৈবালটির অযৌন জনন হয় এবং ছোট বৃন্তকোষের উপর স্পোরথলি (sporangia) জন্মায়। প্রত্যেক স্পোরথলিকে টেটরাস্পোরানজিয়াম বলে। ইহার কারণ, নিউক্লিয়াসটি মিয়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপলয়েড নিউক্লিয়াস তৈয়ারি করে। এই সকল স্পোরকে টেটরাস্পোর (tetraspore) বলা হয়। টেটরাস্পোরানজিয়াম পাকিলে ইহার প্রাচীর ফাটিয়া টেটরাস্পোর বাহির হয়। টেটরাস্পোর হইতে অর্ধেক সংখ্যায় পুংলিঙ্গধর (male gametophyte) এবং অর্ধেক সংখ্যায় স্ত্রীলিঙ্গধর (female gametophyte) উদ্ভিদ জন্মায়।

অতএব দেখা যায়--পলিসাইফনিয়ায় তিন প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায় :— (১) পুং উদ্ভিদ যাহাতে স্পারমাটানজিয়া জন্মায়, (২) স্ত্রী উদ্ভিদ যাহাতে কারপোগোনিয়া ও নিষেকের পরে সিসটোকার্প জন্মায় এবং (৩) টেটরাস্পোরযুক্ত উদ্ভিদ যাহাতে টেটরাস্পোর পাওয়া যায়।

ইহার জীবন-চক্রে পুং ও স্ত্রী উদ্ভিদ লিঙ্গধর এবং টেটরাস্পোরযুক্ত উদ্ভিদ রেণুধর। ইহার জীবন-চক্রে নিয়মিত জনুঃক্রম আছে। দুই প্রকার লিঙ্গধর উদ্ভিদের পরে নিয়মিত রেণুধর উদ্ভিদ জন্মায়।

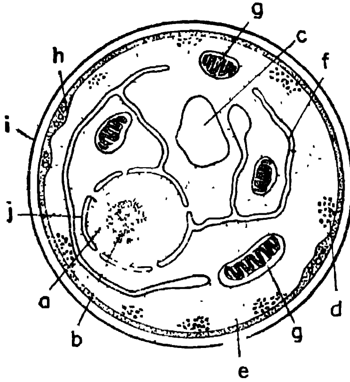


পলিসাইফোনিয়ার জীবন-চক্র :

a=পুং গ্যামিটোফাইট (n), b=টেটরাস্পোর (n), b_1=টেটরাস্পোর (n), c=স্ত্রী গ্যামিটোফাইট (n), d=কারপোগোনিয়াম বহনকারী শাখা, e=জোন মিলন, f=স্পার মাটানডিয়াল সমষ্টি, g=স্পারমাটিয়া, h=জাইগোট (2n), g_1=কারপোস্পোরানজিয়া ও কারপোস্পোর, i=টেটরাস্পোরোফাইট (2n), k=মিয়োসিস, l=পলিসাইফোনিয়া।

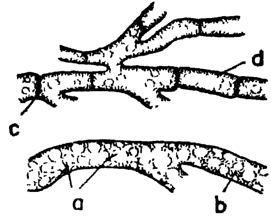
ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাকের দেহ এককোষী গোলাকৃতি হইতে শুরু হইয়া বহুকোষী সূতাকৃতি পর্যন্ত নানা প্রকারের হয়। বহুশাখাবিশিষ্ট সূতাকৃতি ছত্রাকদেহের নাম **মাইসিলিয়াম** (বহুবচন—মাইসেলিয়া)। মাইসিলিয়ামের প্রতি অংশকে **হাইফা** (বহুবচন—hyphae) বলে। সূতাকৃতি বিভেদ-প্রাচীর (septum) বিহীন বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত এককোষী হাইফাকে **সিনোসাইট** (coenocyte) বলে। বিভেদ-প্রাচীর দ্বারা বহুকোষে বিভক্ত মাইসিলিয়ামকে **সেপটেট** মাইসিলিয়াম বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইফার প্রাচীর **কাইটিন** (chitin) নামক নাইট্রোজেন-গঠিত যৌগিক উপাদান দ্বারা গঠিত। ইহা ছাড়া কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর ছত্রাকের **সেলুলোজ** (cellulose)-নির্মিত প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো ছত্রাক-প্রাচীরে **ক্যালোজ** (collose) নামক যৌগিক কার্বহাইড্রেটও থাকে। ছত্রাকদেহের প্রাচীরের মধ্যে দানাদার, ভ্যাকুয়লযুক্ত প্রোটোপ্লাজম থাকে।



আদর্শ ছত্রাক কোষ :
a = নিউক্লিয়াস, b = নিউক্লিওলাস, c = গহ্বর, d = রাইবোজোম, e = গ্লাইকোজেন, f = এণ্ডো-প্লাজম জালিকা, g = মাইটোকনড্রিয়া, h = প্লাজ-মালেমা, i = কোষ-প্রাচীর, j = নিউক্লিয়াস-প্রাচীর।

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে প্রধানতঃ গ্লাইকোজেন নামক শর্করা, তৈলকণা এবং ম্যানিটল জাতীয় কোহল সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে জমা থাকে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এক বা একাধিক নিউ-ক্লিয়াস থাকে। আকারে অনেক ছোট হইলেও ছত্রাক-নিউক্লিয়াসের গঠন উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসের মত। প্রতি নিউক্লিয়াসে



a, b=সিনোসাইট, d=কোষ
c=সেপটেট মাইসিলিয়াম।

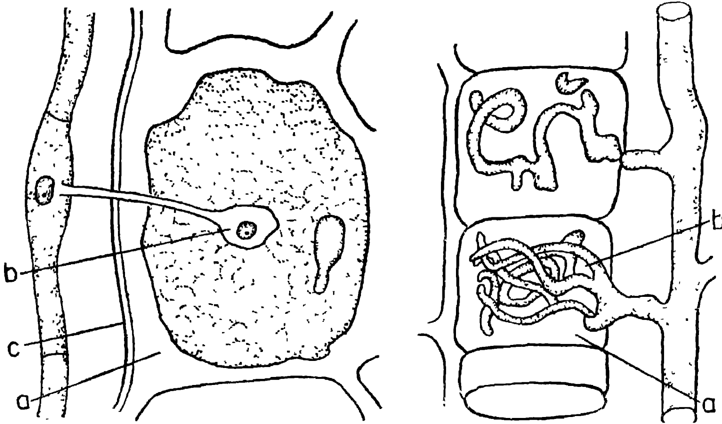
আবরণ (nuclear wall), ক্রোমাটিন স্ট্রাণ্ড (chromatin strand) এবং নিউ-ক্লিওলাস (nucleolus) থাকে। ইহা ছাড়া প্রোটিনগঠিত মাইটোকণ্ড্রিয়াম (বহুবচন—mitochondria), কোন কোন ক্ষেত্রে রেসিন, রঞ্জক প্রভৃতি প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে। বিভেদ-প্রাচীরযুক্ত মাইসিলিয়ামের প্রতি কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকিলে তাহাকে **মনোকেরিয়টিক** (monokaryotic), এবং দুইটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকিলে তাহাকে **ডাইকেরিয়টিক** (dikaryotic) মাইসিলিয়াম বলে। ছত্রাকের বিভেদ-প্রাচীরে সাধারণতঃ একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের সাহায্যে দুই কোষের প্রোটোপ্লাজমের যোগাযোগ থাকে এবং কোষ হইতে অন্য কোষে নিউক্লিয়াসের যাতায়াত সম্ভব হয়। কোনো কোনো ছত্রাকের বিভেদ-প্রাচীরে বিশেষ ধরনের ঢাকনাযুক্ত ছিদ্র থাকে, তাহাকে **ডলিপোর** (dolipore) বলে।

উচ্চশ্রেণীর ছত্রাকের মাইসিলিয়াম একত্রিত হইয়া ছত্রাক কলার বা **প্লেকটেনকাইমা**

(plectenchyma) সৃষ্টি করে এবং নানা প্রকার বিশেষ ধরনের কার্য সম্পাদন করে। যখন প্লেকটেনকাইমার কোষগুলি গোলাকৃতি এবং উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্যারেনকাইমার মত দেখিতে হয় এবং ছত্রাকগঠিত বলিয়া বোঝা যায় না তখন তাহাকে **সিউডোপ্যারেনকাইমা** (pseudoparenchyma) বলে। **প্রোজেনকাইমা** (prosenchyma) কোষগুলি লম্বা এবং ছত্রাকগঠিত বলিয়া সহজেই চেনা যায়। উচ্চশ্রেণীর ছত্রাকের ফলোৎপাদন (fructification) প্লেকটেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

ছত্রাকের পুষ্টি (Nutrition)

ছত্রাক সবুজকণাহীন হওয়াতে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। ফলে, পুষ্টির জন্য নানা জৈববস্তু হইতে ইহা খাদ্য সংগ্রহ করে। সাধারণতঃ উপযুক্ত খাদ্যের সংস্পর্শে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ (25°-30° C) এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাকের সুবৃদ্ধি হয়। মাটি, জৈব উপাদান—যেমন, প্রাণীর মল, মৃত জীবজন্তু ও চামড়া, গাছপালা, জীবন্ত প্রাণী ও গাছপালা, খাদ্যদ্রব্য, শস্য, ফলমূল, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি



a=হোস্টের কোষ, c=কোষ প্রাচীর, b=হস্টোরিয়া।

প্রায় সর্বপ্রকার জৈববস্তু হইতেই ছত্রাক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। খাদ্য আহরণের উপায় অনুযায়ী ছত্রাককে তিনভাগে ভাগ করা হয় :

(১) **স্যাপ্রোফাইট** (Saprophyte)—যে সমস্ত ছত্রাক কেবলমাত্র মৃত ও জৈব উপাদানে জন্মায় তাহাদের **মৃতভোজী** বা **স্যাপ্রোফাইট** বলে।

(২) **প্যারাসাইট** (Parasite)—যাহারা কেবলমাত্র জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ হইতে খাদ্যগ্রহণ করে তাহাদের **পরভোজী** বা **প্যারাসাইট** বলে। পরভোজী ছত্রাক হোস্টের (host) দেহের কোষমধ্যে **হস্টোরিয়া** (haustoria) নামক বিশেষ অনুসূত্র প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বারা খাদ্য আহরণ করে।

যে সমস্ত ছত্রাক কোন অবস্থাতেই প্যারাসাইট অথবা স্যাপ্রোফাইট স্বভাব বদলায় না তাহাদের অবলিগেট (obligate) প্যারাসাইট অথবা স্যাপ্রোফাইট বলে। আবার যাহারা অবস্থানুযায়ী তাহাদের প্যারাসাইট অথবা স্যাপ্রোফাইট স্বভাব পরিবর্তন

করিতে পারে এবং উভয় প্রকারেই খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহাদের **ফ্যাকালটেটিভ** (facultative) **প্যারাসাইট** অথবা **স্যাপ্রোফাইট** বলে।

(৩) **সিমবায়োণ্ট** (Symbiont)—আর একপ্রকারের ছত্রাক অন্য উদ্ভিদের সহিত বিশেষ ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রকার বন্ধনে উভয়েই একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়। কোন কোন ছত্রাক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের সহিত এইরূপ যোগসূত্র স্থাপন করে,—তাহাদের মাইকোরাইজা (mycorrhiza) বলে। ছত্রাক ও অ্যালগা (alga) বিশেষ বন্ধনে লাইকেন (lichen) সৃষ্টি করে।

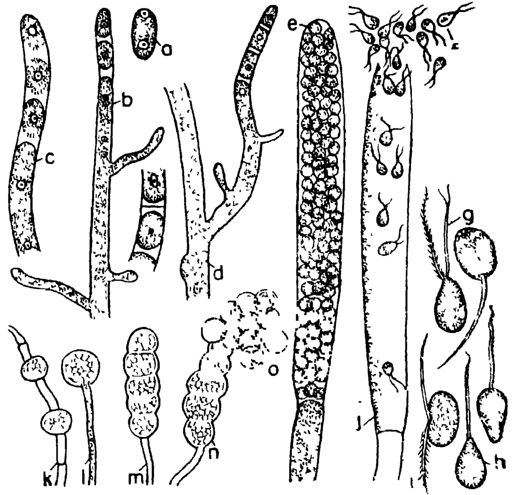
গবেষণাগারে উপযুক্ত পরিবেশে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। অধিকাংশ ছত্রাকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত তাপ (25°-30° C), অনুকূল pH (5-5·5) এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ছত্রাকের স্পোর তৈয়ারি হইবার সময় আলোরও প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, জৈবিক উপাদানের মধ্যে কার্বণগঠিত শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং নাইট্রোজেন গঠিত জৈবিক অথবা অজৈবিক উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সালফার, ফসফরাস, পটাসিয়াম, তামা, লোহা এবং ভিটামিন অনেক ছত্রাকের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বংশবৃদ্ধি (Reproduction)

অঙ্গজ জননের সময় ছত্রাকের মাইসিলিয়াম ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয় এবং পরে প্রতি অংশ বর্ধিত হইয়া নূতন ছত্রাক সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় ইহারা জনন করে।

অযৌন জনন নানা প্রকারের হয় :

(১) **ক্ল্যামাইডোস্পোর** (Chlamydospore) —খাদ্য জমা রাখার ফলে হাইফার অগ্র (terminal) অথবা নিবেশিত (intercalary) অংশ সময় সময় স্ফীত হইয়া উঠে এবং পুরু আস্তরণে আবৃত হয়। ইহারা প্রতিকূল আবহাওয়ায় নষ্ট না হইয়া অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন ছত্রাক সৃষ্টি করে।



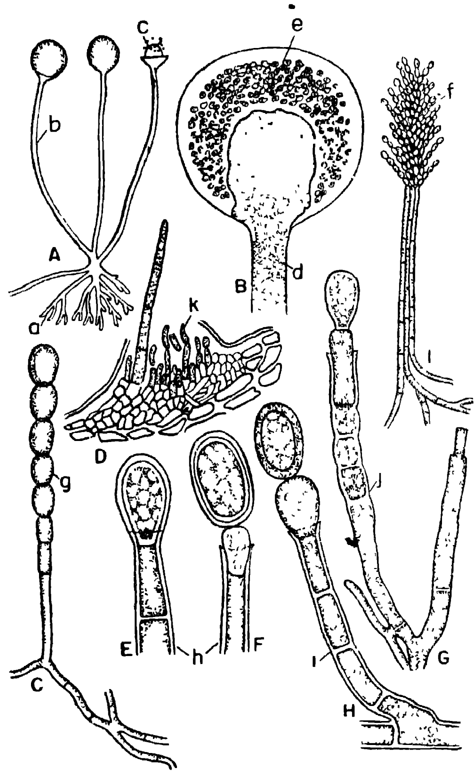
ছত্রাকের বিভিন্ন প্রকার অযৌন স্পোর : a=অয়িডিয়াম, b=হাইফা, c=অয়িডিয়াম সৃষ্টি, d=হাইফা, e=জুস্পোর, f=জুস্পোর, g=দুইটি ফ্ল্যাজেলামের জুস্পোর, h=এক ফ্ল্যাজেলামের জুস্পোর, j=জুস্পোর, k, l, m, n ও o=ক্ল্যামাইডোস্পোর।

(২) **অয়িডিয়া** (Oidia) —হাইফা ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট এক অথবা দুই নিউক্লিয়াসযুক্ত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশ বা **অয়িডিয়া** সৃষ্টি করে। প্রতি অংশ হইতে নূতন ছত্রাক সৃষ্টি হইতে পারে।

(৩) **স্পোরানজিওস্পোর** (Sporangiospore)—এই প্রকার ছোট, এককোষী চলচ্ছক্তিহীন রেণু (spore) সমষ্টি একটি বিশেষ রেণুস্থলীর (sporangium) মধ্যে সৃষ্টি হয়। যে হাইফা হইতে রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় তাহাকে **স্পোরানজিওফোর** (Sporangiophore) বলে। একটি বা দুইটি সিলিয়াম (cilium) দ্বারা চলনশীল স্পোরানজিওস্পোরকে **জুস্পোর** (zoospore) বলে।

(৪) **কনিডিয়াম** (Conidium)–বিশেষ ধরনের হাইফার (conidiophore) অগ্রভাগ হইতে এক বা একাধিক, এক বা বহুকোষী, পাতলা বা পুরু প্রাচীরযুক্ত এইরূপ স্পোরের সৃষ্টি হয়। ইহারা সহজেই বাতাসে বাহিত হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে নূতন ছত্রাক সৃষ্টি করে। কনিডিয়াম যদি কনিডিওফোরের প্রাচীরের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহাকে **এন্ডোকনিডিয়াম** (Endoconidium) বলে।

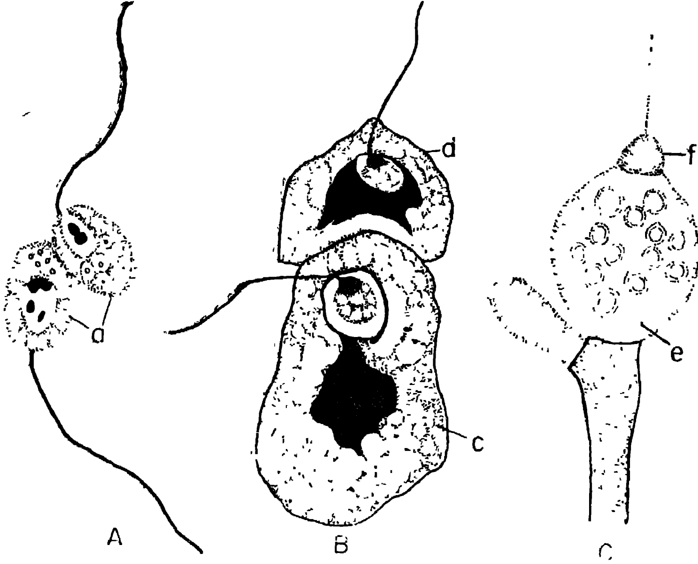
যৌন জনন: অন্যান্য সমস্ত উদ্ভিদের ন্যায় যৌন বংশবৃদ্ধি তিনটি স্তরে সংঘটিত হয়। প্রথম স্তরে **প্লাজমোগ্যামীর** সময় দুইটি মিলনকামী (compatible) হ্যাপ্লয়েড (haploid) নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাস্টের মিলন হয়। দ্বিতীয় স্তরে **কেরিয়গ্যামী** কালে মিলিত প্রোটোপ্লাস্টের মধ্যকার নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড (diploid) নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। তৃতীয় স্তরে মিয়সিস প্রক্রিয়া মারফত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।



বিভিন্ন ছত্রাক স্পোর :
A—রাইজোপাস, a=রাইজয়েড, b=স্পোরানজিয়োফোর, c=স্পোর ; B—স্পোরানজিয়োফোর, e=স্পোর ; C—g=কনিডিয়া ; D ও E কনিডিয়া ; H, G ও I—f=কনিডিয়া ও কনিডিয়োফোর।

এই মিলনকামী প্রোটোপ্লাস্টের নাম গ্যামিট। যদি দুইটি গ্যামিটই সমআকৃতির হয় তবে সেই মিলনকে আইসোগ্যামী (Isogamy) বলে। গ্যামিটগুলির চলচ্ছক্তি থাকিলে তাহাদের প্ল্যানোগ্যামিট (Planogamete) এবং না থাকিলে আপ্ল্যানোগ্যামিট (Aplanogamete) বলে। গ্যামিটগুলি যে ছত্রাক কোষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহাকে **গ্যামিটানজিয়াম** (Gametangium) বলে। নিম্নশ্রেণীর ছত্রাকে আইসোগ্যামিট দ্বারা যৌন জনন দেখিতে পাওয়া পায়। অপেক্ষাকৃত

উচ্চ শ্রেণীতে গ্যামিট দুইটি বিসদৃশ ইহাদের **অ্যানআইসোগ্যামী** (Anisogamy) বলে। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ছত্রাকে (মিউকর, রাইজোপাস) গ্যামিটের পরিবর্তে গ্যামিটানজিয়ার মধ্যে যৌন সংযোগ সাধিত হয়। ইহাকে **গ্যামিটানীজয়াল কপুলেশন** (gametangial copulation) বলে। এই প্রকারে মিলিত কোষটিকে



A = আইসোগ্যামী, a = আইসোগ্যামিট ; B = অ্যানআইসোগ্যামী, c ও d = বিভিন্ন আয়তনের গ্যামিট ; C = উগ্যামী, e = উগোনিয়াম ও f = অ্যানথেরোজয়েড।

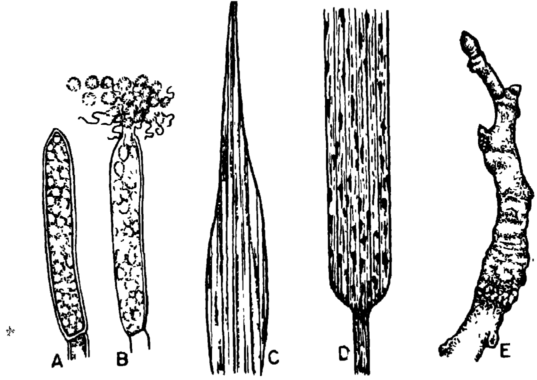
জাইগোস্পোর (zygospore) বলে। যখন মিলনকামী গ্যামিটানজিয়া দুইটি আকৃতিতে পৃথক প্রকৃতির হয় এবং একটি পুরুষ বা পুংধানী (antheridium) এবং অন্যটি ডিম্বাণুস্থলী হিসাবে গণ্য হয় তাহাকে **উগ্যামী** (oogamy) বলে।

ছত্রাকের গুরুত্ব (Importance of Fungi)

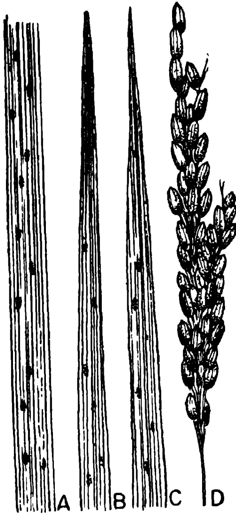
একসময় ছত্রাককে কেবলমাত্র ক্ষতিকারক উদ্ভিদ হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহারা নানা প্রকারের উদ্ভিদরোগের সৃষ্টি করিয়া আমাদের খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের উৎপাদন কমাইয়া প্রচুর আর্থিক ক্ষতিসাধন করে। যেমন, আলুগাছের ফাইটপথোরা জনিত, গমগাছের পাকসিনিয়া ও উস্টিলাগো জনিত, ধানগাছের হেলমিনথোস্পোরিয়াম জনিত এবং আখগাছের কলেটো ট্রাইকাম জনিত রোগ। ইহা ছাড়া, বড়গাছ, মূল্যবান কাঠ, উদ্ভিদজাত দ্রব্য, খাদ্যবস্তু প্রভৃতি প্রায় সর্বপ্রকার জৈবিক উপাদান ছত্রাকদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণী ও মানুষের দেহে ছত্রাকদ্বারা কানডিডা, ব্লাস্টোমাইসিস, ট্রাইকোফাইটন জনিত রোগ এবং মাইক্রোস্পোরা জনিত চর্মরোগ হয়।

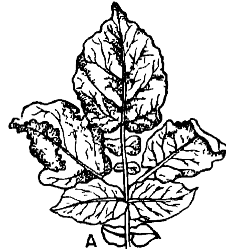
আজকাল কিন্তু ছত্রাককে নানা প্রয়োজনীয় কার্যে লাগানোর ফলে ইহার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসাবে কোন কোন ছত্রাক খুবই মুখরোচক ও পুষ্টিকর। ইহাদের মধ্যে *Agaricus campestris*, *Morchella esculenta* ও *Tuber* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য দেশে বহুকাল হইতে ইহাদের চাষের প্রচলন আছে। অধুনা আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে ইহাদের চাষ শুরু হইয়াছে। নানাবিধ জৈবিক রসায়ন



বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ - রোগের চিহ্ন : A = স্পোরানজিয়াম, B = স্পোর বাহির হইতেছে, C = পাতার স্ট্রেক (streak), D = পাতার স্পট্ (spot), E = কাণ্ডের ক্যাংকার (canker)।



A, B, C, D— ধানের ব্রাউন স্পট্ রোগ।



A— আলুর ধসারোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় উহার প্রকাশ।

তৈয়ারির কারখানায় ছত্রাকের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। মিউকর হইতে স্টিরয়েড, ঈষ্ট হইতে রিবফ্লাভিন ভিটামিন, ইনভারটেস এনজাইম, এসপারজিলাস হইতে সাইট্রিক ও ইটাকনিক অ্যাসিড প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছত্রাক হইতে নানা প্রকারের ঔষধও পাওয়া যায়—যেমন, পেনিসিলিয়ম ক্রাইসোজিনাম হইতে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক, ক্লাভিসেপস পারপিউরিয়া হইতে আরগট নামক অ্যালকালয়েড। আজকাল গবেষণাগারে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও ছত্রাক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

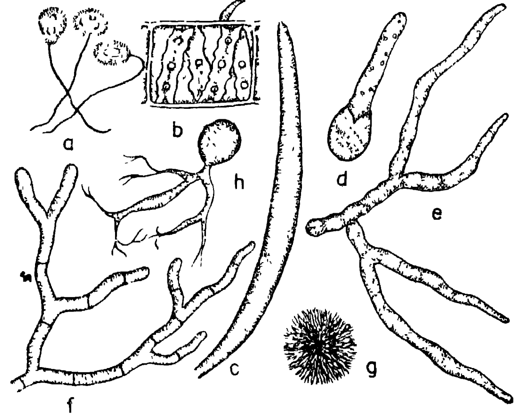
ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Fungi)

ছত্রাককে সুবিধামত নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে (class) বিভক্ত করা হইয়া থাকে :

(ক) ছত্রাকদেহ এককোষী অথবা এককোষী অনুসূত্র (coenocytic mycelium) ; যৌন বিস্তার প্লানোগ্যামিট, অ্যাপ্লানোগ্যামিট অথবা গ্যামিটানজিয়াল কপুলেশনজনিত —Class Phycomycetes (ফাইকোমাইসিটিস)

(খ) মাইসেলিয়াম বিভেদ প্রাচীর বিশিষ্ট

(১) যৌন প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত এস্কোস্পোর বিশেষ এসকাসকোষের মধ্যে সৃষ্টি হয় —Class Ascomycetes (এসকোমাইসিটিস)



ছত্রাকের বিভিন্ন রকমের থ্যালাস ·
a = এককোষী ফ্ল্যাজেলামযুক্ত, h = স্পাইরোগাইরার উপর ছত্রাক, c = এককোষী ছত্রাক, d = অঙ্কুরিত স্পোর, e = শাখাযুক্ত হাইফা, f = হাইফা সেপ্টাযুক্ত, g = তারকার মত হাইফা, h = অঙ্কুরিত স্পোর হইতে মাইসেলিয়ামের উৎপত্তি।

(২) যৌন প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত বেসিডিওস্পোর একটি বিশেষ ব্যাসিডিয়া কোষের মধ্যে সৃষ্টি হয় —Class Basidiomycetes (ব্যাসিডিয়মাইসিটিস)

(৩) যৌন প্রক্রিয়া অজানা (unknown) ; অযৌন স্পোরের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয় —Class Fungi Imperfecti (ফানজাই ইমপারফেকটি)

ফাইকোমাইটিস্ (Phycomycetes)

ইহাদের দেহ এককোষ অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিনোসাইট মাইসিলিয়াম দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে কিছু ছত্রাক জলজ উদ্ভিদ, মাছ অথবা জলে পচা জৈবিক উপাদান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্থলে বসবাসকারী এই ছত্রাক পরভোজী অথবা মৃতভোজী হয়। ইহাদের কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ অথবা কাইটিন দ্বারা গঠিত।

অযৌন জনন জুস্পোর, অ্যাপ্লানোস্পোর অথবা স্পোরানজিওস্পোর যে কোন প্রকারে সংঘটিত হয়। বিশেষ অনুসূত্র স্পোরানজিওস্ফোরের অগ্রভাগে এককোষী স্পোরানজিয়ামের মধ্যে এই স্পোরগুলি থাকে। যৌন বংশবৃদ্ধি আইসোগ্যামী, অ্যানআইসোগ্যামী ও উগ্যামী এই তিন প্রকারেই সাধিত হয়। কোন কোন নিম্নস্তরের ফাইকোমাইসিটিসের সমগ্র দেহটি একটি গ্যামিটানজিয়ামে রূপান্তরিত হইলে তাহাকে **হলোকার্পিক** বলে। যখন ছত্রাক-দেহের কিয়দংশ হইতে গ্যামিটানজিয়াম সৃষ্টি হয় তাহাকে **ইউকার্পিক** বলে। উচ্চস্তরের ফাইকোমাইসিটিসের গ্যামিটানজিয়ামগুলির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী বিভেদ দেখা যায় এবং ইহাদের মধ্যে মিলনের ফলে বহুনিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট জাইগোস্পোরের সৃষ্টি হয়।

বিশিষ্ট ছত্রাকবিজ্ঞানী স্পারোর (Sparrow) মতানুযায়ী ফাইকোমাইসিটিসকে নিম্নলিখিত তিনটি উপশ্রেণীতে (subclass) ভাগ করা যায় :

ক. দেহ হলোকার্পিক অথবা ইউকার্পিক ; এক সিলিয়ামযুক্ত জুস্পোর হয়
—ইউনিফ্লাজেলেট (Uniflagellate)
উদাহরণ,– সিনকাইট্রিয়াম।

খ দেহ অনুসূত্রগঠিত ; অনুসূত্রের প্রাচীর সেলুলোজ গঠিত ; অযৌন জনন দুই সিলিয়ামবিশিষ্ট জুস্পোর অথবা কনিডিয়া দ্বারা
—বাইফ্লাজেলেট (Biflagellatae)
উদাহরণ,— পিথিয়াম, ফাইটপথোরা।

গ. অনুসূত্র প্রাচীর কাইটিন গঠিত ; অযৌন জনন অ্যাপ্লানোগ্যামিট, স্পোরানজিওস্পোর অথবা কনিডিয়া দ্বারা
—আফ্লাজেলেট (Aflagellatae)
উদাহরণ,— মিউকর

সিনকাইট্রিয়াম (Synchytrium)

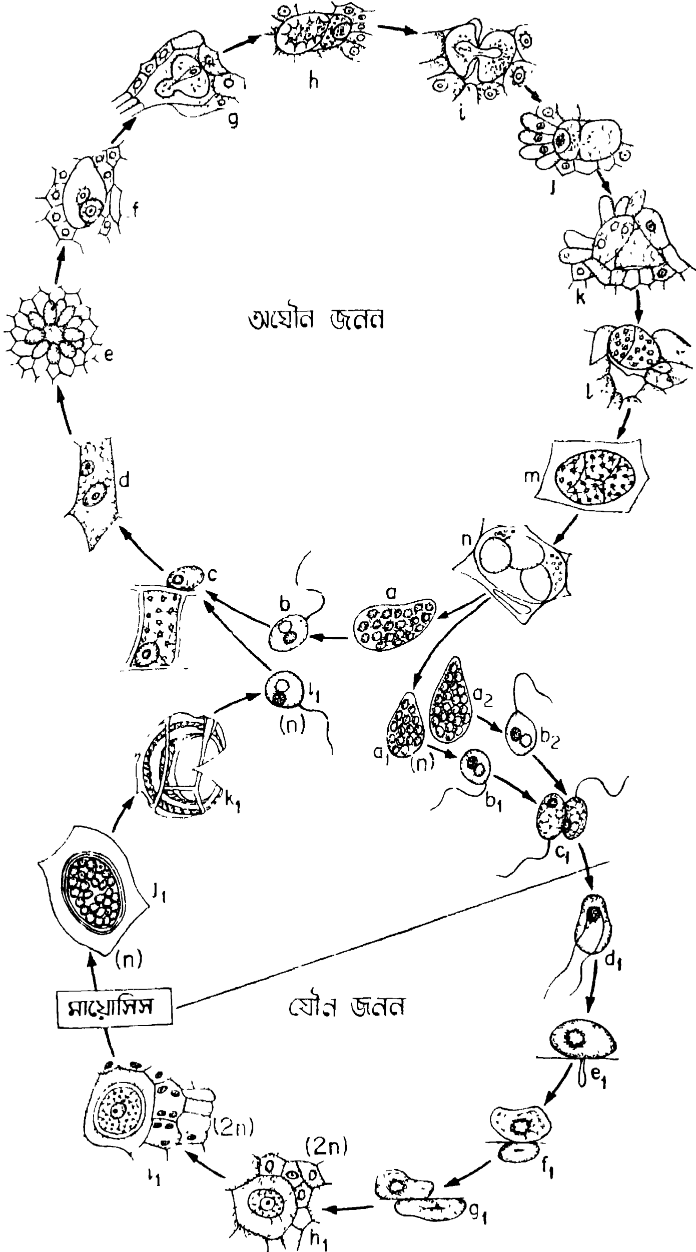
পৃথিবীর গ্রীষ্ম ও শীত প্রধান স্থান সহ প্রায় সর্বত্রই ইহাদের পাওয়া যায়। ইহারা নানাপ্রকার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের পাতা, ফুল, কুঁড়ি ও কাণ্ডের উপর পূর্ণ পরজীবী ছত্রাকরূপে বৃদ্ধি পায়। নানা প্রজাতির মধ্যে **সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবায়োটিকাম** সর্বাপেক্ষা বহুল পঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

আলুর ওয়ার্ট রোগসৃষ্টিকারী এই সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবায়োটিকাম পূর্ণ পরজীবী ছত্রাকরূপে আলুর ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের উপর ছোট ছোট স্ফীত অংশ (ওয়ার্ট) সৃষ্টি করে।

দেহ (Vegetative structure)– এই ছত্রাকের দেহ এককোষী। সম্পূর্ণরূপে আলুকোষের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া ইহারা ঐ কোষ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই ধরনের জীবকে **এণ্ডোবায়োটিক** (endobiotic) বলে। ইহারা এক কোষ হইতে অন্য কোষে যাইতে পারে না।

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

একটি পূর্ণছত্রাক-কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুইস্তরবিশিষ্ট **গ্রীষ্মরেণু** (Summer spore) সৃষ্টি করে। ইহার বাইরের স্তরটি **স্থূল** ও সোনালি এবং ভিতরের স্তরটি পাতলা ও বর্ণহীন। হোষ্ট কোষের মধ্যেই গ্রীষ্মরেণুটি অঙ্কুরিত হয় এবং ইহার বাইরের স্তর ফাটিয়া ভিতরের স্তরটি প্রোটোপ্লাজমসমেত বাহির হইয়া আসে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যকার নিউক্লিয়াসটি পুনঃ পুনঃ মাইটোসিসের মাধ্যমে বিভক্ত হইয়া বহু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। এই বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত অংশটিকে **সোরাস** (Sorus) বলে। এখন সোরাসটি প্রাচীরের সাহায্যে কতকগুলি বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত খণ্ড বা **স্পোরানজিয়ামে** (Sporangium) পরিণত হয়। প্রত্যেক স্পোরানজিয়ামের মধ্যকার প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজম সঞ্চিত হইয়া জুস্পোর সৃষ্টি করে। অবশেষে



ফাইকোমাইসিটিজ—সিনকাইট্রিয়াম। অযৌন – a = স্পোরানজিয়াম, b = জুস্পোর, c = জুস্পোরের আশ্রয় কোষে প্রবেশ, d = আশ্রয় আক্রমণ, e = কোষগুচ্ছ, f = প্রোসোরাস, g = সোরাস, h, i, j, k = নিউক্লিয়াস বিভাজন, l, m = সোরাস, n = স্পোরানজিয়াম। যৌন - a_1, a_2 = গ্যামিটানজিয়া, b_1, b_2 = গ্যামিট, c_1 = মিলন, d_1 = জাইগোট, e_1 = আশ্রয় প্রবেশ, f_1, g_1 = আশ্রয় আক্রমণ, h_1 = স্পোরানজিয়াম, i_1 = সুপক্ক স্পোরানজিয়াম, j_1 = জুস্পোরসৃষ্টি, k_1, l_1 = জুস্পোর বাহির হইল।

সোরাসের ও হোস্ট কোষের প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া স্পোরানজিয়াম বাহির হইয়া আসে এবং ইহার মধ্যকার জুস্পোর ছড়াইয়া পড়ে। পিছনে সিলিয়ামযুক্ত জুস্পোরগুলি কিছুক্ষণ চলমান থাকে এবং উপযুক্ত হোস্টের সংস্পর্শে আসিলে হোস্টকোষের প্রাচীর ছিদ্র করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহারা সিলিয়াম, কোষ-প্রাচীরের বাহিরে ত্যাগ করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

কম আদ্রর্তায় সোরাসের মধ্যকার স্পোরানজিয়ামগুলি **গ্যামিটানজিয়াম** রূপে ব্যবহার **করে** এবং গ্যামিট সৃষ্টি করে। গ্যামিটগুলি স্পোরানজিয়স্পোর অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ছোট হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটানজিয়াম হইতে সৃষ্ট দুইটি গ্যামিট মিলিত হইয়া দুই সিলিয়ামবিশিষ্ট ডিপ্লয়েড **জাইগোট** সৃষ্টি করে। এই জাইগোট কিছুক্ষণ চলাফেরা করার পর হোস্টের সংস্পর্শে আসিলে জুস্পোরের ন্যায় একই পদ্ধতিতে হোষ্টের দেহের প্রাচীরকোষে প্রবেশ করে। এই ডিপ্লয়েড ছত্রাক-কোষটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শক্ত আবরণের সৃষ্টি করিয়া **রেস্টিং স্পোরানজিয়ামে** (Resting sporangium) পরিণত হয়। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মিয়োসিস মাধ্যমে বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরে ইহারা মাইটোসিস মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়। প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হইয়া এক সিলিয়াম বিশিষ্ট জুস্পোর সৃষ্টি করে এবং রেস্টিং স্পোরানজিয়ামের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহারা অযৌন জুস্পোরের ন্যায় একইরূপ ব্যবহার করে।

ফাইটপ্থোরা (Phytophthora)

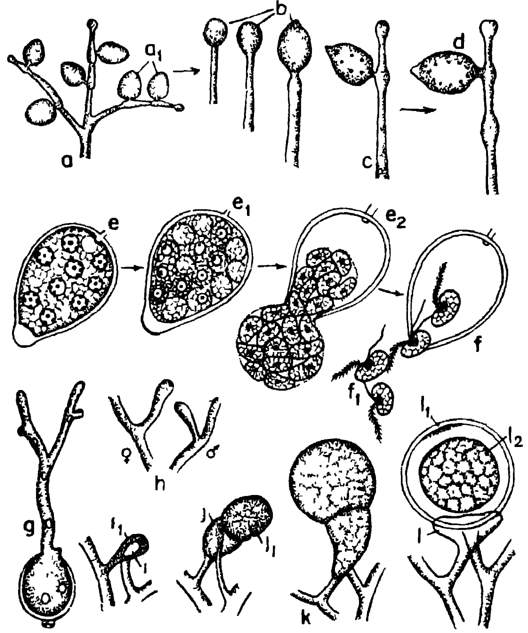
Family : Pythiaceae
Order : Peronosporales
Class : Phycomycetes

ইহা প্রায়শঃই নানা শ্রেণীর বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষের উপর পরজীবী হিসাবে অথবা কখনও কখনও মৃতজীবী হিসাবে দেখা যায়। Facultative saprophyte অথবা facultative parasite—উভয় প্রকার জীবনযাত্রায় ইহারা অভ্যস্ত। ইহাদের মধ্যে ধ্বসারোগ-সৃষ্টিকারী ফাইটপ্থোরা ইনফেস্ট্যান্স সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

দেহ—অনুসূত্র সাধারণতঃ সিনসাইটিক। মৃত অংশ অথবা জনন কোষের কাছাকাছি কিছু অংশে প্রাচীর দেখা যায়। পরজীবী প্রজাতির অনুসূত্র হোস্ট-দেহের অন্তঃকোষীয় (intercellular) অথবা কোষমধ্যক (intracellular) রূপে কোষ হইতে হসটরিয়ার সাহায্যে খাদ্য আহরণ করে।

অঙ্গজ (Vegetative) **জনন** : অগ্র (terminal) অথবা নিবেশিত (intercalary) ক্ল্যামাইডোস্পোরের সাহায্যে সাধিত হয়। এই ক্ল্যামাইডোস্পোর অংকুরিত হইয়া নতুন ছত্রাক-দেহ সৃষ্টি করিতে পারে। এইগুলি গোল অথবা ডিম্বাকার এবং স্বচ্ছ হইতে বাদামী পর্যন্ত যে কোন বর্ণের হয়।

অযৌন (Asexual) **জনন** : শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল আবহাওয়ায় হোস্ট দেহের মধ্য অনুসূত্র হইতে বিশেষ ধরনের কনিডিয়াম বহনকারী হাইফা বা কনিডিওফোর (conidiophore) সৃষ্টি হয়। একক বা গুচ্ছাকারে ইহারা হোস্টের স্টোমাটার মধ্য অথবা হোস্ট-প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং একাধিক কনিডিয়াম ধারণ করে। কনিডিয়ামগুলি ডিম্বাকৃতি এবং ইহার অগ্রভাগ কিছুটা উদ্গত। ইহাদের মধ্যে বহুনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম থাকে। কনিডিয়ামগুলি সহজেই বাতাসে বাহিত হয় এবং সরাসরি অঙ্কুরিত হইয়া হোস্টদেহের কোষে প্রবেশ করে।



ফাইটপথোরার স্পোরানজিয়াম.
a = শাখাযুক্ত স্পোর নজিওফোর, a_1 = স্পোরানজিয়া, b = স্পোরানজিয়া, c ও d = সুপক্ক স্পোরানজিয়া, e, e_1 ও e_2 = জুস্পোর সৃষ্টি, f ও f_1 = জুস্পোর বাহির হইতেছে, g = অঙ্কুরিত, h = পুং ও স্ত্রী, i ও j = মিলন, k = উগোনিযাম, l — এনথেরিডিয়াম, l_2 = উস্পোর।

আর্দ্র ও অনুকূল আবহাওয়ায় কনিডিয়ামগুলি স্পোরানজিয়ামে রূপান্তরিত হয়। ইহার মধ্যকার প্রতিটি নিউক্লিয়াস এবং কিছুটা সাইটোপ্লাজম হইতে একটি জুস্পোর সৃষ্টি হয়। জুস্পোরগুলি বৃক্কাকার এবং ইহার দুইটি সিলিয়াম পার্শ্বের নিচু স্থানে যুক্ত থাকে। জুস্পোরগুলি স্পোরানজিয়ামের উদ্গত অংশ ভাঙ্গিয়া বাহির হয় এবং জলে কিছুক্ষণ সক্রিয় থাকে। পরে সিলিয়াম হারাইয়া গোলাকার সিস্টে (cyst) পরিণত হয়। সিস্ট অঙ্কুরিত হইয়া ১-৩টি অনুসূত্র সৃষ্টি করে এবং হোস্টের স্টোমাটা অথবা প্রাচীরকোষ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে।

যৌন (Sexual) **জনন** : বিশেষ অনুসূত্রের অগ্রভাগ স্ফীত হইয়া একটি অ্যানথেরিডিয়াম সৃষ্টি করে। উগনিয়াম সৃষ্টিকারী অনুসূত্রটিও অ্যানথেরিডিয়ামের নিকট অগ্রসর হয় এবং শেষোক্তটিকে ভেদ করিয়া অপর প্রান্ত হইতে নির্গত হইয়া আসে। পরে স্ফীত হইয়া উগোনিয়ামে পরিণত হয়। ইহার ফলে উগোনিয়ামের নিম্নভাগ ফ্যানেল আকৃতির অ্যানথেরিডিয়াম দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় থাকে। এই প্রকার অ্যানথেরিডিয়ামকে অ্যামফিগাইনাস (amphigynous) বলে। **ফাইটপথোরার ইনফেস্ট্যান্স (P. infestans), কলকেশী (P. colocasiae), প্যারাসিটিকা (P. parasitica)**

প্রভৃতি প্রজাতিতে এইপ্রকার অ্যানথেরিডিয়াম পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন **ফাইটপথোরা ক্যাকটোরম** (P. cactorum), উগোনিয়াম বহনকারী একই বা নিকটস্থ অনুসূত্র হইতে উদ্ভুত অ্যাথেরিডিয়াম উগোনিয়ামের গায়ে আটকাইয়া থাকে। এই প্রকারকে প্যারাগাইনাস (paragynous) অ্যানথেরিডিয়াম বলে। অপক্ক অ্যানথেরিডিয়ামের পাতলা প্রাচীরের মধ্যে এক বা দুইটি নিউক্লিয়াসযুক্ত ভ্যাকুয়লবিহীন সাইটোপ্লাজম থাকে। অপক্ক উয়োগোনিয়াম গোলাকার এবং মসৃণ প্রাচীরযুক্ত। ইহার মধ্যে বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম থাকে। এই প্রোটোপ্লাজম বাহিরের পাতলা স্বচ্ছ পেরিপ্লাজম (Periplasm) নামক অংশ এবং একটি ভিতরের উয়োপ্লাজম (ooplasm) নামক অংশে বিভক্ত হয়। এই অবস্থায় একটি ছাড়া বাকী সমস্ত নিউক্লিয়াস কিণারার দিকে সরিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার হইয়া অবশেষে অবলুপ্ত হয়। কেন্দ্রের একটিমাত্র নিউক্লিয়াসটি একবার বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে এবং অপরটি নষ্ট হইয়া যায়।

একই সময়ে অ্যানথেরিডিয়ামের মধ্যকার নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সবগুলি অবলুপ্ত হয়। অ্যানথেরিডিয়াম হইতে উদ্ভূত এক বা একাধিক প্যাপিলার একটির মধ্য দিয়া এই নিউক্লিয়াসটি উগোনিয়ামের দিকে বর্ধিত হয়। অবশেষে অ্যানথেরিডিয়াম ও উগোনিয়ামের মধ্যকার প্রাচীর অবলুপ্ত হইলে নিউক্লিয়াসটি উগোনিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে।

নিষেকের পরই প্রোটোপ্লাজম দুইটির মিলন হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস দুইটির মিলন কিছু বিলম্বিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট উস্পোরটি একটি পুরু প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয় এবং কিছুকাল স্থির হইয়া থাকে। কিছু কিছু প্রজাতিতে (**P. palmivora** ও **P. infestans**) উস্পোর অংকুরিত হওয়ার কালে প্রাচীরের বহিস্তরটি চূর্ণ করিয়া ভিতরের স্তরটি অংকুরের ন্যায় বাহির হইয়া আসে এবং অগ্রভাগে একটি স্পোরানজিয়াম সৃষ্টি করে। এই স্পোরানজিয়াম জুস্পোর সৃষ্টি করিয়া অথবা সরাসরি অংকুরিত হইয়া পুনরায় অযৌন জনন মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। উস্পোর অংকুরিত হওয়ার কালে ইহার মধ্যকার ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মায়োসিস এবং পরে মাইটোসিস মাধ্যমে বিভাজিত হইয়া কতকগুলি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

রাইজোপাস (Rhizopus)

রাইজো... ...টিজ দলভুক্ত ছত্রাক। ইহা জাইগোমাইসিটিজ শ্রেণীর এবং ইহাকে ... রাখা হয়। ইহার নিকট আত্মীয় মিউকর।

...এবং পচা রুটি, খাদ্যবস্তু, চামড়া, পচা ফল, পনির, ...শুর ম... ...য়। ইহা মৃতজীবীভাবে বহু জৈবপদার্থের ...সৃষ্টি হয়। ... উপর পরজীবীরূপে পাওয়া যায় এবং নানা ...ফলে জন্মিয়া ... rot) তৈয়ারি করে।

... দ্বারা তৈয়ারি। ইহাকে মাইসিলিয়াম বলে। ... কারণ ইহার বহু নিউক্লিয়াসের

মাঝে মাঝে কোন **প্রাচীর** নাই। ইহার শায়িত মাইসিলামকে **স্টোলন** বলে। স্টোলন হইতে রাইজয়েড বাহির হয়।

স্টোলন যে স্থানে জন্মায় তাহার কিছু উপর বায়বীয় হয় এবং মাঝে মাঝে একগোছা রাইজয়েড গঠন করে। রাইজয়েড পচা বস্তু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। রাইজয়েড জন্মাইবার বিপরীত দিকে এক গোছা খাড়াভাবে **রেণুস্থলীধর** (Sporangiophore) গঠন করে। ইহার মাইসিলামের সূতাকে **অনুসূত্র** বা **হাইফা** (hypha) বলে। হাইফার প্রাচীর **কাইটিন** (Chitin) দ্বারা তৈরারি। ইহাদের প্রোটোপ্লাজমে, তৈলবিন্দু, বহু ভ্যাকুওল, গ্লাইকোজেন ও বহু ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস থাকে। ইহারা পরভোজী (heterotrophic) এবং যে জৈব পদার্থে জন্মায় তাহার ভিতর হাইফা প্রবেশ করাইয়া ডায়াস্টেজ উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া কার্বোহাইড্রেটকে জলে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করে এবং অন্যান্য দ্রব্য শোষণ করিয়া দেহের পুষ্টি ও প্রোটোপ্লাজম তৈয়ারি করে।

জনন

মিউকরের ন্যায় রাইজোপাসের **অঙ্গজ** জনন, **অযৌন** ও **যৌন** জনন হয়।

অঙ্গজ জনন—মাইসিলিয়াম ভাঙ্গিয়া, টুকরা হইতে নূতন মাইসিলিয়াম জন্মাইতে পারে।

অযৌন (Asexual): কোন কোন ক্ষেত্রে হাইফা হইতে ছোট গোলাকৃতি **ওইডিয়ার** সারি শিকলের মত উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ওইডিয়াম হইতে অংকুর বাহির হইয়া মাইসিলিয়াম গঠন করে।

প্রতিকূল অবস্থায় মাইসিলিয়াম নিউক্লিয়াস সহ কয়েকটি পৃথক অংশ সৃষ্টি করে! ইহাকে ক্লামাইডোস্পোর বলে। ইহা মাইসিলিয়ামের প্রান্তে বা মাঝে মাঝে জন্মাইতে পারে। পরিবেশ অনুকূল হইলে প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস সহ প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হয়। ইহা হইতে আদিনল (germ tube) জন্মায় এবং বৃদ্ধিলাভ করিয়া মাইসিলিয়াম গঠন করে।

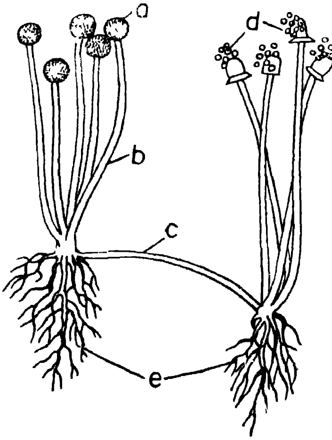
স্পোর দ্বারা অযৌন জনন

স্টোলনের উপর খাড়াভাবে গোছা গোছা হাইফা **রেণুস্থলী** বহন করে। রেণুস্থলী বহনকারী অংশকে স্পোরানজিওফোর বা রেণুস্থলীধর বলে। রেণুস্থলীর ভিতর দুইটি অংশ থাকে। **কলুমেলাপ্লাজম** (Columellaplasm) ও **স্পোরপ্লাজম** (Sporoplasm)। বহু নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজম, স্পোরপ্লাজম সৃষ্টি করে এবং ভ্যাকুওলগুলি সৃষ্টি করে কলুমেলাপ্লাজম। স্পোরোপ্লাজমে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াসসহ পৃথক পৃথক অংশ সৃষ্টি হয়। এই সকল অংশ স্পোরে পরিণত হয়। রেণুস্থলী সুপক্ক হইলে, ফাটিয়া যায় এবং অনুকূল অবস্থায় স্পোর অঙ্কুরিত হয়। পরে আদি অনুসূত্র হইতে ধীরে ধীরে জৈব পদার্থের উপর মাইসিলিয়াম গঠন করে।

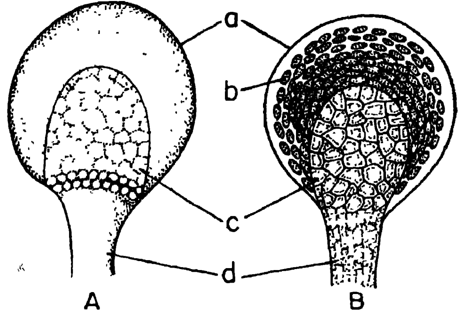
যৌন জনন

ইহার যৌন জনন "+" ও "−" মাইসিলিয়াম থাকিলে তবেই হয়। কেবল "+" বা কেবল "−" হইলে যৌন জনন হইবে না। দুই জাতির (+ ও −) অনুসূত্র মুখোমুখি হইয়া প্রথমে **প্রারম্ভিক** (progametangia) সৃষ্টি করে। "+" কে স্ত্রী ও "−" কে পুং মনে করা হয়; এইখানে যদিও আকারে জননকোষ একই প্রকার কিন্তু শারীরবৃত্তীয় (Physiological) পার্থক্য দেখা যায়। প্রারম্ভিক কোষাধার প্রাচীর দ্বারা প্রান্তকে

জনন কোষাধার ও পিছনে **সাসপেনসর** গঠন করে। জনন কোষাধার **গ্যামিট** বা **সিনো-গ্যামিট** (Coenogamete) বা অ্যাপ্লানোগ্যামিট গঠন করে। এই ক্ষেত্রে জননকোষাধার দুইটি মিলিত হয় (gametangial copulation) এবং একদিকের নিউক্লিয়াস অপরদিকের নিউক্লিয়াসের সহিত ও একদিকের সাইটোপ্লাজম



রাইজোপাস
a = স্পোরানজিয়াম, b = স্পোরানজিযোফোর, c = স্টোলন, d = স্পোর, e = রাইজয়েড।



রাইজোপাস
A-B -a = স্পোরানজিয়াম b = স্পোর, c = কলুমেলা, d = স্পোরানজিওফোব।

অপরদিকের সাইটোপ্লাজমের সহিত মিলিত হইয়া, অনেকগুলি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। এই মিলনের ফলে **জাইগোস্পোর** (Zygospore) সৃষ্টি হয়। জাইগোস্পোরের প্রাচীর স্তরযুক্ত। বাহিরের প্রাচীরকে বহিঃরেণু ত্বক ও ভিতরের ত্বক হইল **অন্তঃরেণুত্বক**। কিছুকাল বিশ্রামের পর জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া একটি প্রোমাইসিলিয়াম গঠন করে। ইহার উপরে রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়াম তৈয়ারি করে। মায়োসিসের পর মাইটোসিস দ্বারা অসংখ্য + ও − রেণু সৃষ্টি হয়। এই সকল রেণু হইতে ভিন্নবাসী মাইসিলিয়াম সৃষ্টি হয়। ইহাকে হেটেরোথ্যালিক প্রজাতি বলা হয়।

অপুংজনি

কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন হয় না এবং একটি গ্যামিটানজিয়াম, জাইগোস্পোরের মত ব্যবহার করে। ইহাকে **এজাইগোস্পোর** বলে। ইহা অপুংজনি (parthenogenesis)।

মিউকর এবং রাইজোপাস এর মধ্য চারিত্রিক প্রভেদগুলি নিম্নে দেখান হইল।

মিউকর	রাইজোপাস
১। ইহাদের সাধারণতঃ গবাদি পশুর মলের উপর জন্মাইতে দেখা যায়।	১। ইহাদের খাদ্যদ্রব্যের উপর, প্রধানতঃ পাঁউরুটিতে দেখা যায়।
২। ইহাদের স্টোলন বা রাইজয়েড জাতীয় অনুসূত্র নাই।	২। ইহাদের স্টোলন এবং রাইজয়েড জাতীয় অনুসূত্র দেখা যায়।
৩। স্পোরানজিওফোর এককভাবে জন্মায়।	৩। অনেকগুলি স্পোরানজিওফোর একত্রে গুচ্ছাকারে জন্মায়।
৪। অনুসূত্রের যে কোন অংশ হইতে স্পোরানজিওফোর জন্মাইতে পারে।	৪। স্পোরানজিওফোরগুলি কেবলমাত্র স্টোলনের পর্ব হইতে জন্মায়।

রাইজোপাসের জীবন-চক্র : a = মাইসিলিয়াম, b = অযৌন, c = স্পোর, d = অঙ্কুর, e – যৌন, f = প্রারম্ভিক গ্যামিট্যানজিয়াম, g = গ্যামিট্যানজিয়াম, h = জাইগোট, i = মায়োসিস, j = প্রোমাইসিলিয়ার, c_1 = স্পোর, d_1 = অংকুরিত স্পোব, a_1 = মাইসিলিয়াল, b_1 = স্পোরানজিয়াম, c_1 = স্পোর।

শ্রেণী : অ্যাসকোমাইসিটিস (Class : Asomycetes)

ইহা ছত্রাকের বৃহত্তম শ্রেণী। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ ছত্রাকই মৃতভোজী হিসাবে মাটি, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর দেহাবশিষ্ট, কাঠ প্রভৃতির উপর অথবা পরজীবী হিসাবে জীবিত উদ্ভিদদেহে রোগসৃষ্টি করিয়া জীবনধারণ করে। কোন কোন ছত্রাক প্রাণীর মলে বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের কপ্রোফিলাস (coprophilous) ছত্রাক বলে।

দেহ (Vegetative body): ঈস্ট ব্যতীত সকল ছত্রাকদেহ অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট অনুসূত্র প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা এক অথবা দুই নিউক্লিয়াস-যুক্ত কোষে বিভক্ত হয়। কোষপ্রাচীর বিশেষতঃ কাইটিন দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদদেহে অনুসূত্র সচরাচর অন্তর্কোষীয় এবং কোষমধ্যক হস্টরিয়াবিশিষ্ট। অনেক উচ্চশ্রেণীর অ্যাসকোমাইসিস ছত্রাকে অনুসূত্রসমূহ একত্রিত হইয়া ছত্রাক কলা গঠিত ফলোৎপাদক বা ফ্রাকটিফিকেশন গঠন করে।

অযৌন জনন (Asexual reproduction): কোষের বাডিং, আর্থ্রিডিয়া, কনিডিয়া প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া অযৌন জনন সাধিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের অনুসূত্র বা কনিডিয়ফোরের অগ্রে সাধারণতঃ একাধিক কনিডিয়াম মালার ন্যায় উৎপন্ন

হয়। অনেক সময় একাধিক কনিডিওফোর একত্রিত হইয়া নানা প্রকার অযৌন ফ্রাকটিফিকেশন উৎপন্ন করে। ইহাদের মধ্য পিকনিডিয়াম (pycnidium) এবং এসারভিউলাস (acervulus) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্লেকটেনকাইমাগঠিত পিকনিডিয়ামগুলি কলস বা ফ্লাস্কের ন্যায় এবং একটি ক্ষুদ্র মুখ বা অসটিওল (ostiole) বিশিষ্ট। পিকনিডিয়ার ভিতরের দেওয়ালে অসংখ্য কনিডিওফোর সারিবদ্ধ থাকে এবং কনিডিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রকার কনিডিয়াকে পিকনোস্পোর (pycnospore) বলে। এসারভিউলি প্লেটের ন্যায় খোলা এবং উপরিভাগ ছোট ছোট কনিডিওফোরযুক্ত।

যৌন জনন (Sexual reproduction): এই শ্রেণীর ছত্রাকে নিম্নলিখিত প্রকারের যৌন জনন পরিলক্ষিত হয়:

(১) **হলগ্যামী** (hologamy): হ্যাপ্লয়েড ঈস্টের এককোষী উদ্ভিদ দেহ সরাসরি গ্যামিটের ন্যায় ব্যবহার করে এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড জাইগোট বা এসকাস সৃষ্টি করে।

(২) **গ্যামিটানজিয়ার সংস্পর্শ দ্বারা** (Gametangial contact): অনেক অ্যাসকোমাইসিটিস ছত্রাক পুরুষ ও স্ত্রী গ্যামিটানজিয়া ভিন্ন আকার বিশিষ্ট। একটি বৃন্তকোষ (stalk cell) পুরুষ গ্যামিটানজিয়াম বা অ্যানথেরিডিয়াম (antheridium) বহন করে। ইহা গদাকৃতি এবং বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। স্ত্রী গ্যামিটানজিয়াম বা এসকোগোনিয়াম একটি ক্ষুদ্র বৃন্তকোষ, মধ্যভাগে একটি বৃহৎ গোলাকার, বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত এসকোগোনিয়াম এবং অগ্রভাগে বাঁকানো নলাকার ট্রাইকোগাইন (trichogyne) নামক তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে। পরিপক্ক অ্যানথেরিডিয়াম ও উগোনিয়াম পরস্পরে ট্রাইকোগাইনের অগ্রদ্বারা সংস্পর্শে আসিলে সংযোগ স্থলের কোষপ্রাচীর দ্রবীভূত হয় এবং একটি পথের সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ট্রাইকোগাইনের মধ্যকার নিউক্লিয়াস নষ্ট হইয়া যায় এবং অ্যানথেরিডিয়ামের প্রোটোপ্লাজম অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। দুইটি প্রোটোপ্লাজমের মিলন হইলেও একটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিউক্লিয়াস জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করিয়া ডাইকেরিয়ন (dikaryon) অবস্থার সৃষ্টি করে এবং জোড়া নিউক্লিয়াসগুলির মিলন বিলম্বিত হয়।

(৩) **স্পারমাটাইজেশন** (Spermatigation): কোন কোন প্রজাতিতে অ্যানথেরিডিয়াম সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কনিডিয়ামের ন্যায় এককোষী, ক্ষুদ্র স্পারমাসিয়ার সৃষ্টি হয়। এসকোগোনিয়ামের সংস্পর্শে আসিলে এইগুলির নিউক্লিয়াস এসকো-গোনিয়ামে প্রবেশ করে এবং যৌন জনন সাধন করে।

(৪) **সোমাটোগ্যামী** (Somatogamy): কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসূত্রের অঙ্গজ কোষ মিলিত হইয়া যৌন জনন সাধিত করে এবং ডাইকেরিয়ন অবস্থা সৃষ্টি করে।

এসকাস সৃষ্টি (Ascus development)

ঈস্ট ছাড়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রায় সমস্ত ছত্রাকে এসকাস নিম্নলিখিত উপায়ে সৃষ্টি হয়: যৌন সংযোগের ফলে এসকোগোনিয়াম হইতে কতকগুলি এসকোজেনাস হাইফা (ascogenous hypha) সৃষ্টি হয়। এইগুলির মধ্যে এসকোগোনিয়ামের জোড়া নিউক্লিয়াসগুলি প্রবেশ করিলে প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টি হয় এবং এসকোজেনাস হাইফা

কোষে বিভক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসকোজেনাস হাইফাগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত দেখা যায়। প্রতি শাখা অগ্রকোষে সচরাচর একজোড়া বিপরীত যৌনধর্মী হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে। অগ্রকোষটি অথবা ইহার ঠিক পিছনের কোষটি (penultimate cell) ক্রজিয়ার (crozier) পদ্ধতিতে বাঁকিয়া একটি আঁকশি উৎপন্ন করে। কোষ-মধ্যস্থ নিউক্লিয়াস দুইটি একই সঙ্গে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা তিনটি কোষে এমনভাবে বিভক্ত হয় যে আঁকশির বাঁকানো অংশের কোষটিতে দুইটি বিপরীতধর্মী অপত্য নিউক্লিয়াস থাকে। অপর দুইটি বিপরীত যৌনধর্মী অপত্য নিউ-ক্লিয়াসের একটি অগ্রকোষে এবং অন্যটি বৃন্তকোষে অবস্থান করে। দুই নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষটি এসকাস মাতৃকোষে রূপান্তরিত হয় এবং ইহার দুইটি নিউক্লিয়াস মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস এবং পরে মাইটোসিস মাধ্যমে আটটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। প্রতিটি নিউক্লিয়াসদ্বারা একটি করিয়া এসকসস্পোর সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রজিয়ারের অগ্র ও বৃন্ত কোষ দুইটি মিলিত হইয়া এসকাস সৃষ্টি করিয়া থাকে। এসকো-জেনাস হাইফার অন্য দ্বিনিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ হইতেও এসকাস উৎপন্ন হইতে পারে।

এসকোকার্প (Ascocarp): এসকাস বহনকারী এসকোমাইসিটিসের ফ্রাকটি-ফিকেশনকে এসকোকার্প (ascocarp) বলে। এসকোকার্প নানা আকারের ও বর্ণের হয়। প্রধানতঃ তিন প্রকারের এসকোকার্প দেখা যায়।

(১) **ক্লিস্টোথেসিয়াম** (Cleistothecium) : এই প্রকারের এসকোকার্প গোলাকার এবং সম্পূর্ণভাবে ছিদ্রবিহীন। ইহার মধ্য মোটামুটি গোলাকার এসকাস ছত্রাক কলায় ছড়ানো থাকে। পরিপক্ক এসকাস ক্লিস্টোথেসিয়ামের প্রাচীর নষ্ট হইলে বাহির হইয়া আসে।

(২) **পেরিথেসিয়াম** (Perithecium) : কলসাকৃতি এই এসকোকার্পের উপরিভাগে একটি অসটিওল (ostiole) নামক ছিদ্র থাকে। পেরিথেসিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে সম্পূর্ণ অথবা কেবলমাত্র নিচের অংশে সচরাচর বেলনাকার (cylindrical) এসকাস এবং অঙ্গজ অনুসূত্র প্যারাফাইসিস (paraphysis) দ্বারা আবৃত থাকে। কলসের গলার ন্যায় অংশের ভিতরের প্রাচীরের অঙ্গজ হাইফাকে পেরিফাইসিস (periphysis) বলে।

(৩) **এপোথিসিয়াম** (Apothecium): প্লেট বা পেয়ালার ন্যায় এই এসকো-কার্পের উপরিভাগে লম্বা এসকাস ও প্যারাফাইসিস গঠিত স্তরকে হাইমেনিয়াম (hymenium) বলে। হাইমেনিয়ামের নিচের সিউডোপ্যারেনকাইমা কলাগঠিত হাইপোথেসিয়াম (hypothecium) এবং সর্বনিম্নে প্রোসেনকাইমাগঠিত এক্সিপিউলাম (excipulum) স্তর পরিলক্ষিত হয়।

এসকাস ও এসকসস্পোর (Ascus and ascospore): গোল, লম্বা, গদাকৃতি প্রভৃতি নানা আকারের ও আয়তনের এসকাস দেখা যায়। এসকসস্পোরও নানা আকারের, আয়তনের ও বর্ণের হয়। এসকসস্পোর সাধারণতঃ এককোষী—যেমন, এসকোবোলাস (Ascobolus) ও এরিসাইফি (Erysiphe); তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বহুকোষী যেমন, প্লীয়স্পোরা (Pleospora)।

এসকোকার্প পরিপক্ক হইলে এসকসস্পোর বিস্তার লাভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকাস প্রাচীর নষ্ট না হইয়া প্রাচীরের অগ্রে অবস্থিত একটি ছিদ্র (pore) অথবা দ্বার (slit)

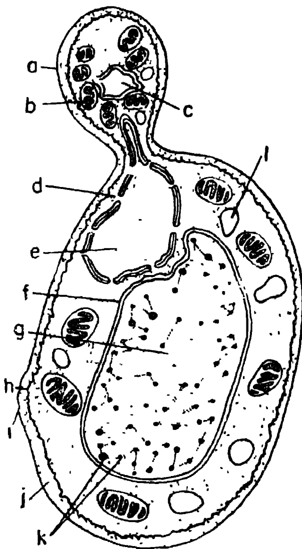
অথবা ঢাকনা (operculum) খুলিয়া একটি একটি করিয়া অথবা একসঙ্গে এসকস্পোর সজোরে নির্গত হয় এবং পরে বাতাসে বাহিত হইয়া বিস্তার লাভ করে।

স্যাকারোমাইসিস (Saccharomyces)

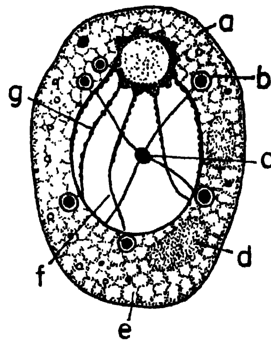
Family : *Saccharomycetaceae*
Order : Endomycetales
Class : Ascomycetes

ঈস্টসম্প্রদায়ভুক্ত ছত্রাকগুলির মধ্যে স্যাকারোমাইসিস (Saccharomyces) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি (S. cerevisiae) নামক ঈস্টটি পাঁউরুটি ও কোহল তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অন্য নানা প্রকার ঈস্ট হইতে নানা প্রয়োজনীয় ভিটামিন, কোহল ও এনজাইম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দেহ (Vegetative body) : স্যাকারোমাইসিস একটি ক্ষুদ্র, সাধারণতঃ গোলাকার এককোষী ছত্রাক। এই কোষের ব্যাস আনুমানিক $10\mu m$। ঈস্টকোষের দুই স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর বিশেষতঃ মান্যান ও গ্লুকোন নামক যৌগিক শর্করা, কিছু কাইটিন এবং কিছু গ্লুকোসামিন দ্বারা গঠিত। পূর্ণাঙ্গ কোষের দানাদার সাইটোপ্লাজম বাহিরের একটোপ্লাজম এবং ভিতরের এন্ডোপ্লাজম নামক অংশে বিভক্ত থাকে। ইহা ছাড়া সাইটোপ্লাজমে চর্বিকণা, মাইটোকনড্রিয়ন, RNA এবং গ্লাইকোজেন নামক শর্করা খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ঈস্ট কোষের নিউক্লিয়াসের



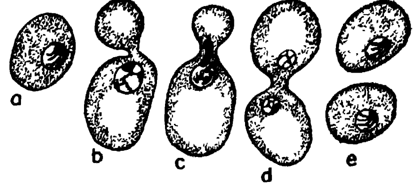
ঈস্ট (২) :
a=বার্ড, b=মাইটোকনড্রিয়ন, c=গহ্বর, d=পোর, e=নিউক্লিয়াস, f=গহ্বর পর্দা, g=গহ্বর, h=কোষ পর্দা, i=প্রাচীর, k=গহ্বর দানা, l=সঞ্চিত দানা।



ঈস্টকোষের বিভিন্ন অংশ :
a=কোষ প্রাচীর, b=সঞ্চিত খাদ্য, c=নিউক্লিয়াস, d=সঞ্চিত খাদ্য, e=সাইটোপ্লাসম্, f=নিউক্লীয় ভ্যাকুওল, g=ক্রোমাটিন জালিকা।

প্রকৃতিটি একটি বহুল বিতর্কিত বিষয়। অনেকের মতে ইহাদের কোষ মধ্যস্থলে একটি দ্বিস্তরযুক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত ভ্যাকুওলের ভিতরে এই নিউক্লিয়াসটি অবস্থিত।

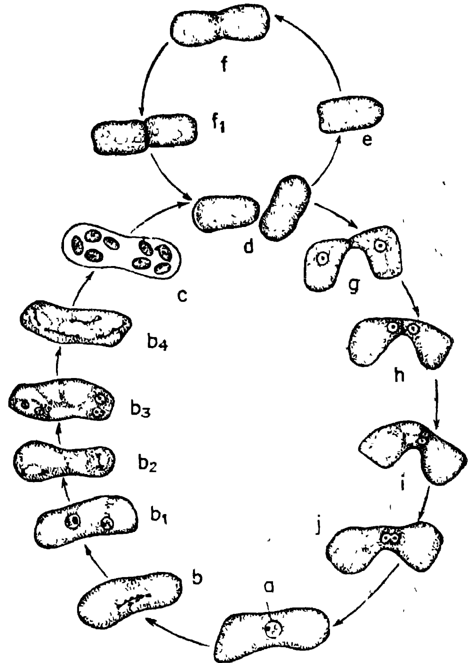
তবে ইহাদের কোন নির্দিষ্ট নিউক্লিওলাস অথবা বংশানুক্রমিক ধারা বহনকারী ক্রোমোসোম পরিলক্ষিত হয় নাই। রবিনো এবং ম্যারক (১৯৬৬) দেখাইয়াছেন যে ফালজেন (Feulgen +) নামক রঞ্জক পদার্থ দ্বারা রঙ করিলে একপ্রকার জালিকাকার সূতার ন্যায় পদার্থ এই নিউক্লিয় ভ্যাকুওয়েলের মধ্যে পাওয়া যায়।



ঈস্ট বাডিং (২) :
a = মাতৃকোষ, b, c ও d = বাডিং, e = অপত্য ঈস্ট।

অঙ্গজ জনন (*Vegetative reproduction*) : ঈস্টের ফিসান (fission) ও বাডিং (budding) উভয় প্রকারের অঙ্গজ জননই দেখা যায়।

বাডিং—পর্যাপ্ত খাদ্য থাকিলে ঈস্ট বাডিংএর সাহায্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় কোষের একপ্রান্তের প্রাচীর হইতে একটি ক্ষুদ্র মুকুল বাহির হয়. এই সময় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় এবং একটি অপত্য নিউক্লিয়াস মুকুলের মধ্যে প্রবেশ করে। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতনৈক্য দেখা যায়। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে নিউক্লিয়াসটি মাঝখান সঙ্কুচিত হইয়া ডাম্বেলের আকার ধারণ করে এবং পরে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আজকাল অধিকাংশের মতে অবশ্য নিউক্লিয়াসের বিভাজন সাধারণ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে মুকুলটি দ্রুত বর্ধিত হইয়া অপত্যকোষে পরিণত হয় এবং মাতৃকোষের প্রায় সমান আয়তন ধারণ করে। দুইটি কোষের মধ্যকার অংশ ক্রমশঃ সংকুচিত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত অপত্যকোষটি মাতৃকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কখন কখন বাডিং প্রক্রিয়া অতি দ্রুত সাধিত হওয়ায় অপত্যকোষটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই ইহা হইতে আর একটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় এবং ধারাবাহিক অপত্যকোষগুলি সংযুক্ত থাকিয়া একটি শৃঙ্খল গঠন করে। ইহা অনেকটা অনুসূত্রের ন্যায় দেখিতে বলিয়া উহাকে **সিউডোমাইসিলিয়াম** বলা হয়।



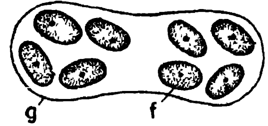
ঈস্ট জীবন-চক্র : a = ঈস্ট, b b_1, b_2, b_3 ও b_4 = এসকাস সৃষ্টি, c = এসকাস ও এসকোস্পোর, d = হ্যাপ্লয়েড কোষ, f ও f_1 = ফিসান, g ও h = মিলন, b, i ও j = প্লাজমোগ্যামী ও কেরিওগ্যামী।

ফিসান (Fission): এই প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়। কখন কখন কোষ দুইটি অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া বার বার বিভক্ত আবার কখন একবার বিভক্ত হইয়া বিছিন্ন হয় এবং পরে পুনরায় বিভক্ত হয়।

যৌন জনন (Sexual reproduction): প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা খাদ্যের অভাব ঘটিলে ঈস্টের যৌন জনন সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়াকালে দুইটি ঈস্টকোষ অথবা দুইটি এসকোসস্পোর মিলিত হইয়া একটি কোষ সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যকার নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি দুই বা তিনবার বিভাজিত হইয়া (প্রথমবার মায়োসিস প্রক্রিয়া দ্বারা) চারিটি অথবা আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইহারাই পরে চারিটি অথবা আটটি এসকসস্পোর সৃষ্টি করে। এই এসকসস্পোরগুলি যে মাতৃকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহাকে এসকাস (ascus) বলে।

ঈস্টের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় স্থায়িত্ব অনুযায়ী তিন প্রকারের জীবনচক্র দেখা যায়:

হ্যাপ্লোবায়ন্টিক জীবনচক্র (Haplobiontic type): **Schizosaccharomyces octosporus** প্রজাতির ঈস্টের অঙ্গজকোষগুলি হ্যাপ্লয়েড অবস্থায় থাকে। এই ঈস্টে যৌন জননের সময় দুইটি কোষ কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রতিটি কোষ হইতে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুরের ন্যায় বাহির হইয়া পরস্পরে মিলিত হইলে একটি জনন নালিকা (conjugation tube) সৃষ্টি করে। এই জনন নালিকা ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে এবং কোষ দুইটির নিউক্লিয়াস ইহার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মায়োসিস দ্বারা বিভাজিত হইয়া চারিটি এবং পরে মাইটোসিস মাধ্যমে আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হইয়া এক একটি এসকোসস্পোর সৃষ্টি করে এবং মাতৃকোষ বা এসকাসের (ascus) মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরিপক্ক হইলে এসকাস প্রাচীর চূর্ণ করিয়া এসকোসস্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে। এই প্রকার জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী এবং ডিপ্লয়েড অবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

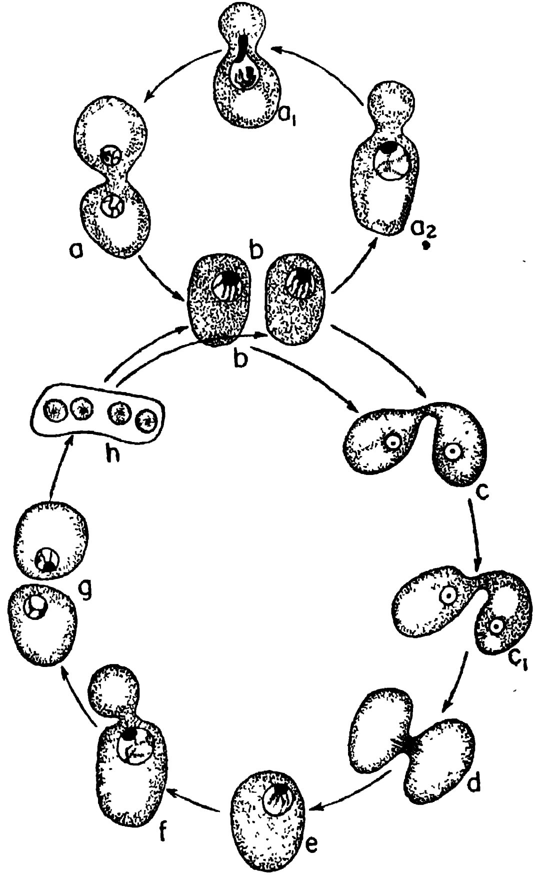


ঈস্ট (৩) এসকাস: f = এসকাস, g = উহার ৮টি এসকোসস্পোর।

ডিপ্লবায়ন্টিক জীবনচক্র (Diplobiontic type): **Saccharomycodes ludwigii** প্রজাতির অঙ্গজ কোষগুলি ডিপ্লয়েড অবস্থায় থাকে এবং অঙ্গজ জনন করে। সময় সময় এক একটি ঈস্টকোষ একটি এসকাসে রূপান্তরিত হয় এবং ইহার মধ্যস্থ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরে প্রতিটি এসকাসে চারিটি এসকোসস্পোর সৃষ্টি হয়। এসকোসস্পোরগুলি কিন্তু এসকাস হইতে বাহির না হইয়াই যৌন জননের ফলে জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। ফলে, প্রতিটি এসকাস প্রাচীরের মধ্যে দুইটি ডিপ্লয়েড কোষ উৎপন্ন হয়। প্রতিটি ডিপ্লয়েড কোষ অঙ্কুরিত হইয়া এসকাস প্রাচীর ভেদ করিয়া

বাহিরে আসে এবং বাডিং প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন মাধ্যমে বৃদ্ধিলাভ করে। **এই প্রকার** জীবনচক্রে ডিপ্লয়েড অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী এবং হ্যাপ্লয়েড অবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

হ্যাপ্লডিপ্লবায়োনটিক জীবনচক্র (Haplodiplobiontic type): এই প্রকার জীবনচক্র **Saccharomyces cerevisiae** প্রজাতির ঈস্টে লক্ষিত হয়। ইহার হ্যাপ্লয়েড অঙ্গকোষগুলি বাডিং প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন সাধন করে। যৌন জননকালে অঙ্গজ কোষ মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড কোষ উৎপন্ন করে। এই ডিপ্লয়েড কোষ নিজেই আবার বাডিং প্রক্রিয়ায় প্রচুর ডিপ্লয়েড অঙ্গজ কোষ সৃষ্টি করে। অবশেষে প্রতিটি ডিপ্লয়েড কোষ একটি এসকাসে রূপান্তরিত হয় এবং উহার মধ্যস্থ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন দ্বারা চারিটি নিউক্লিয়াস এবং চারিটি এসকোসস্পোর সৃষ্টি করে। এসকোসস্পোরগুলি এসকাসপ্রাচীর চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসে। এই প্রকার জীবনীতে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড উভয় অবস্থাই মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী।



স্যাকারোমাইসিসের হ্যাপ্লডিপ্লবায়োনটিক জীবন-চক্র : a=বাডিং, a_1, a_2=বাডিং, b=অপত্য কোষ হ্যাপলয়েড (n), c=যৌন মিলন, c_1=প্লাজমোগ্যামী, d=কেরিওগ্যামী, e=ডিপ্লয়েড কোষ (2n), f=ডিপ্লয়েড বাডিং, g=ডিপ্লয়েড কোষ, h=মায়োসিস, এসকাস ও এসকোসস্পোর (n)।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা

১। ইথাইল কোহল, স্পিরিট, বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

২। পাঁউরুটি, কেক ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ইহা অত্যাবশ্যক।

৩। প্রচুর প্রোটিন থাকায় ইহাদের দেহ চূর্ণ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪। ইহাদের দেহ হইতে জাইমেজ নামক উৎসেচক এবং ভিটামিন B ও G পাওয়া যায়।

৫। ইহা ছাড়া কতকগুলি প্রজাতির ঈস্ট, মানুষ এবং অন্যান্য পশুর নানা প্রকার চর্মরোগ সৃষ্টি করে। যেমন—ব্লাস্টোমাইকোসিস, টরিউলোসিস ইত্যাদি।

পেনিসিলিয়াম (Penicillium)

ইহা ছত্রাকের অ্যাসপারজিলেসি গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ।

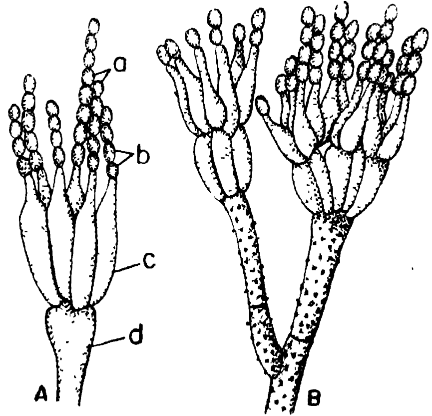
ইহারা মৃতজীবী এবং সবুজ ও বেগুনি বর্ণের হয়। এই ছত্রাক পচা কাঠ, ফল, রুটি, খাদ্যবস্তু, ভিজা চামড়ার উপর জন্মায়। কয়েক প্রজাতির প্রাণী ও মানুষের উপর পরজীবী হইয়াও বাস করে। কমলালেবুর উপর **পেনিসিলিয়াম ডিজিটেটাম** (Penicillium digitatum) ও **পেনিসিলিয়াম ইটালিকাম** (Penicillium italicum) পরজীবী হইয়া বাস করে।

পেনিসিলামের দেহ শাখাযুক্ত অনুসূত্র দ্বারা তৈয়ারি। ইহার কোষে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। ইহার নিউক্লিয়াসে দুইস্তরযুক্ত প্রাচীর পাওয়া যায়। ইহাদের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়ন, রাইবোসম, ভ্যাকুওল ও প্লাজমা পর্দা থাকে। অনুসূত্রের প্রাচীরে রঙের কণা থাকায়, ইহারা নানা রঙের হয়। ইহাদের অনুসূত্র পোষকের ভিতর প্রবেশ করে এবং উৎসেচকের সাহায্যে উহা হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে। পেনিসিলাম হইতে পেনিসিলিন নামক অত্যাশ্চর্য ঔষধ পাওয়া যায়। ইহা মানুষ ও প্রাণীদিগকে মৃত্যু হইতে বহুক্ষেত্রে রক্ষা করে।

জনন : ইহাদের **অযৌন** ও **যৌন** জনন হয়।

অযৌন জনন

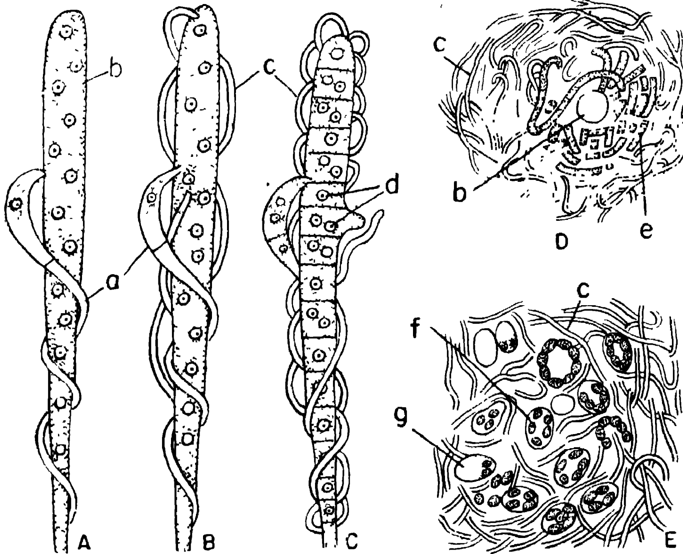
কতকগুলি অনুসূত্র খাড়াভাবে উঠিয়া **কনিডিওফোর** (Conidiophore) সৃষ্টি করে। নানা রকম কনিডিওফোর হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে, একটি সরল কনিডিওফোরের মাথায় এক গোছা **স্টেরিগমা** (Sterigma) জন্মায়। স্টেরেগমার মাথায় শিকলের মত বহু কনিডিয়াম সৃষ্টি করে। কয়েক ক্ষেত্রে কনিডিওফোরের মাথায় শাখা বাহির হয় এবং শাখার উপর প্রশাখা জন্মায়। একবারে মাথার শাখাগুলিকে স্টেরিগমাটা এবং যে শাখায় স্টেরিগমা জন্মায় তাহাকে মেট্যুলি বলে। সমগ্র শাখাবিন্যাস ঝাঁটার ন্যায় বলিয়া ইহাকে "**পেনিসিলাস**" বলে। প্রথম অবস্থায় স্টেরিগমাটায় বহু নিউক্লিয়াস থাকে, পরে কেবল দুইটি নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। কনিডিয়াম এক নিউক্লিয়াসযুক্ত কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি নিউক্লিয়াসও থাকে। স্টেরিগমাটার মাথায় প্রস্থপর্দা দ্বারা পৃথক হইবার পর কনিডিয়ামগুলি শিকলের মত পর পর জন্মাইতে থাকে। কনিডিয়ামের দুইটি স্তরের আবরণ থাকে এবং বাহিরের স্তরে কাঁটার মত অংশ থাকে। কনিডিয়ামের গাত্রে ছিদ্র বা



পেনিসিলিয়াম : A—a = কনিডিয়াম, b— শিকল, c = স্টেরিগমা, d = কনিডিওফোর ; B —শাখাযুক্ত কনিডিওফোর।

জারম-পোর থাকে। কনিডিয়ামগুলি বায়ুর দ্বারা বিস্তারিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে কনিডিয়াম স্টেরিগমার নলের ভিতর জন্মায়। অনুকূল অবস্থায় কনিডিয়াম অংকুরিত হয় এবং মাইসিলিয়াম সৃষ্টি করে।

যৌন জনন—ইহাতে উগ্যামী কদাচিৎ পাওয়া যায়। যে মাধ্যমে জন্মায় উহাতে অক্সিজেনের অভাব হইলে যৌন জনন হয়। ইহারা বেশীর ভাগ প্রজাতিতে হমোথ্যালিক, কয়েকটি প্রজাতি হেটারোথ্যালিক। ইহার স্ত্রী যৌন অঙ্গকে এস্কোগোনিয়াম বলে। যে কোন অনুসূত্র হইতে এককোষী ও এক-নিউক্লিয়াসযুক্ত খাড়াভাবে এস্কোগোনিয়াম বাহির হয়। ক্রমে এস্কোগোনিয়াম বড় হয় এবং নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় ও ১৬ হইতে ৬৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। আর একটি এককোষী অনুসূত্র এস্কোগো-



A—a = এনথেরিডিয়াম, b = এস্কোগোনিয়াম ; B—c = বন্ধ্যা হাইফি ; C—d = দুই নিউক্লিয়াস কোষ ; D—b = এসকোগোনিয়াম, c = বন্ধ্যা হাইফি, e = এস্কোজেনাস অনুসূত্র ; E—f = এসকোসস্পোর, g = এসকাস, c = বন্ধ্যা হাইফি।

নিয়ামকে বেষ্টন করে। ইহা এনথেরিডিয়াম। এনথেরিডিয়ামের আগায় প্রস্থপর্দা দ্বারা একটি কোষ সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ইহার একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং পরবর্তীকালে বারংবার বিভাজনের ফলে উহা হইতে বহু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। কয়েকবার বেষ্টন করিয়া, এনথেরিডিয়ামের অগ্রভাগ এস্কোগোনিয়ামকে স্পর্শ করে। মিলনস্থলে একটি ছিদ্র দেখা দেয় এবং ঐ ছিদ্রপথে এনথেরিডিয়ামের পুং প্রোটোপ্লাজম এস্কোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। ইহার প্রোটোপ্লাজমের সহিত প্লাসটোগ্যামী দ্বারা মিলন হয়। ইহার পর বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত এস্কোগোনিয়াম, প্রস্থপর্দার দ্বারা বিভক্ত হয়। প্রতি অংশে দুই-নিউক্লিয়াসযুক্ত বহুকোষের সারি দেখা যায়। এই অবস্থাকে ডাইক্যারিয়ন বলে। দুই-নিউক্লিয়াসযুক্ত, এক বা একাধিক অনুসূত্র বাহির হয়। কতকগুলি বন্ধ্যা অনুসূত্র এস্কোগোনিয়ামের চারিদিকে প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া

পেরিডিয়াম বা ফ্রুটবডি (fruit body) গঠন করে। প্রত্যেক এসকোজেনাস অনুসূত্র পর্দা দ্বারা বিভক্ত হয় এবং মাতৃ এসকাস সৃষ্টি করে। মাতৃ এসকাসে দুই নিউক্লিয়াস মিলিত হয় এবং মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ৪-৮টি হ্যাপ্লয়েড এসকোসস্পোর সৃষ্টি করে। এসকাসগুলি এসকোকার্পের মধ্যে থাকে। এসকাস আকারে গোল এবং প্রত্যেকের ভিতর ৪-৮টি এসকোস্পোর থাকে। এইপ্রকার সম্পূর্ণরূপে আবৃত এসকোকার্পকে **ক্লাইস্টোথিসিয়াম** বলে। ইহার আবরণকে পেরিডিয়াম বলা হয়। প্রতিকূল অবস্থা ক্লিস্টোথিসিয়াম রূপে অতিবাহনের পর উহা ফাটিয়া এস্কাসগুলি বাহির হইয়া পরে। এসকাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং এস্কোস্পোরগুলি বাহিরে ছড়াইয়া যায়। এই এসকোসস্পোর অনুকূল অবস্থায় নূতন মাইসিলিয়াম গঠন করে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা : ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী **এল্যাকজানডার ফ্লেমিং** কর্তৃক **পেনিসিলিয়াম নোটেটাম** এবং **পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাস** হইতে **"পেনিসিলিন"** নামক ব্যাক্টেরিয়া বিনাশকারী ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার "চিস্" (Chese), গ্লুকোনিক অ্যাসিড, এবং ভিটামিন "D" প্রস্তুতকালে ইহাদের ব্যবহার করা হয়।

অপরদিকে বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফল, খাদ্যদ্রব্য, চামড়ার তৈয়ারি সামগ্রী এবং মজুত খাদ্যের পচন এবং বিনাশসাধন করিয়া পেনিসিলিয়াম প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পেনিসিলায়াম হইতে নিঃসৃত বিষাক্ত রস যথা, "সিট্রিওভিরিডিন" খাদ্যে বিষক্রিয়াকালে যকৃত, বৃক্ক, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করে।

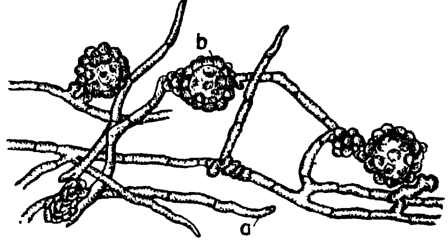
কনিডিয়োফোর
কনিডিয়া
অযৌন
পেনিসিলাম অনুসূত্র (n)
এসকোস্পোর (n)
এনথ্রোডিয়াম (n)
মায়োসিস
অ্যাসকোগোনিয়াম (n)
এসকাস
যৌন
কেরিওগ্যামী 2n
স্ত্রী নিউক্লিয়াস (n)
পুং নিউক্লিয়াস (n)
এসকোজেনাস অনুসূত্র
অ্যাসকোকার্প
প্লাসমোগ্যামী মিলন (n+n)

পেনিসিলিয়ামের জীবন-চক্র

এস্কোবোলাস (Ascobolus)

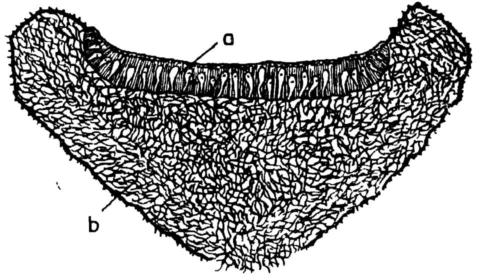
Family : Ascobolaceae
Order : Pezizales
Subclass : Discomycetes
Class : Ascomycetes

গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুর মলের উপর বর্ষাকালে এস্কোবোলাস মৃতজীবীরূপে জন্মে এবং এই কারণে ইহাদের কপ্রোফিলাস (coprophilous) ছত্রাক বলে। মলের উপর সাদা সুতার ন্যায় শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট অনুসূত্রগুলি বর্ধিত হয়। অনুসূত্রের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বহু-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। অধিকাংশ এস্কোবোলাস প্রজাতিতে অযৌন জনন দেখিতে পাওয়া যায় না।



এস্কোবোলাস : a = হাইফা, b = প্যাপুলোস্পোর।

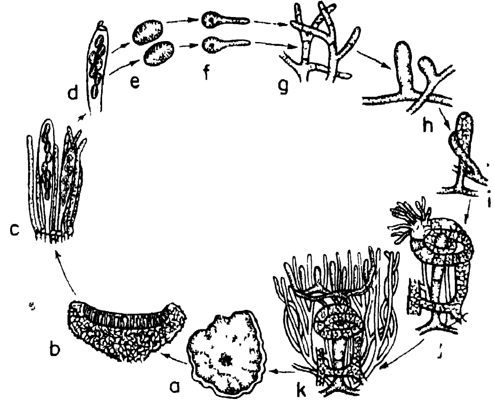
যৌন জনন (Sexual reproduction) : এস্কোবোলাসের দুইটি বিপরীত যৌনধর্মী অনুসূত্র একত্রিত হইলে যৌন জনন সাধিত হয়। অন্তস্তরের (substratum) উপর বর্ধিষ্ণু অনুসূত্র হইতে পুংজনন অঙ্গ বা অ্যানথেরিডিয়াম এবং স্ত্রীজনন অঙ্গ বা এস্কোগোনিয়াম ক্ষুদ্রাকার শাখার ন্যায় উৎপন্ন হয়। প্রথমে প্রতিটি শাখাই এককোষী, বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত থাকে, কিন্তু পরে কয়েকটি কোষে বিভক্ত হয়। একটি এককোষী বৃন্ত বহু-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট গদাকার পুংজনন অঙ্গটি বহন করে। স্ত্রীজনন অঙ্গটি একটি ক্ষুদ্রাকার বৃন্তকোষ, মধ্যভাগে একটি বৃহৎ, গোলাকার, বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত এস্কোগোনিয়াম এবং অগ্রভাগে বাঁকানো নলাকার ট্রাইকোগাইন নামক তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে।



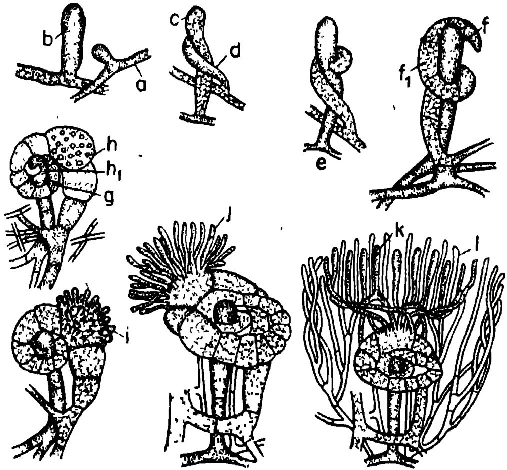
এস্কোবোলাসের ছেদন (৩) : a = হাইমিনিয়াম স্তর, b = বন্ধ্যাকলা।

বাঁকানো ট্রাইকোগাইনের অগ্রভাগ অ্যানথেরিডিয়ামের অগ্রভাগের সংস্পর্শে আসিলে সংযোগস্থলের কোষপ্রাচীর দ্রবীভূত হইয়া একটি পথের সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ট্রাইকোগাইনের মধ্যকার নিউক্লিয়াসগুলিও নষ্ট হইয়া যায় এবং অ্যানথেরিডিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি ট্রাইকোগাইনের মধ্য দিয়া এস্কোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। পরে ট্রাইকোগাইন ও এস্কোগোনিয়ামের মধ্যকার প্রাচীরের রন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়। এস্কোগোনিয়ামের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী সাইটোপ্লাজম মিশ্রিত হয় (plasmogamy) এবং স্ত্রী ও পুরুষ নিউক্লিয়াসগুলি জোড়ায় জোড়ায় পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু ইহাদের মধ্যে

শীঘ্র মিলন হয় না। অবশেষে জোড়া নিউক্লিয়াসগুলি এস্কোগোনিয়ামের মধ্যকার সাইটোপ্লাজমের কিণারায় সরিয়া যায় এবং এস্কোগোনিয়াম হইতে উৎপন্ন কতকগুলি এস্কোজেনাস অনুসূত্রের (ascogenous hyphae) মধ্যে জোড়া জোড়া প্রবেশ করে। পরে এস্কোজেনাস অনুসূত্রগুলি প্রস্থ-প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া বহুকোষে বিভক্ত হয়। অগ্রভাগের কোষগুলি সাধারণতঃ এক জোড়া করিয়া নিউক্লিয়াস বহন করে। ইতিমধ্যে অ্যানথেরিডিয়াম ও এস্কোগোনিয়ামের গোড়া হইতে প্রচুর অঙ্গজ অনুসূত্র বর্ধিত হইয়া অ্যানথেরিডিয়াম ও এস্কোগোনিয়াম ও এস্কোজেনাস হাইফা ঘিরিয়া একটি ঘন ছত্রাক কলা গঠিত ফলোৎপাদন বা ফ্রাকটিফিকেশন (fructification) উৎপন্ন করে। ফ্রাকটিফিকেশনের মধ্যে এস্কোজেনাস অনুসূত্রের অগ্রকোষটি অথবা অগ্রকোষের ঠিক পিছনের কোষটি (penultimate cell) ক্রুজিয়ার (crozier) পদ্ধতিতে বাঁকিয়া একটি এসকাস উৎপন্ন করে এবং ইহার মধ্যস্থ দুইটি নিউক্লিয়াস মিলিত হইয়া (karyogamy) একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মায়োসিস মাধ্যমে চারিটি ও পরে মাইটোসিস বিভাজনের দ্বারা আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্রাচীর দ্বারা আবৃত হইয়া এক একটি এসকস্পোর সৃষ্টি করে।

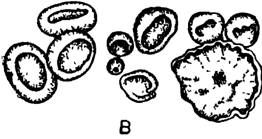


এস্কোবোলাসের জীবনচক্র : a = এপোথিসিয়াম, b = উহার ছেদ, c = এস্কাই, d = এসকাস ও স্পোর, e ও f -- এস্কোস্পোর অংকুরিত, g = হাইফা, h = গ্যামিটের থলি, i = উহার মিলন, j = প্লাজমোগ্যামি, k = এস্কোজেনাস হাইফি।

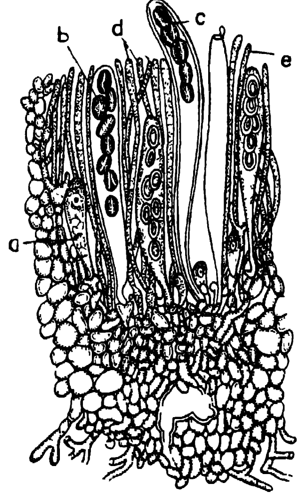


এস্কোবোলাস a = এস্কোগোনিয়ার শাখা, b = অ্যানথেরিডিয়াম শাখা, c = ছোট অ্যানথেরিডিয়াম, d = ছোট এস্কোগোনিয়াম, f = অ্যানথেরিডিয়াম, f_1 = এস্কোগোনিয়াম, i = এস্কোজেনাস হাইফি, k = এস্কোজেনাস, l = বন্ধ্যা হাইফি।

ফলোৎপাদন (Fructification) : এসকাস গঠিত হওয়ার সময় পারিপার্শ্বিক অঙ্গজ অনুসূত্রগুলি প্রচুর বৃদ্ধিলাভ করে। এসকাস পার্শ্বে অবস্থানকারী প্যারাফাইসিস (paraphysis) নামক অনুসূত্রগুলি ঐ অঙ্গজ অনুসূত্র হইতে উদ্ভূত হয়। পরিপক্ক ফ্রাকটিফিকেশনের বাহিরের অনুসূত্রগঠিত আবরণ ছিঁড়িয়া যায় এবং ছত্রাককলা গঠিত পেয়ালার ন্যায় অ্যাপোথেসিয়াম (apothecium) পরিলক্ষিত হয়। একটি অ্যাপোথেসিয়াম লম্বালম্বি ছেদ করিলে তিনটি স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। উপরের এসকাস এবং ইহাদের মধ্যকার বহুকোষী প্যারাফাইসিস গঠিত হাইমেনিয়াম (hymenium) স্তর। এসকাসগুলি লম্বা ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং ইহাদের প্রতিটির মধ্যে আটটি এসকস্পোর বহন করে। হাইমেনিয়াম স্তরের ঠিক নিচেই সিউডোপ্যারেনকাইমা কলা গঠিত হাইপোথেসিয়াম (hypothecium) এবং সর্বনিম্নে প্রোসেনকাইমা গঠিত এক্সিপিউলাম (excipulum)।



B=এস্কোবোলাস এপোথিসিয়ার বিভিন্ন অবস্থা।।



এসকোসবোলাসের এসকাস : a=ছোট এসকাস, b - এসকাস, c=এসকোসস্পোর, d ও e= প্যারাফাইসিস।

আর্দ্র আবহাওয়ায় এসকাসের অগ্রভাগের রন্ধ্র দিয়া পরিপক্ক এসকোসস্পোরগুলি সজোরে বাহিরে আসে এবং বাতাসে কিছুদূর বাহিত হয়। স্পোরগুলি উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে অংকুরিত হইয়া অনুসূত্র সৃষ্টি করে।

শ্রেণী : বেসিডিওমাইসিটিস (Class : Basidiomycetes)

ইহা একটি অতি বৃহৎ ছত্রাক শ্রেণী। ইহাদের অধিকাংশই—যেমন, অ্যাগারিকাস (Agaricus), পলিপোরাস (Polyporus), পার্কসিনিয়া (Puccinia), উস্টিলাগো (Ustilago), লাইকোপারডন (Lycoperdon) ইত্যাদি মৃতজীবীরূপে জীবনধারণ করে। কেবল কতকগুলি পরজীবী হিসাবে—যেমন, স্মাট্ ও রাস্ট, মানুষের নানা প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করিয়া প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। এই শ্রেণীর ছত্রাকের বিশেষত্ব হইল যৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট সাধারণতঃ চারিটি বেসিডিওস্পোর (basidiospore), প্রতি মাতৃকোষের (basidium) বাহিরে স্টেরিগমাটার সাহায্যে যুক্ত থাকে।

দেহ (Vegetative body) : এই শ্রেণীর ছত্রাকে শাখা-প্রশাখাযুক্ত মাইসিলিয়াম বহুকোষবিশিষ্ট। নিউক্লিয়াসের দশা অনুযায়ী এই শ্রেণীর ছত্রাকের মাইসিলিয়ামে তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) একটি বেসিডিওস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত প্রাইমারী বা মনো-কেরিয়টিক মাইসিলিয়াম উৎপন্ন হয়। এই মাইসিলিয়ামের প্রতিটি কোষে একটি করিয়া হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে। ইহা অনির্দিষ্টকাল বর্ধিত হইতে পারে এবং অয়িডিয়াম অথবা কনিডিয়ামের সাহায্যে সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারে।

(খ) সেকেন্ডারী বা ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের প্রতিটি কোষে দুইটি করিয়া বিপরীত যৌনধর্মী হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে। দুইটি নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একত্রিত বিভাজন (conjugate division) দ্বারা ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

নানাভাবে ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত যৌনধর্মী দুইটি মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের দুইটি একনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ মিলিত হইলে একটি কোষের নিউক্লিয়াস অপর কোষে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ (dikaryotic cell) সৃষ্টি করে। এই দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন দ্বারা একটি ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়াও, কখন কখন একটি মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম হইতে উদ্ভূত অয়িডিয়া বিপরীত যৌনধর্মী মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের একটি কোষের সহিত মিলিত ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টি করে। দুইটি বিপরীত যৌনধর্মী বেসিডিওস্পোর মিলিত হইয়াও ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে ডাইকেরিয়টাইজেসন (dikaryotization) বলে। অনেক সময় ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের প্রস্থপ্রাচীরে বিশেষ ধরনের ক্ল্যাম্প-যোগসূত্র (clamp-connection) দেখা যায়।

(গ) অপক্ক বেসিডিয়ামের মধ্য নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করিলে ডিপ্লফেজ (diplophase) দশা সৃষ্টি হয়।

ক্ল্যাম্প-সংযোজক (Clamp-connection)—নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ল্যাম্প যোগসূত্র সৃষ্টি হয় :

ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের বিভাজন উদ্যত অগ্রকোষে বিপরীত যৌনধর্মী নিউক্লিয়াস দুইটি (মনে করা যাক্ উপরেরটি "+" ও নিচেরটি "–") কোষের মধ্যে কিছুটা ব্যবধানে অবস্থান করে। দুইটি নিউক্লিয়াসের মাঝামাঝি অংশে মাইসিলিয়ামের প্রাচীর হইতে একদিকে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুরের ন্যায় বাহির হয়। উপরের "+" নিউক্লিয়াসটি একটু তেরছা ভাবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে বিভক্ত হয় যাহার ফলে একটি অপত্য "+" নিউক্লিয়াস মাইসিলিয়ামের মধ্যে ও অপরটি অঙ্কুরের মধ্যে অবস্থান করে। একই সঙ্গে নিচের "–" নিউক্লিয়াসটি মাইসিলিয়ামের সমান্তরালভাবে মাইটোসিস মাধ্যমে দুইটি অপত্য "–" নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়। এইবার বিভাজিত মাতৃ নিউক্লিয়াস দুইটির মাঝামাঝি দুইটি প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টির ফলে কোষটি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়। অগ্রভাগটি একটি "+" ও একটি "–" অপত্য নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং ইহার নিম্নের কোষটি কেবল একটি "–" অপত্য নিউক্লিয়াসযুক্ত। অপর "+" অপত্য নিউক্লিয়াসযুক্ত অঙ্কুরটি বাঁকিয়া ক্ল্যাম্প সৃষ্টি করিয়া নিচের

কোষের সহিত মিলিত হয় এবং ইহার মধ্যস্থ "+" অপত্য নিউক্লিয়াসটি নিচের কোষে প্রবেশ করে। ফলে, দুইটি দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থ প্রস্থপ্রাচীরে ক্ল্যাম্প-সংযোজক সৃষ্টি হয়।

ফলোৎপাদন (Fructification): ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম দ্বারা সৃষ্ট ছত্রাককলা গঠিত উচ্চশ্রেণীর বেসিডিওমাইসিটিসের ফ্রাকটিফিকেশনকে বেসিডিওকার্প (basidiocrap) বলে। নানা বর্ণের বেসিডিওকার্প দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইহাদের দেহ নরম জেলীর ন্যায় আবার কখন কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত হয়। আয়তনে অতি ক্ষুদ্রাকার হইতে আরম্ভ করিয়া তিন ফুট ব্যাস পর্যন্ত বেসিডিওকার্প দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম (mushroom) জাতীয় বেসিডিওকার্পের নিম্নে ফুলকার ন্যায় গিল (gill) দেখিতে পাওয়া যায়। এগারিকাসে ইহা সুন্দরভাবে দেখা যায়। কখন কখন বেসিডিওকার্পের নিম্নে অসংখ্য রন্ধ্র (পলিপোর জাতীয় ছত্রাক) অথবা দাঁত (হিডনাম জাতীয় ছত্রাক) দৃষ্টিগোচর হয়।

বেসিডিয়াম (Basidium): আকার ও সৃষ্টির প্রভেদ অনুযায়ী দুই প্রকারের বেসিডিয়াম দেখিতে পাওয়া যায়।

হলোবেসিডিয়াম (Holobasidium)—এই প্রকার বেসিডিয়াম এককোষী ও সাধারণতঃ গদার ন্যায় দেখিতে হয়। ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের অগ্রকোষটি রূপান্তরিত হইয়া এই প্রকার বেসিডিয়াম উৎপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে অপক্ব বেসিডিয়ামের মধ্যস্থ নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই নিউক্লিয়াসটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে বেসিডিয়ামের উপরিভাগ হইতে চারিটি আঙ্গুলের ন্যায় স্টেরিগমাটা (sterigmata) বাহির হয়। প্রতি স্টেরিগমার মাথায় একটি করিয়া বেসিডিওস্পোর সৃষ্টি হয়। বেসিডিয়ামের মধ্যকার চারিটি নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম চারিটি বেসিডিওস্পোরের মধ্যে স্থানান্তরিত হইবার পর প্রাচীর দ্বারা পৃথক হইয়া যায়।

ফ্রাগমোবেসিডিয়াম (Phragmobasidium)-গুলি বহুকোষী। পুরু প্রাচীর-যুক্ত, দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট রাস্টের টেলিউটোস্পোর ও স্মাটস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া একটি বেসিডিয়াম বা প্রোমাইসিলিয়াম সৃষ্টি করে। এই বেসিডিয়ামের মধ্যকার নিউক্লিয়াস দুইটি প্রথমে মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ও পরে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। অবশেষে বেসিডিয়ামের মধ্য প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা চারিটি এক নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে বিভক্ত হয়। রাস্টের ক্ষেত্রে প্রতিকোষ হইতে একটি করিয়া এবং কোন কোন স্মাটের ক্ষেত্রে একাধিক বেসিডিওস্পোর সৃষ্টি হয়।

বেসিডিওস্পোর (Basidiospore): বেসিডিওস্পোর এককোষী, গোল অথবা ডিম্বাকার, পাতলা অথবা স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসযুক্ত হয়। অধিকাংশ বেসিডিওস্পোর হাইলাম (hilum) নামক অংশ দ্বারা স্টেরিগমার সহিত তেরছা ভাবে যুক্ত থাকে। পরিপক্ক হইলে হাইলামের নিকট একটি ক্ষুদ্র জলকণা দেখা দেয়। ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং নির্দিষ্ট আয়তনপ্রাপ্ত হইলে বেসিডিওস্পোরটি স্টেরিগমা হইতে সজোরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরে বাতাসে কিছুটা বাহিত হয়।

অ্যাগারিকাস (Agaricus)

অ্যাগারিকাস ক্যামপেসট্রিস বা **স্যালিওটা ক্যামপেসটিস** সাধারণ ভোজ্য ব্যাঙের ছাতা। অধিকাংশ প্রজাতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় সুতরাং ইহার চাষ হইয়া

a = স্পোরোফোর, b = পিলিয়স, c = গিল, d = এনিউলাস, e = স্টাইপ, f = ভোলভা।

a = হাইফা, b = বেসিডিওকার্প, c = সুপক্ব গিল ও পিলিয়াস, d = গিল, e = গিলের ছেদন, f = বেসিডিয়াম, g, g_1 = বেসিডিওস্পোর, h, h_1 = একনিউক্লিয়াস হাইফা (n)।

থাকে। ইহারা মৃতজীবী এবং বর্ষাকালে প্রচুর জন্মায়। ইহারা একক বা দলবদ্ধ ভাবে পচা কাঠ, গোবর, চারণভূমি ও অকর্ষিত সারযুক্ত ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ঘন জঙ্গলে ইহারা জন্মায় না। খোলামাঠে ইহাদের জনন অঙ্গগুলি বৃত্তাকারে দেখা যায় এবং ইহাকে "ফেয়ারি রিং" (fairy ring) বলে। এই সকল বৃত্ত প্রত্যেক বৎসর একই স্থানে দেখা যায়। এই সকল বৃত্তের ভিতর দিকে ঘাস জন্মায় এবং অ্যাগারিকাস মাইসিলিয়াম মাটির জৈব পদার্থ হইতে অ্যামোনিয়া বিশ্লেষণ করে এবং মাটির নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া, ইহাকে (অ্যামোনিয়া) নাইট্রেটে পরিণত করিয়া ঘাসের পুষ্টি সাধন করে।

অ্যাগারিকাসের দেহ

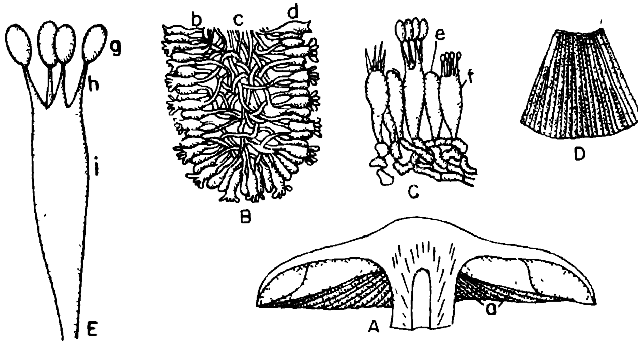
ইহার দেহ মাইসিলিয়াম দ্বারা তৈয়ারি এবং বহু শাখা থাকে। মাইসিলিয়াম মৃদগত ও বহুবর্ষজীবী এবং শ্বেতবর্ণের। অনুসূত্রগুলির মাঝে মাঝে পর্দা দ্বারা বিভক্ত ও বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত। অনুসূত্রের কোষে বহুনিউক্লিয়াস, দানাদার সাইটোপ্লাজম, তৈলকণা (সঞ্চিত খাদ্য) থাকে। অনুসূত্র পৃথক থাকিতে পারে অথবা একত্রে সংযুক্ত হইয়া রজ্জুর আকার ধারণ করিয়া **রাইজোমর্ফ** (rhizomorph) সৃষ্টি করে। জননের সময়, ইহা হইতে **স্পোরোফোর** (sporophore) সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহার দেহ সাধারণ **মাইসিলিয়াম ও স্পোরোফোর** বা রেণুধর, এই দুই অংশ দ্বারা গঠিত।

স্পোরোফোর

ইহার একটি অংশ বৃন্তের মত, উহাকে **স্টাইপ** (stipe) বলে। ইহা প্রায় ৬-৮ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ ও পরিধিতে ১-২ সে. মি.। স্টাইপ বায়বীয় হাইফা দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি প্রথম অবস্থায় ঘন বা কঠিন এবং কন্দের মত দেখিতে হয়, পরে ইহা বেলনাকার হয়। স্টাইপের উপরদিকে **বলয়** (annulus) থাকে। ইহা বর্ণহীন চক্রের মত অংশ। স্টাইপের মাথার দিকে ছাতার মত অংশকে **টুপি** বা **পিলিয়াস** (pileus) বলে। ইহার বাহিরের উপর অংশ প্রথমে গোলাকার ও পরে চ্যাপটা হয়। ইহা মসৃণ, সাটিনের মত কোমল ও সাদা হয়। পিলিয়াসের কিনারা তরঙ্গায়িত, কোমল ও সাদা রঙের হয়। পিলিয়াসের উপরের অংশকে **মাংসল** অংশ বলে। পিলিয়াসের নিচে কতকগুলি **গিল** (gills) ঝুলিতে থাকে। গিলগুলি স্টাইপ হইতে পৃথক থাকে। পাকিলে গিলের রং শ্বেত হইতে পিঙ্গল বা চকোলেটের মত রং ধারণ করে।

জনন

Alexopouloz (1952)-এর মতে ইহাদের বংশ বিস্তার ক্ল্যামাইডোস্পোরের সাহায্যে অযৌন জনন হইতে পারে। ইহা বেসিডিওস্পোরের সাহায্যে যৌন জনন করিয়া থাকে।



A—a = গিল ; B—গিলের ছেদন, b = উপহাইমিনিয়াম, c = ট্রামা, d = হাইমিনিয়াম ; C—e = প্যারাফাইসিস, f = বেসিডিয়া ; D—গিল ; E—i = বেসিডিয়াম, g = বেসিডিওস্পোর, h = স্টেরিগমাটা।

গিলের প্রস্থচ্ছেদ লইলে তিনটি অংশ দেখা যায় :—

(১) ট্রামা (trama), (২) **উপহাইমিনিয়াম** (subhymenium) ও (৩) হাইমিনিয়াম (hymenium)।

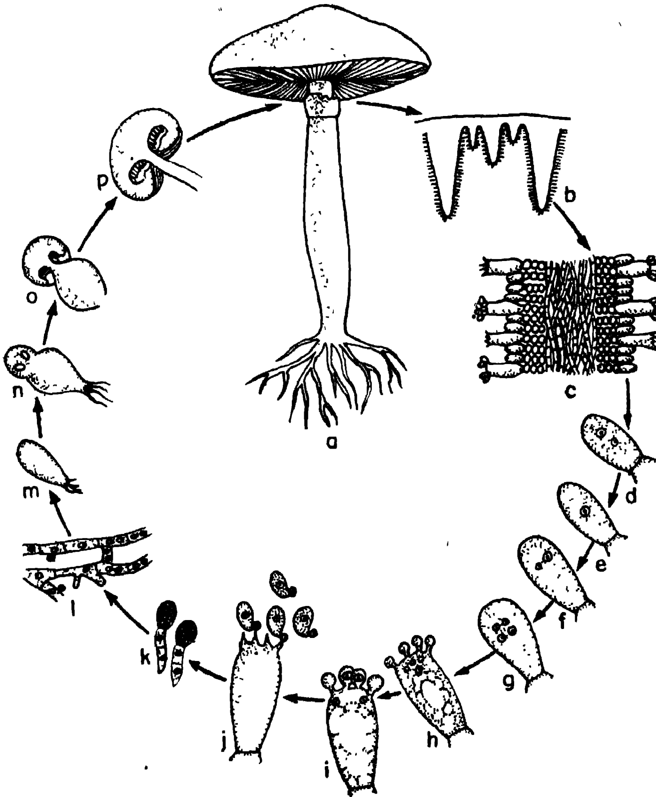
ট্রামা—ইহা গিলের মধ্যস্থলে থাকে। বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত অনুসূত্র কোষ দ্বারা ইহা তৈয়ারি।

উপহাইমিনিয়াম—একাধিক স্তরযুক্ত গোলাকার কোষ, ট্রামার দুইধারে থাকে।

হাইমিনিয়াম—ট্রামার দুই প্রান্তে এই স্তর **বেসিডিয়া** ও **প্যারাফাইসিস** দ্বারা গঠিত। বেসিডিয়া কোষগুলি রেণুমাতৃকোষ ; প্রথমে বেসিডিয়া কোষে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া **ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস** গঠন করে। ইহার পর মায়োসিস প্রণালীতে, ইহা হইতে চারিটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য

নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বেসিডিয়ামের উপর চারিটি **স্টেরিগমাটা** নামক দণ্ড সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক স্টেরিগমার ভিতর একটি নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে স্থূল প্রাচীর সৃষ্টি হয়। ইহাকে **বেসিডিওস্পোর** বলে। ইহা বৃক্কাকার ও লোহিত-পিঙ্গল বা বেগনি-পিঙ্গল রঙের হয়।

বেসিডিওস্পোর স্টেরিগামার সহিত যুক্ত থাকে। রেণু পাকিলে, একবিন্দু জলরেণু (sporangial drop) স্টেরিগমাটা এবং বেসিডিওস্পোরের সংযোগস্থলে সঞ্চিত হয়। জলবিন্দুর সাহায্যে রেণুটি প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ছড়াইয়া পড়ে। উপযুক্ত স্থানে পড়িলে ইহা অংকুরিত হয়। অংকুরিত হইবার পর দুই বা তিনটি আদি অনুসূত্র (germ tube) সৃষ্টি করে ও ইহাদের শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া নূতন মাইসিলিয়াম জন্মায়। **অ্যাগারিকাস ক্যামপেসট্রিস** প্রজাতিটি হোমোথ্যালিক এবং যে স্পোর হইতে মাইসিলিয়াম জন্মায়, তাহা হইতেই স্পোরোফোর সৃষ্টি হইতে পারে।



a = অ্যাগারিকাস, b = গিল, c = গিলের ছেদন, d, e, f = বেসিডিয়ামে নিউক্লিয়াস বিভাজিত, g = চারিটি নিউক্লিয়াস, h, i, j = বেসিডিওস্পোর, k = অংকুর, l = হাইফা সৃষ্টি, m, n, o, p = বেসিডিওকার্প।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (+) অথবা (−) শ্রেণীর অনুসূত্র এককভাবে স্পোরোফোর বা বেসিডিওকার্প গঠনে অক্ষম। সাধারণতঃ (+) অথবা (−) শ্রেণীর বেসিডিওস্পোর

মাটিতে অঙ্কুরিত হইয়া নিজ প্রকৃতির অনুসূত্র গঠন করে। এই প্রকার দুইটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনুসূত্রের মিলনকে **ডাইকেরিওটাইজেসান** (Dikaryotization) বলা হয়। ইহার ফলে প্রতি কোষে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অনুসূত্রকে **ডাইকেরিওটিক অনুসূত্র** বলা হয়। **কেবলমাত্র ডাইকেরিওটাইজেসানের ফলে উদ্ভূত ডাইকেরিওটিক অনুসূত্রই স্পোরফোর বা বেসিডিওকার্প গঠনে সক্ষম।**
অপরদিকে এই **স্পোরফোর** বা বেসিডিওকার্প হইতে বেসিডিওস্পোরগুলি বিস্তার করিবার অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র স্পোরফোরটি উহা হইতে নিঃসৃত **উৎসেচকের** প্রভাবে লুপ্ত হইয়া যায়—এই প্রক্রিয়াকে **অটোলাইসিস** (Autolysis) বলা হয়।

উস্টিলাগো (Ustilago)

Family : Ustilaginaceae
Order : Ustilaginales

উস্টিলাগো ছত্রাকের প্রায় ৩০০ প্রজাতি বিদ্যমান। ইহাদের **অধিকাংশই** অতি প্রয়োজনীয় গম, ভুট্টা, ওট, বার্লি প্রভৃতি শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদে পরজীবী হিসাবে জন্মে এবং স্মাট্ (smut) রোগ সৃষ্টি করে। ফলে, অনেকক্ষেত্রে শতকরা ২৫—৫০ ভাগ শস্য উৎপাদন হ্রাস পায়।

দেহ (Vegetative body) : হোস্টের দেহে স্বচ্ছ, শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বহুকোষী অন্তর্কোষীয় মাইসেলিয়াম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কোষ হইতে হস্টরিয়ার সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম দ্বারা গঠিত। কখন কখন মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামও দেখা যায়। ইহারা অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ডাইকেরিয়টিক অনুসূত্রে রূপান্তরিত হয়। অধিকাংশ স্মাট্ মাইসিলিয়াম হোস্ট উদ্ভিদের দেহের সমস্ত অংশে বিস্তার লাভ করে (systemic) কিন্তু স্পোরসৃষ্টি কেবলমাত্র হোস্টের ফুলে অথবা বীজে হয় (*U. nuda* জনিত গমের আলগা স্মাট্রোগ)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্মাট্রোগ হোস্টদেহের কেবলমাত্র স্থানিক রোগ সৃষ্টি করে (localised) এবং সমস্ত হোস্ট দেহে সম্প্রসারিত হয় না (*U. maydis* জনিত ভুট্টার স্মাট্ রোগ)। ভুট্টা গাছের বিভিন্ন অংশে এই রোগের আক্রমণে ফোলা টিউমারের ন্যায় অংশের সৃষ্টি হয়। এই টিউমার উদ্ভিদ দেহ এবং সংক্রামক মাইসিলিয়ামের দেহ দ্বারা গঠিত। ইহা খুবই দুর্গন্ধযুক্ত এবং ছত্রাকের আক্রমণে উদ্ভিদের দেহের দুই প্রকার বিক্রিয়ার ফলে গঠিত, যথা **হাইপারট্রফি** (যাহাতে হোস্টের কোষ আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) এবং **হাইপারপ্লাসিয়া** (যাহাতে কোষ বিভাজন হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়)। আরও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ডাইকেরিওটিক মাইসিলিয়ামই হোস্টের দেহে রোগ সংক্রামণ করিতে পারে।

অযৌন জনন (Asexual reproduction) : হোস্টদেহের মধ্যস্থ দ্বিনিউক্লিয়াস কোষবিশিষ্ট ডাইকেরিয়টিক মাইসেলিয়াম হইতে এককোষী, ঘন বাদামী অথবা কৃষ্ণবর্ণের দুই-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ক্ল্যামাইডোস্পোর বা স্মাট্স্পোর সৃষ্টি হয়। এই প্রকার স্পোরে দুই-স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর বিদ্যমান। বাহিরের স্তর বা এপিস্পোর

(epispore) স্থূল, মসৃণ অথবা ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত এবং ভিতরের এণ্ডোস্পোর (endospore) পাতলা ও কোমল। পরিপক্ব স্পোরের মধ্যকার নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের পাউডারের ন্যায় ক্ল্যামাইডোস্পোর সৃষ্টিই স্মাট্‌রোগের বৈশিষ্ট্য। ক্ল্যামাইডোস্পোর নিজেরা অবশ্য কোন রোগ সৃষ্টি করিতে পারে না।

কোন কোন স্মাট্ রোগে ক্ল্যামাইডোস্পোরগুলি হোস্টদেহের বাহিরে আলগাভাবে থাকে এবং বাতাসে সহজেই ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের আলগা স্মাট্ (loose smut) বলে, যেমন *U. nuda* জনিত গমগাছের আলগা স্মাট্‌রোগ। আবার কোনো কোন ক্ষেত্রে স্পোরগুলি শস্যের দানার মধ্যে একটি আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে এবং শস্য ঝাড়াইয়ের সময় এই আবরণ ফাটিয়া স্পোর ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের ঢাকা স্মাট্ (covered smut) রোগ বলে, যেমন *U. hordei* জনিত বার্লির ঢাকা স্মাট্‌রোগ। ক্ল্যামাইডোস্পোরগুলি কিছুকাল সুপ্ত থাকার পর মাটিতে, গাছের পাতায় অথবা কাণ্ডের উপর অঙ্কুরিত হইয়া একটি স্বচ্ছ বেসিডিয়াম বা প্রোমাইসিলিয়াম উৎপন্ন করে। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি বেসিডিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়োসিস বিভাজন মাধ্যমে চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। পরে বেসিডিয়ামটি প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা চারিটি একনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে বিভক্ত হয়। প্রতি কোষের নিউক্লিয়াসটি বারংবার বিভক্ত হইয়া একাধিক বেসিডিওস্পোর বা স্পোরিডিয়াম (sporidium) সৃষ্টি করে। *U. nuda* ছত্রাকটিতে কোন বেসিডিয়স্পোর উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বেসিডিয়ামের দুইটি কোষ মিলিত হইয়া একটি দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ সৃষ্টি করে। এই কোষটি হইতে ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম উৎপন্ন হইয়া হোস্টদেহে প্রবেশ করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction): উস্টিলাগোর বিভিন্ন প্রজাতিতে নানা প্রকারের যৌন জনন সংঘটিত হয়। কখন কখন দুইটি বিপরীত যৌনধর্মী বেসিডিওস্পোর মিলিত হইয়া (*U. violaceae*), অথবা একটি বেসিডিওস্পোর ও ইহার বিপরীত যৌনধর্মী মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের মিলনের ফলে, অথবা বেসিডিয়ামে দুইটি বিপরীত যৌন নিউক্লিয়াস সম্বলিত কোষের মিলনের ফলে (*U. nuda*), অথবা দুইটি বিপরীত যৌনধর্মী মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম মিলনের ফলে (*U. maydis*)। সকল ক্ষেত্রেই দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ সৃষ্টি হয় এবং ঐ কোষ হইতে ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টি হয়।

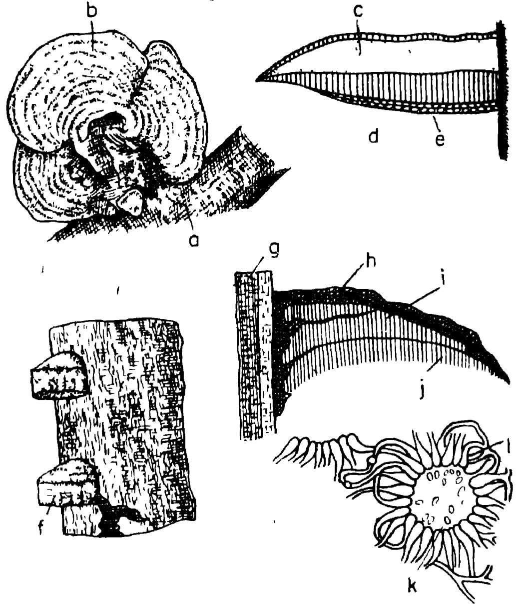
পলিপোরাস (Polyporus)

Family : Polyporaceae
Order : Hymenomycetales

এই ছত্রাকের প্রায় 250 প্রজাতি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের অধিকাংশই জীবিত বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন কাষ্ঠের পচন রোগ সৃষ্টি করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বার্চরোগ সৃষ্টিকারী *Polyporus betulinus*, *Abies* বৃক্ষের পচনরোগ সৃষ্টিকারী *P. abietinus*, মেহগনী গাছের রোগসৃষ্টকারী *P. calcuttensis.*

দেহ (Vegetative body) : ইহা শাখাপ্রশাখাযুক্ত বহুকোষী মাইসিলিয়াম দ্বারা গঠিত। এই মাইসিলিয়াম হোস্টদেহের মধ্যে অন্তর্কোষীয় বা কোষমধ্যক বিস্তারলাভ করে। ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম ক্ল্যাম্প-সংযোজক বিশিষ্ট।

বেসিডিওকার্প (Basidiocarp) : বৃক্ষের কাণ্ডে ও মৃত কাষ্ঠের বাহিরে নানা আকারের বেসিডিওকার্প বাহির হইয়া আসে। এই বেসিডিওকার্পগুলি কখন অবৃন্তক বা sessile (*P. adustus, P. sanguineus*) আবার কখন সবৃন্তক (*P. brumalis, P. agariceus*)। ব্রাকেটের আকারে বেসিডিওকার্প সরু অথবা চওড়া গোড়ার সাহায্যে অন্তস্তরের সহিত যুক্ত থাকে। সবৃন্তক বেসিডিওকার্পে বৃন্তগুলি কেন্দ্রিক অথবা অকেন্দ্রিক উভয় প্রকারেই দেখা যায়।



পলিপোরাসের স্পোর সৃষ্টির আধার
a, f = বেসিডিওকার্প, c d, e - বেসিডিওকার্পের ছেদন h, i, j = বেসিডিওকার্পের ছেদন k = বেসিডিয়া।

হোস্টদেহের মধ্যকার ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম বাহিরে আসিয়া একত্রিত হইয়া ছত্রাক কলা দ্বারা গঠিত ছোট ছোট মুণ্ডাকার অংশ সৃষ্টি করে। এইগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ বেসিডিওকার্প উৎপন্ন করে।

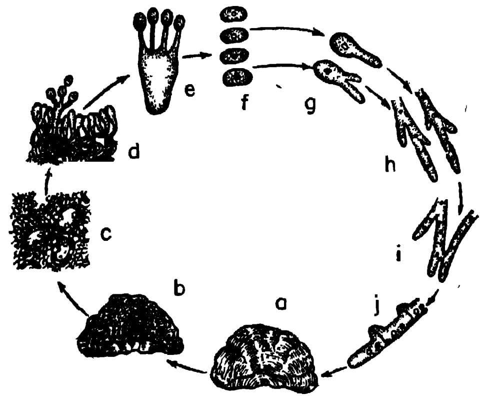
একটি পূর্ণাঙ্গ বেসিডিওকার্পে নিম্নলিখিত অংশ দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) **উপরের ত্বক** (Upper surface) : ইহা কখন মসৃণ আবার কখন রোমযুক্ত। অনেকক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক চক্রাকার দাগ দেখা যায়।

(২) **কনটেক্সট** (Context) : ত্বকের নিচে এবং পোরটিউবের উপরের অংশকে কনটেক্সট বলে। বেসিডিওকার্পের লম্বচ্ছেদ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অনেক প্রজাতিতে ইহা খুবই পাতলা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পুরু।

(৩) **পোরটিউব** (Pore tube) : কনটেক্সটের নিচের এই অংশ পাশাপাশি লম্বভাবে সাজানো অসংখ্য টিউব দ্বারা গঠিত। নিচের ত্বকে এই টিউবগুলির ক্ষুদ্র রন্ধ্র (pore) পরিলক্ষিত হয়। রন্ধ্রের মুখগুলি নানা আয়তনের এবং গোল, ছয়কোনা প্রভৃতি নানা আকারের দেখা যায়। এই রন্ধ্রের মধ্য দিয়া নিক্ষিপ্ত বেসিডিওস্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে।

(৪) **হাইমেনিয়াম** (Hymenium): পোরটিউবের ভিতরের প্রাচীর অসংখ্য বেসিডিয়াম দ্বারা আবৃত। বেসিডিয়ামের সহযোগী প্যারাফাইসিস (paraphysis) সিসটিডিয়া (cystidia), সিটি (setae) প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুসূত্র গঠিত অঙ্গ দেখা যায়। বেসিডিয়ামগুলির আকার গদার ন্যায় এবং প্রতিটি হইতে চারিটি স্টেরিগমাটা বাহির হয়। চারিটি স্টেরিগমাটা চারিটি ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি বেসিডিওস্পোর বহন করে। বেসিডিওস্পোরগুলি স্টেরিগমাটা হইতে সজোরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর, পোর টিউবের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে।



পলিপোরাসের জীবনচক্র; a = বেসিডিওকার্পের উপর b = উহার নিচের অংশ c = বেসিডিয়া, d, e = বেসিডিয়া ও বেসিডিওস্পোর f = বেসিডিওস্পোর g, h = অঙ্কুরিত, i = মনোকেরিওটিক, j = ডাইকেরিওটিক হাইফা।

প্রতি বেসিডিওকার্প হইতে অসংখ্য বেসিডিওস্পোর সৃষ্টি হয়। অনুকূল পরিবেশে এবং উপযুক্ত খাদ্যের উপস্থিতিতে বেসিডিওস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টি করে। অধিকাংশ Polyporus প্রজাতি heterothallic হওয়াতে দুই বিপরীত যৌনধর্মী (compatible strain) মনোকেরিয়টিক মাইসিলিয়ামের হোস্টদেহে মিলনের ফলে ডাইকেরিয়টিক মাইসিলিয়াম সৃষ্টি হয়।

পাকসিনিয়া (Puccinia)

Family : **পাকসিনিয়েসি** (Pucciniaceae)

Order : **ইউরিডিনেলিস** (Uredinales)

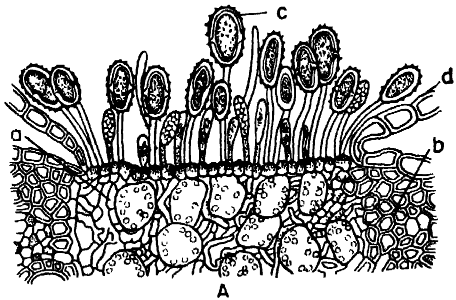
পাকসিনিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি রাস্ট (rust) হিসাবে গণ্য, কারণ পাকসিনিয়ার দ্বারা রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে মরিচার ন্যায় লক্ষণ দেখা যায়। প্রায় সকল পাকসিনিয়া প্রজাতিই অবলিগেট পরজীবী (obligate parasite) হিসাবে জন্মায় অর্থাৎ জীবিত হোস্টদেহ ছাড়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আজকাল অবশ্য কিছু কিছু রাস্টকে বিজ্ঞানাগারে বিশেষ জৈব খাদ্য সরবরাহ করিয়া বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। গম, ভুট্টা, ওট, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি শস্য-উৎপাদনকারী ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে এবং বারবেরিস, থ্যালিকট্রাম প্রভৃতি জংলী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

প্রায় সব পাকসিনিয়া প্রজাতিই পলিমরফিক (polymorphic) অর্থাৎ জীবনচক্রে বেশ কয়েকপ্রকারের স্পোরদশা সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একই হোস্ট উদ্ভিদে জীবনচক্র শেষ করে, ইহাদের অটোসিয়াস (autoecious) রাস্ট বলে— যেমন, পাকসিনিয়া বাটলারি (*P. butleri*)। আবার কতকগুলি প্রজাতি জীবনচক্র

শেষ করিতে দুইটি ভিন্ন হোস্ট উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। ইহাদের হেটেরসিয়াস (heteroecious) রাস্ট বলে—যেমন, পাকসিনিয়া গ্রামিনিস (*P. graminis*)। প্রায় সমস্ত হেটেরসিয়াস রাস্টে ইউরিডো (uredo) এবং টেলিউটো (teleuto) স্পোর দশা প্রাথমিক হোস্টের (primary host) উপর জন্মে কিন্তু পিকনিয়া (pycnia) এবং ইসিয়া (aecia) দশা একান্তর (alternate) হোস্টে জন্মে। বিভিন্ন প্রজাতির পাকসিনিয়ার মধ্যে *P. graminis* সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার জীবনচক্রে অনেকগুলি স্পোরদশা দৃশ্যমান। জীবনচক্র পূর্ণতা লাভের জন্য ইহার দুইটি হোস্ট, গমগাছ এবং বারবেরী গাছের প্রয়োজন হয়। গমগাছের ইহা 'কালো কাণ্ড রাস্ট' (black stem rust) রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগের প্রকোপে সময় সময় গমগাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। রোগাক্রান্ত গমগাছ হইতে পরজীবী রাস্ট দ্বারা অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণের ফলে গমগাছের নিজস্ব জীবনধারা ব্যাহত হয়। তাছাড়া রোগের লক্ষণ পাতায় প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হওয়ার ফলে পাতার সালোকসংশ্লেষ বা অঙ্গারাত্তীকরণ প্রক্রিয়া ও প্রস্বেদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উদ্ভিদগুলি শেষ পর্যন্ত শুকাইয়া মরিয়া যায়।

ইউরিডোসোরাস (Uredosorus)

গমগাছের পাতা ও পাতার গোড়ায় ডিম্বাকার লালচে বাদামী রঙের ইউরিডোসোরাস বা ইউরিডোস্পোর বহনকারী ধসা রোগের প্রথম লক্ষণ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। এইপ্রকার রোগগ্রস্ত পাতার লম্বচ্ছেদ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে পাতার কোষমধ্যক স্থানসমূহে এই ছত্রাকের শাখা-প্রশাখাযুক্ত মাইসেলিয়াম বিস্তৃত থাকে। এই মাইসেলিয়াম হইতে উদ্ভূত হস্টোরিয়া কোন কোন হোস্ট কোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্য আহরণ করে। রোগাক্রান্ত হোস্টকোষগুলি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবিত থাকে। পাতার ত্বককোষের নিচে কোন কোন অংশে এই মাইসেলিয়াম ঘন হইয়া জমা হয়। দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষবিশিষ্ট এই ডাইকেরিয়টিক (dikaryotic) মাইসেলিয়াম হইতে উৎপন্ন একগোছা দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত বেসাল (basal) কোষ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বেসাল কোষ প্রস্থচ্ছেদের ফলে একটি নিচের পদ (foot) কোষ সৃষ্টি করে আর উপরেরটি পুনরায় বিভক্ত হইয়া একটি বৃন্তকোষ ও ইউরিডোস্পোর গঠন করে। প্রতিটি ইউরিডোস্পোর দীর্ঘ বৃন্তকোষযুক্ত, গোলাকার বা আয়তাকার এবং দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। স্পোরের একটি বাহিরের কাঁটাযুক্ত আবরণ, এক্সাইন (exine) এবং ভিতরের মসৃণ ইনটাইন (intine) বিদ্যমান। প্রতিটি স্পোরে এক বা একাধিক জার্মরন্ধ্র (germ pore) থাকে।



পাকসিনিয়ার ইউরিডোস্পোর : a = হাইফা, b = হোস্টের কলা, c = ইউরিডোস্পোর, d = এপিডারমিস ফাটিয়াছে।

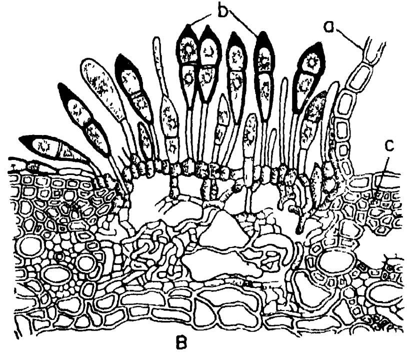
স্পোর পরিপক্ক হইলে ত্বককোষের স্তর ভিতরের ইউরিডোস্পোরের চাপে ফাটিয়া যায় এবং স্পোরগুলি ছড়াইয়া পড়ে। বাতাসে বাহিত হইয়া এই স্পোর নূতন গমগাছের পাতায় রোগ সৃষ্টি করিতে পারে।

ইউরিডোস্পোর অঙ্কুরিত হওয়ার সময় জার্মরন্ধ্র দিয়া একটি জার্ম টিউব (germ tube) বাহির হইয়া পাতার ত্বকের উপর বর্ধিত হয় এবং স্টোমাটার মুখে প্রবেশ করিয়া স্ফীত হইয়া এপ্রেসোরিয়াম (appresorium) সৃষ্টি করে। সমস্ত প্রোটোপ্লাজম ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে বাহিরের খালি জার্ম টিউবের অংশ শুকাইয়া যায়। এপ্রেসোরিয়াম হইতে উদ্ভূত মাইসেলিয়াম স্টোমাটার নিচে পাতার মধ্যে একটি ভেসিকল সৃষ্টি করে। এই ভেসিকল হইতে উৎপন্ন হইয়া বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মাইসেলিয়াম কোষমধ্যক স্থানে বিস্তার লাভ করে।

মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ইউরিডোস্পোর পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় এবং ছড়াইয়া পড়ে। ফলে, একটি উদ্ভিদ হইতে অসংখ্য উদ্ভিদে রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

টেলিউটোসোরাস (Teleutosorus)

আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ ও শুষ্ক হইতে থাকিলে গমগাছের মধ্যস্থ একই ডাইকেরিয়টিক মাইসেলিয়াম হইতে কৃষ্ণ বর্ণের টেলিউটোসোরাস বা টিলিয়াম (telium) দেখা দেয়। এই সোরাসের মধ্যে ঘন কৃষ্ণ বর্ণের টেলিউটোস্পোর বা টিলিয়স্পোর (teliospore) সৃষ্ট হয়। অনেক সময় একই সোরাসের মধ্য ইউরিডো ও টেলিউটোস্পোর একত্রে দেখা যায়। ইউরিডোসোরাসের ন্যায় টেলিউটোসোরাসও পাতার ত্বকের নিচে একইভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার বেসাল কোষ বিভক্ত হইয়া নিচেরটি হইতে পদ (foot) সৃষ্টি হয়। উপরের কোষ কিন্তু তিনটি কোষে বিভক্ত হয় এবং উপরের দুইটি হইতে একটি দুই-কোষযুক্ত স্পোর এবং তৃতীয়টি হইতে বৃন্তকোষ সৃষ্টি হয়।



পাকসিনিয়ার টেলিউটোস্পোর :
a = এপিডারমিস ফাটিয়াছে, b = টেলিউটোস্পোর, c = হোস্টের কলা।

প্রতিটি স্পোর মাকুর ন্যায় দুই-কোষী, পুরুপ্রাচীর এবং দীর্ঘবৃন্তযুক্ত। স্পোরের অগ্র সূচাগ্র অথবা ভোঁতা। প্রতিটি কোষে একটি করিয়া জার্মরন্ধ্র এবং দুইটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। টেলিউটোস্পোর পরিপক্ক হইলে নিউক্লিয়াস দুইটি সংযুক্ত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

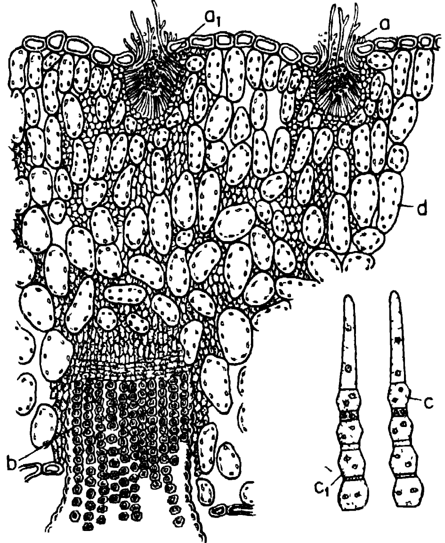
বেসিডিয়াম (Basidium)

টেলিউটোস্পোরগুলি মাটিতে অথবা মৃত উদ্ভিদের সাথে কিছুকাল সুপ্ত থাকে এবং কোন হোস্ট উদ্ভিদ ছাড়াই অঙ্কুরিত হইতে পারে। বিশ্রামের পর এই

স্পোরের প্রতিটি কোষই জার্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়া অংকুরিত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রবেশ করে এবং মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে ইহা পরে চারিটি কোষে বিভক্ত হয় এবং বেসিডিয়াম (basidium) বা প্রোমাইসেলিয়াম (promycelium) সৃষ্টি করে। প্রতিটি কোষ হইতে একটি করিয়া বৃন্তের ন্যায় স্টেরিগমা এবং তাহার উপর একটি এককোষী বেসিডিওস্পোর (basidiospore) বা স্পোরিডিয়ামের (sporidium) সৃষ্টি হয়। বেসিডিওস্পোরগুলি পাতলা আবরণযুক্ত, বর্ণহীন এবং একনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। প্রতি বেসিডিয়ামে চারিটির স্পোরের মধ্যে দুইটি প্লাস (+) স্ট্রেন বহনকারী এবং অপর দুইটি মাইনাস (–) স্ট্রেন বহনকারী। বেসিডিওস্পোরগুলি প্রথমে সজোরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরে বাতাসে বাহিত হয়।

পিকনিয়াম (Pycnium)

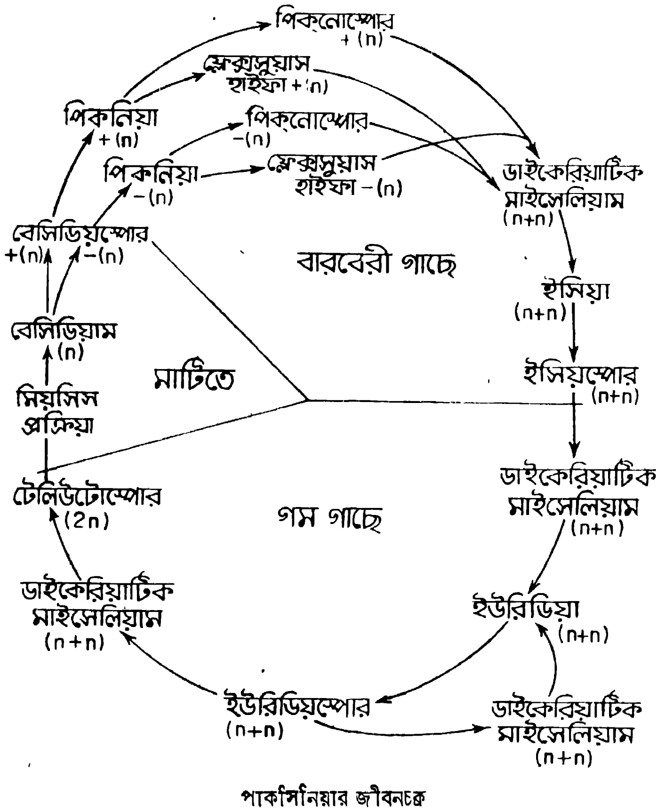
বেসিডিওস্পোর বারবেরী গাছের পাতায় অংকুরিত হয় এবং জার্ম টিউব সরাসরি ত্বক্ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কালক্রমে ইহা উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধি পাইয়া বহুকোষবিশিষ্ট, শাখা-প্রশাখাযুক্ত কোষমধ্যক মনোকেরিয়টিক মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে। এই মাইসেলিয়ামের প্রতিটি কোষে একটি করিয়া হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে। ইহার কিছুদিন পরই পাতার ঊর্ধ্বত্বকের নিচে স্থানে স্থানে এই মাইসেলিয়াম জমা হইয়া পিকনিয়া (pycnia) বা স্পারমোগোনিয়া (spermogonia) উৎপন্ন করে। প্রতিটি পিকনিয়াম সাধারণতঃ কলসাকার এবং উপরে অসটিওল (ostiole) নামক রন্ধ্রযুক্ত। অসটিওল এবং কলসের গলার অংশে অনেক বন্ধ্যা হাইফি থাকে, ইহাদের পেরিফাইসেস্ (periphyses) বলে। ইহা ছাড়া কতকগুলি অধিকতর দীর্ঘ হাইফি থাকে, তাহাদের ফ্লেক্সুয়াস (flexuous) বা রিসেপটিভ (reeeptive) হাইফি বলে। কলসের নিচের গোলাকার অংশের ভিতরের দেওয়ালে অসংখ্য ছোট ছোট হাইফি থাকে ইহাদের পিকনোফোর (pycnophore) বা স্পারমাটিওফোর (spermatiophore) বলে। এইগুলির অগ্র হইতে



বারবেরী পাতার ছেদন :
-স্পারমোগোনিয়া, b = ইসিয়া, d = পাতার কলা,
c, c_1 = দুইটি ইসিওস্পোর শিকল।

অতিক্ষুদ্র অসংখ্য পিকনোস্পোর (pycnospore) বা স্পারমাসিয়া (spermatia) সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি বেসিডিওস্পোর কেবলমাত্র প্লাস (+) অথবা মাইনাস (−) স্ট্রেন বহনকারী হওয়াতে ইহা হইতে সৃষ্ট মাইসেলিয়াম, পিকনিয়া, ফ্লেক্সসুয়াস হাইফি এবং পিকনোস্পোর প্রভৃতি সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র + অথবা − স্ট্রেন বহন করে। বিশিষ্ট ছত্রাক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে রাস্টের যৌন জনন + এবং − স্ট্রেন বহনকারী পিকনোস্পোরের সহিত যথাক্রমে − এবং + স্ট্রেন বহনকারী ফ্লেক্সসুয়াস হাইফির মিলনের ফলে সাধিত হয়। পিকনোস্পোর সৃষ্টির সময় একপ্রকার মিষ্ট মধুর ন্যায় দ্রব্য নিঃসৃত হয়। ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া কীটপতঙ্গ এই মিলনে সহায়তা করে।



পাকসিনিয়ার জীবনচক্র

অনেক সময় একই পাতার উপর দুইটি বিপরীত স্ট্রেন বহনকারী বেসিডিওস্পোর অঙ্কুরিত হইয়া উদ্ভিদদেহের মধ্যে দুইটি বিপরীত স্ট্রেন বহনকারী বেসিডিওস্পোর মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে। এই দুই মাইসেলিয়ামের উদ্ভিদ দেহের মধ্যে মিলন হইয়া যৌন জনন সাধিত হয়।

পিকনোস্পোরের সহিত ফ্লেক্সসুয়াস হাইফার মিলনের ফলে ইহার মধ্যকার নিউক্লিয়াসটি শেষোক্ত হাইফার কোষে প্রবেশ করে এবং একটি দুই-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ সৃষ্টি

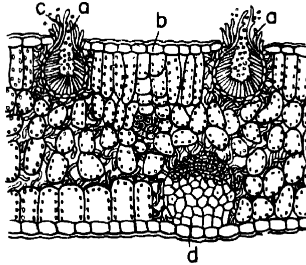
করে। দুই বিপরীত স্ট্রেনধর্মী মাইসেলিয়ামের মিলনের ফলেও একই প্রকারে একটি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ সৃষ্টি হয়। বিপরীত স্ট্রেনের এই নিউক্লিয়াসের একটি করিয়া অপত্য প্রতি কোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষ সৃষ্টি করিতে পারে। আবার এই দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট কোষের পুনঃ পুনঃ বিভাজন এমনভাবে হয় যে প্রতিটি অপত্য কোষে একটি করিয়া বিপরীত স্ট্রেন (+ এবং −) নিউক্লিয়াস থাকিয়া একটি ডাইকেরিয়টিক মাইসেলিয়াম গঠন হয়।

ইসিয়াম (Aecium, বহুবচনে Aecia)

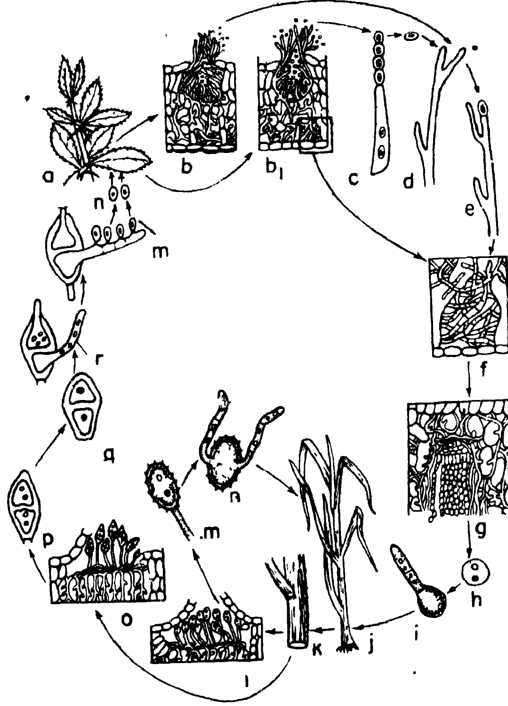
বারবেরী পাতার মধ্য এই ডাইকেরিয়টিক মাইসেলিয়ামের বিস্তার হয় এবং কালক্রমে পাতার নিচের ত্বকের ঠিক উপরেই ইসিয়া বা ইসিডিয়া (Aecidia) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ইসিয়াম একটি এককোষ স্তর পুরু রক্ষণ প্রাচীর বা পেরিডিয়াম (Peridium) দ্বারা আবৃত থাকে। ইসিয়ামের নিচের অংশে একটি দীর্ঘ বেসাল কোষস্তর (basal cells) থাকে। প্রতিটি বেসাল কোষ হইতে পর্যায়ক্রমে একটি ছোট এবং একটি বড় কোষ সৃষ্টি হয়। এইভাবে অসংখ্য কোষ পাতার নিচের ত্বকের দিকে সৃষ্টি হইতে থাকে। বড় কোষগুলি হইতে ইসিয়স্পোর (aeciospore) বা ইসিডিওস্পোর (aecidiospore) এবং ছোটগুলি হইতে বন্ধ্যা ডিসজাংটার (disjunctor) কোষ উৎপন্ন হয়।

ইসিয়স্পোরগুলি প্রথমে বহুভূজাকার কিন্তু পরে মোটামুটি গোলাকার ধারণ করে। ইহাদের প্রাচীর পুরু এবং কয়েকটি জার্মরন্ধ্রযুক্ত। ভিতরে দুইটি বিপরীত স্ট্রেনধর্মী নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।

পরিপক্ক হইলে হোস্টের ত্বককোষ ও ইসিয়ামের পেরিডিয়াম প্রাচীর ফাটিয়া যায় এবং ইসিয়ামগুলি পাতার নিচে পেয়ালায় ন্যায় দেখায়। স্পোরগুলি পরিপক্ক হইলে ডিসজাংটার কোষগুলি নষ্ট হয় এবং স্পোরগুলি পরস্পর হইতে আলাদা হইয়া যায় এবং বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা কিন্তু আর বারবেরী গাছে রোগসৃষ্টি করিতে পারে না। ইসিয়স্পোরের সাহায্যে রাস্ট আবার গমগাছে ফিরিয়া যায় এবং পাতায় অংকুরিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করে। গমগাছে ইহাদের প্রবেশ প্রায় ইউরিডোস্পোর সাহায্যে রোগসৃষ্টিরই ন্যায়। পাতার স্টোমাটার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া জার্মটিউবগুলি বর্ধিত হইয়া দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ গঠিত ডাইকেরিয়টিক মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে এবং পরে ইউরিডোসোরাস ও ইউরিডোস্পোর সৃষ্টি করে।



পাতা বারবেরী : a= স্পারমেটিয়া, b= পাতার কলা, c= হাইফ, d= ইসিয়া, e= ইসিয়স্পোব, f= বেসাল কোষ।



পাকসিনিয়ার জীবনচক্র

a = বারবেরী পাতায় প্রবেশ, b, b_1 = স্পারমাগোনিয়া, c = স্পারমাটোফোর, d = হাইফার প্রবেশ, e = হাইফা, f = ইসিয়া, g = ইসিয়স্পোর, h = স্পোর অঙ্কুর, i = অঙ্কুরিত, j = গম গাছ, k = আক্রমণ, l = ইউরিডোসোরাস, m = স্পোর, n = অঙ্কুর, o = টেলিউটোস্পোর, p, q = ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ; m = বেসিডিওস্পোর, n = পাতায় প্রবেশ।

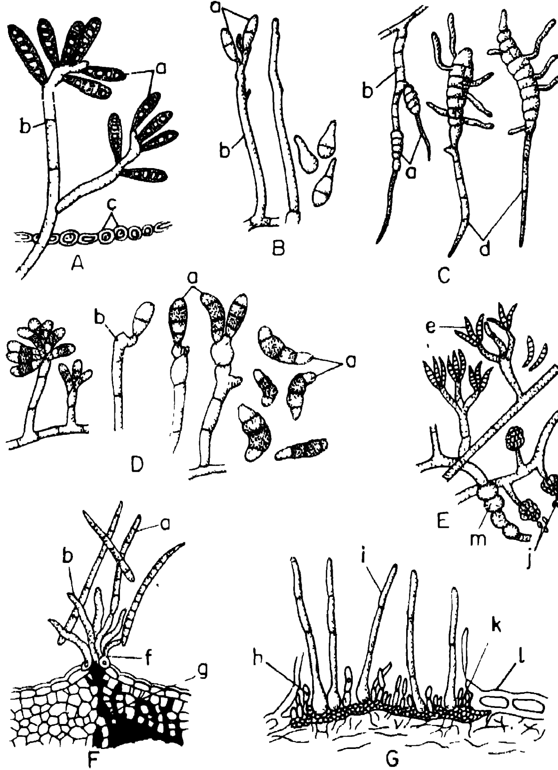
ফর্ম-ক্লাশ : ডয়টেরোমাইসিটিস (Form-Class : Deuteromycetes)

এখনও পর্যন্ত অনেক ছত্রাকের যৌন জনন প্রক্রিয়া এবং যৌন জনন দ্বারা উদ্ভূত জাইগোস্পোর (zygospore), উস্পোর (oospore), এসকসপোর (ascospore) এবং বেসিডিয়স্পোর (basidiospore) প্রভৃতি অবর্তমানে অথবা ইহাদের যৌন জনন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। এই সমস্ত ছত্রাকের জীবনচক্র সম্পূর্ণভাবে না জানা থাকাতে ইহাদের একত্রিত করিয়া ফরম-ক্লাশ ডয়টেরোমাইসিটিস (form-class Detueromycetes) বা ফানজাই ইমপারফেক্টি (Fungi Imperfecti) নামক শ্রেণীতে অস্থায়ীভাবে রাখা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর ছত্রাকের মাইসিলিয়াম এস্কোমাইসিটিস ও বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাকের ন্যায় বহুকোষী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্থপ্রাচীর ক্ল্যাম-সংযোজকবিহীন হওয়াতে এই শ্রেণীর ছত্রাকগুলির বেশীর ভাগ, সম্ভবতঃ এস্কোমাইসিটিস শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের অযৌন অবস্থা। যতদিন পর্যন্ত ইহাদের যৌন জনন প্রক্রিয়া না জানা যায়

ততদিন পর্যন্ত অবশ্য ইহাদের অস্থায়ী শ্রেণীতে (form-class) রাখা হইয়া থাকে। কিছু কিছু ইমপারফেক্ট রাস্ট ছত্রাকের—যেমন, ইউরিডো (*Urdo*), ইসিডিয়াম (*Aecidium*), পেরিডারমিয়াম (*Peridermium*), অযৌন অবস্থা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অন্যান্য রাষ্টের সহিত সাদৃশ থাকাতে সরাসরি ইউরিডিনেলিস (*Uredinales*) অর্ডারে রাখা হইয়া থাকে।

আখগাছের লাল ধসা রোগসৃষ্টিকারী (Red rot of sugarcane) ছত্রাকের অযৌন অবস্থার নাম **কলেটোট্রাইকাম ফালকেটাম** (*Colletotrichum fulcatum*)

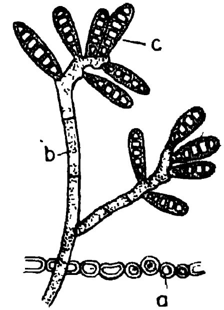


ডয়টেরোমাইসিটির বিভিন্ন প্রকার অযৌন রেণু :
A– হেলমিনথোস্পোরিয়াম, a = কনিডিয়া, b = কনিডিয়াফোর, c = ক্ল্যামাইডোস্পোর ; B—পাইরিকিউলেরিয়া, কনিডিয়া ও কনিডিয়াফোর ; C— অলটারনেরিয়া, a = কনিডিয়া, অংকুরিত কনিডিয়া ; D—কারভিউলেরিয়া, a = কনিডিয়া. b = কনিডিয়াফোর ; E—ফিউজেরিয়ার, e = কনিডিয়া, m = ক্ল্যামাইডস্পোর ; F—সাকোস্পোরা, a = কনিডিয়া, b = কনিডিয়াফোর, f = স্ট্রোমা, g = হাইফা ; G—কলেটোট্রিকাম, i = সিটা, h = কনিডিয়া, k = হাইফা, l = আশ্রয় উদ্ভিদ ত্বক্।

কিন্তু পরে ইহাব যৌন অবস্থা আবিষ্কৃত হয় ইহার নাম ফ্যাইস্যালোস্পোরা টুকুমানেনসিস (*Physalospora tukumanensis*)। অবশ্য কলেটোট্রাইকামের সকল প্রজাতিই ফাইস্যালোস্পোরা প্রজাতি নয়।

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছত্রাকগুলি প্যারাসাইট অথবা স্যাপ্রোফাইট উভয় প্রকারে জীবন-ধারণ করিতে সক্ষম। প্যারাসাইট ছত্রাকে মাইসেলিয়াম (হোস্ট) পোষকদেহের আন্তর্কোষীয় অথবা কোষমধ্যক উভয় প্রকারেই দেখা যায়। মাইসিলিয়ামগুলি প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা বহুকোষে বিভক্ত। প্রতিটি কোষে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। অনেক সময় মাইসিলিয়ামের একই কোষে বিভিন্ন জীনগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে। দুই বিভিন্নধর্মী হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরে এই ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মাইটোসিস বিভাজনের সময় কখন কখন বিশেষ ধরনের মাইটোটিক ক্রশিং-ওভারের (mitotic crossing-over) ফলে জেনেটিক উপাদানের বিনিময় হয়। পরে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস হ্যাপ্লয়েডাইজেসান প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে প্যারাসেক্সুয়ালিটি (parasexuality) বলে। যৌন জননপ্রক্রিয়ার অবর্তমানে ইহার মাধ্যমেই এই সমস্ত ছত্রাকে নূতন জীনগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

অযৌন জনন—নানা প্রকার কনিডিয়ামের সাহায্যে এই শ্রেণীর ছত্রাকে অযৌন বংশবৃদ্ধি হয়। অঙ্গজ মাইসিলিয়াম হইতে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের হাইফা বা কনিডিয়ফোর হইতে এক বা একাধিক কনিডিয়াম সৃষ্টি হয়। কনিডিয়াম এককোষী হইতে বহুকোষী—যেমন, অলটারনেরিয়া (*Alternaria*), হেলমিনথোস্পোরিয়াম (*Helminthosporium*), পাতলা অথবা পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট, স্বচ্ছ অথবা গাঢ় বর্ণের হয়। অনেক সময় একাধিক কনিডিয়াম একটির পর একটি লম্বা শেকলের ন্যায় আটকাইয়া থাকে এবং পরে সহজেই আলাদা হইয়া বাতাসে বাহিত হয়।



হেলমিনথোস্পোরিয়ামের কনিডিয়া : a = ক্ল্যামাইডোস্পোর, b = কনিডিওফোর, c = কনিডিয়াম।

কোন কোন ছত্রাকে—যেমন, ফিউসেরিয়াম (*Fusarium*) সরল কোনিডিয়ফোরগুলি একত্রিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক কলা গঠিত স্পোরোডকিয়াম (Sporodochium) সৃষ্টি করে। এই কনিডিয়ফোরের অগ্রে গঠিত কনিডিয়ামগুলি স্পোরোডকিয়ামের উপর একটি আঁটার ন্যায় তরলে আবদ্ধ থাকে। এই কনিডিয়ামগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং আকারে দুই প্রকারের : এককোষী গোলাকারগুলি **মাইক্রোকনিডিয়া** (microconidia) এবং বহুকোষী লম্বগুলির নাম **ম্যাক্রোকনিডিয়া** (macroconidia)।

কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণের ক্ষুদ্র পেয়ালার আকারে ছত্রাক কলা গঠিত **একারভিউলির** (acervuli) ভিতরের দেওয়ালে কনিডিয়ফোরগুলি থাকে—যেমন, কলেটোট্রাইকাম (*Colletotrichum*)। কনিডিয়ামগুলি স্বচ্ছ এককোষী বাঁকানো লম্বা। এসারভিউলির বাহিরের দিকে বহু কাঁটার ন্যায় লম্বা সিটি (setae) দ্বারা আবৃত থাকে।

ডিপলডিয়া (*Diplodia*), এস্কোকাইটা (*Aschochyta*) প্রভৃতি ছত্রাকে কনিডিয়ফোরগুলি ছত্রাক কলা গঠিত কলসীর ন্যায় **পিকনিডিয়ার** ভিতরের দেওয়ালে থাকে। কনিডিয়ামগুলি স্বচ্ছ অথবা গাঢ় বর্ণের এবং এক বা দুইকোষবিশিষ্ট হয়।

ডয়টেরোমাইসিটিসকে নিম্নলিখিত অস্থায়ী অর্ডারে (form-order) বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) অস্থায়ী অর্ডার **মনিলিয়েলিস** (Form-order Moniliales): ইহাদের কনিডিয়াম কনিডিয়ফোর হইতে সরাসরি উৎপন্ন হয়। কনিডিয়ফোরগুলি সরল অথবা শাখাবিশিষ্ট এবং একক অথবা গুচ্ছকারে সৃষ্টি হয়। এই অর্ডারকে আবার ছয়টি ফর্ম ফ্যামিলিতে (form-family) বিভক্ত করা হইয়াছে।

(২) অস্থায়ী অর্ডার **স্ফেরপসিডেলিস** (Form-order Sphaeropsidales): ইহাদের কনিডিয়াম **পিকনিডিয়ার** (pycnidia) মধ্যে সৃষ্টি হয়। পিকনিডিয়ামগুলি সাধারণতঃ গোলাকার এবং ভিতরের প্রাচীর কনিডিয়ফোর দ্বারা আবৃত থাকে। এই কনিডিয়ফোর হইতে কনিডিয়াম উৎপন্ন হয় এবং সময় সময় কনিডিয়ামগুলি একটি আঁঠালো তরলে মিশ্রিত অবস্থায় সরু সুতার আকারে অস্টিয়োলের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহাকে চারিটি অস্থায়ী ফর্ম-ফ্যামিলিতে ভাগ করা হইয়াছে।

(৩) অস্থায়ী অর্ডার **মেলাঙ্কনিয়েলিস** (Form-order Melanchoniales): ইহাদের কনিডিয়াম এসারভিউলাস (acervulus) হইতে উৎপন্ন হয়। মাইসেলিয়াম গঠিত এসারভিউলাস উঁচু বেদীর ন্যায় এবং উপরিভাগ কনিডিয়ফোর দ্বারা আবৃত। ইহা একটিমাত্র অস্থায়ী ফর্ম-ফ্যামিলি গঠিত।

(৪) অস্থায়ী অর্ডার **মাইসিলিয়া স্টেরিলিয়া** (Form-order Mycelia Sterilia): এই প্রকার ছত্রাকে কোন প্রকার কনিডিয়াম বা স্পোর সৃষ্টি হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মাইসিলিয়াম জট পাকাইয়া স্কেলরসিয়াম (sclerotium) অথবা রাইজোমর্ফ (rhigomorph) সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত ছত্রাকের ফর্ম-ফ্যামিলিগুলিকে ছত্রাকের স্পোরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিখ্যাত বিজ্ঞানী সাকার্ডো (P. A. Sarcardo, 1899) পুনরায় বিভক্ত করিয়াছেন।

স্পোর এককোষী, গোল, ডিম্বাকার অথবা লম্বা	—এমেরোস্পোরী (Amerosporae)
স্পোর স্বচ্ছ	—হায়ালোস্পোরী (Hyalosporae)
স্পোর ঘনবর্ণের	—ফিয়স্পোরী (Phaeosporae)
স্পোর দুইকোষী ডিম্বাকার অথবা লম্বা	—ডিডিমোস্পোরী (Didymosporae)
স্পোর স্বচ্ছ	—হায়ালোডিডিমী (Hyalodidymae)
স্পোর ঘনবর্ণের	—ফিয়ডিডিমী (Phaeodidymae)
স্পোর তিন অথবা বহুকোষী, কেবল প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত	—ফ্রাগমোস্পোরী (Phragmosporae)
স্পোর স্বচ্ছ	—হায়ালোফ্রাগমী (Hyalophragmae)
স্পোর ঘনবর্ণের	—ফিয়ফ্রাগমী (Phaeophragmae)
স্পোর বহুকোষী এবং লম্ব ও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত	—ডিকটিয়স্পোরী (Dictyosporae)
স্পোর স্বচ্ছ	—হায়ালোডিকটি (Hyalodictyae)

স্পোর ঘনবর্ণের	—ফিয়াডিকটি	(Phaeodictyae)
স্পোর সরু সূতার ন্যায় লম্বা, এক বা বহুকোষী	—স্কোলীকোস্পোরী	(Scolecosporae)
স্পোর সরু স্প্রিং এর ন্যায় পেচানো, এক বা বহুকোষী	—হেলিকোস্পোরী	(Helicosporae)
স্পোর তারার ন্যায়, এক বা বহুকোষী	—স্টরোস্পোরী	(Staurosporae)

উদ্ভিদ রোগবিদ্যা (Plant Pathology)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত সামগ্রীর উপর বিশেষ করিয়া জীবিকা নির্বাহের জন্য যাহারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহাদের সকলের পক্ষেই উদ্ভিদের সুরক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। যাহাই উদ্ভিদের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তাহাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানবজাতির ক্ষতিসাধন করে। বিশেষ করিয়া উন্নতিকামী দেশে যেখানে সর্বস্তরে আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম ও প্রক্রিয়ার বহুল প্রচলন এখনও সম্ভব হয় নাই, সেখানে কৃষিকর্মির জীবনে সুখ ও দুঃখ অনেকাংশে উদ্ভিদরোগের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদরোগে শুধুমত্রে যে প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু দরিদ্র দেশে খাদ্যাভাবে প্রচুর জীবননাশ ঘটিয়া থাকে। উন্নত দেশের উদ্ভিদরোগের ফলে আর্থিক ও জীবনক্ষতির পরিমাণ কিছু কম নয়। ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডে আলুর *Phytophthora infestans* জনিত ব্যাপক late blight রোগ যাহার ফলে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে এবং পনের লক্ষ লোক চিরতরে দেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় বসবাসের জন্য চলিয়া যায়।

উদ্ভিদ রোগের ফলে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য হইতে শুরু হইয়া শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত সম্ভব। ক্ষতির পরিমাণ উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদজাত দ্রব্য, জীবাণু নানাপ্রকার এবং আবহাওয়া এই সবকিছুর উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় ক্ষতি শুধুমাত্র পরিমাণগত ভাবে আবার কখনও ইহা সামগ্রীর উৎকর্ষতা হিসাবে।

রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় অনেক সময় কৃষিকর্মীকে বাধ্য হইয়া কম ফলনশীল রোধপ্রতিরোধক উদ্ভিদ প্রজাতির চাষ করিতে হয় যাহার ফলে অতি সামান্য আর্থিক লাভ সম্ভব। অনেক সময় নানাবিধ দুর্মূল্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় যেমন, মূল্যবান রাসায়নিক জীবাণুনাশক দ্রব্যের ব্যবহার। হিমশীতল গুদামঘরে মজুত অথবা সুস্থ ও রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ আলাদাভাবে বাছাই করার ব্যয়সাধ্য উপায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই কৃষিকর্মীর লাভের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। আজকাল অনেক উদ্ভিদ রোগই ক্ষেত্রবিশেষে কম বা বেশী পরিমাণে ব্যয়সাপেক্ষ নানা উপায়ে রোধ করা সম্ভব।

উদ্ভিদরোগ বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংস্থা (Terms)

উদ্ভিদরোগ (plant disease) কি ? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই জটিল। সহজভাবে রোগ অর্থে উদ্ভিদের অস্বাভাবিক ক্ষতিকারক জৈবনিক পরিবর্তন বুঝায়। যে বিজ্ঞান পাঠে উদ্ভিদরোগের নানাবিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ হয় তাহাকে উদ্ভিদরোগবিদ্যা (plant pathology) বলে। মাটি বা অন্য কোন প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা কোন জীবাণু রোগের কারণ হইতে পারে। ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া অথবা ভাইরাস দ্বারা রোগ সৃষ্টি হইলে ঐ জীবাণুকে pathogen বলে। অধিকাংশ pathogen পরভোজী হিসাবে জীবন্ত উদ্ভিদদেহ হইতে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। যে উদ্ভিদ হইতে খাদ্য সংগৃহিত হয় তাহাকে host বা suscept বলে। যখন কোন পরজীবি জীবাণুকে (pathogen) জীবিত host ছাড়া কোন উপায়েই গবেষণাগারে মৃত জৈব উপাদানে বৃদ্ধি করা সম্ভব

হয় না তাহাকে obligate parasite বলে। যে সমস্ত পরজীবী প্রয়োজনে মৃত জৈবিক উপাদানেও বৃদ্ধি পায় তাহাকে facultative parasite বলে।

কোন ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতাকে ইহার pathogenicity বলে। বিভিন্ন রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর আপেক্ষিক রোগসৃষ্টির ক্ষমতার নাম virulence, যেমন একই জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে তাহাদের রোগসৃষ্টির ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়, কোনটি অধিক ক্ষমতাশীল আবার কোনটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশীল। ইহাদের মধ্যে আবার যে প্রজাতিগুলির রোগসৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না তাহাদের avirulent (nonvirulent) বলে। বিভিন্ন প্রজাতির আপেক্ষিক ক্ষমতার বা virulence এর একই অর্থে সময় সময় agressiveness ব্যবহৃত হয়।

কোন উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারী আক্রমণ হইতে কম বা বেশী কতখানি নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম এই অর্থে উদ্ভিদের resistance বা susceptibility ব্যবহৃত হয়। কোন উদ্ভিদ যদি জীবাণুর আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় অথবা নিজদেহে প্রবেশের পরে বর্ধিত হইতে না দেয় তবে সেই উদ্ভিদকে উচ্চ প্রতিরোধক বা highly resistant (low susceptibility) বলে। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিরোধক-ক্ষমতাশীল উদ্ভিদকে immune বলে। আবার যে সমস্ত উদ্ভিদ সহজেই রোগাক্রান্ত হয় এবং দেহের মধ্যে জীবাণু সহজেই বৃদ্ধি প্রায় তাহাদের highly susceptible (low resistant) বলে। বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদে বিভিন্ন রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক resistance বা susceptibility দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একটি উদ্ভিদের প্রতিরোধক্ষমতা একই জীবাণুর সবগুলি প্রজাতির বিরুদ্ধে সমানভাবে কার্যকর হয় তবে তাহাকে horizontal resistance বলে। আবার যদি কেবলমাত্র কয়েকটি প্রজাতির বিরুদ্ধে কার্যকর কিন্তু অন্যগুলির বিরুদ্ধে না হয় তবে তাহাকে vertica resistance বলে। উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা এক বা একাধিক জীন (gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে যথাক্রমে monogenic বা polygenic resistance বলে। জীন (gene)-গুলির ক্ষমতা অনুযায়ী major বা minor নামে পরিচিত।

যে সমস্ত উদ্ভিদের রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতা কম (tolerant) তাহাদের ক্ষেত্রে রোগের বহিঃপ্রকাশ খুব স্পষ্ট হয় না। অনেক প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদদেহে জীবাণুর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট হোস্ট কোষে জৈবনিক প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ কোষের মৃত্যু হয় এবং জীবাণুর বিস্তার রোধ হয়। এই প্রক্রিয়াকে hypersensitive reaction বলে।

অনুকূল পরিবেশে প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন উদ্ভিদ প্রজাতির দেহে জীবাণুর প্রবেশ ও বৃদ্ধির পর রোগসৃষ্টি হয়। উচ্চ প্রতিরোধক উদ্ভিদের দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ হইলেও, পরে ইহার বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টি ঘটে না। কখন কখন জীবাণু সমগ্র উদ্ভিদদেহে সম্প্রসারিত হইয়া সমস্ত উদ্ভিদকে রোগগ্রস্ত করে তাহাকে systemic disease বলে। আবার কোন কোন রোগ কেবলমাত্র একটি অঙ্গে বা অংশে আবদ্ধ থাকে তাহাকে স্থানিক রোগ বা localised disease বলে।

রোগ সৃষ্টির পর উদ্ভিদদেহের রোগের যে নানা প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে symptoms বলে। জীবাণুর প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের প্রকাশ

পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাকে incubation period বলে। রোগসৃষ্টির কারণ যে জীবাণু তাহাকে causal organism বলে। causal organism এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যাহা রোগসৃষ্টিতে সহায়তা করে তাহাদের সমষ্ঠিগতভাবে causal complex বলে।

প্রকৃতিতে pathogen সৃষ্ট স্পোর এবং শক্ত আবরণযুক্ত অন্যান্য নানা অংশ যাহা রোগ বিস্তার ও সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং প্রতিকূল অতি-শীতল বা অতি-গ্রীষ্ম আবহাওয়ায় জীবিত থাকিয়া ঐ সময় অতিক্রমে সহায়তা করে তাহাদের যথাক্রমে overwintering বা oversummering অঙ্গ বলে।

উদ্ভিদরোগের ইতিহাস

মানবজাতি উদ্ভিদরোগের বিষয় বহুপুরাকাল হইতে অবগত আছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে মানবদেহের রোগের সহিত উদ্ভিদের blast ও mildew জাতীয় রোগের উল্লেখ আছে। গ্রীক দার্শনিক Theophrastus (খৃঃ পূঃ 370-286) প্রথম বৃক্ষ, শস্য এবং লেগুম জাতীয় উদ্ভিদের রোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন একই উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি বিশেষ কোন একটি রোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধক্ষমতা বহন করে। তাছাড়া মাটি ও আবহাওয়া রোগের মহামারীতে সাহায্য করে। Leeuwenhoek (1675) তাঁর সৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু পরীক্ষা করেন। P. A. Micheli (1729) ছত্রাকের বিষয় গবেষণা করেন এবং ছত্রাকের স্পোর দ্বারা বংশ-বিস্তারের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। Tillet (1755) প্রথম সুষ্ঠুভাবে মাঠের পরীক্ষা (plot experiment) মাধ্যমে প্রমাণ করেন বান্ট (bunt) রোগাক্রান্ত গমবীজের কালো পাউডার (স্পোর) সুস্থ গমবীজের সহিত মিশ্রিত করিলে রোগের প্রাদুর্ভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। C. H. Persoon (1801) এবং E. M. Tries (1821) নানাশ্রেণীর ছত্রাকের উপর প্রচুর গবেষণা করেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল রাস্ট্ (rust) এবং স্মাট্ (smut) জাতীয় রোগের কোন জীবাণু সৃষ্ট নয় বরং ইহা রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের সৃষ্ট উপাদান। 1845 খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডে রোগের ফলে আলু চাষের প্রচুর ক্ষতি হয়। ফলে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। H. A. de Bary (1851, '63) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন এই রোগের কারণ *Phytophthora infestans* নামক একটি ছত্রাক। তিনি আরোও প্রমাণ করেন যে কতকগুলি ছত্রাকদ্বারা স্মাট্ ও রাস্ট্ জাতীয় রোগের সৃষ্টি হয়। তিনি ডাউনি মিলডিউ জাতীয় রোগের কারণ যে *Peronospora* এবং রাস্ট এর জীবনীতে দ্বিতীয় জনুক্রমিক (alternate) উদ্ভিদের প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করেন। উদ্ভিদদেহ কোষের ক্ষতিসাধনকারী ছত্রাকসৃষ্ট এনজাইম (enzyme) বিষয়েও তিনি অনেক গবেষণা করেন।

M. J. Berklev (1845, '57) এবং J. G Kuhn (1858) শস্য, শাকসব্জী এবং অন্যান্য উদ্ভিদরোগের বিষয় গবেষণা করেন। Kuhnই প্রথম পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ রোগবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। O. Brefeld (1875, 83), Petri এবং Koch প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে ছত্রাকের কৃত্রিম কৃষ্টি বিষয়ক নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রচলন করেন।

1878 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে আঙ্গুরলতার downy mildew নামক ছত্রাক রোগে প্রচ' ক্ষতি সাধন হয়। Millardet (1882) আবিষ্কৃত bordeaux mixture (কপা সালফেট ও লাইমের মিশ্রণ) আঙ্গুর লতায় ছিটানোর ফলে রোগ নিবারণে প্রভূত সাফল দেখা যায়। ইহার পরই ছত্রাক রোগের হাত হইতে উদ্ভিদকে রক্ষার জন্য নানা প্রকা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের বহুল গবেষণা ও ব্যবহার সুরু হয়। আজও পৃথিবী সর্বত্র নানারোগের হাত হইতে রক্ষার জন্য bordeaux মিশ্রণের বহুল প্রচলন আছে Biffen (1905, 1912) রাস্টরোগের নিবারণের ক্ষেত্রে রোগপ্রতিরোধক (resistant প্রজাতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

E. F. Smith (1895) ব্যাকটিরিয়া জনিত উদ্ভিদরোগের উপর প্রচুর গবেষণা করেন। Mayer (1886) তামাক পাতার মোজেক রোগ লইয়া গবেষণা করেন তিনি রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ হইতে তরল লইয়া সুস্থ তামাক পাতায় প্রবেশ করাইয়া রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। অবশ্য Beijerinck (1898) প্রথম দেখান যে তামাক পাতার মোজেক রোগ কোন জীবাণুসৃষ্ট নয় ইহা একপ্রকার ছোঁয়াচে তরল পদার্থ (Contagium vivum fluidum) যাহার নাম দেন তিনি ভাইরাস (virus).

বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদরোগ বিষয় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর নানা স্থানের গবেষণার সাথে সাথে আমাদের ভারতবর্ষেও বিভিন্ন গবেষণাগারে উদ্ভিদরোগ বিষয়ে নানান গবেষণা হইতেছে।

Koch Postulate দ্বারা রোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ

কোন উদ্ভিদরোগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ইহাকে Koch postulate বলে।

(ক) প্রথমে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটি সকল রোগগ্রস্থ উদ্ভিদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা অবশ্যই প্রয়োজন ;

(খ) শুদ্ধ জীবাণুটির উপযুক্ত খাদ্যে কৃষ্টিগত বৃদ্ধি করিতে হইবে (facultative parasite এর ক্ষেত্রে) অথবা রোগ অপ্রতিরোধক (susceptible) প্রজাতিতে বৃদ্ধি করিতে হইবে (obligate parasite-এর ক্ষেত্রে) ;

(গ) শুদ্ধ জীবাণুটির কৃষ্টি দ্বারা একই ধরণের উদ্ভিদে রোগ সংক্রমণ করিলে একই ধরণের রোগের লক্ষণ দেখা যাইবে ;

(ঘ) সংক্রামিত উদ্ভিদ হইতে (ক) পুনরায় জীবাণুটিকে শুদ্ধ অবস্থায় কৃষ্টিগত বৃদ্ধি করিয়া দেখিলে ঐ জীবাণু এবং (খ) লব্ধ জীবাণু সম্পূর্ণ অভিন্ন হইবে।

যদি এই সবগুলি স্তরই ঠিকমত পরীক্ষা করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা হইলে জীবাণুটির রোগসৃষ্টিকারী ক্ষমতা এবং রোগটির সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হইবে।

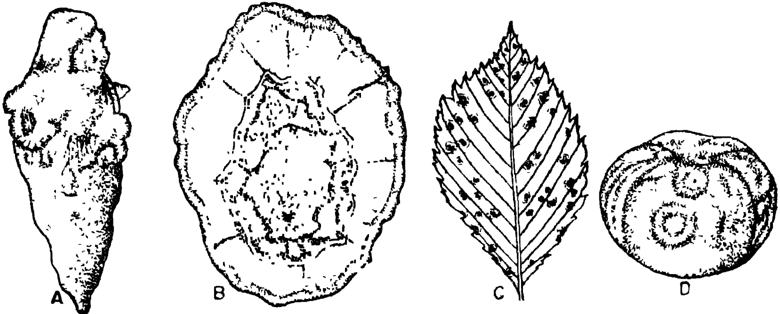
উদ্ভিদ রোগের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of plant diseases)

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের শত শত রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। একই উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা রোগসৃষ্টি এবং একই জীবাণু বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে রোগসৃষ্টি প্রায়শঃই দেখা যায়। রোগ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান এবং রোগের

কার্যকরী প্রতিরোধের নিমিত্ত সকল প্রকার উদ্ভিদরোগকে সুবিধামত শ্রেণীবিন্যাস করা হইয়া থাকে। কখন কখন লক্ষণ অনুযায়ী উদ্ভিদরোগের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যেমন মূল পচন, ক্যাংকর, উইল্ট, পাতার স্পট, ব্লাইট, রাস্ট, স্মাট্ প্রভৃতি। আবার কখন কখন উদ্ভিদদেহের আক্রান্ত অংশের উপর নির্ভর করিয়া এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। যেমন, মূলের রোগ, কাণ্ডের রোগ, পাতার রোগ, ফলের রোগ ইত্যাদি। উদ্ভিদের প্রকারভেদ অনুযায়ীও কখন কখন রোগের শ্রেণীবিন্যাস করা হইয়া থাকে। যেমন, শস্যজাতীয় উদ্ভিদের রোগ, শাকসব্জীজাতীয় উদ্ভিদের রোগ, ফল গাছের রোগ, বনজ বৃক্ষের রোগ, পাতাবাহার উদ্ভিদের রোগ ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত রোগের শ্রেণীবিন্যাস অবশ্য উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর শ্রেণীর উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে :—

(ক) সংক্রামক বা ছোঁয়াচে জীবাণুজনিত রোগ
- (১) ছত্রাকসৃষ্ট
- (২) ব্যাকটিরিয়াসৃষ্ট
- (৩) পরজীবী উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদসৃষ্ট
- (৪) ভাইরাসসৃষ্ট
- (৫) নিমাটোড নামক প্রাণীসৃষ্ট

(খ) জৈবনিক কারণজনিত
- (১) খাদ্যাভাবজনিত
- (২) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থজনিত
- (৩) অতি-উচ্চ অথবা অতি-নিম্ন তাপজনিত
- (৪) স্বল্পতা অথবা সম্পূর্ণ আলোকাভাবজনিত
- (৫) অত্যধিক অথবা অত্যল্প মাটির আর্দ্রতাজনিত
- (৬) অক্সিজেনের অভাবজনিত
- (৭) বাতাস দূষিতকরণ জনিত
- (৮) মাটির ক্ষার অথবা এ্যামিনজনিত



A—রাঙ্গাআলুর Soft rot, B—প্লামের (Plum' অন্তঃপচন, C—পাতার স্পট Spot), D—টম্যাটোর এন্থ্যাকনস রোগ (Antaracnose)।

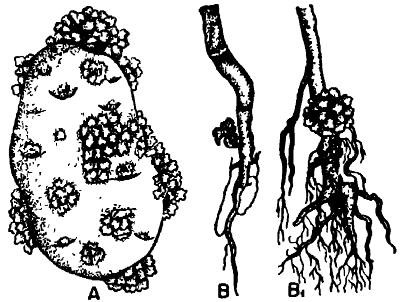
উদ্ভিদ রোগের বিস্তার (Dissemination of Plant Diseases)

ছত্রাক স্পোর, ব্যাকটিরিয়া, ও ভাইরাস দ্বারা উদ্ভিদরোগ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অথবা এক উদ্ভিদ হইতে অন্য উদ্ভিদে বিস্তার লাভ করে। রোগ নিবারণের উপযুক্ত উপায় সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই রোগবিস্তারের নানাবিধ উপায় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের রোগের বিস্তার সাধিত হয়, নিম্নে প্রধান প্রধান মাধ্যমের বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :—

(১) বাতাসের সাহায্যে রোগবিস্তার—নানাপ্রকার রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকের শুষ্ক স্পোর বাতাসের সাহায্যে সরাসরি বিস্তার লাভ করে, যেমন পাউডারি মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের পাতা ও ফুলের অংশ বাতাসে বাহিত হইয়া পরোক্ষভাবে রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। বাতাসে বাহিত জলের ফোঁটা অনেক সময় রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাক স্পোর ছড়ায়।

(২) জলের সাহায্যে রোগবিস্তার—অনেক রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া এবং জলজ ছত্রাক (water moulds), চিট্রিড (chytrids), ডাউনিমিলডিউ প্রভৃতি ছত্রাকের চলনশীল কোষ বা স্পোর তাহাদের সিলিয়ামের সাহায্যে জলের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়, যেমন আলুর ওয়ার্ট (wart) ও ব্লাইট (blight) রোগ, কপির ক্লাব রুট (club-root) রোগ ইত্যাদি। শিশির বা বৃষ্টির ফোঁটার সাহায্যেও চলচ্ছক্তিহীন স্পোরের বিস্তার হইয়া থাকে। কিছু কিছু রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক স্পোর ও ব্যাকটিরিয়া আঠাল মিউসিলেজে আবদ্ধ থাকে। বৃষ্টি অথবা শিশিরে এই মিউসিলেজ দ্রবীভূত হইলে স্পোর ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, আপেল গাছের ব্যাকটিরিয়া জনিত fire blight রোগ রোগাক্রান্ত উঁচু গাছ হইতে নিচু গাছে অথবা উঁচু ডাল হইতে নিচু ডালে ছড়াইয়া পড়ে।

বন্যার এবং সেচের জল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নানা রোগের জীবাণু বহন করে। এইভাবে নানাপ্রকার ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের, ergot রোগের স্লেসিয়া (Seletia) ভাসিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উদ্ভিদকে আক্রান্ত করে।



সিনটিট্রিয়ামজনিত আলুর প্রাথমিক ধসা রোগ. A—আলুর রোগ, B, C– কাণ্ড ও মূলের উপর।

পতঙ্গের সাহায্যে রোগ বিস্তার—কীটপতঙ্গ নানাভাবে রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। কখনও কখনও ইহারা দেহের ভিতরে অথবা বাহিরে জীবাণু বহন করে এবং উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। যদিও পতঙ্গ অনেক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ ছড়ায়, ভাইরাসজনিত রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইহারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নলিখিত উপায়ে পতঙ্গরা উদ্ভিদরোগ ছড়ায় :—

(ক) জীবাণু পতঙ্গের গায়ে লাগিয়া শুধুমাত্র স্থানান্তরিত হয় যদিও পতঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে বিস্তারে সাহায্য করে না। যেমন, আপেলের ব্যাকটিরিয়াজনিত fire blight রোগ, নানাপ্রকার rust ও smut রোগ ইত্যাদি।

(খ) জীবাণু ও ভাইরাস পতঙ্গবাহিত এবং পতঙ্গকৃত ক্ষত মাধ্যমে। যেমন, দংশনকারী পতঙ্গ (biting insects) দ্বারা ভাইরাস রোগ। ব্যাকটিরিয়াজনিত আলু, টম্যাটো প্রভৃতি উদ্ভিদের রোগ ইত্যাদি।

(গ) পতঙ্গ বাহিত না হইয়া কিন্তু উদ্ভিদদেহে পতঙ্গকৃত ক্ষত মারফত বাতাস-বাহিত জীবাণু দ্বারা। যেমন, পেঁয়াজের blight, তুলাগাছের ব্যাকটিরিয়াজনিত blight রোগ।

(ঘ) জীবাণু পতঙ্গদেহের মধ্য দিয়া মলের সহিত বাহিরে আসে, কিন্তু জীবাণুর সংখ্যা পতঙ্গদেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, যেমন ergot রোগের sphacelia স্পোর

(ঙ) জীবাণু বা ভাইরাস পতঙ্গদেহের মধ্য দিয়া বাহিত হওয়ার কালে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ ভাইরাস রোগ এইভাবে বিস্তার লাভ করে।

অন্যান্য জীবজন্তুর সাহায্যে রোগের বিস্তার –নিমাটোড, শামুক, পাখী, বন্য ও গৃহপালিত পশুর দ্বারা নানাপ্রকার রোগের বিস্তার সাধিত হয়। আলুর ব্যাকটিরিয়াজনিত brown rot নিমাটোড দ্বারা, ব্যাকটিরিয়াজনিত chestnut blight পাখীর দ্বারা, ইঁদুর ও কাঠবিড়ালীর সাহায্যে গাছের কাঠপচানো ছত্রাক রোগ। ইহা ছাড়াও মাটিতে মিশ্রিত জীবাণু ও স্পোর অনেক সময় গৃহপালিত পশুর পায়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিস্তৃত হয়।

বীজের সাহায্যে রোগবিস্তার—উদ্ভিদের বীজ অথবা বীজ হিসাবে ব্যবহৃত স্ফীতকন্দ, কন্দ, কর্ম, রাইজোম প্রভৃতির মধ্যে অথবা বাহিরে রোগবীজাণু বাহিত হইতে পারে। ধানের brown spot, গমের loose smut, প্রভৃতিতে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু বীজের মধ্যে বাহিত হয়। গমের bunt, বার্লির coversmut ইত্যাদিতে জীবাণু বীজের বাহিরে বাহিত হয়। সাধারণতঃ ভাইরাসজনিত রোগ বীজবাহিত হয় না। লেগুম, লেটুস, পিটুনিয়া প্রভৃতির মোজেক রোগ অবশ্য বীজবাহিত।

মাটির সাহায্যে রোগ বিস্তার—মাটি স্থানান্তরিত করার কালে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিস্তার হয়। যথা, কপিজাতীয় উদ্ভিদের club root রোগ।

কমপস্ট বা সারের সাহায্যে রোগ বিস্তার—অনেক সময় রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ হইতে সৃষ্ট কমপস্ট অথবা পশুর মল হইতে প্রস্তুত সারের সাহায্যে রোগের বিস্তার হয়। যেমন, রাঙাআলুর stem rot.

কৃষিপদ্ধতি এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগবিস্তার—সাধারণ কৃষি পদ্ধতি যেমন ফসল বোনা বা কাটা অথবা ঝাড়াইয়ের সময় অনেক রোগ ছড়ায়। ইহা ছাড়া ফলগাছ ছাঁটার সময় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে fire blight রোগ মাটি হইতে আলু আহরণের সময় late blight এবং চাষের সময় তামাক সেবনকারী চাষীর হাত হইতে তামাক গাছের মোজেক রোগ ছড়ায়।

উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ (Symptoms of Palnt Diseases)

রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে নানাপ্রকার বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্ভিদে একই প্রকার রোগের লক্ষণ একাধিক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। রোগের

প্রাথমিক লক্ষণ সাধারণতঃ আক্রমণ স্থলেই প্রকাশ পায় কিন্তু মাধ্যমিক লক্ষণ আক্রমণ-স্থল হইতে দূরে প্রায় সুস্থ অংশেও দৃষ্টিগোচর হয়। রোগের লক্ষণগুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, নেক্রটিক (necrotic), এ্যাট্রফিক (atrophic) এবং হাইপারট্রফিক (hypertrophic).

Necrotic symptoms: এই প্রকার লক্ষণে উদ্ভিদদেহে রোগাক্রান্ত হোস্ট কলার মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত অংশ প্রথমে স্বাভাবিক হইতে হলুদ, বাদামী প্রভৃতি নানা বর্ণে রূপান্তরিত হয় এবং শেষে মৃত অংশ ধূসর অথবা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই প্রকার লক্ষণে উদ্ভিদের কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইতে দেখা যায়। এই প্রকার লক্ষণের মধ্যে spot, discolouration, canker, wilting, mummification প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Atrophic symptoms: অনেক সময় স্বাভাবিক অপেক্ষা শ্লথ গতিতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু বা ভাইরাস ছাড়াও নানাপ্রকার প্রতিকূল আবহাওয়া এই প্রকার রোগলক্ষণের কারণ হইতে পারে, যেমন প্রতিকূল মাটির পরিবেশ। অত্যধিক frost ইত্যাদি। শাখাপ্রশাখার অথবা উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের শ্লথ বৃদ্ধি ছাড়াও কখন কখন উদ্ভিদকোষে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম ক্লোরোফিল সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

Hypertrophic symptoms: অনেক সময় রোগাক্রান্ত উদ্ভিদদেহে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়। এই বৃদ্ধি দুইটি কারণে সম্ভব, সংখ্যাগতভাবে কোষ বিভাজনের দ্বারা অথবা কোষের অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু আক্রমণে অথবা প্রতিকূল আবহাওয়া যে কোন কারণেই এই প্রকার বৃদ্ধি সম্ভব। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, gall, Witches' broom, curling ইত্যাদি। নিম্নে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রোগ লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) **স্পট্** (Spot)—পাতা, ফুলের পাপড়ি, ফল ও অন্যান্য উদ্ভিদ অংশে প্রায়শঃই গোলাকার স্থানিক ফোঁটার আকারে রোগাক্রান্ত অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত অংশ হলুদ, বাদামী, কালো অথবা ধূসর বর্ণের এবং নানা আকারের হয়। অনেক সময় রোগাক্রান্ত অংশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ এলাকা দ্বারা বাহিরে ঘেরা থাকে।

(২) **সট্হোল** (Shot hole): অনেক সময় স্থানিক রোগাক্রান্ত পাতার অংশ খসিয়া পড়ে এবং পাতায় নানা আকার ও আয়তনের ছিদ্রের সৃষ্টি করে।

(৩) **বিবর্ণ** (Discolouration): উদ্ভিদের রোগাক্রান্ত অংশ বিশেষ নিজস্ব বর্ণ হারাইয়া হলুদ, বাদামী, রূপালি প্রভৃতি নানা বর্ণে রূপান্তরিত হয়। অনেক ভাইরাস-জনিত রোগ পাতায় নানা বর্ণের অংশে মিশ্রিত হইয়া variegation সৃষ্টি করে।

(৪) **ক্যাঙ্কর** (Canker): কাণ্ড, পাতা ও ফলের স্থানিক রোগাক্রান্ত অংশে প্রথমে কোষের মৃত্যু হয় এবং পরে মৃত অংশ খসিয়া পড়ে ও ক্ষত সৃষ্টি করে। এই রোগ যখন বৃক্ষের গভীরে ক্যাম্বিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন অনেক সময় বৃক্ষের বল্কল খসিয়া পড়িতে দেখা যায়। ক্যাঙ্কর বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষজীবী উভয় প্রকারেরই হয় এবং বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে ইহাদের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বহুবর্ষজীবী

ক্যান্কর—অধিকতর ক্ষতিকারক। বর্ষজীবী ক্যাংকরে অনেক সময় ক্যালস কলা সৃষ্টির ফলে ক্ষত অংশ ঢাকিয়া রোগমুক্ত হয়।

(৫) **শুকাইয়া যাওয়া** (Wilting): রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ ছাড়াও গরমের দিন জলাভাবে উদ্ভিদের এই লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু জল পাইলেই এই সকল উদ্ভিদ রোগমুক্ত হয়। জীবাণুজনিত এই রোগে কিন্তু রোগমুক্তি বিরল। চারা গাছের এই হঠাৎ শুকাইয়া মৃত্যু হওয়ার রোগকে damping-off বলে। পূর্ণবয়স্ক উদ্ভিদেও অনেক সময় জীবাণুজনিত এই শুকাইয়া মরা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের শাখার অগ্র হইতে শুরু করিয়া গোড়ার দিকে শুকাইতে থাকিলে তাহাকে die back বলে।

(৬) **মামিভূত** (Mummification): অনেক সময় ছত্রাকজনিত রোগ দ্বারা ফলের মধ্যকার কলা নষ্ট হয় এবং ছত্রাক অনুসূত্র দ্বারা পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া ফলের মামির আকার ধারণ করে। ইহারা প্রতিকূল অবস্থায় ছত্রাককে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে এবং অনুকূল পরিবেশে স্পোর সৃষ্টি করিয়া ছত্রাকের বিস্তারে সাহায্য করে।

(৭) **ব্লাইট** (Blight): এই ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত পাতা ফুলের পাপড়ি বিবর্ণ হইয়া নষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত অংশে নানা বর্ণের এককেন্দ্রিয় চক্র (Concentric rings) সৃষ্টি হয়। যথা :—আলুর early blight ও late blight এবং ধানের ব্যাকটিরিয়াজনিত blight.

(৮) **রট** (Rot): রসাল পাতা, ফল এবং অন্যান্য নরম উদ্ভিদ অংশ রোগাক্রান্ত হইলে পচন দেখা যায়। পচন কখন কখন জলীয় নরম (soft rot) আবার কখন শুষ্ক (dry rot) হয়। রোগাক্রান্ত বীট, গাজর, রাঙাআলুর নরম মূলে পচন রোগ দেখা যায় (root rot)। ইহা ছাড়াও নানাপ্রকার ফল ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে পচনশীল।

(৯) **তরল পদার্থ নিঃসরণ** (Production of exudate): রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ হইতে অনেক সময় নানাপ্রকার তরল আঠাল ল্যাটেক্স (latex) অথবা রেসিন (resin) জাতীয় পদার্থ অধিকমাত্রায় নিঃসৃত হয়।

(১০) **ক্লোরোসিস** (Chlorosis): অনেক ভাইরাসজনিত রোগে ক্লোরোপ্লাস্ট সৃষ্টি সর্বত্র সমানভাবে ব্যাহত হওয়ায় পাতা হালকা সবুজ দেখায়। পাতার অংশবিশেষে ক্লোরোপ্লাস্ট সৃষ্টি ব্যাহত হইলে variegation দেখা দেয়।

(১১) **ডোয়ার্ফিন** (Dwarfing): কখন কখন রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ সম্পূর্ণ আংশিকভাবে অথবা ইহার অংশবিশেষ, যথা পাতা, ফুল বা ফল স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে।

(১২) **রোসেট্** (Rosette): রোগগ্রস্ত উদ্ভিদের পর্বমধ্য স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে পর্বের পাতাগুলি ঘন এবং চক্রাকারে সাজান অবস্থায় এই প্রকার লক্ষণ সৃষ্টি করে।

(১৩) **উইচেস্ ব্রুম** (Witches' broom): রোগের আক্রমণের ফলে অনেক উদ্ভিদে শাখাপ্রশাখাগুলি অস্বাভাবিক সরু এবং সমান্তরালভাবে ঝাঁটার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে বাঁশ গাছে এই প্রকার লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়।

(১৪) **অস্বাভাবিক আকার** (Malformations): রোগগ্রস্ত উদ্ভিদে অনেক প্রকার অস্বাভাবিক আকার পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় রোগসৃষ্টিকারী কীট দ্বারা অস্বাভাবিক রোম সৃষ্টি বা বৃদ্ধি দেখা যায় (hairy)। উদ্ভিদদেহে কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির স্থানিক, অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ছোট ছোট স্ফীত intumescence অথবা gall অথবা tumour সৃষ্টি হয়। কোষের আয়তন বৃদ্ধি অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা উভয়ে যৌথভাবে ইহার কারণ, যথা আলুর ওয়ার্ট রোগ, ধনে গাছের কাণ্ডের টিউমার রোগ ইত্যাদি।

(১৫) **কারলিং** (Curling): অনেক সময় পাতার অংশবিশেষের অধিকতর বৃদ্ধির ফলে এবং অন্য অংশে স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে পাতার কুঁচকনোর এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য স্বাভাবিক অপেক্ষা কম এবং অন্য অংশে স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলেও এই লক্ষণ দেখা যায়। যথা পিচ লিফ কর্ল।

উদ্ভিদরোগের প্রতিকারবিধি (Control of Plant Diseases)

উদ্ভিদরোগ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ কিভাবে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করা সম্ভব। বিভিন্ন রোগ ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। রোগ বিস্তারের উপায়, জীবাণুর জীবনচরিত ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া নানা প্রকার প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

কতকগুলি ভৌতিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগ হইতে নিষ্কৃতি বা রোগ দমন করা যায়:

(১) **তাপ দ্বারা মাটি শোধন**: নার্সারীর চারা উদ্ভিদ তৈয়ারীর মাটি উত্তপ্ত বাষ্প বা বিদ্যুত দ্বারা শোধন করা যায়। অল্প পরিমাণ মাটির ক্ষেত্রে বিশেষ পাত্রে মাটি লইয়া বাষ্প দ্বারা শোধন অথবা মাটির মধ্যে নলের সাহায্যে বাষ্প প্রবেশ করাইয়া বা বিদ্যুতের সাহায্যে মাটির তাপমাত্রা ৮২° সেণ্টিগ্রেড বা ইহার উর্ধ্বে ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করিলে মাটি শোধিত হয়।

(২) **তাপ দ্বারা বীজশোধন**: বীজ অথবা বীজ হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের অন্য অংশ ক্ষেত্রবিশেষে ৩৫° হইতে ৫৪° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কয়েক মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত উত্তপ্ত বায়ু অথবা বাষ্পে রাখিলে ভাইরাস বা অন্য জীবাণুর আক্রমণ হইতে অনেক সময় উদ্ধার পাওয়া যায়। ধান গাছের বীজ ৫৪° সেঃ তাপমাত্রায় কয়েক মিনিট শোধন করিলে বীজে অন্তর্নিহিত brown spot রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩) **ঠাণ্ডা পরিবেশে রোগমুক্তি**—সরস ফল বা ফলজাত দ্রব্যাদি যাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই সমস্ত খুব ঠাণ্ডায় মজুত করিলে রোগের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় রোগের অধিকাংশ জীবাণুর মৃত্যু না হলেও তাহাদের কার্যাবলী বহুলাংশে হ্রাস পায়। যদিও এই প্রক্রিয়া খুবই খরচসাপেক্ষ, বিশেষ কার্যকরী হওয়ায় ইহা নানা দেশে ব্যাপক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার দ্বারা: আল্ট্রাভায়োলেট, এ-রশ্মি, গামা-রে প্রভৃতি তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে নানা সব্জী ও ফলের মধ্যস্থ রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ঐ জীবাণু ধ্বংস করিতে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজন তাহা হোস্টকলার ক্ষতি সাধন করে। তৎসত্ত্বেও এই প্রক্রিয়া

খুবই কার্যকরী হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য এখনও ইহার বহুল প্রচলন শুরু হয় নাই।

নানা প্রকার কৃষ্টি বিষয়ক প্রক্রিয়ার (cultural control) মাধ্যমেও উদ্ভিদ রোগ নিবারণ সম্ভব :

হোস্ট নির্মূলীকরণ (Host eradication) : সুস্থ উদ্ভিদের মাঝ হইতে রোগগ্রস্ত উদ্ভিদগুলি বাছাই করিয়া ধ্বংস করার নাম eradication। সাধারণতঃ নার্সারীতে চারাউদ্ভিদ অবস্থায় এইভাবে রোগ বিস্তার রোধ করা হয়। ইহা ছাড়া আলুর হলুদ ভাইরাস রোগ, কিউকামবরা মোজেক ভাইরাস যাহা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদে শীত বা গ্রীষ্মে সুপ্ত থাকিয়া পরে রোগবিস্তারে সহায়তা করে, সেই সমস্ত বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের নিস্মূলীকরণ মাধ্যমে রোগের পরিমাণ অনেক পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব। Puccinia graminis-জনিত গমগাছের রোগে বারবেরী উদ্ভিদ ক্রমিক (alternate) হোস্ট হিসাবে রাস্ট ছত্রাকের জীবনচরিতে অংশগ্রহণ করে। বারবেরী উদ্ভিদ নিস্মূলীকরণ মাধ্যমে এই রোগের প্রকোপ বহুল অংশে হ্রাস সম্ভব।

শস্য পর্যায় (Crop rotation) : রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু মাটিতে বসবাস করে কিন্তু রোগ অপ্রতিরোধক উদ্ভিদের অনুপস্থিতিতে বেশীদিন মাটিতে জীবিত থাকিতে পারে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্য ফসলের চাষের দ্বারা এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে অপ্রতিরোধক উদ্ভিদের চাষের দ্বারা এই রোগ নিবারণ করা সম্ভব।

স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) : কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রের সাহায্যে অনেক রোগ প্রসারলাভ করে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ পরিষ্কার করিলে রোগের প্রকোপ কমে। কৃষিক্ষেত্র হইতে রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদ অংশ সময়মত সরাইয়া ও পুড়াইয়া ফেলিয়া কৃষিক্ষেত্র পরিষ্কার রাখিলে অনেক রোগের প্রকোপ কমে। যে সমস্ত স্থানে শস্য মজুত থাকে সেগুলি সময় সময় উপযুক্তভাবে পরিষ্কার রাখিলে রোগ নিবারণ করা সম্ভব। তামাক সেবনকারী কৃষক কৃষিকার্যের সময় হাত ধুইয়া কাজ করিলে তামাক ও টম্যাটো গাছের ভাইরাসজনিত রোগের হাত হইতে বহুলাংশে নিস্তার পাওয়া যায়।

উদ্ভিদকে সুস্থ ও সবল রাখার মাধ্যমে (Improving host health) : দুর্বল উদ্ভিদ সহজেই রোগগ্রস্ত হয়। উপযুক্ত সার ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রের জল নিকাশ, আগাছা পরিষ্কার প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভিদকে সুস্থ ও সবল রাখিলে অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জীবাণু প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি দ্বারা (Unfavourble condition for the pathogen) : অনেক সময় রোগজীবাণুর অনুপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব। শস্য প্রভৃতি উপযুক্তভাবে শুকাইয়া মজুত করিলে শস্যাগারের জীবাণুজনিত রোগের বহুলাংশে হ্রাস পায়। উপযুক্ত সারের ব্যবহারে অনেক সময় মাটির pH বদলাইয়া মাটিতে বসবাসকারী রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর আক্রমণ হইাত উদ্ভিদকে রক্ষা করা সম্ভব।

কলাকৃষ্টি দ্বারা (Tissue culture) : কিছু কিছু ছত্রাকজনিত (*Fusarium verticillium*) এবং ভাইরাসজনিত উদ্ভিদরোগে কাণ্ডের অগ্রভাগের ভাজক কলা

কেবলমাত্র রোগমুক্ত থাকে। ঐ কলা হইতে কলাকৃষ্টির মাধ্যমে রোগমুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব হয়।

বিশেষ করিয়া রোগপ্রতিরোধক উদ্ভিদ সৃষ্টির দ্বারা অথবা কখন কখন এক জীবাণু ব্যবহার দ্বারা অন্য রোগজীবাণুর আক্রমণ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করা সম্ভব।

অন্য জীবাণুর ব্যবহার দ্বারা (Cross protection) : পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বরবটী জাতীয় উদ্ভিদের কম ক্ষতিকারক ভাইরাস দ্বারা পূর্বে আক্রান্ত করাইলে rust অথবা mildew ছত্রাক দ্বারা বরবটীর ব্যাপক ক্ষতি রোধ করা সম্ভব। আপেল গাছের ব্যাকটিরিয়া জনিত fire blight রোগ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক ঐ ব্যাকটিরিয়ার প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত করাইলে ব্যাপক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত অবশ্য এই প্রকার রোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় নাই।

রোগপ্রতিরোধক প্রজাতির ব্যবহার (Disease resistant vaiiety): কোন বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে একই উদ্ভিদের নানা প্রজাতির রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়। গবেষণার দ্বারা এইরূপ রোগপ্রতিরোধক উচ্চফলনশীল প্রজাতির সৃষ্টি করা সম্ভব। রোগপ্রতিরোধক প্রজাতির অধিকতর ব্যবহারের দ্বারা রোগ প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

বাধ্যতামূলক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পরীক্ষা দ্বারা (Plant quarantine) : পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজাতি নিজের প্রয়োজনে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশ এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করার কালে অজ্ঞাতসারে উদ্ভিদ রোগের জীবাণু বহন করিতে পারে। নতুন পরিবেশে ঐ জীবাণু মহামারীর আকারে রোগ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। রোগবিস্তার রোধের নিমিত্ত উদ্ভিদ স্থানান্তরিত করার কালে নানা দেশে বাধ্যতামূলক সরকারী পরীক্ষার নিয়ম বলবৎ আছে (quarantine laws)। ঐ সংস্থা হইতে উদ্ভিদের রোগমুক্ত সম্বন্ধে স্বীকৃতিপত্র লাভ করার পরই ঐ উদ্ভিদ এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। অন্যথায় ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ।

রাসায়নিক ব্যবহার দ্বারা (Chemical control) :

আধুনিক কালে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শত শত প্রতিষেধক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার প্রচলন আছে। উহাদের কোনটি মাটি শোধন করিতে, কোনটি উদ্ভিদ দেহে শুষ্ক গুড়া হিসাবে অথবা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিটানোর সাহায্যে আবার কোনটি শষ্যাগার শোধন করিতে গ্যাস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ তামা, পারদ ও গন্ধক ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থের জৈব অথবা অজৈব লবণ। উদ্ভিদরোগের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ রাসায়নিক পদার্থই প্রতিষেধক (protectai t) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ রোগ আক্রমণের পূর্বেই ইহা ব্যবহৃত হওয়ার ফলে রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অতি অধুনা দুই একটি যথার্থ প্রতিরোধক (therapeutant) পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ব্যবহারের ফলে রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ কিছু পরিমাণে আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্ভিদরোগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রাকনাশক (fuugicides) কতকগুলি ব্যাকটিরিয়ানাশক

(bactericides) এবং কতকগুলি কীটনাশক (insecticides)। নিম্নে কতকগুলি বহুল প্রচলিত ছত্রাক ব্যাকটিরিয়ানাশক পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

তামা গঠিত (Cu compounds): ইহাদের মধ্যে Millardet আবিষ্কৃত Bordeaux মিশ্রণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কপার সালফেট ১০ পাউন্ড, লাইম ১০ পাউন্ড ১০০ গ্যালন জলে দ্রবীভূত করিয়া ঐ মিশ্রণ ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়াজনিত leaf spot, downy mildew canker প্রভৃতি রোগে ছিটাইলে খুবই কার্যকরী ফল পাওয়া যায়।

গন্ধক গঠিত (Sulphur compounds): গন্ধক গুড়া অথবা পেস্ট হিসাবে সরাসরি ব্যবহার করিয়া powdery mildew অথবা rust রোগের বিরুদ্ধে সুফল পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া লাইম ও গন্ধক মিশ্রণ নানা প্রকার ফল গাছের blight, powdery mildew এবং পিচগাছে leaf curl-এ বিশেষ কার্যকরী।

আজকাল নানা প্রকার জৈবিক গন্ধক গঠিত অতি কার্যকরী পদার্থের ব্যবহারে নানা প্রকার উদ্ভিদরোগ নিরাময়ে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। ইহাদের অধিকাংশের মূল উপাদান ডাইথারো কারবামিক এ্যাসিডের নানা ধাতুর লবণ। লৌহ লবণ ফারবাম (ferbam), দস্তা লবণ জিরাম (ziram) ও জিনেব (zineb), সোডিয়াম লবণ নাবাম (nabam) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীজ শোধন, মাটি শোধন এবং নানা শাকসব্জী, শস্য, ফল, ফুল পাতাবাহার উদ্ভিদের ছত্রাকজনিত রোগ ইহাদের ব্যবহারে দমন করা যায়।

পারদ গঠিত (Mercury compounds): অজৈব পদার্থগুলির মধ্যে $HgCl_2$ এবং Hg_2Cl_2 উল্লেখযোগ্য। ইহা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় (0 1%) বীজ অথবা বীজ হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ শোধনে, মাটি শোধনে, ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকজনিত রোগ দমনে বিশেষ কার্যকর।

পারদ গঠিত জৈব যৌগগুলির যথা, ফিনাইল মারকারী এ্যাসিটেট এবং ফিনাইল মারকিউরিক ইউরিয়া বীজশোধন এবং নানা উদ্ভিদের পাতায় ছিটানোর ফলে রোগ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

অন্যান্য পদার্থ (Other compounds): বেনজিন গঠিত পেন্টাক্লোরো নাইট্রো বেনজিন (সংক্ষেপে PCNB) নানা শাকসব্জীর রোগে ও মাটি শোধনে অতিশয় কার্যকর। ইহা ছাড়া হেটেরোমাইক্লিক যৌগের মধ্যে (captan) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। Rust ও mildew জনিত রোগ ছাড়া প্রায় অন্য সমস্ত ছত্রাকজনিত রোগে বিশেষভাবে পাতা ও ফলের রোগ প্রতিষেধক হিসাবে ইহা বিপুল ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া মাটি ও বীজশোধনে ইহা বিশেষভাবে কার্যকর।

এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার দ্বারা (Antibiotics): আজকাল উদ্ভিদরোগ প্রতিরোধে নানাপ্রকার এ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। Crown gall, fire blight প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগে স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin Streptomyces gresin), বা টেরামাইসিন বা Terramycin বিশেষ কার্যকর। গ্রিসিওফালভিন (griseofulvin) অথবা অরিওফানজিন (Aureo-

fungin) নামক ছত্রাক হইতে সংগ্রহীত এ্যান্টিবায়োটিক নানা ছত্রাকজনিত রোগ দমনে বিশেষ সুফলদায়ক।

ধান গাছের পাতার দাগ রোগ (Brown spot disease of rice)

পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে ধান চাষ হয় তার প্রায় সর্বত্রই ছত্রাকজনিত Brown spot রোগ .দেখা যায়। ভারতে প্রায় সমস্ত ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলেই বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে প্রায়শঃই এই রোগ দেখা যায়। ১৯৪২/৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় যে খাদ্যাভাব এবং ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার কারণ ধানের এই রোগ। কেবলমাত্র অনুকূল আবহাওয়ায় এই রোগ মহামারী আকারে দেখা যায় অন্যথায় ইহার ফলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী মারাত্মক হয় না।

রোগের লক্ষণ (Symptoms) :

প্রথমে পাতা ও পাতার গোড়ায় ছোট ছোট গোল অথবা ডিম্বাকৃতি বাদামী রঙের ফোঁটার ন্যায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে ঐ ফোঁটাগুলি একত্রিত হইয়া বড় বড় অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। ধানগুলির গায়েও অনুরূপ ফোঁটা দেখা যায়। অনেক সময় এই ছত্রাক বীজে অন্তর্নিহিত থাকে। ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গমন ব্যাহত হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় রোগাক্রান্ত ধানগাছে ধানের পরিমাণ অনেক সময় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causal organism) :

এই রোগের কারণ যে ছত্রাক তাহার কনিডিয়াম বহনকারী অবস্থার নাম *Helminthosporium oryzae* (Fam. : Dematiaceae ; Order : Moniliales, Class : Deuteromycetes)। ইহার যৌন জনন ফলে এসকাস ও এসকোসস্পোর সৃষ্টিকারী অবস্থার নাম *Co.hliobolus miyabianus.*

হোস্ট দেহের অন্তর্কোষীয় অথবা কোষমধ্যক অনুসূত্র হইতে উৎপন্ন বহুকোষী কনিডিওফোর (150—160 μm লম্বা) পাতার বহিঃত্বক ভেদ করিয়া অথবা পাতার রন্ধ্র (stoma) মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। প্রতি কনিডিওফোর অগ্রভাগে একাধিক কনিডিয়াম বহন করে। প্রতিটি কনিডিয়াম বাদামী, লম্বা, ৮—১০ কোষবিশিষ্ট, মধ্যভাগ ঈষৎ স্ফীত এবং দুইধার অপেক্ষাকৃত সরু (১১—১৮ × ৫০ – ১০০ μm)। প্রতিটি কনিডিয়াম অংকুরিত হইবার কালে বিশেষতঃ দুইটি প্রান্তিক কোষ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়।

যৌন জননের সময় এই ছত্রাকের গোলাকার অস্টিওল ছিদ্রসম্বলিত বাদামী রংয়ের দেওয়ালযুক্ত পেরিথিসিয়া সৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যকার এসকাসগুলি লম্বা এবং সামান্য বক্র (২১ – ৩৬ × ১৪২ — ২৩৫ μm)। প্রতিটি এসকাসের মধ্যে ৪—৬টি লম্বা ৬ – ১৫ কোষবিশিষ্ট স্বচ্ছ এসকোসস্পোর সৃষ্টি হয়।

রোগচক্র (Disease Cycle) :

এই রোগ প্রধানতঃ বীজবাহিত। সামান্য রোগাক্রান্ত বীজ অংকুরিত হইলে চারাগাছে ব্লাইট রোগ দেখা যায়। ইহাই রোগের প্রাথমিক উৎস হিসাবে রোগবিস্তারে সাহায্য করে। এই চারা গাছের পাতা ও কলিওপটাইলের উপর সৃষ্ট ক্ষতে কনিডিয়াম সৃষ্টি

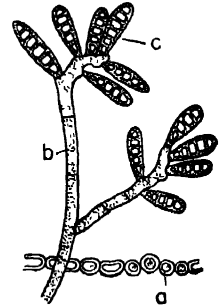
হয়। ঐ কনিডিয়াম বাতাসে বাহিত হইয়া অন্য সুস্থ ধান গাছে পড়ে এবং অঙ্কুরিত হইয়া রোগসৃষ্টি করে। ২৫—৩০° সেণ্টিগ্রেড এবং শতকরা ৯০ ভাগ বাতাসে আর্দ্রতা রোগ সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক। প্রকাশ্য সূর্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ হোস্টদেহের কলায় এই ছত্রাকের প্রসারে সহায়তা করে। ধানগাছের ফুল ফোটার সময় গাছগুলির রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রোগসৃষ্টি সবচেয়ে বেশী হয়। তাছাড়া গাছে নাইট্রোজেন সারের আধিক্য হইলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

রোগের প্রতিকার (Disease control)

রোগটি বীজবাহিত হওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ বীজ অথবা ছত্রাকনাশক রাসায়নিক দ্রব্য (Agrosan or Coresan প্রতিগ্রাম/প্রতিপাউন্ড বীজ) দ্বারা শোধিত বীজ ব্যবহারে রোগ অনেকাংশে নিরোধ হয়। ভিজা ধানকে ৫২—৫৪° সেঃ কিছু সময় তাপ দ্বারা শোধন করিলেও রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

মাটিতে অবস্থানকারী ছত্রাক হইতেও প্রাথমিক পর্যায়ে গাছে এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে চারা অবস্থায় ধানগাছে ছত্রাকনাশক রাসায়নিক পদার্থ ছিটানো প্রয়োজন। চারা তৈয়ারীর মাটি শোধন করিয়াও বহুলাংশে এই রোগ প্রশমিত করা যায়।

এই রোগে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল রোগপ্রতিরোধক ধান প্রজাতির চাষের মাধ্যমে। BAM-১০, CO-২০, T-১৪০, T-১৪১, চীনা ৪৭, ৯৭২, ৯৮৮, রুশ ৫, ৮৯৫ এবং HR ৪৭ উল্লেখযোগ্য রোগপ্রতিরোধক ধান প্রজাতির উদাহরণ।



হেলমিনথোস্পোরিয়ামের কনিডিয়া: a=ক্ল্যামাইডোস্পোর, b=কনিডিওফোর, c=কনিডিয়াম।

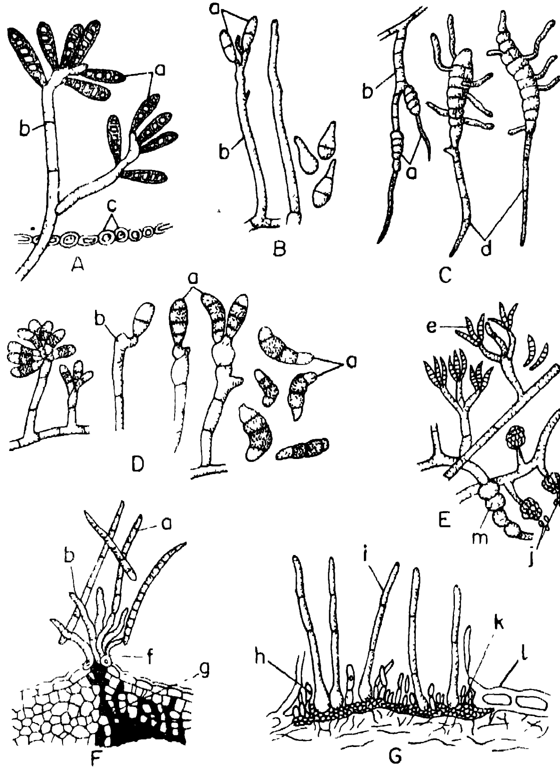
পাটগাছের কাণ্ডের পচন রোগ (Stem rot of jute)

পাঠগাছের ফ্লোয়েমগঠিত আঁশ হইতে মানুষের নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই পাট রপ্তানী করিয়া ভারত প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিয়া থাকে। পাটগাছের কাণ্ডের পচনরোগ বা stem rot, আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার যে যে স্থানে পাটের চাষ হয় সেই সমস্ত স্থানে বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়। এই রোগের ফলে পাটে আঁশ পরিমাণগত ও উৎকর্ষতা উভয় দিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

রোগের লক্ষণ (Symptoms) :

যে কোন বয়সে পাটগাছে এই রোগ দেখা যায়। চারা অবস্থায় বীজপত্রের উপর কালো ক্ষত (lesions) দেখা দেয়। অত্যধিক আর্দ্রতায় এবং অনুকূল পরিবেশে এই ক্ষত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং চারা গাছ হঠাৎ শুকাইয়া যায় (damping-off)। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক (৪/৫ মাস বয়স) উদ্ভিদে পাতার আগায়, কিনারায় মধ্যশিরা ইত্যাদিতে কালো কালো ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডের পর্ব আক্রান্ত হয় এবং পর্বের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। অনেক সময় ক্ষত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উদ্ভিদের

বল্কল খসিয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত রোগগ্রস্ত উদ্ভিদের পাতা অকালে ঝরিয়া যায় এবং পাটগাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। পাটের আঁশের পরিমাণগত ও উৎকর্ষতাগত ক্ষতি হয়। অনেক সময় এই রোগ কাণ্ড হইতে ক্রমশঃ মূলের দিকে বিস্তার লাভ করিলে উদ্ভিদের শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। পাটের পুষ্পমঞ্জরী আক্রান্ত হইলে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণের হয় এবং বীজগুলি ক্ষুদ্রাকার ও বর্ণহীন (discoloured)। রোগাক্রান্ত



A—হেলমিনথোস্পোরিয়াম, a = কনিডিয়া, b = কনিডিওফোর, c = ক্ল্যামাইডোস্পোর ; B—পাইরিকিউলেরিয়া, কনিডিয়া ও কনিডিওফোর ; C—অলটারনেরিয়া, a = কনিডিয়া, অঙ্কুরিত কনিডিয়া ; D—কারভিউলেরিয়া, a = কনিডিয়া b = কনিডিওফোর ; E—ফিউজেরিয়ার, e = কনিডিয়া, m = ক্ল্যামাইডোস্পোর ; F—সাকোস্পোরা, a = কনিডিয়া, b = কনিডিওফোর, f = স্ট্রোমা, g = হাইফা ; G—কলেটোট্রিকাম, i = সিটা, h = কনিডিয়া, k = হাইফা, l = আশ্রয় উদ্ভিদ ত্বক্।

মূল, কাণ্ড ও অন্যান্য পচনশীল অংশে এই ছত্রাকের পিকনিডিয়াম নামক কনিডিয়াম সৃষ্টিকারী বিশেষ অঙ্গের সৃষ্টি হয়।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causal organism)

রোগসৃষ্টিকারী এই ছত্রাকের নাম Macrophomina phaseolina (Fam. :

Sphaeropsidaceae, Order : Sphaeropsidales, Class : Deuteromycetes)। ছত্রাকের অনুসূত্রগুলি পাটগাছের দেহের সমস্ত প্রকার কলা বিশেষভাবে ত্বক্‌কোষ এবং কর্টেক্স মধ্যে অন্তর্কোষীয় অথবা কোষমধ্যক ভাবে বিস্তার লাভ করে। এই অনুসূত্র হইতে উদ্ভূত পিকনিডিয়াম (Pycnidium)-গুলি ত্বক্‌কোষের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। পিকনিডিয়ামের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র (১৬—২৭×৬—১০ μm) ডিম্বাকৃতি, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এককোষী অযৌন পিকনোস্পোর সৃষ্টি হয়। অনুসূত্র হইতে কাল, গোলাকার নানা আয়তনের (৪০—১১০ μm ব্যাস) বহুকোষী স্থূল প্রাচীরযুক্ত স্কেলেরসিয়াম (sclerotium) সৃষ্টি হয়। প্রতিকূল পরিবেশে এইগুলির কোন ক্ষতি হয় না এবং অনুকূল আবহাওয়া পাইলে অংকুরিত হইয়া নতুন ছত্রাক সৃষ্টি করে।

রোগ চক্র (Disease cycle)

ছত্রাকটি facultative হওয়ায় মাটির মৃত জৈবিক উপাদানে জীবিত থাকিতে সক্ষম। ইহা ছাড়া, আলু তূলা, তামাক, বেগুন, লেগুম প্রভৃতি নানা উদ্ভিদের রোগসৃষ্টি করিয়া ছত্রাকটি সারা বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাছাড়া ইহার স্কেলেরসিয়ামগুলি প্রতিকূল আবহাওয়া অতিক্রান্ত করিতে সক্ষম।

রোগের প্রতিকারক (Disease control)

রোগটি কখন কখন মাটি বাহিত, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বীজবাহিত। ছত্রাকটি বীজমধ্যে অন্তর্নিহিত থাকায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বীজ শোধন বিশেষ কার্যকর হয় না। যে সমস্ত স্থানে রোগের প্রকোপ কম সেই স্থান হইতে সংগৃহীত রোগমুক্ত, সবল বীজের ব্যবহার রোগের প্রকোপ কমাইবার একটি বিশেষ উপায়। পাটক্ষেতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং উপযুক্ত সারের ব্যবহারে পাটগাছ সবল রাখিলে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা অনেকাংশে সম্ভব। ইহা ছাড়া রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির ব্যবহার দ্বারা রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব।

গম গাছের কালো রাস্ট রোগ

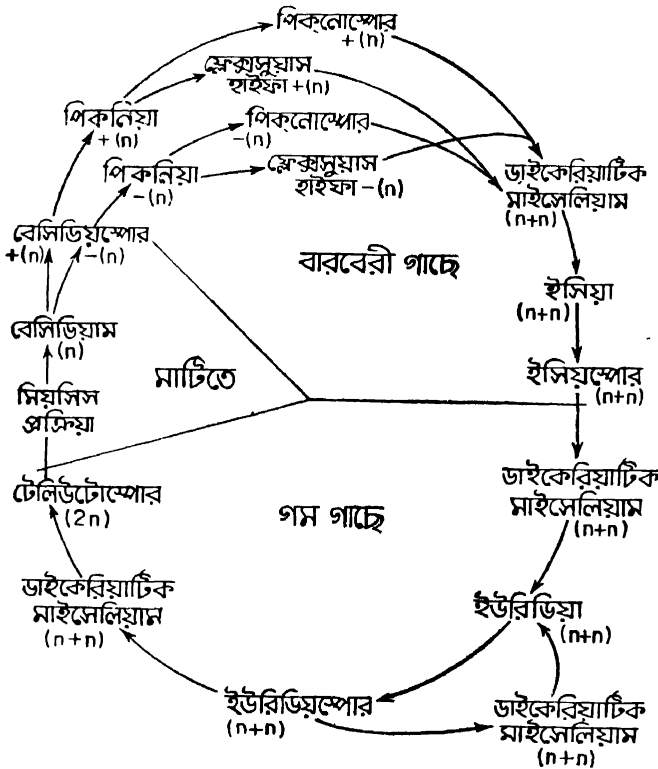
পৃথিবীতে প্রধান খাদ্য শস্য হিসাবে গম সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। খাদ্য শস্য হিসাবে ভারতে ধানের পরই গমের স্থান। যদিও উত্তর ভারতে গম চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলন আজকাল অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেই কম বা বেশী পরিমাণে গম চাষ শুরু হইয়াছে। গম গাছের প্রধান রোগগুলির মধ্যে ছত্রাকজনিত রাস্ট (rust) ও স্মাট্ (smut) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ভারতে যে সমস্ত প্রদেশে গম চাষ হয় সেখানেই রাস্টরোগ দেখা যায়। উত্তর ভারতে সচরাচর মার্চ মাসে যখন গমগাছ প্রায় পাকিয়া আসে সেই সময় এই রোগের আক্রমণ হওয়াতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। দক্ষিণ ভারতে ইহা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ছোট ছোট গম গাছ আক্রান্ত হওয়ার ফলে শস্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়।

রোগের লক্ষণ (Symptoms of the disease): পাতা, পাতার গোড়া, ফুলের অংশে বর্ণহীন ক্ষতের ন্যায় রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইগুলিই

পরে বাদামী বর্ণের ইউরিডোসোরাসে (uredosorus) পরিণত হয়। মাঝে মাঝে নিকটস্থ ইউরিডোসোরাস মিশিয়া একত্রিত হইতে দেখা যায়। পরে ইউরিডোসোরাসের আবরণ চূর্ণ করিয়া ইউরিডোস্পোর (uredospore) বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। ঋতুর শেষে একই পাতায় ঘনবাদামী অথবা কৃষ্ণবর্ণের টেলিউটোসোরাস (teleutosorus) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় উদ্ভিদদেহের কৃষ্ণবর্ণের ক্ষতচিহ্ন বহুদূর হইতে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। রোগের প্রকোপ অত্যধিক হইলে সম্পূর্ণ গমগাছ অথবা মঞ্জরীগুলি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে।

রোগের জীবাণু (Causal organism) : রোগসৃষ্টিকারী এই ছত্রাকটির নাম *Puccinia graminis triti* (Family : Pucciniaceae ; Order : Uredinales, Class : Basidiomycetes)। ছত্রাকটি obligate ধরণের পরজীবী হওয়ায় ইহাকে কেবলমাত্র জীবন্ত গমগাছে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু মৃতজীবী হিসাবে জৈব উপাদানে



পাকসিনিয়ার জীবনচক্র

ইহার কৃষ্টি সম্ভব নয়। এই ছত্রাকের জীবনচক্র পাঁচ প্রকারের স্পোর সৃষ্টি হয় এবং দুইটি বিভিন্ন হোস্ট, গম ও বারবেরী উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। গমগাছের পাতার উপর বাদামী বর্ণের এককোষী, দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত ইউরিডোস্পোর এবং কৃষ্ণবর্ণের দ্বিকোষ বিশিষ্ট (প্রতি কোষে দুইটি নিউক্লিয়াসযুক্ত) টেলিউটোস্পোর সৃষ্টি হয়।

টেলিউটোস্পোর মাটিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত হয় এবং বেসিডিয়াম সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যকার নিউক্লিয়াস দুইটি মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস পরে মায়োসিসের মাধ্যমে চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয় এবং বেসিডিয়ামটি প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা চারিটি একনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে বিভক্ত হয়। প্রতি কোষ হইতে একটি স্টেরিগমা ও একটি বেসিডিওস্পোর বাহির হয় এবং কোষের নিউক্লিয়াসটি বেসিডিওস্পোরে স্থানান্তরিত হয়।

এককোষী, ক্ষুদ্রাকার, একনিউক্লিয়াসযুক্ত এই বেসিডিওস্পোর দ্বিতীয় হোস্ট বারবেরীর পাতায় অঙ্কুরিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করে। বারবেরী গাছের পাতার উপরিভাগে কালক্রমে ছোট ছোট কলসীর আকারের পিকনিয়া (pycnia) ও ইহার মধ্যে এককোষী অতিক্ষুদ্রাকার পিকনোস্পোর সৃষ্ট হয়। পাতার নিচে পেয়ালার আকারে ইসিয়ার (aecia) মধ্যে দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত ইসিওস্পোর সৃষ্টি হয়। এই ইসিওস্পোর গম গাছের পাতায় অঙ্কুরিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করে এবং পরে ইউরিডোসোরাস উৎপন্ন করে।)

রোগের প্রতিকার (Disease control) :

(১) রোগপ্রতিরোধক গমপ্রজাতি সৃষ্টি এবং তার ব্যবহারই এই রোগ প্রতিকারের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায়। গমের NP-700, NP-800, সোনালিকা প্রভৃতি রাস্ট রোগ প্রতিরোধক প্রজাতি এই রোগ প্রতিকারে বিশেষ কার্যকর।

(২) রাস্টের জীবনচক্রের এই অংশ বারবেরী উদ্ভিদের সহিত যুক্ত। বারবেরী একটি অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ হওয়ার জন্য ইহা সরাইয়া ছত্রাকের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করিতে বাধা সৃষ্টি দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব।

(৩) ভারতে পাহাড়ী অঞ্চলে গমচাষ বন্ধ করিয়াও এই রোগের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব।

(৪) গম চাষের সময়ের সামান্য রদবদল করিয়া এই রোগের প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। ইহা ছাড়াও উপযুক্ত পরিমাণে সুসম সার ব্যবহারে উদ্ভিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বারা রোগের কিছুটা প্রতিকার করা সম্ভব।

(৫) যদিও গন্ধকের গুড়া এবং চুণ ও গন্ধক মিশ্রণ সপ্তাহে একবার ছিটানোর ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে, তবুও এই ব্যয়সাধ্য উপায়ের বিশেষ প্রচলন নাই। ইহা ছাড়াও Dithane Z-78, Dithane M-22 প্রভৃতি আধুনিক ছত্রাকনাশক রাসায়নিক ব্যবহার রোগের প্রকোপ হ্রাস করিতে সক্ষম।

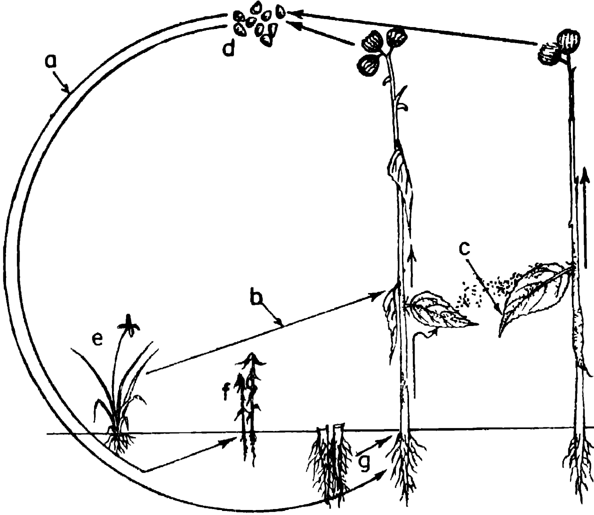
পাটগাছের কাণ্ডের পচন রোগ (Stem rot of jute)

পাট **টীলিয়েসী** (Tiliaceae) গোত্রীয় এবং **কর্কোরাস** (Corchorus) গণভুক্ত উদ্ভিদ। বয়নতন্তুর মধ্যে ইহারা অন্যতম এবং **কর্কোরাস ক্যাপসুলারিস** (C. capsularis) এবং **কর্কোরাস অলিটোরিয়াস** (C. olitorius) নামক প্রজাতি হইতেই উৎকৃষ্ট প্রকৃতির পাট উৎপন্ন হয়। পাট গাছের কাণ্ডের **ফ্লোয়েম** (phloem) তন্তু হইতে পাট পাওয়া যায়। পাট-তন্তুর সাহায্যে দড়ি, কার্পেট, চটের থলি, বস্তা, মোটা

কাপড় এবং একপ্রকার সিল্ক ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। উভয় প্রজাতির পাটগাছই উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে চাষ করা হইয়া থাকে। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে মাঝারি পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং ২৬-২৮° সেণ্টিগ্রেড আর্দ্র উষ্ণতায় উদ্ভিদগুলির সুষ্ঠু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধিক কর্দমাক্ত অথবা বালুকাময় ছাড়া যে কোন মৃত্তিকায় উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকিলে ইহারা জন্মাইতে পারে। হেক্টার প্রতি প্রায় ১৫—২৫ মণ পর্যন্ত পাট পাওয়া যায় এবং ভারতে প্রায় প্রতি বৎসর সাত লক্ষ টনের মত পাট উৎপাদন হয়। আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর পাট রপ্তানীর ফলে প্রচুর পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা আয় হয়।

ভারতবর্ষে পাটগাছের মূল এবং কাণ্ডের পচন রোগই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এবং ইহার ফলে উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি হয়।

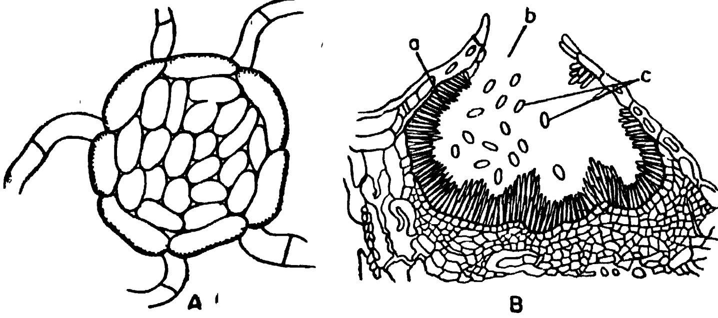
রোগের লক্ষণ (Symptoms): উদ্ভিদের জীবনচক্রের যে কোন অংশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণরূপে উদ্ভিদের ভ্রূণ এবং বীজপত্রের উপর সরুসরু কালো দাগ দেখা যায়। অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ বাতাসের আর্দ্রতা অধিক থাকিলে এই ক্ষত স্থানগুলি বৃদ্ধিলাভ করে এবং চারাগাছ-গুলিকে বিনষ্ট করে। কোন কোন সময় এই রোগের বিস্তার খুবই অল্প সময়ের মধ্য হইয়া থাকে বলিয়া উহাকে **ড্যাম্পিং রোগ** (Damping-off) বলা হয়। পরিণত



পাটগাছের মূল ও কাণ্ডের পচন রোগ সৃষ্টিকারী ম্যাক্রোফোমিনা ফেসিওলির জীবন-ইতিহাস
a = প্রাথমিক রোগ সংক্রামণ, b = মাধ্যমিক রোগ সংকামণ, c = পাতা হইতে পিকনিওস্পোরের বিস্তার, d = রোগাক্রান্ত বীজ, e = একান্তর পোষক, f = রোগাক্রান্ত চারাগাছ, g = পূর্ববর্তী রোগাক্রান্ত মূল হইতে রোগের বিস্তার।

পাট গাছে এই রোগের লক্ষণ রূপে পাতার কিনারা, আগা, মধ্যশিরা এবং পত্রমূলে গাঢ় বাদামী হইতে ঘন কৃষ্ণবর্ণের ক্ষত স্থান পরিলক্ষিত হয়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক কাণ্ডের পর্ব ও পর্বমধ্য আক্রমণ করে এবং গাঢ়

বাদামী হইতে ঘন-কৃষ্ণ বর্ণের ক্ষত সমগ্র কাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে। ইহার ফলে কাণ্ডের বহিঃত্বক্ এবং বল্কল কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়ে। অপরিণত অবস্থাতেই আক্রান্ত উদ্ভিদগুলির পাতা ঝড়িয়া পড়ে এবং উদ্ভিদটি শুখাইয়া (wilt) যায়। কখন কখন কাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে এই রোগ ক্রমান্বয়ে মূলে ছড়াইয়া পড়িলে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়। রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক দ্বারা পুষ্পবিন্যাস আক্রান্ত হইলে উদ্ভিদের



A—স্ক্লেরোসিয়াম ; B—পিক্নিডিয়াম, a=কনিডিওফোর, b=অসটিওল, c=কনিডিয়া।

ক্যাপসুলজাতীয় ফলগুলি বর্ণহীন হইয়া যায় এবং বীজগুলি ক্ষুদ্র ও বর্ণহীন হয়। ছত্রাকের জনন অঙ্গ রূপে রোগাক্রান্ত মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন অংশে **পিক্নিডিয়াম** (Pycnidium) দেখা যায়। রোগাক্রান্ত ক্যাপসুলের (Capsule) উপর স্ক্লেরোসিয়াও (Sclerotia) দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Casual Organism)

(১) **অনিয়ত অবস্থা** (Imperfect Stage) : **ম্যাক্রোফোমিনা ফেসিওলি** (*Macrophomina phaseoli*)

(Class : ডিউটেরোমাইসিটিস্ ; Order : স্কেরপ্সিডেলিস্ ; Family : স্কেরপ্সিডেসি)

(২) **স্ক্লেরোসীয় অবস্থা** (Sclerotial Stage) : **রাইজক্টোনিয়া ব্যাটাটিকোলা** (*Rhizoctonia bataticola*)

(Class : ডিউটেরোমাইসিটিস ; Order : মাইসিলিয়া স্টেরিলিয়া)

রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকের বিবরণ : ছত্রাকের দেহটি প্রস্থপ্রাচীর (Septa)-যুক্ত অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। অনুসূত্রগুলি প্রস্থে ১.৫—২.৫ μm বিস্তৃত। অনুসূত্রগুলি কোষমধ্যবর্তী রন্ধ্রে অথবা কোষের মধ্যে উভয় স্থানেই পাওয়া যায়। স্ক্লেরোসিয়ামগুলি গাঢ় বাদামী অথবা কৃষ্ণবর্ণের এবং পরিধিতে প্রায় ১০০ μm পর্যন্ত হইতে পারে। পিক্নিওস্পোরগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

রোগচক্র (Disease cycle) : রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকটি মাটির জৈব পদার্থের উপর মৃতজীবীরূপে অথবা পোষকদেহে পরজীবীরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে বলিয়া ইহারা **ফ্যাকালটেটিভ পরজীবী** (Facultative Parasite) নামে অভিহিত।

ইহারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদদেহে পরজীবীরূপে বসবাস করিতে সক্ষম, যথা আলু, তুলা, বিভিন্ন প্রকার ডাল, তামাক, তিল ইত্যাদি। এই কারণে ইহাদের প্রতিকূল অবস্থা অতিবাহনকারী বিশ্রাম রেণুর (resting spore) প্রয়োজন হয় না এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই ইহারা সক্রিয় থাকে। এই রোগের বিস্তার মাটি ও বীজের দ্বারা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাথমিক রোগাক্রমণ রোগাক্রান্ত বীজের সাহায্যেই হয়। আক্রান্ত উদ্ভিদ হইতে অযৌন পীকর্ণিওরেণুর সাহায্যে রোগের বিস্তার সাধিত হয়।

রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা (Control measures): উপযুক্ত পরিমাণ সার, জল নিকাশের ব্যবস্থা, এবং চাষের ক্ষেত পরিষ্কার থাকিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হয় এবং রোগাক্রমণ হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত রোগমুক্ত বীজ এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রোগপ্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। অধুনা রোগপ্রতিরোধকারী বিভিন্ন প্রকার সংকর উদ্ভিদের চাষ করিয়াও ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস

ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)

বহু কোটি বৎসর পূর্বে কোনও আদি প্রাণ হইতে ব্যাকটিরিয়া জন্মিয়া ছিল। পূর্বে ব্যাকটিরিয়া ছত্রাক দলভুক্ত ছিল। জার্মান ছত্রাকবিদ্, এনটন্ ডি বেরি (Anton de Bary, ১৮৩১—১৮৮৮) ব্যাকটিরিয়াকে ছত্রাক হইতে পৃথক করেন এবং ইহাকে **সাইজোমাইসিটিজ** (Schizomycetes) শ্রেণীভুক্ত করেন।

সাইজোমাইসিটিজ বা ব্যাকটিরিয়া সর্বাপেক্ষা সরল উদ্ভিদ। ইহারা জলে, বাতাসে, মাটিতে এবং সকল জীবিত ও মৃত জৈব পদার্থে বাস করিতে পারে। কোন কোন ব্যাকটিরিয়া অতি-উষ্ণ বা শৈত্য অবস্থা সহ্য করিতে পারে। কোন কোন ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাস করে, ইহাদিগকে **বায়ুজীবী** (aerobic) বলে এবং কিছু সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বাস করে, উহাদিগকে **অবায়ুজীবী** (anaerobic) বলে, আবার কতক ব্যাকটিরিয়া দুই প্রকার অবস্থাতেও বাস করে।

ব্যাকটিরিয়া আকারে 3—20 μm এবং অবীজ বা ক্রিপটোগাম দলভুক্ত উদ্ভিদ। ইহারা সমাঙ্গদেহী বা থ্যালোফাইটা অন্তর্গত, সাইজোমাইকোফাইটা (Schizomycophyta) বিভাগের এবং সাইজোমাইসিটিজ শ্রেণীভুক্ত।

ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীর রং করিবার পদ্ধতি অনুযায়ী দুইটি ভাগ করা হয় :—

(১) **গ্রাম-পজিটিভ** (Gram-positive) ও

(২) **গ্রাম-নিগেটিভ** (Gram-negative)।

ব্যাকটিরিয়া নানাপ্রকার হইতে দেখা যায়, যথা এককোষী, সূত্রাকার বা শাখাযুক্ত। কোন ব্যাকটিরিয়া ফ্ল্যাজেলামযুক্ত ও সচল এবং কোন কোন ব্যাকটিরিয়া ফ্লাজেলামহীন ও নিশ্চল।

ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে হয়। ১৮৭২ সালে কোন্ (Cohn) আকার অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়াকে চারি ভাগে ভাগ করেন, যথা—(১) **কক্কি** (Cocci), (২) **ব্যাসিলি** (Bacilli), (৩) **কমাস** (Commas) ও (৪) **স্পাইরিলি** (Spirilli)।

(১) **কক্কাস** আকারে গোল এবং নানা রকমের হয়। (ক) **মাইক্রোকক্কাস** (Micrococcus) আকারে গোল ও অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথক থাকে। (খ) **ডিপলোকক্কাসে** (Diplococcus) দুইটি কক্কাস এক সঙ্গে থাকে। (গ) **স্টাফাইলোকক্কাসে** (Staphylococcus) অনেকগুলি কক্কাস আঙ্গুরের গোছার মত থাকে। (ঘ) **স্ট্রেপটোকক্কাসে** (Streptococcus) কক্কাসগুলি পর পর সাজান শৃঙ্খলের মত দেখায়।

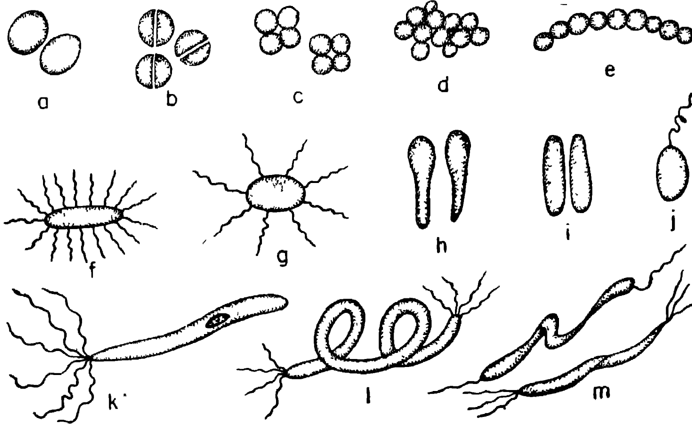
(২) **ব্যাসিলাস** (Bacillus) দেখিতে নলের মত।

(৩) **কমাস** (Comma) দেখিতে কমার মত।

(৪) **স্পাইরিলি**—ইহা দেখিতে সূতার মত এবং পেঁচানো।

ব্যাকটিরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম অনুসারে কয়েক প্রকার শ্রেণী করা হয়। যদি এক মেরুতে একটিমাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে, তাহাকে **মনোট্রিকস** (monotrichous), যথা ভিবরিও

(vibrio) ; যদি দুই মেরুতে একটি করিয়া **ফ্ল্যাজেলাম** থাকে, তাহাকে **অ্যাম্ফিট্রিকাস** (amphitrichous), যথা স্পারিলাম (spirillum) ; এক মেরুতে একগোছা থাকিলে **কেফালোট্রিকাস** (Cephalotrichous), যথা সিওডোমনাস (Pseudomonas) ; প্রতি মেরুতে একগোছা করিয়া থাকিলে **লফোট্রিকাস** (Lophotrichous) ; চারিদিক হইতে অনেকগুলি ফ্ল্যাজেলাম থাকিলে পেরিট্রিকাস (Peritrichous), যথা ব্যাসিলাস (Bacillus) ।



ব্যাকটিরিয়া : a = কক্কাস, b = ডিপলোকক্কাস, c = কক্কাস, d = স্টেফাইলোকক্কাস, e = স্ট্রেপটোকক্কাস, f, g, k, l, m = ফ্ল্যাজেলামযুক্ত ব্যাকটিরিয়া, h, i = ব্যাসিলাস, j = ফ্ল্যাজেলামযুক্ত ব্যাসিলাস ।

যদি ব্যাকটিরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম না থাকে, তাহাকে **অ্যাট্রিকস** (atrichous) বলে, যথা ডিপথিরিয়া ব্যাসিলাস (Diptheria bacillus) ।

ফ্ল্যাজেলাম একপ্রকার তন্তুময় প্রোটিন দ্বারা তৈয়ারি, ইহাকে ফ্ল্যাজেলিন (flagellin) বলে ।

পুষ্টির ভিত্তিতে চারিপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণী করা হয় :—

(১) **মেটাট্রফিক** (Metatrophic),
(২) **কেমো-অটোট্রফিক** (Chemo-autotrophic),
(৩) **প্যারাট্রফিক** (Paratrophic) ও
(৪) **ফটো-অটোট্রফিক** (Photo-autotrophic) ।

(১) **মেটাট্রফিক**—ইহারা উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত খাদ্যের উপর বাস করে । ইহারা **পরভোজী** (heterophyte) । ইহারা উৎসেচক বাহির করিয়া মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ ভাঙ্গিয়া দেয় । ইহার দ্বারা নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং অপরদিকে যৌগিক উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহ ভাঙ্গিয়া, অজৈব পদার্থ পরিবেশে ফিরাইয়া দেয় । ইহাদিগকে মৃতজীবী (Saprophyte) বলে ।

যদি মৃত জীব ছাড়াও জীবিত কোষ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহাকে **স্বেচ্ছাপরজীবী** (Facultative Parasite) বলে ।

(২) **কেমো-অটোট্রফিক**—ইহারা নিজ খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতে বাস করে। ইহারা বেশীর ভাগ বায়ুজীবী (aerobes), যথা নাইট্রোব্যাকটার (Nitrobacter)। কয়েক প্রকার বায়ুর অনুপস্থিতেও বাস করে তাহারা **অবায়ুজীবী** (anaerobes), যথা ডিসালফোভিবরিও (Desulphovibrio) ; কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা কিছু সংখ্যায় বায়ুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, উভয় ক্ষেত্রেই বাস করে যথা থিওব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিকান্স (Thiobacillus denitrificans)। ইহারা অজৈব (হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রাইটস, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) এবং জৈব (মিথেন) জারণ করে। বেশীর ভাগ অক্সিজেন অণু এই জারণ করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অজৈব অক্সাইড (নাইট্রেটস) জারকরূপে অর্থাৎ অক্সিডাইজার হিসাবে কাজ করে। ইহারা ক্লোরোফিলবিহীন বলিয়া সালোক-সংশ্লেষ করিতে পারে না। জারণ ক্রিয়ায় উদ্ভূত কিছু শক্তি ATPতে পরিণত হয়। পরে ATP, CO_2 বিজারণে ব্যবহার করে। ইহারা রাসায়নিক শক্তির দ্বারা কার্বন ব্যবহার করে বলিয়া, ইহাকে **কেমোসিনথেসিস** (Chemosynthesis) বলে।

(৩) **প্যারাট্রফিক**—ইহারা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবিত কোষে বাস করে। ইহারা নিজ উৎসেচক ও আশ্রয় কোষের নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাদিগকে **অবলিগেট পরজীবী** (Obligate Parasite) বলে।

(৪) **ফটো-অটোট্রফিক**—ইহারা নিজের খাদ্য সালোক-সংশ্লেষ করিয়া তৈয়ারি করে। ইহারা স্বভোজী এবং কোষে ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল (Bacteriochlorophyll) নামক একপ্রকার আদি-সবুজ কণিকা পাওয়া যায়। ইহারা জলের পরিবর্তে জৈব বা অজৈব যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে। ইহাদের O_2 বাহির হয় না। যথা, পার্পল ক্লোরোফিল ব্যাকটিরিয়া।

আর একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার শ্রেণীবিভাগ, উষ্ণতার উপর ভিত্তি করিয়া করা হয় ঃ—

১। মধ্য-উষ্ণতা ব্যাকটিরিয়া—মেজোফাইলিক (২০—৪৬°C),

২। তাপপ্রেমী ব্যাকটিরিয়া—থার্মোফাইলিক (৪০—৭৫°C),

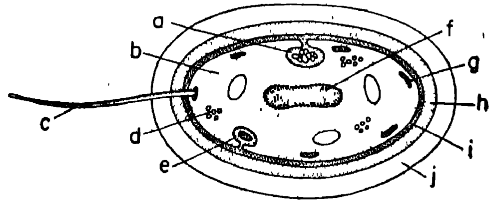
৩। শৈত্যপ্রেমী ব্যাকটিরিয়া—সাইক্রোফাইলিক ব্যাকটিরিয়া (০—৩০°C)।

ব্যাকটিরিয়ার দেহ

ইহাদের দেহ **এককোষী** তবে সূতার মত হইলে বহুকোষী। ইহাদের নিউক্লিয়াস প্রোকেরিওটিক। ইহাদের কোষে DNA ও RNA দুইটি নিউক্লিক অ্যাসিড একসঙ্গে থাকে। DNA ও RNA ব্যতীত প্রোটিন, লিপিড ও নানা প্রকার শর্করা থাকে। ব্যাকটিরিয়া ঐ সকল বস্তু তৈয়ারিও করে। ইহার নিউক্লিয় বস্তুকে নিউক্লিয়য়েড (nucleoid) বলে। ইহাদের দুইটি সূত্রে DNA অণু আবদ্ধ থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাহিরে নিউক্লিয়াসের পর্দা বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে না। মেসোজোম (mesosome), জীবাণুর শ্বাসকার্য চালায়। ইহা মাইটোকনড্রিয়ামের মত বলিয়া কনড্রিয়ড্ও বলে। কোন কোন ব্যাকট্রিয়ায় ঝিল্লী আবৃত **ক্রোমেটোফোর** (chromatophore) থাকে। ইহা সালোক-সংশ্লেষ করে।

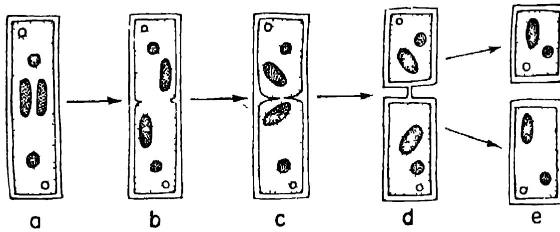
এইগুলি ছাড়া অনেক **রাইবোজোম** (ribosome) থাকে। ইহার সাইটোপ্লাজমে প্রচুর রাইবোজোম থাকে। অনেক রাইবোজোম RNA তন্তু দ্বারা যুক্ত হইয়া

পলিরাইবোজোম (polyribosome) সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়য়েড ভাগ হইবার পূর্বে DNA দ্বিগুণ হয় এবং পরে ভাগ হইয়া দূরে সরিয়া যায়। নূতন প্রাচীর তৈয়ারি করিয়া দুইটি পৃথক ব্যাকটিরিয়া জন্মায়। ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয় বস্তুতে হিসটোন (histone) অথবা অ্যাসিডিক প্রোটিন থাকে না। সাইটোপ্লাজমে দানাদার গ্লাইকোজেন, স্নেহবিন্দু, ভলিউটিন, প্রোটিন ইত্যাদি দেখা যায়।



ব্যাকটিরিয়া : a = মেসোজোম, b = সাইটোপ্লাজম, c = ফ্ল্যাজেলাম, d = চর্বি, e = ক্রোম্যাটোফোর, f = নিউক্লিয় পদার্থ, g = রাইবোজোম, i = প্লাজমা পর্দা, h = কোষ প্রাচীর, j = পিচ্ছিল স্তর।

ব্যাকটিরিয়ার প্রাচীর অ্যামিনো-অ্যাসিড ও কার্বোহাইড্রেট একত্রে গঠন করে। ইহাদের কোষপ্রাচীর RNA থাকায়, Gram-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার প্রাচীর আয়োডিন ও কৃস্টাল ভায়োলেট স্টেন (stain) দ্বারা রং করা যায়।



জনন : a, b, c d, e = দ্বিবিভাজন।

ব্যাকটিরিয়ার জনন :—

ইহা তিন প্রকারে হইতে পারে :– **(১) অঙ্গজ-জনন, (২) অযৌন-জনন** ও **(৩) যৌন-জনন**।

অঙ্গজ জনন—অবস্থা অনুকূল হইলে, নিউক্লিয়াস বস্তু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একটি প্রাচীর সৃষ্টি হয় এবং দুইটি ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয়। ইহাকে **দ্বিবিভাজন** (binary fission) বলে।

অযৌন জনন—অবস্থা প্রতিকূল হইলে অর্থাৎ খাদ্য ইত্যাদির অভাব হইলে, ব্যাকটিরিয়ার নিউক্লিয়াস বস্তুর সহিত সাইটোপ্লাজমের বাহিরে নূতন প্রাচীর তৈয়ারি করিয়া **এণ্ডোস্পোর** (endospore) সৃষ্টি হয়। এণ্ডোস্পোর দ্বারা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে, ইহার উদ্দেশ্য জনন নহে। ইহা **সারসিনা ইউরিয়ে** নামক কক্কাসে দেখা যায়। ইহার পর অনুকূল অবস্থায় ভিতর হইতে নলের মত জার্ম টিউব (germ tube) প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয়।

অ্যাজাটোব্যাকটর নামক ব্যাকটিরিয়ায় প্রাচীর নিঃসৃত করিয়া **সিস্ট** (cyst) সৃষ্টি করে। অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হইয়া নূতন কোষ উৎপন্ন করে।

যৌন জনন—সচরাচর ব্যাকটিরিয়ার যৌন জনন দেখা যায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌন জনন হয়, যথা এসচেরিসিয়া কোলাই (Escherichia coli)। ব্যাকটিরিয়ার যৌন সংযোগে দাতা কোষ হইতে DNA, গ্রহীতা কোষের DNA সহিত মিলিত হয়। ইহাকে জেনেটিক মিলন বা genetic recombination বলে। দাতা পুংকোষ হইতে DNA, একটি নলের মধ্য দিয়া স্ত্রীকোষে যায়। দাতা ও গ্রহীতা অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী কোষ দুইটিই হ্যাপ্লয়েড। ডিপলোকক্কাস নিমোনিয়েতে (Diplococcus pneumoniae) ইহা দেখা গিয়াছে।

ব্যাকটিরিয়ার উপকারিতা এবং অপকারিতা

ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগ হয়।

মানুষের ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা রোগ—

নিউমোনিয়া (Diplococcus pneumoniae), যক্ষ্মা (Mycobacterium tuberculosis), টাইফয়েড (Salmonella typhosa), কলেরা (Vibrio comma), পেটের অসুখ (Bacillus cola)।

গৃহপালিত প্রাণীর অসুখ—

গরুর যক্ষ্মা (Mycobacterium bovis), ঘোড়া, ছাগল, গরুর সেপটিসিমিয়া (Staphylococcus aureus), কৃষ্ণ পদ বা "black leg" (Clostridium chauvei), ফুসফুসের অ্যাকটিনোমাইকসেস (Actinomycoses bovis)।

ব্যাকটিরিয়া দ্বারা উদ্ভিদের রোগ—

কুমড়াজাতীয় গাছের উইল্ট (Wilt) রোগ (Bacillus tracheiphious), লেবুজাতীয় বা সাইট্রাস ক্যাঙ্কার (Xanthomonas citri), আলুর রিং রট (ring rot) (Corynebacterium sepedonicum), টম্যাটোর ক্যাঙ্কার (Corynebacterium michiganense)।

খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকারী ব্যাকটিরিয়ার উদাহরণ, স্টাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) ও সেলমোনেলা (Salmonella)।

ক্লসট্রোডিয়াম বটুলিনাম (Clostridium botulinum) পটোমেনস (Ptomaines) সৃষ্টি করিয়া খাদ্য বিষাক্ত করে। ইহার নাম বটুলিজম (botulism)।

তুলার পচন হয় স্পাইরোকিটা সাইটোফোগার (Spirochaeta cytophoga) দ্বারা। মাটির নাইট্রেট হইতে নাইট্রোজেন মুক্ত করে, সিওডোমনাস (Pseudomonas) এবং ইহাতে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। ইহাকে ডিনাইট্রিফাইং (denitrifying) ব্যাকটিরিয়া বলা হয়।

উপকারী ব্যাকটিরিয়া—

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ ভাঙ্গিয়া জটিল যৌগ পদার্থ যেমন কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন ইত্যাদির বিজারণ ঘটাইয়া পৃথিবী আবর্জনা মুক্ত হয় এবং অপরদিকে যৌগ পদার্থ হইতে অকঠিন পদার্থ বাহির করিয়া, বাতাসের ক্ষয় পূরণ করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

সালফার ব্যাকটিরিয়া, থিওব্যাসিলাই (Theobacilli) H_2S হইতে H_2SO_4 সৃষ্টি

করে। এই H_2SO_4 মাটির মধ্যে সালফেটে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় সালফেট দান করে।

ব্যাসিলাস মাইকয়েডেস, জীব দেহ ভাঙ্গিয়া অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে। মাটির ন্যইট্রোজেন বৃদ্ধি করে **নাইট্রোসোমোনাস**, অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইট ও পরে **নাইট্রোব্যাকটর** নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করে। ইহাকে নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া বলে।

তামাক ও চা পাতার ব্যবহার উপযোগী করিবার জন্য (ripening and curing) ব্যাসিলাস মেগাথিরাম (Bacillus megatherium) ব্যবহার হয়।

মেস্তা, পাট ইত্যাদি হইতে তন্তু (fibre) বাহির করা হয়, ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা পচাইয়া (retting); ক্লসট্রিডিয়াম বিউট্রিকাম (Clostridium butricum) পেক্টিক পদার্থকে ভাঙ্গিতে পারে।

মানুষের বৃহদান্ত্রে বহুপ্রকার ব্যাকটিরিয়া বাস করে এবং সুস্থ দেহে ইহারা ক্ষতি করে না। এসচেরিসিয়া কোলাই (Escherichia coli) ব্যাকটিরিয়া অন্ত্র ভিটামিন K_2 তৈয়ারি করে।

তৃণভোজী ছাগল, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীর অন্ত্রে একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সেলুলোজকে একপ্রকার উৎসেচক বাহির করিয়া উহাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে উপযুক্ত বিজারণ করিয়া, সাহায্য করে।

রাইজোবিয়ম শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি তৈয়ারি করে (root nodule) এবং বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করিয়া প্রোটিন তৈয়ারি করিতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে স্বাভাবিক সার (natural manure) বলে।

দুধ হইতে দধি করা হয়, স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস, ল্যাকটোব্যাসিলাস ইত্যাদি "ল্যাকটিক অ্যাসিড" ব্যাসিলাসের সাহায্যে। ভিনিগার (Vinegar) তৈয়ারি হয়, এসিটোব্যাকটার এসিটি (Acetobacter aceti) কোহলকে এসিটিক অম্লে পরিণত করিয়া।

ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতেও ক্ষুদ্র। কেহ কেহ মনে করেন ভাইরাস জড় ও জীবের অন্তবর্তী স্থান অধিকার করে। ইহা ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

মেয়ার (Mayer) ১৮৮৬ সালে সর্বপ্রথম ভাইরাস সৃষ্ট মোজাইক রোগের বর্ণনা করেন। ১৮৯২ সালে, আইওয়ানোস্কি দেখিলেন, মোজাইক রোগ আক্রান্ত তামাক পাতার রস জীবাণু পরিস্রাবকের (bacterial filter) ভিতর দিয়া পাঠাইলেও, ঐ রস রোগ সৃষ্টি করে। ১৮৯২ সালে বেজারনিক দেখিলেন, তামাক পাতার মোজাইক রোগের রস, ব্যাকটিরিয়া পরিস্রাবকের মধ্য দিয়া চালনা করিবার পর, ঐ রস মোজাইক রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। তিনি ইহাকে "Contagium virum fluidium নাম দেন এবং পরে ইহাকে ভাইরাস বলা হয়। ১৮৯৮ সালে, লুফলার ও ফ্রস, গৃহপালিত গবাদির "ফুট ও মাউথ" অসুখ, ব্যাকটিরিয়া পরিস্রাবকের মধ্য দিয়া চালিত হইলেও রোগ-সৃষ্টিকারী ভাইরাস রস আবিষ্কার করেন।

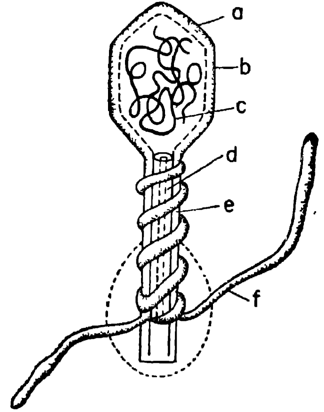
সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কিছুকাল পূর্বেও ভাইরাস অজ্ঞাত ছিল। আজকাল ইলেকট্রন অনুবীক্ষণের সাহায্যে ইহার বহু তথ্য জানা গিয়াছে।

বহু প্রকার ভাইরাস পাওয়া যায়, গোলাকার মাম্পস (mumps) নামক রোগে, রডের মত (তামাকের মোজাইক), বহুকোণের লেজযুক্ত (ব্যাকটিরিওফাজ)।

প্রকৃতি

যদিও জীবনের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, তবুও ভাইরাস আবিষ্কারের পূর্বে জীব ও জড়ের পার্থক্য সহজেই বলা যাইত। ভাইরাসের প্রকৃতি ঠিক জড় অথবা জীব, তাহা নির্দিষ্ট রূপে বলা কঠিন। ভাইরাসের স্থান, জীবাণু ও সরল উৎসেচকের মধ্যবর্তী বলা যায়। ভাইরাসের কেলাস, নিষ্ক্রিয় অণুর ন্যায়। জীবিত কোষের মধ্যে আসিলে, ইহা পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসে পরিণত হয়। তখন জীবনের মৌলিক লক্ষণ দেখা যায়। ইহা বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সাধারণ জীব যে শৈত্যে বা উষ্ণতায় মরিয়া যায়, ভাইরাসের তাহাতে ক্ষতি হয় না। ইহাদের সাইটোপ্লাজম নাই ও শ্বাসকার্য হয় না। ইহারা জীবের ন্যায় বংশ বিস্তার করে। মিউটেশন দ্বারা ইহাদের নূতন বর্ণের (strain) সৃষ্টি হয়। ইহাদের বংশগতিধারক, নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। ভাইরাস আশ্রয়দাতা কোষের খাদ্য উপাদান ও বিপাকের ব্যবস্থা নিজ প্রজননের জন্য ব্যবহার করে। ইহারা আশ্রয় কোষে অবলিগেট পরজীবী হইয়া বাস করে। ইহাদের আশ্রয়কোষের প্রাচীর ভেদ করিবার উৎসেচক থাকে কিন্তু অন্য উৎসেচক থাকে না।



জীবাণু ভাইরাস—ব্যাকটিরিওফ্যাজ : a = মাথার আবরণী, b = প্রোটিন প্রাচীর, c = ডি এন. এ. সূত্র, d = লেজের মধ্য, e = লেজ, f = লেজের সূত্র।

ভাইরাসের চলচ্ছশক্তি নাই, ইহার বৃদ্ধির নিজস্ব শক্তি-উৎস নাই। ইহার বংশ বিস্তার আছে কিন্তু জীবিত কোষে প্রবেশ করিবার পরই এই ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। ইহা অন্য জীবিত কোষে প্রবেশ করিয়া শত শত ভাইরাস সৃষ্টি করে।

অদ্যাবধি প্রায় তিনশত ভাইরাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাণী ও মানুষের রোগসৃষ্টিকারী, যথা পীতরোগ বা yellow fever, জলাতঙ্ক বা rabies, পলিমাইলাইটিস, বসন্ত, মাম্পস, জলবসন্ত।

উদ্ভিদের তামাক পাতার ও দেহের মোজাইক রোগ, টম্যাটো মোজাইক, পীচ ফলের মোজাইক রোগ ইত্যাদি। সচরাচর উদ্ভিদের ভাইরাস আকারে দীর্ঘ এবং প্রাণী ভাইরাস গোলাকার।

স্লাইডেন ও সোয়ান যে কোষ মতবাদ প্রকাশ করেন তাহা ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না এবং কোষ অভ্যন্তরে যাহা থাকে তাহাও পাওয়া যায় না। জীবিত কোষের বাহিরে

থাকিলে, ইহারা নিষ্ক্রীয় অণুর মত এবং ক্রিস্টালের আকার ধারণ করিতে পারে। জীবিত কোষে প্রবেশ করিলে, ভাইরাসে জীবের লক্ষণ দেখা যায় এবং নিজ আকারের মত শত শত ভাইরাস সৃষ্টি করে। জীবের মত প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড, ইহার মধ্যে থাকে।

ইহাদের জটিল স্বভাবের জন্য জীব-বিজ্ঞানীরা নানারূপে ইহাদের বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা জীবিত রাসায়নিক বস্তু ; কেহ কেহ বলেন কোষ নির্মিত নিম্ন শ্রেণীর পরজীবী ; আবার কেহ কেহ বলেন আদিম জীব যাহা সম্পূর্ণ কোষের আকার পায় নাই।

ইহারা বহু রোগের কারণ এবং এই সকল রোগ মারাত্মক ও সংক্রামক।

ভাইরাস আকারে এত ছোট, যে অণুর আকার পাইয়াছে। তুলনা করিলে ২000 সাধারণ মানব কোষ প্রায় ১ ইঞ্চি কিন্তু একটি মানুষের কোষে ৬ কোটি পলিমাই-লাইটিসের ভাইরাস থাকিতে পারে। ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস আকারে একটি ছোট ব্যাকটিরিয়ামের মত এবং জাপানী Encephalitis ভাইরাস প্রোটিন অণুর মত। ইহারা এত ছোট যে মাইক্রন দ্বারা মাপা হয় না।

এক মাইক্রন (micron) = $\frac{১}{১,00,000}$ মিটার এবং angstrom (Å) দ্বারা মাপা হয়।

এক Å = ১0$^{-১0}$ মিটার বা ১0$^{-৯}$ ন্যানোমিটার।

কয়েকটি ভাইরাসের মাপ :

১। বসন্ত—২৭৫ Å বা ২৭·৫ ন্যানোমিটার
২। চিকেনপক্স—১৭৫ Å বা ১৭·৫ ন্যানোমিটার
৩। মাম্পস—২৩0 Å বা ২৩ ন্যানোমিটার
৪। রেবিজ—১২৫ Å বা ১২·৫ ন্যানোমিটার
৫। ইনফ্লুইনজা-B – ১২৩ Å বা ১২·৩ ন্যানোমিটার
৬। পলিওমাইলাইটিস—২৫ Å বা ২·৫ ন্যানোমিটার
৭। পীতজ্বর—২২ Å বা ২·২ ন্যানোমিটার
৮। তামাকের মোজাইক—১৫ × ২৮0 Å বা ১৫ × ২৮ ন্যানোমিটার
৯। ব্যাকটিরিওফাজ-TI—মস্তক ৫0, লেজ –১২ × ১২0 Å বা ১২ × ১২ ন্যানোমিটার
১0। ঘোড়ার এনকেফেলাইটিস—৪২ Å বা ৪·২ ন্যানোমিটার

গঠন—সম্পূর্ণ ভাইরাসকে **ভিরিয়ন** (virion) ও প্রোটিন আবরণকে ক্যাপসিড (capsid) বলে।

সকল ভাইরাস, উদ্ভিদ, প্রাণী বা ব্যাকটিরিওফাজ, সম্পূর্ণ নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা তৈয়ারি। ভাইরাস এক বা একাধিক নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের যৌগ বস্তু। একটি আদর্শ ভাইরাসের কেন্দ্রে থাকে DNA অথবা RNA যাহা বংশানুক্রমিক গুণ বহন করে এবং চতুর্দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রোটিনের আবরণ। সচরাচর উদ্ভিদের ভাইরাসের কেন্দ্রে RNA (Ribonucleic acid) এবং প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটিরিওফাজের (যে ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে) কেন্দ্রে সচরাচর

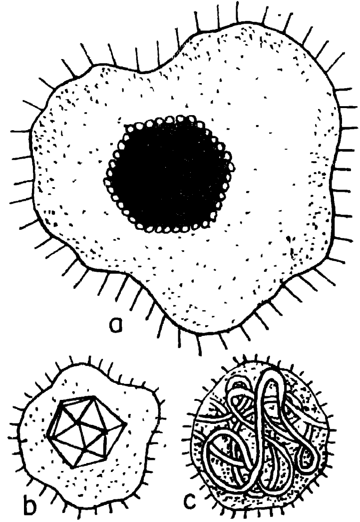
DNA (deoxyribonucleic acid) অথবা কোন কোন প্রাণী ভাইরাসে কেবল RNA.

মিউটেশন (Mutation) বা **পরিব্যক্তি**

ভাইরাসের পরিব্যক্তি করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাতে নূতন ধারা (strain) জন্মায়। পরিবর্তনের পর নূতন ভাইরাস বহুকাল স্থায়ী হয়। এই পরিব্যক্তির ক্ষমতা জীবেরই থাকে এবং জড়ের হয় না।

ভাইরাসের আক্রমণ পদ্ধতি

ভাইরাস কোষকে সোজা আক্রমণ করে। এই আক্রমণ ব্যাকটিরিয়া আক্রমণকারী **ব্যাকটিরিওফাজে** দেখা যায়। ভাইরাস আশ্রয়কোষ প্রাচীরের পর্দার সহিত মিলিত হয়। মিলনবিন্দুতে উৎসেচকের সাহায্যে কোষ আবরণের বিজারণ ঘটিয়া, একটি ছিদ্র পথ তৈয়ারি হয়। এই পথ দিয়া ভাইরাস জীব-কোষে প্রবেশ করে। ভাইরাসের ক্যাপসিড সরিয়া নিউক্লিক অ্যাসিড বাহির হয়। ভাই-রাসের DNA আশ্রয় কোষের নিউক্লিয়াস আক্রমণ করে। ইহার ফলে ভাইরাসের DNA ও আশ্রয়কোষের DNA মধ্যে যুদ্ধের মত হয়। যদি ভাইরাস DNA জয় করে, তাহা হইলে আক্রান্ত কোষের DNA এর শতকরা ৮০% ভাঙিয়া যায়। ইহা হইতে ভাইরাসের DNA পুনঃবার তৈয়ারি হয়। আশ্রয়কোষের বিপাকীয় সমস্ত কাজ, এখন ভাইরাসের DNA প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। অন্ত্রের ব্যাক-টিরিয়া এসচেরিসিয়া কোলাই (Escherichia coli) হইতে বহু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ভাইরাসের DNA প্রবেশ করিবার পর কয়েক মিনিট পরেই কয়েক, ভাইরাস DNA কয়েক বংশ নূতন ভাইরাস সৃষ্টি হয়। এই সময়কে "eclipse period" বলে এবং অঙ্গজ বর্ধমান (vegetative) অবস্থা বলে। যখন ভাইরাসের বহু প্রতিলিপি (replica) ভাইরাস সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে আশ্রয় কোষের সাইটোপ্লাজম ভাইরাসের আবরণ সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত প্রোটিনে পরিণত হয়। এই সকল আবরণ নূতন সৃষ্ট ভাইরাসের আবরণ তৈয়ারি করে। ভাইরাস ব্যাকটিরিয়ায় প্রবেশের ৩০ মিনিটের মধ্যে আশ্রয় কোষের পর্দা গলিয়া যায় (lysis) এবং প্রায় ২০০—৩০০ ভাইরাস কণা জন্মায়। এই সকল নূতন ভাইরাস এখন ব্যাকটিরিয়া আক্রমণে সক্ষম হয়।

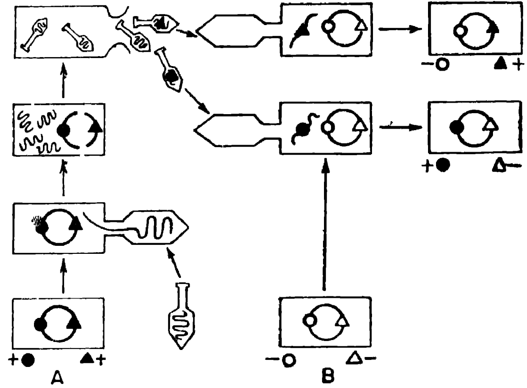


a = ভাইরাস দেহ—ক্যাপসিড কেন্দ্র, b = ভাই-রাসের কেন্দ্র ঘন ক্ষেত্রাকার, c = মাম্পস (mumps) রোগের ভাইরাসের কেন্দ্র পেঁচানো।

প্রাণীদেহ ভাইরাস আক্রান্ত হইলে, দেহে প্রতিষেধক (antibody) তৈয়ারি করে। ভাইরাসের এন্টিজেন, ইহার প্রোটিনের আবরণ হইতে তৈয়ারি হয়। বসন্ত রোগ

ভাইরাস দ্বারা হয়। প্রথম বসন্তের টীকা (টীকা = vaccine) বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৈয়ারি হইয়াছিল।

১৫০ বৎসর পূর্বে, যখন ভাইরাস আবিষ্কার হয় নাই, ইংরাজ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার, গোটীকা মানব দেহে দিয়া বসন্ত রোগী বাঁচাইয়াছিলেন। অদ্যাবধি গোবসন্তের টীকা শৈশবেই মানব দেহে প্রবেশ করাইয়া, এই মারাত্মক বসন্ত রোগ হইতে মানুষকে রক্ষা করা হয়। আধুনিক উপায়ে টীকা অন্য ভাইরাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৈয়ারি হয়, যথা পোলিও, জল বসন্ত, পীতজ্বর ইত্যাদি।



A—ভাইরাস জীবাণু কোষে প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে ব্যাকটিরিওফাজ, B—ভাইরাস ব্যাকটিরিয়া কোষে প্রবেশ করিতেছে।

ভাইরাস রোগের বিস্তার : ভাইরাস রোগের জীবকোষ আক্রান্ত রস হইতে রোগ ছড়ায়। মানুষের ইনফ্লুয়েনজা ভাইরাস রোগ, কথা, থুতু, কাশি, হাঁচি হইতে অপর লোকের হয়। ভাইরাস রোগ, কীট, পতঙ্গ, মশা (পীতজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর), মাটি, জল, বাতাস, পরাগ, অঙ্গজ জনন, প্রাণীর ক্ষতস্থান ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রোগ ছড়ায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)

ব্রায়োফাইটা একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-শ্রেণী সচরাচর ভিজা, স্যাঁতসেঁতে স্থানে জন্মায়। ইহারা পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে জন্মায় এবং বিশেষতঃ যে স্থানে প্রচুর জল পাওয়া যায়। ইহাদের জীবন-চক্রে জনুঃক্রম দেখা যায়। প্রধান উদ্ভিদটি লিঙ্গধর (gametophyte) এবং দেহ থ্যালাস অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কাণ্ড, পাতা ও রাইজয়েড নামক মূলের ন্যায় অংশ দ্বারা মাটি হইতে জল সংগ্রহ করে। পাতা ও কাণ্ডে ক্লোরোফিল থাকে এবং সালোক-সংশ্লেষ করে। ইহার লিঙ্গধর উদ্ভিদটি স্বভোজী ও স্বাধীন। ইহারা পুংধানী (antheridia) ও স্ত্রীধানী (archegonia) সৃষ্টি করে এবং উহার মধ্যে জননকোষ উৎপন্ন করে। ইহাদের জলের মাধ্যমে নিষেক হয়। নিষেকের পর উস্পোর হইতে একটি রেণুধর উদ্ভিদ জন্মায়। রেণুধর উদ্ভিদ লিঙ্গধর উদ্ভিদ হইতে খাদ্য শোষণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খাদ্য সংগ্রহ করে অথবা রেণুধর সালোক-সংশ্লেষ করিয়া কিছুটা খাদ্য প্রস্তুত করে।

ইহাদের এনথেরিডিয়া ও আরচিগোনিয়া থ্যালাসের উপর জন্মায় এবং মসবর্গে অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীতে বিটপের অগ্রভাগে জন্মায়। ইহাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু যথাক্রমে এনথেরিডিয়াম ও আরচিগোনিয়ামে জন্মায় এবং কতকগুলি বন্ধ্যা কোষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

ব্রায়োফাইটার উৎপত্তি

অধিকাংশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মনে করেন যে, "ইহারা সবুজ শৈবাল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।" উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্ট্রেইন দেখাইয়াছেন, "সবুজ শৈবালে যে ক্লোরোফিল ও জ্যানথোফিল পাওয়া যায় তাহা ব্রায়োফাইটার উদ্ভিদেও দেখা যায়।" কেহ কেহ বলেন ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা হইতে জন্মিয়াছে।

ব্রায়োফাইটার শ্রেনীবিন্যাস ঃ ইহাদের তিনটি শ্রেণী—

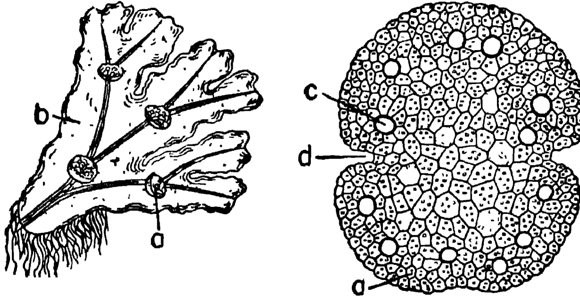
(১) **হেপাটিসি** (Hepaticae)—ইহাদের লিঙ্গধর থ্যালাসটি **বিষমপৃষ্ঠ** (dorsiventral) এবং ইহাদের কিছু কিছু উদ্ভিদ আকারে সরল, যথা—রিকসিয়া ও মারক্যানসিয়া, এবং কিছু কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা থাকে, যথা—পোরেলা। ভিতরে একই প্রকার কলা থাকে অথবা কয়েক প্রকার কলা দেখা যায়। ইহাদের জনন-অঙ্গ থ্যালাসের উপর দিকে জন্মায়। ইহাদের রেণুধর অত্যন্ত সরল হইতে পারে, যথা—**রিকসিয়া**; অথবা রেণুধর পদ, সিটা ও ক্যাপসুলে পরিণত হয়, যথা—**মারক্যানসিয়া**। রেণুধর সম্পূর্ণভাবে লিঙ্গধর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ পরভোজী (parasitic)।

(২) **এনথোসেরোটি** (**Anthocerotae**)—ইহাদের থ্যালাস বিষমপৃষ্ঠ ও সরল আকারের হয়। ভিতরদিকে একই প্রকার কলা থাকে (homogeneous)। জনন-অঙ্গগুলি থ্যালাসের মধ্যে থাকে এবং ইহারা থ্যালাসের উপরদিকে অবস্থিত। ইহাদের রেণুধরে পদ ও ক্যাপসুল থাকে। ক্যাপসুলের নিচের দিকের কলা—**ভাজককলা** (meristematic)। রেণুকলা এমফিথিসিয়াম হইতে জন্মায় কারণ এণ্ডোথিসিয়াম কলুমেলায় পরিণত হয়। ইহার উদাহরণ—**এনথোসেরস, নোটোথাইলাস**।

(৩) **মাসকি (Musci)**—ইহাদের লিঙ্গধর প্রথম অবস্থায় শায়িত (prostrate) এবং ইহার উপর কাণ্ড, পাতাযুক্ত বিটপশাখা জন্মায়। শায়িত অংশ শুকাইয়া যায় এবং বিটপ- জনন-অঙ্গ বহন করে। ইহারা সহবাসী বা ভিন্নবাসী হইতে পারে এবং এনথেরিডিয়া ও আরকিগোনিয়া কাণ্ডের অগ্রভাগে জন্মায়। ইহাদের রেণুধর উদ্ভিদে পদ, সিটা ও ক্যাপসুল থাকে। ইহাদের রেণুধর কিছুটা পুষ্টি, লিঙ্গধর হইতে গ্রহণ করে (semiparasite)। ইহার উদাহরণ—**পোগোনেটাম, ফিউনেরিয়া, বারবিউলা।**

মারক্যানসিয়া (Marchantia)

মারক্যানসিয়া একটি লিভারওয়ার্ট গোত্রীয় উদ্ভিদ। ইহা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৬৫ প্রকারের প্রজাতির মধ্যে ১১টি ভারতের প্রধানতঃ হিমালয় পর্বতে জন্মায়। ইহাদের মধ্যে মারক্যানসিয়া পলিমর্ফা (*Marchantia polymorpha*) নামক প্রজাতি ভারতে এবং পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা যায়। অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে *M. palmata* উল্লেখযোগ্য।



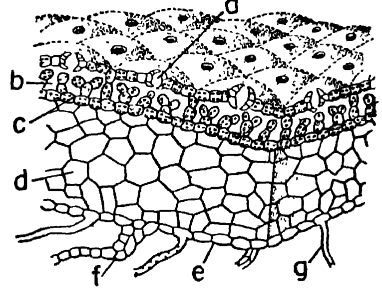
মারক্যানসিয়ার: a=গেমিকাপ, b=থ্যালাস, c=তৈলকোষ, d=খাঁজ।

দেহ (Vegetative body)

সাধারণতঃ আর্দ্র ও ছায়াঘন আবহাওয়ায় পাহাড়ের খাঁজে, ঝরণার ধারে অথবা খোলা জায়গায় ইহারা জন্মায়। মারক্যানসিয়ার দেহ থ্যালাস (thallus) গঠিত এবং চামড়ার ন্যায় চ্যাপ্টা। দ্বিশাখাগ্রবিশিষ্ট (dichotomously branched) এবং মাটির সহিত যুক্ত থাকিয়া বর্ধিত হয়। প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে খাঁজ অংশে **বর্ধনশীল** কোষ (growing point) বিদ্যমান। প্রতিটি থ্যালাসের মধ্যশিরা আছে। একটি লেন্সের সাহায্যে থ্যালাসের উপরিভাগ ভালভাবে পরীক্ষা করিলে গাঢ় সবুজবর্ণের ছোট ছোট অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিটি অংশের মধ্যভাগে একটি বায়ুরন্ধ্র থাকে। এই ছিদ্রের সাহায্যে ভিতরের বায়ু প্রকোষ্ঠে (air chamber) বাহিরের সহিত যুক্ত থাকে। থ্যালাসের নিম্নাংশ হইতে এককোষী রাইজয়েড (rhizoid) এবং বহুকোষী শল্ক (scale) বাহির হয়। রাইজয়েড দুই প্রকারের, ভিতরের প্রাচীরে ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত টিউবারকিউলেট (tuberculate) এবং মসৃণপ্রাচীরযুক্ত (smooth-walled)। ইহা ছাড়া যে একসারি শল্ক বাহির হয় তাহা স্থূল প্রাচীর-বিশিষ্ট এবং ঘন-বাদামী রঙের। অগ্রকোষের বৃদ্ধির সময় শল্কগুলি বিভক্ত হয় এবং

থ্যালাসের পশ্চাৎদিকে দুইটি সারিতে পরিণত হয়। রাইজয়েড মাটি হইতে জল ও খাদ্য শোষণ করে এবং থ্যালাসকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে। শল্কের প্রধান কার্য রাইজয়েডগুলিকে রক্ষা করা।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে থ্যালাসের লম্বচ্ছেদ পরীক্ষা করিলে সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বত্বক্ দেখা যায়। ঊর্ধ্বত্বকে বায়ুরন্ধ্র থাকে যাহা কতকগুলি কোষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। বায়ুরন্ধ্র দ্বারা নিম্নস্থ বায়ুপ্রকোষ্ঠে বায়ু প্রবেশ করে। ঊর্ধ্বত্বকের নিচের মেসোফিল দুইটি অংশে বিভক্ত। উপরের অংশটি ক্লোরোফাইলোজ (chlorophyllose zone) এবং নিম্নের অপেক্ষাকৃত মোটা অংশটিকে স্টোরেজ অংশ (storage zone) বলে। উপরের অংশের ক্লোরোফিলযুক্ত উপবৃত্তাকার (elliptical) অথবা ডিম্বাকার (ovoid) কোষগুলি উল্লম্ব থাকে (vertical tiers) দুই বা তিন-স্তরযুক্ত শাখাবিশিষ্ট হইয়া সজ্জিত থাকে। নিম্নের স্টোরেজ অংশ আট বা বারটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। এই অংশে অসংখ্য আন্তঃকোষরন্ধ্র থাকে। কোষগুলিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। স্টোরেজ অংশ একটি একস্তরবিশিষ্ট নিম্নত্বক্ (lower epidermis) দ্বারা আবৃত থাকে। এই নিম্নত্বক্ হইতে শল্ক ও রাইজয়েড বাহির হয়।



লম্বচ্ছেদ - মারক্যানসিয়ার দেহ : a = বায়ুগর্ত, b = বায়ুঘর, c = উপরের এপিডারমিস, d = প্যারেনকাইমা, e = নিচের এপিডারমিস, f = স্কেল, g = রাইজয়েড।

জনন (Reproduction)

মারক্যানসিয়ার সাধারণতঃ তিন প্রকারের জনন সাধিত হয় :

(ক) অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)—এই প্রকার জনন দ্বিশাখাগ্রবিশিষ্ট দেহের ক্রমবৃদ্ধি এবং পিছনের পুরাতন উদ্ভিদ দেহাংশ শুকাইয়া মরিয়া যাওয়ার ফলে সাধিত হয়। ফলে, দ্বিশাখার অগ্রভাগ আলাদা হইয়া নিজেরাই বৃদ্ধি পাইয়া নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে।

(খ) **অযৌন জনন** (Asexual reproduction)—বিশেষ ধরনের মুকুলের (gemmae) সাহায্যে এই প্রকার জনন হয়। থ্যালাসের উপরিভাগে অবস্থিত পেয়ালার আকারের মুকুল প্রকোষ্ঠের (gemmae cup) মধ্যকার ভূমি হইতে অনেকগুলি বহুকোষী, ডিসকয়েড, মুকুল সৃষ্টি হয়। মুকুলগুলির সহিত কতকগুলি পিচ্ছিল রোম (mucilage hairs) একত্রিত থাকে।

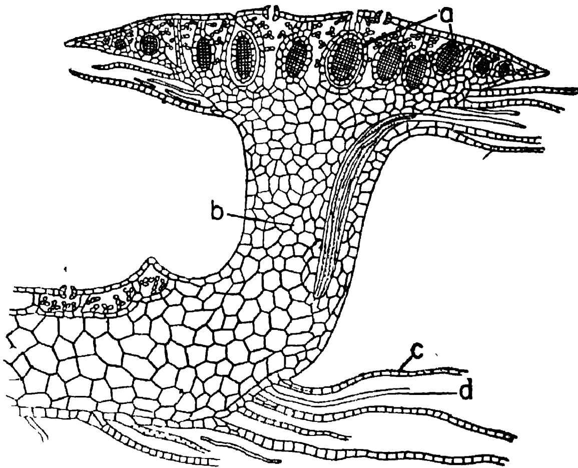
প্রতিটি মুকুল একটি এককোষী বোঁটাকোষ দ্বারা প্রকোষ্ঠের সহিত যুক্ত থাকে। চ্যাপটা মুকুলের দুই পার্শ্বের মধ্যভাগ কিছুটা চাপা (notch) থাকে। এই অংশে অগ্রকোষ বিদ্যমান। মুকুলের অধিকাংশ কোষে ক্লোরোফিল থাকে। ক্লোরোফিলবিহীন কতকগুলি কোষে তৈল জমা থাকে (oil cell) এবং অন্য কতকগুলি হইতে রাইজয়েড উৎপন্ন হয় তাহাদের রাইজয়েড কোষ বলে।

(গ) **যৌন জনন** (Sexual reproduction)—মারক্যানসিয়ার যৌন জনন পুরুষ ও স্ত্রী গ্যামীটের মিলনের মাধ্যমে উগ্যামী (oogamy) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। পুংধানীর (antheridia) মধ্যে পুরুষ গ্যামীট এবং স্ত্রীধানীর (archegonia) মধ্যে স্ত্রী গ্যামীট সৃষ্টি হয়।

মারক্যানসিয়া ভিন্নবাসী (dioecious) উদ্ভিদ হওয়াতে পুংধানী ও স্ত্রীধানী যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী উদ্ভিদে সৃষ্টি হয়। পুরুষ থ্যালাসের দ্বিশাখাগ্র অংশের উপরিভাগ হইতে এ্যানথেরিডিওফোর উৎপন্ন হয়।

এ্যানথেরিডিওফোর (Antheridiophore)

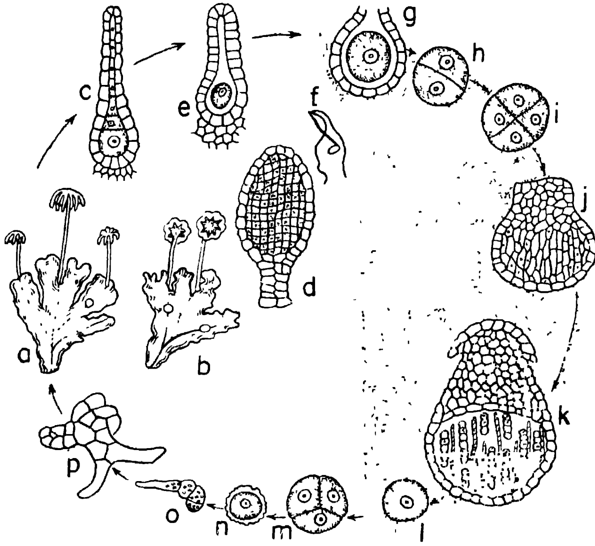
প্রতিটি এ্যানথেরিডিওফোরের একটি ২-৩ সে. মি. লম্বা বোঁটা এবং ইহার অগ্রভাগে একটি অষ্টভুজ চ্যাপটা চাকতির ন্যায় অংশ থাকে। চাকতির লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে এ্যানথেরিডিয়ামগুলি চাকতির মধ্যে এ্যানথেরিডিয়াম প্রকোষ্ঠে নিমজ্জিত থাকে। পূর্ণাঙ্গ এ্যানথেরিডিয়াম চাকতির মধ্যস্থলে এবং কনিষ্ঠতর এ্যানথেরিডিয়ামগুলি ক্রমান্বয়ে পরিধির দিকে সাজানো থাকে। দুইটি এ্যানথেরিডিয়াম প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্তী একটি বায়ুপ্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। বায়ুপ্রকোষ্ঠের মধ্যে থ্যালাসের ন্যায় ক্লোরোফিলযুক্ত কোষ উলম্বভাবে সাজানো থাকে।



মারক্যানসিয়ার এ্যানথেরিডিওফোরের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ : a = এ্যানথেরিডিয়া, b = বৃন্ত, c = স্কেল, d = রাইজয়েড।

এ্যানথেরিডিয়াম (Antheridium)—প্রতিটি এ্যানথেরিডিয়ামের একটি বহুকোষ-বিশিষ্ট বোঁটা বিদ্যমান। এ্যানথেরিডিয়াম সাধারণতঃ গোলাকার এবং এককোষস্তর পুরু আস্তরণ দ্বারা আবৃত। এ্যানথেরিডিয়ামের মধ্যে বহু সংখ্যক n ক্রোমোজোমযুক্ত হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামীট মাতৃকোষ (antherozoid mother cell) থাকে। প্রতিটি মাতৃকোষ কোনাকুনি বিভক্ত হইয়া একজোড়া ত্রিভুজাকৃতি কোষ সৃষ্টি করে। প্রতিটি ত্রিভুজাকৃতি কোষ একটি এককোষী দ্বিফ্লাজেলামযুক্ত পুংগ্যামীটে রূপান্তরিত হয়।

আরচিগোনিওফোর (Archegoniophore)—প্রতিটি আরচিগোনিওফোর একটি বৃন্ত এবং একটি তারার ন্যায় বিভক্তিত চাকতিবিশিষ্ট। তারার ছটার মধ্যবর্তী অংশে একাধিক আরচিগোনিয়াম অবস্থিত থাকে। চাকতিটির অপক্ক অবস্থায় আরচিগোনিয়ামের গ্রীবা ঊর্ধ্বমুখে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গগুলি কেন্দ্রের দিকে ও অপক্কগুলি ক্রমান্বয়ে পরিধির দিকে সজ্জিত থাকে। পরিণত অবস্থায় বৃন্তটির অগ্র বর্ধিত হইয়া চাকতির কেন্দ্রের তলদেশে ঠেলা দেয়। ফলে চাকতিটি ১৮০° ঘুরিয়া উল্টাইয়া যায়। এই অবস্থায় আরচিগোনিয়ামগুলি চাকতি হইতে ঝুলিতে থাকে এবং আরচিগোনিয়ামের গ্রীবাগুলির মুখ মাটির দিকে থাকে। পক্ক আরচিগোনিয়ামগুলি এই অবস্থায় পরিধির দিকে এবং অপক্কগুলি কেন্দ্রের নিকট অবস্থান করে।



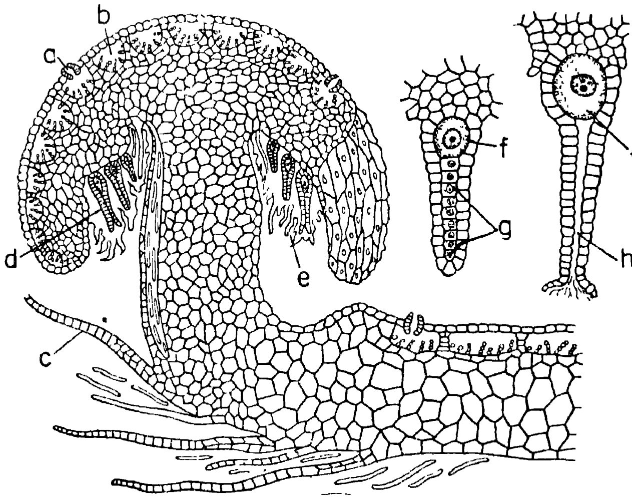
মারক্যানসিয়ার জীবনচক্র : a= স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদ, b= পুং লিঙ্গধর উদ্ভিদ, c=আর্বচিগোনিয়াম, d= এ্যানথেরিডিয়াম, e=ডিম্বাণু, f=পুং জনন কোষ, g=জাইগোট, h=দুই কোষ ভ্রূণ, i=চার কোষ ভ্রূণ, j= রেণুধর ভ্রূণ, k=রেণুধর ক্যাপসুল, l=স্পোর মাতৃকোষ, m= স্পোর টেটরাড, n=স্পোর, o= স্পোর অঙ্কুরোদগম, p=লিঙ্গধর উদ্ভিদ।

আরচিগোনিয়াম (Archegonium)— পক্ক আরচিগোনিয়ামের একটি লম্বা গ্রীবা (neck) এবং একটি স্ফীত ভেন্টার (venter) থাকে। ভেন্টারের মধ্য একটি ডিম্বকোষ (egg cell) এবং একটি ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষ (ventral canal cell) থাকে। গ্রীবার প্রাচীর ছয় থাক্ প্রাচীর কোষ দ্বারা গঠিত এবং ইহার মধ্যে চার হইতে আটটি নেক ক্যানাল কোষ (neck canal cell) থাকে।

নিষেক (Fertilization)—পরিপক্ক আরচিগোনিয়ায় ভেন্টার ক্যানাল কোষ এবং নেক ক্যানাল কোষগুলি অবলুপ্ত হয়। ইহারা শর্করাজাতীয় একটি তরল পদার্থ প্রস্তুত করে। রাসায়নিক উপায়ে ইহা পুংগ্যামীটগুলিকে আকৃষ্ট করে। সাধারণতঃ

পুংগ্যামীট সন্তরণ করিয়া আরচিগোনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুকে (egg) নিষেক করে। একটি পুংগ্যামীট কেবলমাত্র একটি ডিম্বাণুকে নিষেকে সক্ষম। নিষেকের ফলে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট পুংগ্যামীট এবং হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট স্ত্রীগ্যামীট মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট এককোষী স্পোরোফাইট বা জাইগোট সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর স্পোরোফাইট (sporophyte) আরচিগোনিয়ামের স্থূলাভিষিক্ত হয়। ভেণ্টারের প্রাচীর ক্যালিপট্রা (calyptra) নামক একটি রক্ষপ্রদ আবরণ সৃষ্টি করে। স্পোরোফাইটকে ঘিরিয়া পেরিয়েনথ (perianth) এবং ইনভোলিউকার (involucre) সৃষ্টি হয়।

নিষেকের ফলে সৃষ্ট এককোষী জাইগোট কোষের বিভাজনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট সৃষ্টি হয়। বিভাজনের সময় জাইগোট কোষটি প্রথমে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হইয়া একটি উপরের এপিবেসাল (epibasal) এবং নিচের হাইপোবেসাল (hypobasal) কোষ সৃষ্টি করে। পরে লম্বালম্বি বিভক্ত হইয়া প্রথমে চারিটি

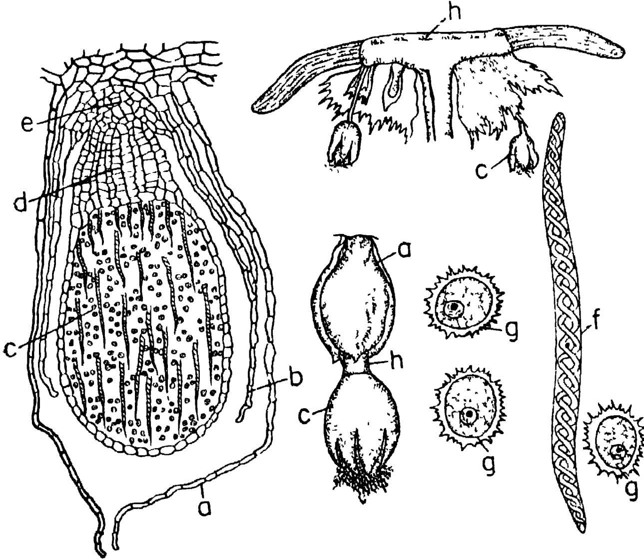


মারক্যান্সিয়া। a = বায়ুগর্ত, b = বায়ুঘর, c = স্কেল, d = আরচিগোনিয়াম, e = পেরিকিটিয়াম, f = ডিম্বাণু, g = গলার কোষ, h = নালী।

(quadrant stage) ও পরে আটটি কোষ (octant stage) সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় স্পোরোফাইটটি লম্বা হইতে থাকে। *M. polymorpha* ক্ষেত্রে হাইপোবেসাল অংশের কোষ আরো কয়েকবার বিভক্ত হইয়া স্পোরোফাইটের ফুট (foot) ও সীটার সৃষ্টি হয়। মারক্যান্সিয়ার অন্যান্য কিছু কিছু উপজাতিতে অবশ্য হাইপোবেসাল অংশ ফুট ও সীটার নিচের অংশ এবং এপিবেসাল হইতে ক্যাপসিউল ও সীটার উপরের অংশ উৎপন্ন হয়। অপক্ক ক্যাপসিউল কোষগুলি পেরিক্লিন্যাল (periclinal) উপায়ে পরিধির দিকে বিভক্ত হইরা বাহিরের এ্যাম্ফিথেসিয়াম

(amphithecium) এবং ভিতরের এণ্ডোথেসিয়াম (endothecium) অংশে রূপান্তরিত হয়। এম্ফিথেসিয়াম হইতে ক্যাপসিউলের জ্যাকেট এবং এণ্ডোথেসিয়াম হইতে আরচিস্পোরিয়াম (archesporium) সৃষ্টি হয়। আরচিস্পোরিয়াম কলা পুনরায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য স্পোরোজেনাস কোষ (sporogenous cells) সৃষ্টি করে।

পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট (Mature sporophyte)—পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট পদ (foot), সীটা (seta) এবং ক্যাপসিউল (capsule) এই তিনটি অংশে বিভক্ত। পদটি ত্রিভুজাকৃতি অথবা বালবাস (bulbous) এবং আরচিগোনিয়ফোরের চাকতির সহিত স্পোরোফাইটকে আটকাইয়া রাখে এবং খাদ্য শোষণ করে। এই স্পোরোফাইট অবস্থা খাদ্যের জন্য গ্যামীটফাইটের উপর নির্ভরশীল। সীটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং স্থূল। ইহা পদ ও ক্যাপসিউলের মধ্যে যোগসাধন করে। ক্যাপসিউল প্রায় গোলাকার এবং একস্তরকোষবিশিষ্ট জ্যাকেট দ্বারা আবৃত থাকে। স্পোরোফাইটের জ্যাকেটের



মারক্যানসিয়ার ক্যাপসুল : a = পেরিজাইনিয়াম, b = ক্যালিপট্রা, c = ক্যাপসুল, d = সীটা, e = পদ, f = ইলেটার, g = স্পোর, h = আরচিগোনিয়াম ফাটিতেছে।

অগ্রভাগের কিছু অংশ তিনস্তরকোষবিশিষ্ট হয়। অপক্ব স্পোরোফাইটের পদ, সীটা এবং ক্যাপসিউলের জ্যাকেট কোষে ক্লোরোফিল থাকায় কিছু পরিমাণ খাদ্য তৈয়ারি করিতে সক্ষম। জ্যাকেটের কোষগুলি খুব ঘনভাবে সাজানো থাকে এবং ইহাদের ভিতরের প্রাচীরে আংটির আকারে স্থূল অংশ (annular thickening) থাকে। জ্যাকেটের ভিতরে অবস্থিত স্পোরোজেনাস কোষের শতকরা ৫০ ভাগ কোষ কয়েকবার বিভক্ত হইয়া স্পোর মাতৃকোষ (spore mother cell) সৃষ্টি করে। প্রতিটি স্পোর মাতৃকোষের ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি টেট্রাড আকারে মায়োসিস বিভাজনের

মাধ্যমে যে চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে তাহার প্রতিটি হইতে একটি স্পোর সৃষ্টি হয়। চারিটি স্পোর টেট্রাড অবস্থায় কিছুকাল থাকে। অবশিষ্ট স্পোরোজেনাস কোষগুলি রূপান্তরিত হইয়া দীর্ঘ, দুইপাশ সরু ইলেটারে (elater) পরিণত হয়। ইলেটারের দেওয়ালের অংশবিশেষ সর্পিলাকারে পুরু হয় এবং আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে জল গ্রহণ করিয়া সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়।

ক্যাপসিউলের বিদারণ ও স্পোরের বিস্তার (Dehiscence of capsule and spore dispersal)

স্পোর পরিপক্ক হইলে সীটার হঠাৎ বৃদ্ধির ফলে ক্যাপসিউলটি ক্যালিপট্রা, পেরিয়েন্থ প্রভৃতি ভেদ করিয়া বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসে। এই অবস্থায় ক্যাপসিউলের প্রাচীর অগ্র হইতে লম্বালম্বি ফাটিয়া স্পোর ও ইলেটারগুলি বাহির হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় বাইস্পাইরাল (bispiral) ইলেটারগুলি শুকাইয়া সঙ্কুচিত হয় এবং হঠাৎ স্পোরগুলি বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে।

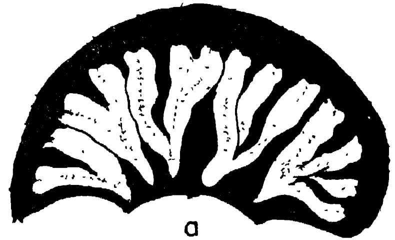
স্পোরগুলি অতি ক্ষুদ্র (0·012-0·03 mm পরিধি), গোলাকার। ইহাদের দুই-স্তরযুক্ত আবরণ থাকে। ভিতরের এণ্ডোস্পোর পাতলা এবং বাহিরের এক্সোস্পোর অপেক্ষাকৃত পুরু এবং মসৃণ অথবা কারুকার্য খচিত। স্পোরগুলি বিস্তারের অব্যবহিত পরে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে একই দিকে কোষ বিভাজনের ফলে একটি লম্বা ফিলামেণ্ট (filament) সৃষ্টি হয় এবং পরে অন্যান্য দিকে কোষ বিভাজনের দ্বারা থ্যালাসের উৎপত্তি হয়।

রিকসিয়া (Riccia)

রিকসিয়া ব্রায়োফাইটা দলভুক্ত, হেপাটিসি শ্রেণীর সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ।

রিকসিয়া বর্ষাকালে ভিজা প্রাচীর, স্যাঁতসেতে স্থানে, গোলাকার (rosette) ভাবে দলবদ্ধ হইয়া স্তরে স্তরে জন্মায়। ইহাদিগকে লিভারওয়ার্ট (liverwort) বলে।

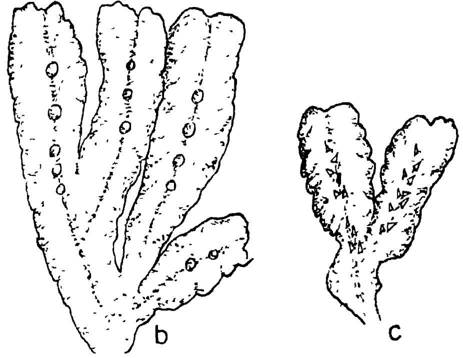
পৃথিবীতে প্রায় ১২৫টি প্রজাতি পাওয়া যায়। ইহারা স্থলে জন্মায় কেবল একটি প্রজাতি জলে পাওয়া যায়, ইহার নাম রিকসিয়া ফ্লুইটানস্ (Riccia fluitans) ; ভারতে সচরাচর রিকসিয়া ডিসকোলর (R. discolor) বা রিকসিয়া হিমালয়েন-সিস দেখা যায়।



a = রিকসিয়ার থ্যালাস।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ বা গ্যামিটোফাইট (Gametophyte)—ইহার দেহ বিষম-পৃষ্ঠ, শায়িত, চ্যাপ্টা থ্যালাস দ্বারা তৈয়ারি। ইহার থ্যালাস দ্ব্যগ্র (dichotomous) ভাবে শাখা সৃষ্টি করে। থ্যালাসের মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত। ইহার উপরতলে একটি রেখা (midrib) আছে। শল্ক ও রাইজয়েড থ্যালাসের নিম্নতলে জন্মায়।

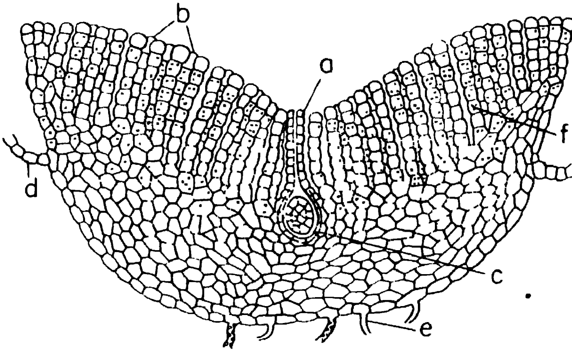
থ্যালাসের নিচের দিকে, এককস্তরের কোষনির্মিত শল্ক ও রাইজয়েড জন্মায়। রাইজয়েড মূলের কাজ করে। রাইজয়েড দুই প্রকারের—এক প্রকারে প্রাচীর মসৃণ ও আর এক প্রকারে ভিতরের প্রাচীরে কাঁটার মত (pegged) থাকে।



ভিন্নবাসী রিকসিয়া : b=স্ত্রী থ্যালাস, c=পুং থ্যালাস।

থ্যালাসের প্রস্থচ্ছেদ (T. S. of thallus)

উপরের তলে শাখাবিহীন ক্লোরোপ্লাস্টপূর্ণ কোষগুলি সূত্র গঠন করে। নিচের তলে কোষগুলি প্যারেনকাইমা দ্বারা তৈয়ারি। ইহাতে শ্বেতসার থাকিতে পারে। উপরের তলে সূত্রের মাঝে মাঝে বায়ুপ্রকোষ্ঠ (air-chamber) থাকে। সূত্রগুলির বাহিরের কোষস্তর (ফাঁকা ফাঁকা) উপরিত্বক্ (epidermis) সৃষ্টি করে। উপরিত্বকের ছিদ্রকে



রিকসিয়ার থ্যালাসের ছেদ : a = আরচিগোনিয়াম, b = ত্বকের কোষ, c = ভ্রূণ, d = স্কেল, e = রাইজয়েড।

বায়ুছিদ্র বা এয়ারপোর বলে। নিম্নভাগের কোষগুলি বর্ণহীন এবং পাঁচ-ছয়টি কোষস্তরে তৈয়ারি। বাহিরের স্তর হইতে বহুকোষী শল্ক ও এককোষী রাইজয়েড জন্মায়।

প্রজনন (Reproduction)

ইহাদের জনন দুই প্রকারে হয়—(১) **অঙ্গজ জনন** ও (২) **যৌন জনন**।

অঙ্গজ জনন—(ক) থ্যালাসের নিচে একপ্রকার অস্থানিক শাখা উৎপন্ন হইয়া মাতৃ-উদ্ভিদ হইতে পৃথক হয় এবং একটি নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

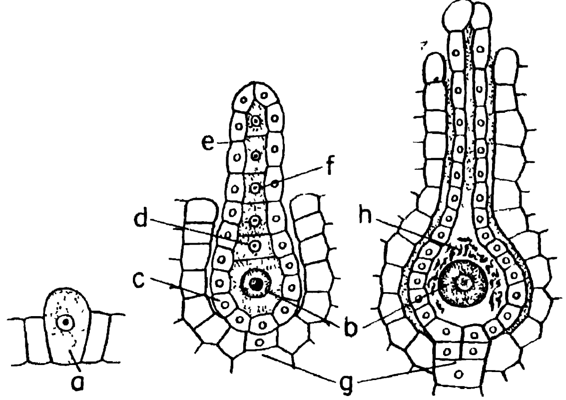
(খ) কখন কখন কন্দের মত অংশ হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়।

(গ) উদ্ভিদের পিছনের অংশ শুকাইয়া যায় এবং অগ্রভাগে দ্ব্যগ্রশাখা বৃদ্ধিলাভ করিয়া দুইটি থ্যালাস গঠন করে।

(ঘ) রাইজয়েডের অগ্রভাগ গেমার (gemma) মত মুকুল উৎপন্ন করিয়া, উহার দ্বারা নূতন থ্যালাস জন্মায়।

যৌন জনন

রিকসিয়া সচরাচর সহবাসী (monoecious) এবং কয়েকটি প্রজাতি ভিন্নবাসী (dioecious)। সহবাসী উদ্ভিদে পুংধানী ও স্ত্রীধানী একই থ্যালাসে থাকে। পুংধানী ও স্ত্রীধানী একলাইনে মাঝখানে ঢালু অংশে জন্মায়। জনন-অঙ্গগুলি একটি কক্ষের মধ্যে থাকে। পুংধানী কক্ষ ও স্ত্রীধানী কক্ষ, রন্ধ্রের দ্বারা বাহিরে খুলিয়া থাকে।

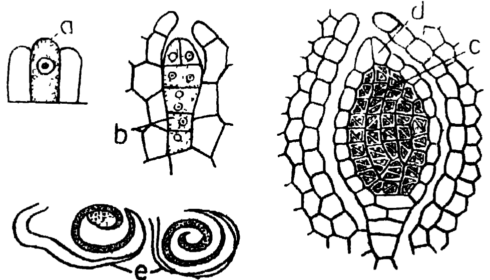


রিকসিয়া। a = আর্কিগোনিয়াম প্রাথমিক কোষ, b = ডিম্বাণু, c = ভেনটার, d = ভেনটার নালীকোষ, e = গ্রীবা, f = গ্রীবাকোষ, g = বৃন্ত, h = শুক্রাণু।

পুংধানী বহুকোষী ও আকারে ন্যাসপাতির মত। ইহার পুংধানীর মধ্যভাগে বহু শুক্রাণু মাতৃকোষ থাকে এবং বাহিরে এককোষী আবরণের স্তর দেখা যায়। পুংধানীর একটি বৃন্ত থাকে।

পুংজনন কোষগুলি বা শুক্রাণু পাকান ও দুই ফ্লাজেলাযুক্ত। পুংধানী ফাটিয়া শুক্রাণু, রন্ধ্র দ্বারা জিলাটিনের তরল পদার্থে মুক্ত হয়।

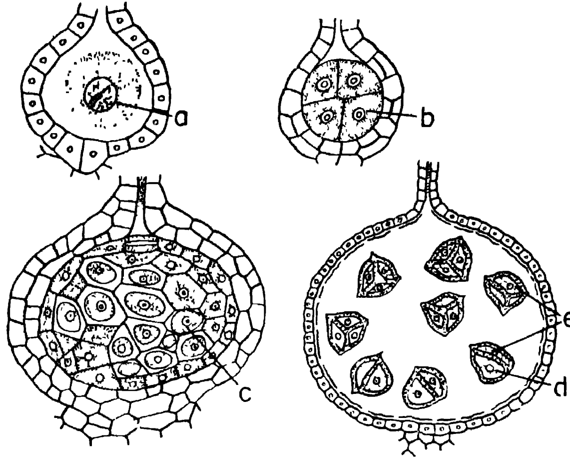
সুপক্ক স্ত্রীধানী আকারে ফ্লাস্কের মত এবং দেহকোষ অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহাদের ছোট বৃন্ত থাকে। স্ত্রীধানীর নিচের অংশকে ভেন্টার বা অংক এবং তাহার উপরে গ্রীবা (neck) থাকে। অংক দুইটি অংশ দ্বারা গঠিত। একটি অংক নালীকোষ এবং ডিম্বাণু বা ওভাম বা উস্ফিয়ার দ্বারা তৈয়ারি। গ্রীবা চারিটি নালীকোষ (neck canal cells) এবং চারিটি ঢাকনা দ্বারা গঠিত।



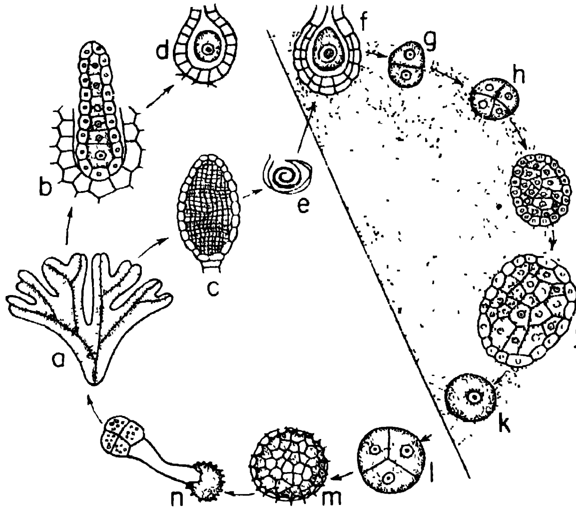
এনথেরিডিয়ামের প্রথম অবস্থা, b = বৃন্তকোষ, c = এনড্রোসাইট, d = আবরণ, e = শুক্রাণু।

নিষেক (fertilization)—স্ত্রীধানীর নালীকোষগুলি ও অংকীয় নালীকোষটি দ্রবীভূত হইয়া, একটি নালীপথ সৃষ্টি করে। নালীপথটি মিউসিলেজ তরল পদার্থপূর্ণ হয় এবং ঢাকনাকোষগুলি খুলিয়া যায়। শুক্রাণুগুলি নালীপথে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীধানীর মধ্যে প্রবেশ করে। একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাকে নিষেক

বলে। নিষেকের ফলে এককোষী জাইগোট বা ভ্রূণাণু সৃষ্টি হয়। জাইগোট হইতে ডিপ্লয়েড অবস্থা ও রেণুধর জণু (sporophyte) আরম্ভ হয়।



রিকসিয়ার রেণুধর জণুর উৎপত্তি a = পুং ও স্ত্রী নিষেক, b = জাইগোট চারিকোষে বিভক্ত, c = স্পোর মাতৃকোষ, d = স্পোর টেট্রাড ভেনটারের মধ্যে, e = স্পোর।



রিকসিয়ার জীবনচক্র : a রিকসিয়া লিঙ্গধর, b = আরচিগোনিয়াম, c = এনথেরিডিয়াম, d = ডিম্বাণু, e = পুং জননকোষ, f = জাইগোট, g = দুইকোষী ভ্রূণ, h = চারকোষী ভ্রূণ, i = রেণুধর ভ্রূণ, j = ক্যাপসুলের মধ্যে স্পোর মাতৃকোষ, k = স্পোর মাতৃকোষ, l = স্পোর টেট্রাড, m = স্পোর, n = অঙ্কুরিত স্পোর।

রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte)

জাইগোট কোষ বিভাজন করিয়া বহুকোষী স্পোরোগোনিয়াম বা রেণুধর জণু গঠন করে। স্ত্রীধানীর মধ্যে গোলাকার স্পোরোগোনিয়াম সৃষ্টি হয়। সুপক্ক স্পোরোগোনিয়ামের

ভিতর কতকগুলি রেণুমাতৃকোষ এবং উহার এককোষ স্তরের প্রাচীর থাকে। রেণু-মাতৃকোষগুলি মায়োসিস প্রণালীতে রেণু (spore) গঠন করে। স্পোরোগোনিয়ামে প্রাচীর ভাঙিয়া যাইলে রেণুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। রেণু অংকুরিত হইয়া নূতন লিঙ্গধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

জণুক্রম (Alternation of generations)

নিষেকের পর জাইগোটে দ্বিগুণ বা ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম থাকে। জাইগোট হইতে স্পোরোগোনিয়াম রেণুধর (sporophyte) অবস্থা।

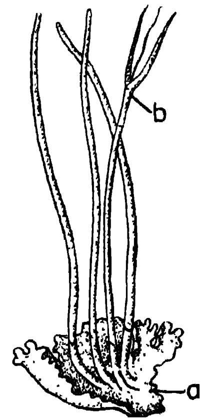
রেণু বা স্পোর হ্যাপ্লয়েড অবস্থা এবং রেণু হইতে যে থ্যালাস বা উদ্ভিদ জন্মায় তাহা লিঙ্গধর ও হ্যাপ্লয়েড। রিকসিয়ার জীবনচক্রে জণুক্রম দেখা যায়। ইহার লিঙ্গধর উদ্ভিদ স্বভোজী ও স্বাধীন কিন্তু রেণুধর স্পোরোফাইট সম্পূর্ণ গ্যামীটো-ফাইট থ্যালাসের উপর নির্ভরশীল।

এনথোসেরাস (Anthoceros)

প্রায় ২০০ প্রজাতি সম্বলিত এনথোসেরাস পৃথিবীর সর্বত্র, শীত ও গ্রীষ্ম উভয় প্রধান অংশে জন্মায়। ভারতবর্ষে প্রায় ২৫টি প্রজাতি পাওয়া যায়। প্রধানতঃ আর্দ্র ছায়াঘন পাহাড়ের খাঁজে অথবা ডোবার ধারে ইহারা জন্মায়। কোন কোন প্রজাতি পচা কাঠের উপরও জন্মায়। এনথোসেরাস হিমালয়েনসিস্ (*A. himalayensis*), লিভিস (*A. laevis*), ইরেকটাস (*A. erectus*), ফিউসিফরমিস্ (*A. fusiformis*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেহ (Vegetative body)

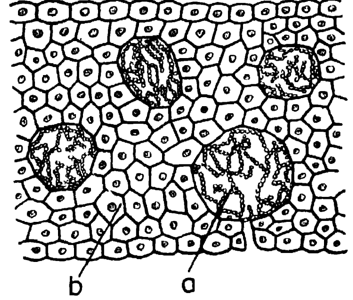
এনথোসেরাসের দেহ বিষমপৃষ্ঠ, থ্যালাসগঠিত, মণ্ডালাকার (suborbicular) এবং সাধারণতঃ খণ্ডিত প্রান্তবিশিষ্ট। ইহা রিকসিয়া ও মারক্যানসিয়া অপেক্ষা অধিকতর কম দ্বিশাখাগ্রবিশিষ্ট এবং মধ্যশিরা অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট। থ্যালাসের পৃষ্ঠদেশ (dorsal surface) সাধারণতঃ মসৃণ কিন্তু কোন কোন প্রজাতিতে অমসৃণ অথবা ভেলভেটের ন্যায়। অংকদেশে (ventral surface) কেবলমাত্র মসৃণ প্রাচীরবিশিষ্ট এককোষী রাইজয়েড বিদ্যমান, কিন্তু টিউবারকিউলেট রাইজয়েড এবং শল্ক অবর্তমান। অংকদেশ হইতে কতকগুলি নীলাভ অংশ দেখা যায় এবং এইগুলির মধ্যে নীলাভ সবুজ (blue-green) শৈবাল বাসা বাঁধে।



a = এনথোসেরস উদ্ভিদ ও b = ক্যাপসুল।

থ্যালাসের মধ্যভাগ কেবলমাত্র অল্প কয়েককোষ পুরু কিনারার দিকে ক্রমশঃ পাতলা হইয়া যায়। লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এককোষ পুরু সুস্পষ্ট উর্ধ্বত্বক এবং নিম্নত্বকের মধ্যভাগে একই ধরনের কোষবিশিষ্ট মেসোফিল পরিলক্ষিত হয়। উর্ধ্বত্বক রন্ধ্র-বিহীন। মেসোফিল কোষগুলি বহুভুজাকৃতি সাধারণতঃ আন্তঃরন্ধ্রশূন্য প্যারেনকাইমা

দ্বারা গঠিত। থ্যালাসের প্রায় প্রত্যেক কোষে একটি নিউক্লিয়াস এবং একটি বৃহৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট নানা আকারের দেখা যায় যদিও সচরাচর ইহা গোলাকার এবং চ্যাপটা। ক্লোরোপ্লাস্টের একটি প্রধান বিশেষত্ব হইল যে কোন কোন শৈবালের ন্যায় ইহার উপর একটি বৃহৎ পাইরিনয়েড (pyrenoid) থাকে। অন্য কোন ব্রায়োফাইট জাতীয় উদ্ভিদে এই প্রকার পাইরিনয়েড সম্বলিত ক্লোরোপ্লাস্ট পাওয়া যায় না। নিম্নত্বকের যে কোষগুলি হইতে রাইজয়েড বাহির হয় কেবলমাত্র সেই কোষগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। *A. pearsoni*তে প্রতি কোষে দুইটি এবং *A. hallii*তে চারিটি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।



এনথোসেরাসের লম্বচ্ছেদ. a=নসটক কলোনী, b=লিঙ্গধর থ্যালাস।

অংকদেশে অবস্থিত কতকগুলি মিউসিলেজ প্রকোষ্ঠের (mucilage cavities) মধ্যে অন্তঃবাসী নীলাভ-সবুজ শৈবাল (blue-green algae) অবস্থান করে। *Nostoc* অথবা *Anabaena* নামক এই শৈবালগুলি নিম্নত্বকে অবস্থিত মিউসিলেজ রন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করে। নিম্নত্বক হইতে উদ্ভব রাইজয়েডগুলি থ্যালাসের কেবলমাত্র মধ্য অংশে নিবদ্ধ থাকে।

জনন (Reproduction)

অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)—রিকসিয়া ও মারক্যানসিয়ার ন্যায় থ্যালাসের অগ্রভাগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এবং পশ্চাদাংশ মরিয়া পচিয়া যাওয়ার ফলে দ্বিশাখাগ্র আলাদা হইয়া থ্যালাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ইহা ছাড়া, প্রতিকূল শুষ্ক আবহাওয়ায় থ্যালাস হইতে টিউবার (tuber) সৃষ্টি হয়। থ্যালাসের অন্যান্য অংশের মৃত্যু হইলেও এই টিউবার প্রতিকূল জীবিতায় সহায়তা করে। অনুকূল আবহাওয়ায় টিউবারগুলি অংকুরিত হইয়া নূতন থ্যালাসের সৃষ্টি করে। থ্যালাসের বিভিন্ন অংশ হইতে টিউবার উৎপন্ন হয়। *A. himalayensis* প্রজাতিতে অংকদেশে বৃন্তযুক্ত টিউবার সৃষ্টি হয়। *A. tuberosus*-এর টিউবারগুলি থ্যালাসের কিনারা হইতে এবং *A. laevis* বর্ধনশীল অগ্রভাগের পিছন হইতে উদ্ভূত হয়।

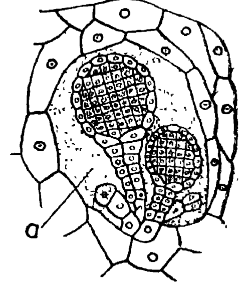
কোন কোন এনথোসেরাসের (*A. glandulosus*) পৃষ্ঠদেশে গেমী উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে *A. fusiformis* বর্ধনশীল অগ্রভাগ ছাড়া সম্পূর্ণ থ্যালাসটি শুকাইয়া যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় এই অগ্রভাগগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থ্যালাস সৃষ্টি করে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

A. erectus, *A. laevis* প্রভৃতি প্রজাতি সহবাসী (monoecious) আবার *A. fusiformis*, *A. himalayensis* প্রভৃতি ভিন্নবাসী (dioecious) উদ্ভিদ। সহবাসী প্রজাতিগুলি এনথেরিডিয়ামগুলি আগে এবং আরচিগোনিয়াগুলি পরে সৃষ্টি

হয়। এনথেরিডিয়াম ও আরচিগোনিয়াম উভয় যৌনধানীই থ্যালাসের বর্ধনশীল অগ্রভাগের পিছনে সৃষ্টি হয়। উভয় যৌনধানীই থ্যালাসের পৃষ্ঠদেশে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে।

এনথেরিডিয়াম (Antheridium)—এনথেরিডিয়াম সৃষ্টিকালে থ্যালাসের বর্ধনশীল অগ্রের ঊর্ধ্বত্বকের একটি কোষ উঁচু হইয়া উঠে এবং পেরিক্লিন্যাল বিভাজনের ফলে একটি বাহিরের এবং একটি ভিতরের অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। দুইটি কোষের মধ্যভাগে কিছু মিউসিলেজ সৃষ্টি হয় এবং পরে এই অংশ বৃদ্ধি পাইয়া এনথেরিডিয়াল প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করে। বাহিরের কোষটি বারংবার বিভাজনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বহু কোষবিশিষ্ট এনথেরিডিয়াল প্রকোষ্ঠের ছাদ সৃষ্টি করে। ভিতরের কোষটি এনথেরিডিয়াল ইনিসিয়ালে (antheridial initial) রূপান্তরিত হয় এবং এই কোষটি কোন কোন প্রজাতিতে (*A. pearsoni*) কেবলমাত্র একটি এনথেরিডিয়াম সৃষ্টি করে। আবার কখন কখন লম্বচ্ছেদ দ্বারা কয়েকটি কোষে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি কোষ হইতে একটি করিয়া এনথেরিডিয়াম সৃষ্টি করে (*A. erectus*).

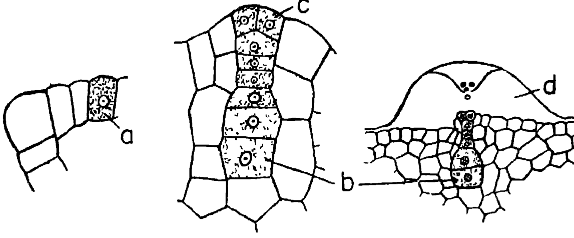


এনথোসেরাস · a – এনথেরিডিয়াম ঘর ও এনথেরিডিয়া।

প্রতিটি এনথেরিডিয়াল ইনিসিয়াল কোষ দুইবার লম্বচ্ছেদ এবং একবার প্রস্থচ্ছেদ মাধ্যমে আটটি কোষ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় নিচের চারকোষবিশিষ্ট থাক্ এবং কোষগুলি পুনঃ পুনঃ প্রস্থচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া বৃন্ত সৃষ্টি করে। উপরের চারকোষের স্তরটি পুনরায় প্রস্থে বিভক্ত হইয়া অকট্যান্ট (octant) এবং পরে পেরিক্লিন্যাল বিভাজন দ্বারা বাহিরের আটকোষী প্রাইমারী জ্যাকেট (primary jacket) এবং ভিতরের আটকোষী প্রাইমারী এনড্রোগোনিয়াল কলা (primary androgonial tissue) উৎপন্ন করে। উভয় প্রকার কোষই কয়েকবার বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত এনড্রোগোনিয়াল কোষগুলি এনড্রোসাইট মাতৃকোষে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি মাতৃকোষ কোণাকুণি বিভক্ত হইয়া দুইটি ত্রিভুজাকৃতি এনড্রোসাইট (androcyte) উৎপন্ন করে। পরে এইগুলি দুই সিলিয়াযুক্ত এনথেরোজয়েডে (antherozoid) রূপান্তরিত হয়। এনথেরিডিয়াগুলি পরিপক্ব হইলে প্রকোষ্ঠের ছাদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং এনথেরিডিয়াগুলি বায়ুর আর্দ্রতা শুষিয়া লয়। এনথেরিডিয়ার অগ্রভাগে একটি ছোট রন্ধ্র সৃষ্টি হয় এবং এনথেরোজয়েডগুলি বাহির হইয়া আসে।

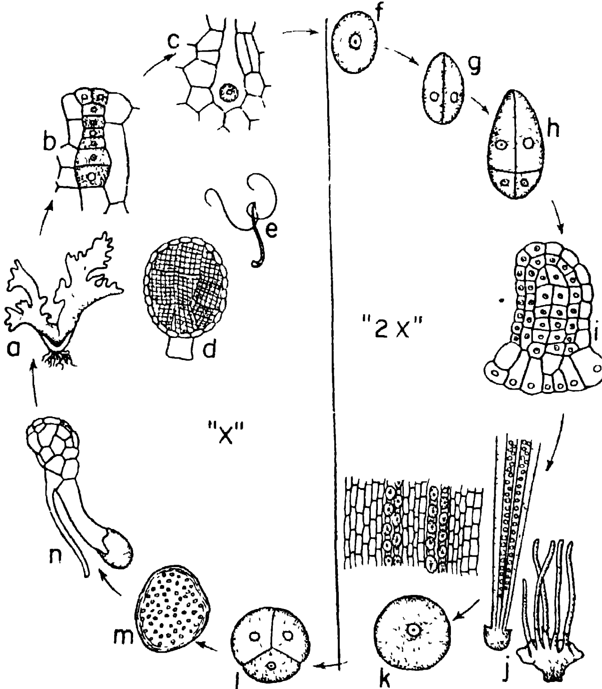
আরচিগোনিয়াম (*Archegoium*)—এনথেরিডিয়ামের ন্যায় থ্যালাসের বর্ধনশীল অগ্রভাগের ঠিক পিছনের ঊর্ধ্বত্বকের একটি কোষ আরচিগোনিয়াল ইনিসিয়াল (archegonial initial) হিসাবে কাজ করে। এই কোষটি তিনবার লম্বচ্ছেদের সাহায্যে এমনভাবে বিভক্ত হয় যে বাহিরের তিনটি জ্যাকেট ইনিসিয়াল (jacket initial) এবং কেন্দ্রে একটি প্রাইমারী এক্সিয়াল কোষ (primary axial cell) সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত কোষটি প্রস্থচ্ছেদের ফলে ভিতরের প্রাইমারী ভেণ্ট্রাল কোষ (primary ventral cell) এবং বাহিরেরটি পুনরায় বিভক্ত হইয়া একেবারে বাহিরের

কভার কোষ (cover cell) এবং ভিতরের প্রাইমারী নেক ক্যানাল কোষে (primary neck canal cell) বিভক্ত হয়। শেষোক্ত কোষটি কয়েকবার প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে ৪-৬টি নেক ক্যানাল কোষ (neck canal cell) সৃষ্টি করে। প্রাইমারী ভেণ্ট্রাল কোষ বিভাজিত হইয়া ভেণ্ট্রাল ক্যানাল কোষ (ventral canal cell) এবং



a = প্রাথমিক আরচিগোনিয়াম, b = ডিম্বাণু, c আবরণকোষ d = মিউসিলেজ।

ডিম্বাণু (egg) সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে বাহিরে জ্যাকেট ইনিসিয়াল কোষগুলি বিভক্ত হয়। আরচিগোনিয়াগুলি থ্যালাসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকাতে জ্যাকেট কোষে পরবর্তী বিভাজন সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

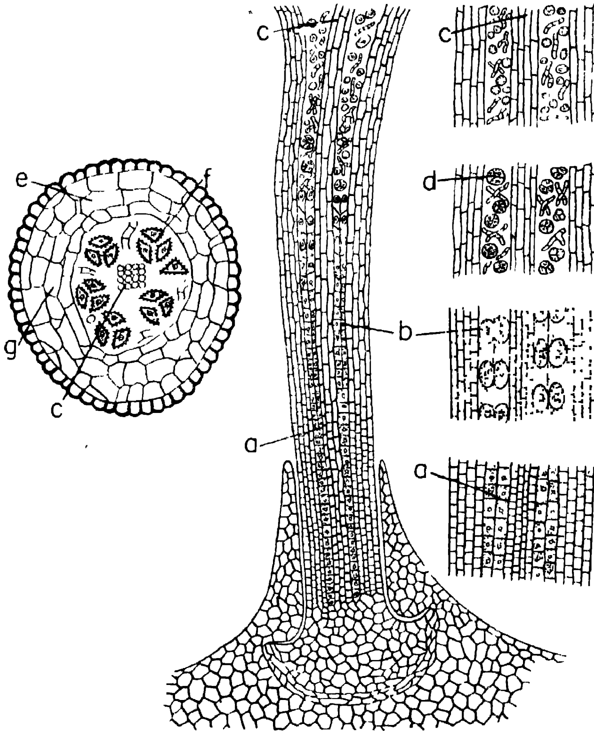


এনথোসেরাসের জীবনচক্র. a = লিঙ্গধর উদ্ভিদ, b = আরচিগোনিয়াম, c = ডিম্বাণু, d = এনথেরিডিয়াম, e = পুং জননকোষ, f = নিষেকের পর জাইগোট, g = দুইকোষী ভ্রূণ, h = চারকোষী ভ্রূণ, i = শিশু ভ্রূণ, j = রেণুধর, k = স্পোর মাতৃকোষ, l = মিয়োসিসের পর টেটরাড, m = স্পোর, n = স্পোর হইতে অঙ্কুর।

পরিপক্ক আরচিগোনিয়াম থ্যালাসের পৃষ্ঠদেশে নিমজ্জিত থাকে। কেবলমাত্র কভার কোষগুলি সামান্য উঁচু হইয়া থাকে। জ্যাকেট কোষের ভিতরে ৪-৬টি নেক ক্যানাল কোষ, একটি ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষ এবং একটি ডিম্বাণু থাকে। পরে নেক ক্যানাল ও ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং কভার কোষগুলি পড়িয়া যায় এবং ডিম্বাণু পর্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ সৃষ্টি হয়।

নিষেক (Fertilization)—এনথোসেরাসের নিষেক প্রক্রিয়া মারক্যানসিয়ারই অনুরূপ।

নিষেকের পর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এককোষী ডিম্বাণুটি ক্রমশঃ আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং লম্বচ্ছেদ বিভক্ত হইয়া দুইটি সমান আয়তনের কোষ সৃষ্টি করে। পরে এই দুইটি কোষ প্রস্থচ্ছেদের ফলে চারিটি কোষ উৎপন্ন করে। প্রতিটি কোষ পুনরায়



এনথোসেরাসের স্পোরোফাইটের : a = দৈর্ঘ্যচ্ছেদে আরচিস্পোরিয়াম, b = স্পোর মাতৃকোষ, c = কলুমেলা, d = স্পোর টেট্রাড, e = প্রস্থচ্ছেদ আবরণ কোষ, f = স্পোর টেট্রাড, g = আবরণ কোষ।

লম্বচ্ছেদের সাহায্যে আটকোষবিশিষ্ট (octant) স্পোরোফাইট সৃষ্টি করে। পরবর্তী কোষ বিভাজন বিভিন্ন প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন। *A. erectus*-এর ক্ষেত্রে আটকোষবিশিষ্ট স্পোরোফাইটের নিচের চারিটি কোষ বারংবার বিভাজিত হইয়া পদ (foot)

এবং উপরের চারিটি কোষ হইতে ক্যাপসিউল এবং বর্ধনশীল অংশ উৎপন্ন হয়। উপরের যে কোষগুলি হইতে ক্যাপসিউল উৎপন্ন হয় সেইগুলি প্রথমে এক বা দুইবার প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে এবং পরে পেরিক্লিন্যাল বিভাজনের মাধ্যমে একটি বাহিরের কলা বা এমফিথেসিয়াম এবং একটি ভিতরের কলা বা এনডোথেসিয়াম সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ এনডোথেসিয়াম হইতে কলুমেলা (columella) উৎপন্ন হয়।

এমফিথেসিয়াম কলার পেরিক্লিন্যাল বিভাজনের দ্বারা বাহিরের বন্ধ্যা (sterile) জ্যাকেট ইনিসিয়াল এবং ভিতরের প্রাইমারী স্পোরোজেনাস কলা বা আরচিস্পোরিয়াম গঠিত হয়। জ্যাকেট ইনিসিয়াল হইতে ৪-৬ কোষস্তরবিশিষ্ট জ্যাকেট সৃষ্টি হয়। জ্যাকেটের একেবারে বাহিরের কোষস্তরটি বহিঃত্বক গঠন করে। বহিঃত্বকে কতকগুলি কোষ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের স্টোমাটার অনুরূপ স্টোমাটা সৃষ্টি করে। বহিঃত্বকে ভিতরে অবস্থিত জ্যাকেটের অবশিষ্ট স্তরগুলি সবুজ প্যারেনকাইমা কলা গঠিত। ইহার প্রতিটি কোষে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। *A. vesicularis* প্রজাতিতে একটি এবং *A. halli* ও *A. pearsoni* প্রজাতিগুলিতে চারিটি করিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট বিদ্যমান।

অপক্ক স্পোরোফাইটে আরচিস্পোরিয়ামটি কলুমেলার অগ্রভাগের উপর গম্বুজের আকারে থাকে। কোন কোন প্রজাতিতে (*A. erectus*) আরচিস্পোরিয়াম এককোষ ঘন হয় আবার কখন কখন (*A. himalayensis*) দুইকোষ ঘন হয়। প্রথমে সমস্ত কোষ আকারে অনুরূপ থাকে। ক্রমশঃ কোষগুলি দুই প্রকারে রূপান্তরিত হয়। কতকগুলি প্রায় গোলাকার সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত বৃহৎ কোষ যাহা স্পোর মাতৃকোষ সৃষ্টি করে এবং কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সরু ডিম্বাকার এবং ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস-যুক্ত বন্ধ্যা (sterile) কোষ বা সিউডোইলেটার মাতৃকোষ (pseudoelater mother cell)। অবশেষে স্পোর মাতৃকোষ আয়তনে আরো বৃদ্ধি পায় এবং সম্পূর্ণ গোলাকার ধারণ করে এবং মায়োসিস মাধ্যমে টেট্রাড বিভাজনের সাহায্যে চারিটি হ্যাপ্লয়েড স্পোর সৃষ্টি করে। সিউডোইলেটার মাতৃকোষগুলিও প্রস্থ ও বিষম বিভাজনের দ্বারা বন্ধ্যা কোষসমষ্টি সৃষ্টি করে। পরে এইগুলি এক হইতে তিন কোষবিশিষ্ট সিউডোইলেটার আকারে আলাদা হইয়া যায়।

ক্যাপসিউলের তিনটি অংশ অর্থাৎ কলুমেলা, আরচিস্পোরিয়াম এবং বাহিরের জ্যাকেটের অংশ সৃষ্টি হইবার পর অগ্রস্থ বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং পদ ও ক্যাপসিউলের সংযোগস্থলে অবস্থিত ইনটারক্যালারী মেরিস্টেম (intercalary meristem) মারফত বৃদ্ধি হয়। এই মেরিস্টেম ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি করে যাহা কালক্রমে কলুমেলা, আরচিস্পোরিয়াম ও জ্যাকেটে রূপান্তরিত হয়।

স্পোরোফাইটের বৃদ্ধিকালে ইহা ইনভোলিউকার (involucre) নামক আস্তরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এই ইনভোলিউকার নিমজ্জিত আরচিস্পোরিয়াম সংলগ্ন থ্যালাস কোষ হইতে সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইনভোলিউকার স্পোরোফাইটটি সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া বৃদ্ধি পায়। পরে অবশ্য স্পোরোফাইটের দ্রুততর বৃদ্ধির ফলে ইনভোলিউকার ভেদ করিয়া ইহা বাহির হইয়া আসে।

পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট (Mature sporophyte)

পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট বালবাস (bulbous) পদ এবং লম্বা ও সরু ক্যাপসিউল লইয়া গঠিত এবং সীটা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বিভিন্ন প্রজাতিতে স্পোরোফাইট ৫ হইতে ১৫ সে. মি পর্যন্ত লম্বা হয়। পদটি গ্যামীটোফাইট উদ্ভিদের থ্যালাসে নিমজ্জিত (sunken) অবস্থায় থাকে এবং থ্যালাস হইতে আংশিকভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্পোরোফাইটের জ্যাকেট কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকাতে ইহারা নিজেরাই কিছু পরিমাণ খাদ্য তৈয়ারি করিতে সক্ষম হওয়াতে আংশিক স্বনির্ভরশীল। অবশ্য গ্যামীটোফাইটের মাধ্যমেই খাদ্য তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি হইতে শোষণ করে।

ক্যাপসিউলের কেন্দ্রে বন্ধ্যা কলুমেলা (columella) কলা অবস্থিত। ইহা ১৬টি উল্লম্ব কোষসারি দ্বারা গঠিত। এই অংশের কোষগুলি আকারে দীর্ঘ এবং সামান্য স্থূলপ্রাচীরবিশিষ্ট। অনেকের মতে জল পরিবহণই কলুমেলার প্রধান কার্য। আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা স্তম্ভক কলা (mechanical tissue) হিসাবে কাজ করে।

কলুমেলাকে ঘিরিয়া স্পোরোজেনাস কলা অবস্থিত। ক্যাপসিউলের একেবারে নিচের অংশে ইহা আরচিস্পোরিয়াম হিসাবে থাকে। ইহার কিছু উপরের অংশে স্পোর মাতৃকোষ এবং সিউডোইলেটার মাতৃকোষে রূপান্তরিত থাকে। ক্রমশঃ উপরের দিকে স্পোর টেট্রাড এবং সিউডোইলেটার এবং একেবারে উপরের অংশে পক্ব স্পোর এবং পূর্ণাঙ্গ সিউডোইলেটার অবস্থায় বিরাজ করে। স্পোরোজেনাস কলাকে ঘিরিয়া কয়েকস্তরবিশিষ্ট ক্লোরোফিলযুক্ত জ্যাকেট কলা বিদ্যমান। জ্যাকেটের সবচেয়ে বাহিরের কোষস্তরটি ত্বক্ সৃষ্টি করে। ত্বককোষের মধ্যে ছড়ানো স্টোমাটা বা রন্ধ্র থাকে। স্টোমাগুলি রক্ষীকোষযুক্ত (guard cells)।

পদ ও ক্যাপসিউলের মধ্যবর্তী অংশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ধনশীল কলা (meristematic tissue) বিদ্যমান। এই কলা ক্রমান্বয়ে নূতন কোষ সৃষ্টি করে যাহা ক্রমশঃ কলুমেলা, স্পোরোজেনাস কলা ও জ্যাকেট কলায় রূপান্তরিত হয়। ইহার ফলেই এনথোসেরাসের স্পোরোফাইট অনিয়ত (indefinite) বৃদ্ধি পায়।

ক্যাপসিউলের বিদারণ (Dehiscence of capsule)

স্পোরোফাইট পরিপক্ব হইলে ক্যাপসিউলের বিদারণ হয়। শুষ্ক আবহাওয়ার ক্যাপসিউলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ শুকাইতে আরম্ভ করে এবং সংকুচিত হয়। জ্যাকেটের দারণ রেখা (dehiscence line) ধরিয়া ক্যাপসিউল ফাটিতে সুরু করে। ক্যাপসিউলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ফাঁক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ফলে, ভিতরের অংশ বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে সিউডোইলেটারগুলি বাতাসের আর্দ্রতার তারতম্য অনুযায়ী পেঁচাইয়া সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে এবং স্পোর বিস্তারে সহায়তা করে। পরে লম্বালম্বি দ্বিখণ্ডিত ক্যাপসিউলের দুইটি ভাগ বাতাসের আর্দ্রতার তারতম্যে সর্পিলাকারে সংকুচিত হয়। স্পোর বাহিরে আসার পর বাতাসের সাহায্যে ইহার কিছুটা বিস্তার সম্ভব হয়।

স্পোর (Spore)

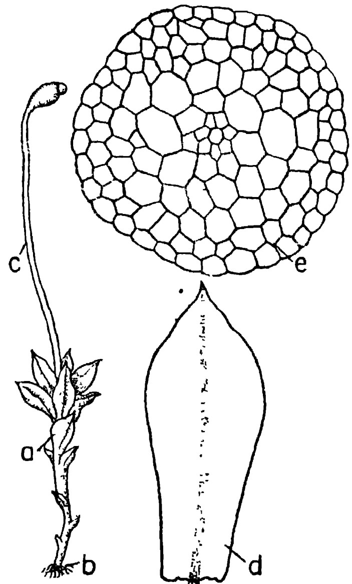
টেট্রাহেড্রাল স্পোরগুলি দুই স্তর আস্তরণবিশিষ্ট। ভিতরেরটি পাতলা এণ্ডোস্পোর (endospore) এবং বাহিরেরটি পুরু এবং নানা বর্ণের এক্সোস্পোর (exospore) আস্তরণের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস, বর্ণহীন প্লাসটিড, তৈলকণা এবং অন্যান্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বিস্তার লাভের পর স্পোরগুলি কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েকমাস পর্যন্ত সুপ্ত থাকে। পরে অংকুরিত হইয়া নূতন থ্যালাস সৃষ্টি করে।

ফিউনেরিয়া (Funaria)

Family : ফিউনেরিয়েসি (Funariaceae)
Order : ফিউনেরিয়েলিস (Funariales)

ফিউনেরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র একটি সহজলভ্য মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় ১১৭টি প্রজাতির মধ্যে ১২টি ভারতে পাওয়া যায়। ফিউনেরিয়া হাইগ্রোমেট্রিকা (F. hygrometrica) সর্বাপেক্ষা বহুল বিস্তৃত প্রজাতি।

উদ্ভিদদেহটি লিঙ্গধর (gametophyte) এবং পাথরের খাঁজে, দেওয়ালে অথবা মাটিতে গুচ্ছাকারে জন্মে। গ্যামিটফাইটের দুইটি দশা দৃশ্যমান। একটি দশা শৈবালের ন্যায় সূত্রবৎ (filamentous) শায়িত এবং ক্ষণস্থায়ী, ইহাকে প্রোটোনিমা (protonema) বলে। অপরটি উল্লম্ব পত্রবাহী কাণ্ডবিশিষ্ট স্থায়ী গ্যামীটফোর (gametophore)। গ্যামীটফোর দশা ১—৩ সে. মি দীর্ঘ এবং বহুশাখাপ্রশাখাযুক্ত কাণ্ড। শাখাপ্রশাখাগুলি কাক্ষিক নয় এবং পাতার নিচের কাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়। প্রধান কাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখাগুলি ছোট ছোট বৃন্তহীন একক পত্র দ্বারা চক্রাকারে ঢাকা থাকে। কাণ্ডের আগার পত্রগুলি ঘন হইয়া কুঁড়ির আকারে সাজানো থাকে। প্রতিটি পত্র ডিম্বাকার এবং স্পষ্ট মধ্যশিরাবিশিষ্ট। কাণ্ডের গোড়ায় অসংখ্য সরু শাখাবিশিষ্ট বহুকোষী রাইজয়েড থাকে। রাইজয়েডগুলির কোষপ্রাচীর বিষম প্রস্থ-প্রাচীরযুক্ত। রাইজয়েডগুলি প্রথমে স্বচ্ছ থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে বাদামী বর্ণের হয়। রাইজয়েডগুলি সূর্যালোক ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে ক্লোরোপ্লাস্ট সৃষ্টি করে। ইহাদের পাতা ও কাণ্ড উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের মত নহে।



a = মসের লিঙ্গধর উদ্ভিদ -পাতা ও কাণ্ড, b = রাইজয়েড, c = রেণুধর ক্যাপসুল, d = পাতা, e = কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।

কাণ্ড (Stem)

কাণ্ডের বৃদ্ধি একটি পিরামিড আকারের তিনমুখবিশিষ্ট অগ্রকোষের বিভাজনের দ্বারা সাধিত হয়। প্রতিটি মুখ হইতে বিভাজনের ফলে তিনটি করিয়া কোষ উৎপন্ন হয়। ইহার প্রতিটি কোষ পেরিক্লিন্যাল বিভাজনের জন্য তিনটি বাহিরের এবং তিনটি ভিতরের কোষ সৃষ্টি করে। ভিতরের তিনটি কোষ পুনঃ পুনঃ বিভাজন করিয়া কাণ্ডের আভ্যন্তরীণ কলা সৃষ্টি করে। বাহিরের কোষ তিনটি হইতে তিনটি পত্র এবং সংশ্লিষ্ট কাণ্ডের বাহিরে কলা সৃষ্টি হয়। পত্রে অগ্রকোষের বিভাজনের দ্বারা পত্রের বৃদ্ধি সাধিত হয়।

কাণ্ডের অভ্যন্তর ত্বক্ বা এপিডারমিস (epidermis), কর্টেক্স (cortex) এবং কেন্দ্রস্থ কোষ কলা গঠিত। একেবারে বাহিরের অংশ ত্বক্ একস্তর ট্যানজেনসিয়াল লম্বা কোষ গঠিত। কোষগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ত্বকের ভিতরের দিকে বহুকোষস্তরযুক্ত কর্টেক্স কলা অবস্থিত। পূর্ণ বয়স্ক কাণ্ডের কর্টেক্স কলার বাহিরের অংশের কোষগুলি সাধারণতঃ কিছুটা পুরু কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং কখন কখন সবুজকণাযুক্ত। কর্টেক্সের অবশিষ্ট অংশের কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত। কর্টেক্সের বাহিরের অংশে পত্রাভিসারী (leaf trace) বিদ্যমান। কাণ্ডের মধ্যস্থলে কেন্দ্রিক বেলনের (central cylinder) কোষগুলি উল্লম্ব, দীর্ঘাকার। কর্টেক্স কোষ অপেক্ষা এই কোষগুলির ব্যাস অপেকাকৃত কম এবং সামান্য পুরু কোষপ্রাচীরযুক্ত। এই প্রোটোপ্লাজমহীন মৃত কোষগুলি জল ও খাদ্য চলাচলে সাহায্য করে।

পাতা (Leaf)

পাতার মধ্যশিরা অংশ বহুস্তরকোষযুক্ত কিন্তু অন্যান্য অংশ একস্তরকোষযুক্ত। মধ্যশিরার কেন্দ্রে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট সরু কতকগুলি কোষ থাকে। ইহার ঠিক বাহিরে কতকগুলি পুরুপ্রাচীরযুক্ত সরু কোষ থাকে। একেবারে বাহিরের কোষগুলি সবুজকণাবিশিষ্ট। পাতার একস্তরকোষযুক্ত অংশে কোষগুলি বহুক্লোরোপ্লাস্ট-বিশিষ্ট।

অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)

প্রোটোনিমার অংশবিশেষ পৃথক হইয়া নূতন প্রোটোনিমা হিসাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া কখন কখন বুলবিল (bulbil) পত্রবাহী কাণ্ডে অথবা রাইজয়েড অংশে সৃষ্টি হয়। এইগুলি হইতে নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

কখন কখন রাইজয়েড আলো এবং আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে নূতন প্রোটোনিমা সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাদের মাধ্যমিক (secondary) প্রোটোনিমা বলে।

যৌন জনন (Sexual reproduction)

ফিউনেরিয়া হাইড্রোমেট্রিকা একটি সহবাসী (monoecious) উদ্ভিদ। একই উদ্ভিদের বিভিন্ন শাখায় স্ত্রী ও পুরুষ জননাঙ্গগুলি জন্মায়। প্রধান কাণ্ডের আগায় পুরুষ জননাঙ্গ (antheridia) গুচ্ছাকারে থাকে। স্ত্রীজননাঙ্গ (archegonia) পার্শ্বীয় শাখার আগায় থাকে।

এনথেরিডিয়াম (Antheridium)—গুচ্ছাকারে সজ্জিত এনথেরিডিয়াম বহনকারী কাণ্ডের নিচের দিকে পত্রগুলি ছোট এবং ছড়ানো থাকে। কিন্তু কাণ্ডের উপরের দিকে এই পত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বিশেষ ধরনের গুচ্ছাকার পেরিকিটিয়াল (perichaetial) পত্র দ্বারা প্রস্তুত পেয়ালার ন্যায় অংশ সৃষ্টি করে। এনথেরিডিয়ামের সহিত অসংখ্য বহুকোষযুক্ত প্যারাফাইসেস একত্রে অবস্থান করে। একই এনথেরিডিয়াম সমষ্টির মধ্যে সবগুলি একই সঙ্গে বৃদ্ধি না হওয়ায় নানা অবস্থার এনথেরিডিয়াম দৃষ্টিগোচর হয়।

পূর্ণাঙ্গ এনথেরিডিয়ামের একটি বহুকোষী ক্ষুদ্র, বৃন্ত এবং একটি গদাকৃতি অংশ লইয়া গঠিত। এই গদাকৃতি অংশটি একটি রক্ষাপ্রদ ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। ইহার মধ্যে বহু n-সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট এনথেরজয়েড মাতৃকোষ (antherozoid mother cell) থাকে। শেষ পর্যন্ত এনথেরজয়েড মাতৃকোষ কোনাকুনি বিভক্ত হইয়া দুইটি ত্রিভুজাকৃতি কোষ সৃষ্টি করে। প্রতিটি ত্রিভুজাকৃতি কোষ এক একটি এককোষী, দ্বিফ্লাজেলামযুক্ত, একনিউক্লিয়াস ও n (haploid)-সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি পুরুষ গ্যামীট সৃষ্টি করে। পুংগ্যামীটগুলি পরিপক্ক হইলে এনথেরিডিয়ামের আগায় প্রাচীরকোষ অপারকুলাম (operculum) নামক অংশ খুলিয়া যায় এবং গ্যামীটগুলি বাহির হইয়া পড়ে।

আরচিগোনিয়াম (Archegonium)

বিশেষ ধরনের শাখার আগায় অবস্থানকারী আরচিগোনিয়ামগুলি গুচ্ছাকারে প্যারাফাইসিসের সহিত একত্রিত সাজানো থাকে। আরচিগোনিয়ামগুলি অবশ্য সাধারণ পত্র দ্বারা আবৃত থাকে। আরচিগোনিয়াম বহনকারী শাখার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট কারণ এই শাখার বর্ধনশীল অগ্রকোষটি আরচিগোনিয়াম সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

এই মসের যে কোষটি হইতে আরচিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে একটি আগার আরচিগোনিয়াম মাতৃকোষ এবং একটি গোড়ার কোষে বিভক্ত হয়। প্রথমোক্ত কোষটি তিনবার বিষম বিভাজনের মাধ্যমে একটি ভিতরের টেট্রাহেড্রাল কোষ এবং তিনটি বাহিরের পেরিফেরাল কোষ সৃষ্টি করে। টেট্রাহেড্রাল কোষটি প্রস্থচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া উপরের প্রাইমারী কভার কোষ (primary cover cell) এবং ভিতরের কেন্দ্রিক কোষ (central cell) সৃষ্টি করে। কেন্দ্রিক কোষ বিভাজিত হইয়া প্রাইমারী ক্যানাল কোষ (primary canal cell), ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষ (ventral canal cell) এবং ডিম্বাণু (egg) সৃষ্টি করে। প্রাইমারী কভার কোষ বিভাজিত হইয়া গলা (neck) অংশের জ্যাকেট স্তর গঠন করে।

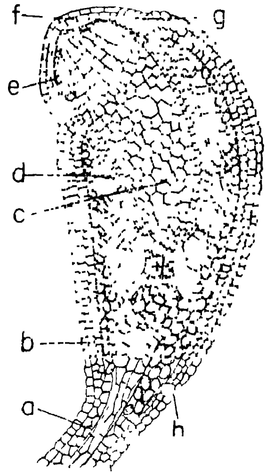
পূর্ণাঙ্গ আরচিগোনিয়ামের দীর্ঘ ও স্থূল বৃন্ত, সামান্য স্ফীত ভেন্টার এবং দীর্ঘ গলা বিদ্যমান। ভেন্টারের কেবলমাত্র নিচের অংশের জ্যাকেট দুই কোষস্তরবিশিষ্ট। আরচিগোনিয়ামের বাকী অংশ এককোষস্তরযুক্ত জ্যাকেট দ্বারা ঢাকা থাকে। জ্যাকেটের মধ্যে একটি ডিম্বাণু, একটি ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষ এবং ছয় অথবা তার অধিক নেক ক্যানাল কোষ থাকে। পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় নেক ক্যানাল ও ভেন্ট্রাল ক্যানাল কোষগুলি নষ্ট হইয়া মিউসিলেজ (mucilage) সৃষ্টি করে এবং কভার কোষগুলি আলাদা হইয়া ডিম্বাণু পর্যন্ত একটি পথ সৃষ্টি করে।

নিষেক (Fertilisation)

জলের মাধ্যমে এনথেরোজয়েডগুলি সাঁতার কাটিয়া আর্কিগোনিয়ামে উপস্থিত হয় এবং আর্কিগোনিয়াম হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের আকর্ষণে কেমট্রপিজমের (chemotropism) মাধ্যমে ভেণ্টারের মধ্যস্থ ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়।

স্পোরোফাইট (Sporophyte)

নিষেকের ফলে সৃষ্ট জাইগোট আকারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্থচ্ছেদের দ্বারা একটি উপরের এপিবেসাল এবং নিচের হাইপোবেসাল কোষ সৃষ্টি করে। এপিবেসাল কোষের বিষমচ্ছেদের দ্বারা একটি দুইপার্শ্ববিশিষ্ট অগ্রস্থ কোষ উৎপন্ন হয়। ঠিক একইভাবে নিচের হাইপোবেসাল কোষ হইতে একটি অগ্রস্থ কোষ উৎপন্ন হয়। উপরস্থ অগ্র কোষের পর্যায়ক্রমে দক্ষিণে ও বামে বারংবার বিভাজনের দ্বারা ক্যাপসিউল ও সীটার উপরের অংশ সৃষ্টি হয়। নিচের অগ্র বিভাজনের শেষ ফলে পর্যন্ত পদ বা ফুট (foot) এবং সীটার নিচের অংশ সৃষ্টি হয়।



ফিউনেরিয়া ক্যাপসুলের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।
a = সীটা, b = এ্যাপোফাইসিস, c = কলুমেলা, d = আর্কিস্পোরিয়াম, e = পেরিস্টোম, f = অপারকুলাম, g = এনুলাস।

পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট (Mature sporophyte)

পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইট তিনটি অংশে বিভক্ত : (ক) পদ বা ফুট, (খ) সীটা এবং (গ) ক্যাপসিউল। পদটি বেশ ছোট এবং আর্কিগোনিয়াম বহনকারী শাখার অগ্রভাগের কলায় নিমজ্জিত থাকে। সীটা বেশ সরু এবং দীর্ঘ। সীটার অগ্রে ক্যাপসিউলটি বিষম অবস্থায় যুক্ত থাকে।

ক্যাপসিউলের লম্বচ্ছেদ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহার ভিতরের কলা বেশ জটিল এবং তিনটি অংশে বিভক্ত : (ক) এ্যাপোফাইসিস (apophysis), (খ) মূল থিকা অংশ (theca proper) এবং উপরের অংশ (upper region)। ক্যাপসিউলের সবচেয়ে নিচের অংশের নাম এ্যাপোফাইসিস। ইহার কেন্দ্রে অবস্থিত সংবহন-কলা সীটার সংবহন-কলার সহিত যুক্ত থাকে। সংবহন-কলার চারিদিকে ক্লোরোফিল ও অন্তর্কোষীয় রন্ধ্রযুক্ত কয়েক স্তর কোষ বিদ্যমান। ইহাকে ঘিরিয়া স্টোমাটাযুক্ত ত্বককোষ থাকে।

মূল থিকা অংশের কেন্দ্রে কলুমেলা থাকে। কলুমেলার উপরিভাগ শাঙ্কব (conical) এবং অপারকুলামের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। কলুমেলার গোড়ার অংশ এ্যাপোফাইসিসের কেন্দ্রীয় কলার সহিত যুক্ত থাকে। কলুমেলার চারিদিকে রেণুপ্রকোষ্ঠ বা স্পোর স্যাক (spore sac) অবস্থিত। স্পোর স্যাকের বাহিরের প্রাচীর ৩—৪ কোষস্তরযুক্ত এবং ভিতরের প্রাচীর এককোষস্তরবিশিষ্ট। দুই-প্রাচীর স্তরের মধ্যে স্পোর মাতৃকোষ অবস্থিত। ইহা সাধারণতঃ টেট্রাড বিভাজনের

দ্বারা কেবলমাত্র স্পোর সৃষ্টি করে। কোন ইলেটার সৃষ্টি হয় না। স্পোর স্যাকের বাহিরের দিকে বায়ুপ্রকোষ্ঠ (air chamber) থাকে। ক্লোরোফিল-যুক্ত ফিলামেণ্ট বায়ুপ্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া ভেদ করিয়া স্পোর স্যাককে ক্যাপসিউলের প্রাচীরের ভিতরের অংশের সহিত যুক্ত রাখে। ক্যাপসিউলের প্রাচীর বহুকোষ-স্তরবিশিষ্ট। ভিতরের কয়েকটি স্তর ক্লোরোকোষ ও অন্তঃকোষীয় রন্ধ্রবিশিষ্ট কিন্তু ত্বকের ভিতরের ২—৩ স্তর ক্লোরোফিলবিহীন ঘন প্যারেনকাইমা গঠিত। ক্যাপসিউলের উপরের অংশ থিকা অংশ হইতে একটি খাঁজ দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং অপারকিউলাম (operculum) ও পেরিস্টোম দাঁত গঠিত। এই খাঁজের ঠিক নিচেই ডায়াফ্রাম (diaphragm) এবং উপরের এনুলাস (annulus) থাকে। ক্যাপসিউলের মুখ অপারকুলাম দ্বারা আবৃত থাকে। ইহা প্রায় তিনস্তর ক্ষুদ্র কোষবিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল কোষপ্রাচীরযুক্ত ত্বককোষ দ্বারা আবৃত। অপারকিউলামকে ঘিরিয়া পেরিস্টোম দাঁত থাকে। প্রতি স্তরে ১৬টি করিয়া দাঁত দুইস্তরে সাজানো থাকে। প্রতিটি দাঁত ত্রিভুজাকৃতি, কিছুটা বাঁকানো এবং প্লেটের ন্যায়। বাহিরের স্তরের দাঁতগুলি অধিক কারুকার্যখচিত, লাল এবং স্থূল প্রস্থপ্রাচীর বিশিষ্ট। এই দাঁতগুলি পরস্পরে পেঁচানো অবস্থায় থাকে। ভিতরের স্তরের দাঁতগুলি অপেক্ষাকৃত নরম, বর্ণহীন এবং ক্ষুদ্র। ভিতরের স্তরের দাঁতগুলির গোড়া বাহিরের স্তরের দাঁত দ্বারা আবৃত থাকে।

দারণ (Dehiscence)

পরিপক্ক হইলে ক্যাপসিউল শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে কলুমেলা এবং ক্যাপসিউলের বাহিরের কোষগুলি শুকাইয়া যায় এবং স্পোর প্রকোষ্ঠের দেওয়াল ছিঁড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে এনুলাস ছিঁড়িয়া যায় এবং অপারকুলাম খসিয়া পড়িলে পেরিস্টোম দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়ে। পেরিস্টোম দাঁতগুলি বাতাসের আর্দ্রতার তারতম্যে কুঁচকাইয়া স্পোর বিস্তারে সহায়তা করে। যখন আর্দ্রতা অধিক থাকে তখন বাহিরের পেরিস্টোম দাঁতের বাহিরের কোষস্তর বেশী পরিমাণে জল গ্রহণ করিয়া ডোম (dome) আকারে ভিতরের দিকে বাঁকিয়া থাকে এবং ক্যাপসিউল হইতে স্পোর বিস্তার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে। শুষ্ক আবহাওয়ায় বাহিরের দাঁতের সারির বাহিরের কোষস্তর বেশী পরিমাণে শুষ্ক হওয়ার ফলে দাঁতগুলি খুলিয়া বাহিরের দিকে বাঁকিয়া যায় এবং স্পোর বিস্তারে সহায়তা করে। ভিতরের পেরিস্টোম দাঁতের সারি অবশ্য বায়ুর আর্দ্রতায় বেশী কাতর নয়।

সীটা ও আর্দ্রতার তারতম্যে পর্যায়ক্রমে শুকাইয়া পাকাইয়া অথবা লম্বা হইয়া স্পোর বিস্তারে সহায়তা করে। এইভাবে সীটা ও পেরিস্টোম দাঁতের সহায়তায় অনুকূল পরিবেশে এককালীন অল্প পরিমাণে স্পোর বহু সময়যাবৎ বিস্তার লাভ করে।

স্পোর (Spore)

স্পোরগুলি সচরাচর গোলাকার এবং বাহিরের প্রাচীর (exosporium) রঙ্গিন ও মসৃণ। ভিতরের প্রাচীর (endosporium) পাতলা ও বর্ণহীন। স্পোরের মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস এবং প্রচুর তৈলকণা ও ক্লোরোফিলযুক্ত সাইটোপ্লাজম থাকে।

বিস্তারের পর অনুকূল বাসস্থান ও আবহাওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যেই স্পোর অঙ্কুরিত হয়। প্রথমে স্পোর আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং এক্সস্পোরিয়াম ফাটিয়া এণ্ডোস্পোরিয়াম বাহির হইয়া আসে এবং প্রস্থচ্ছেদের দ্বারা কয়েকটি কোষে বিভক্ত হয়। এই কোষগুলি বারংবার বিভাজিত হইয়া শাখাযুক্ত ফিলামেণ্ট সৃষ্টি করে। ইহাকে প্রাথমিক প্রোটোনিমা (primary protonema) বলে। প্রাথমিক প্রেটোনিমার কিছু কিছু শাখা মাটির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ইহাদের রাইজয়েডাল শাখা (rhizoidal branch) বলে। কতকগুলি শাখা মাটিতে কিছুদূর সমান্তরাল বৃদ্ধি পাইয়া পরে উঁচু হইয়া উঠে, ইহাদের ক্লোরোনিমাল শাখা (chloronemal branch) বলে। এই শাখাগুলির কোষে অসংখ্য ছোট ছোট ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

কিছুকাল পর প্রোটোনিমার প্রস্থচ্ছদার নিকট কুঁড়ি বাহির হয়। এই কুঁড়ি অগ্রকোষের বিভাজনের দ্বারা নূতন পত্রবহণকারী স্থায়ী কাণ্ডবিশিষ্ট গ্যামীটফোর সৃষ্টি হয়।

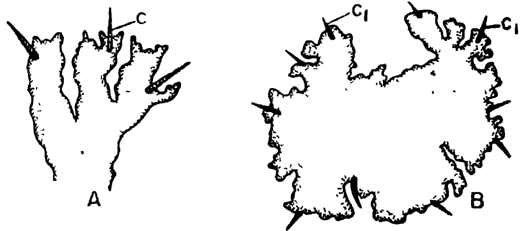
নোটোথাইলাস (Notothylas)

ইহা ব্রায়োফাইটা শ্রেণীভুক্ত অবীজ উদ্ভিদ। ১৯৪০ সালে, মুলার এনথোসেরোটেলসকে দুইটি ফ্যামিলিতে বিভক্ত করেন—(১) এনথোসেরোটেসি ও (২) নোটোথাইলেসি। নোটোথাইলাস ভিজা মাটি, পাহাড়ে ও ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মায়। ইহার ১১টি প্রজাতি শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাওয়া যায়। ভারতে তিনটি প্রজাতি হইল—নোটোথাইলাস চৌধুরী, নোটোথাইলাস ইনডিকা ও নোটোথাইলাস লিভেরি।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ

ইহার দেহ থ্যালাস ও সচরাচর গোলাকার এবং মাটিতে শায়িত থাকে। ইহা কোমল, পাতলা ও দ্ব্যগ্রভাবে বিভক্ত হয়। আকারে অত্যন্ত সরল এবং ফিকা সবুজ রঙের হইয়া থাকে।

ইহার ভিতরের কলার বিশেষ প্রকারভেদ নাই। ভিতরের দিকে ৬-৮ স্তরের কলা এবং কিনারায় ১-৩ স্তরের কোষ থাকে। ত্বকের কোষ একটি বড় ক্লোরোপ্লাস্ট ও একটি পাইরিনয়েড-যুক্ত। কোন কোন প্রজাতিতে কোষের মধ্যে নস্টক কলোনী ও মিউসিলেজ থাকে।



A, B—নোটোথাইল্যাসের থ্যালাস, c, c_1 =রেণুধর।

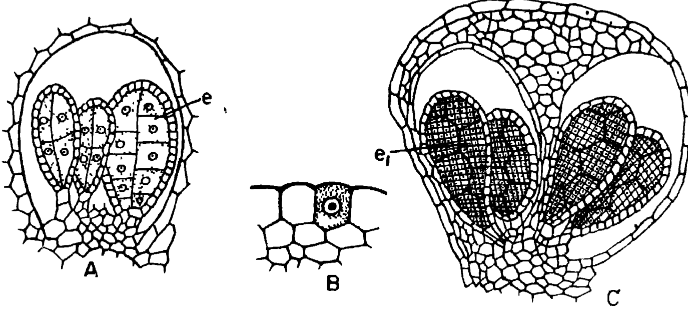
জনন

ইহার দুই প্রকার জনন—(১) অঙ্গজ ও (২) যৌন।

অঙ্গজ জনন, থ্যালাস দ্বারা হয়। পুরানো অংশ মরিয়া যায় এবং দ্ব্যগ্র বিভাগ হইয়া দুইটি থ্যালাস সৃষ্টি হয়।

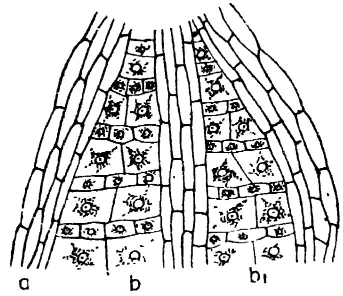
যৌন

ইহারা সহবাসী ও ভিন্নবাসী হয়। এনথেরিডিয়াম থ্যালাসের ভিতর সৃষ্টি হয়। এইগুলি ২, ৩ অথবা বেশী এনথেরিডিয়াল ঘরে জন্মায়। ত্বকের নিচে এনথেরিডিয়াম



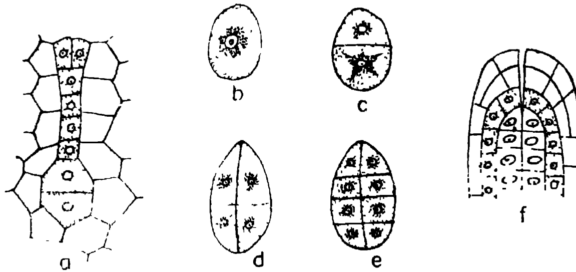
A—নোটোথাইলাসের এনথেরিডিয়া, B—এনথেরিডিয়াম সৃষ্টি হইতেছে, C—e₁=গহ্বরে এনথেরিডিয়া।

বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চলে জন্মায়। ইহার উপর দুই স্তরের আবরণ থাকে। সুপক্ক এনথেরিডিয়ামে একটি ছোট বৃন্ত, আকার গোল এবং কমলা বা লাল রঙের হয়। ইহাদের দুই ফ্ল্যাজেলাম-যুক্ত শুক্রাণু এনথেরিডিয়াম ঘর ভাঙ্গিলে বাহির হয়।



a=দৈর্ঘ্যচ্ছেদ বেণুধর ক্যাপসুলের বন্ধ্যা ও b=স্পোর সৃষ্টিকারী কলা।

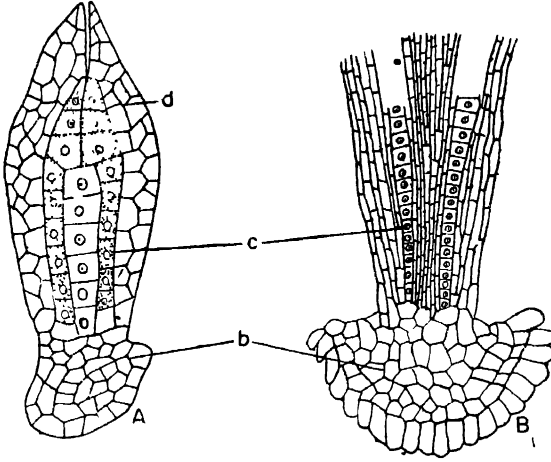
আরর্কিগোনিয়াম থ্যালাসের মধ্যে এবং অগ্র-ভাগে একটি সৃষ্টি হয়। ইহার ৩-৫ গ্রীবা-নালী কোষ থাকে। গ্রীবার নিচে **ভেনটার**। ভেনটার একটি অংকীয় কোষ ও একটি ডিম্বাণু গঠন করে। আরর্কিগোনিয়ামের গ্রীবার উপরে **চারিটি আবরণী কোষ** দেখা যায়। ইহা পাকিলে গ্রীবাকোষগুলি ও অংকীয় কোষ বিনষ্ট হইয়া একটি নালা সৃষ্টি করে। এই নালীর ভিতর দিয়া



a=আরর্কিগোনিয়াম, b=উস্পোর, c, d. e=উস্পোর বিভাজিত হইতেছে,
f=ক্যাপসুলের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ ও ভিতরে আরর্কিস্পোরিয়াম।

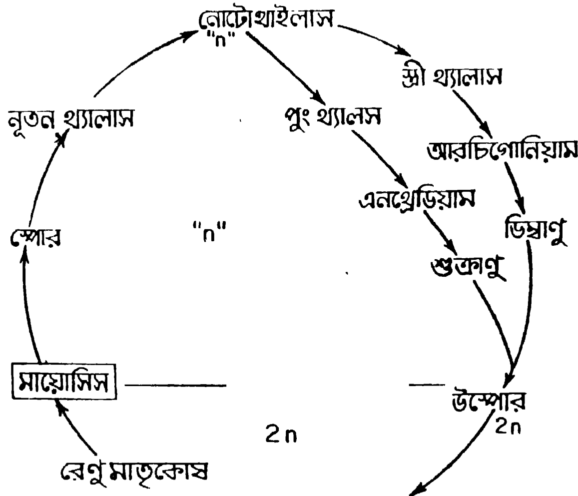
শুক্রাণু প্রবেশ করে। একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইয়া **নিষেক** সম্পন্ন করে। শুক্রাণুর প্রবেশ জলের সাহায্যে হয়। নিষেকের পর জাইগোট আবরণ গঠন

করে এবং এই উস্পোর প্রায় ভেণ্টার পূর্ণ করে। উস্পোর ডিপ্লয়েড এবং ইহা স্পোরোফাইটের সূচনা করে।



A—নোটোথাইলাসের ক্যাপসুল, a=আবরণ, b=ফুট, c=রেণুপ্রসূকলা, B—সুপক্ক ক্যাপসুল।

উস্পোর পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হইয়া ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ইহা তিন সারি কোষ দ্বারা তৈয়ারি। উপরের কোষের সারি হইতে **ক্যাপসুল** ও সীটা তৈয়ারি হয়, এবং নিচের দুই



নোটোথাইলাসের জীবনচক্র

সারি হইতে **ফুট** জন্মায়। প্রথম হইতেই **ফুট** বেশ মোটা হয় কিন্তু সীটা ছোট ও মেরিস্টেমেটিক হয়। উপরের স্তরের কোষগুলি প্রস্থে ভাগ হইয়া বাহিরের দিকে **এমফিথিসিয়াম** ও ভিতর দিকে **এণ্ডোথিসিয়াম** সৃষ্টি করে। নোটোথাইলাস লেভেরিতে, **কলুমেলা থাকে**

না এবং এন্ডোথিসিয়াম হইতে রেণুকোষ জন্মায় এবং এমফিথিসিয়াম হইতে আবরণ গঠন করে। নোটোথাইলাস ইন্ডিকাতে, এমফিথিসিয়াম হইতে রেণুকোষ জন্মায়। পাকিলে স্পোরোগোনিয়াম সিলিন্ডারের মত দেখায় এবং দুই প্রান্ত সামান্য সরু হয়। এই স্পোরোগোনিয়ামগুলি থ্যালাসের কিনারায় একক বা এক জোড়া জন্মায়। স্পোরোগোনিয়ামের বাহিরে সম্পূর্ণ বা আংশিক আবরণ থাকে। এই আবরণ মাতৃ-থ্যালাস গঠন করে। ক্যাপসুলের আবরণ স্তরযুক্ত এবং বাহিরের ত্বকে কিউটিন থাকে। ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে কিন্তু স্টোমা জন্মায় না। এমফিথিসিয়াম সম্পূর্ণ বা কিছুটা আবরণ গঠন করে।

রেণু-কলা একান্তরভাবে বন্ধ্যা ও রেণুপ্রসূকলা দ্বারা তৈয়ারি। বন্ধ্যা কোষগুলি মিথ্যা ইলেটার বা সিওডোইলেটার তৈয়ারি করে এবং মায়োসিস প্রণালিতে রেণুমাতৃ কোষগুলি চারিটি রেণু বা স্পোর গঠন করে। রেণু সৃষ্টির সহিত লিঙ্গধর অবস্থার সূচনা হয়। স্পোরগুলি চারিটি প্রাচীর-যুক্ত এবং বাদামী রঙের হয়। ক্যাপসুলের প্রাচীর বিনষ্ট হইয়া স্পোর বাহির হইয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে সুচার (suture) বা আংশিক ফাটিয়া বাহির হয়। স্পোর অঙ্কুরিত হইয়া নূতন লিঙ্গধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

টেরিডোফাইটা (Pteridophyta)

টেরিডোফাইটাগোষ্ঠীটি উদ্ভিদজগৎ-এর **ট্রেকীওফাইটা** বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সুনির্দিষ্ট ভ্যাসকুলার ব্যাণ্ডিলযুক্ত রেণুধর উদ্ভিদ। উদ্ভিদদেহে ব্রাওফাইটাগোষ্ঠীর ন্যায় আরচিগোনিয়াম এবং এনথেরিডিয়াম বর্তমান এবং অপরপক্ষে উন্নতশ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় ইহাদের উৎপত্তি ভ্রূণ (embryo) হইতে হইয়া থাকে কিন্তু ইহাদের বীজ (seed) থাকে না। ইহারা একটি সুবৃহৎ উদ্ভিদগোষ্ঠী এবং প্রায় চারিশত গণ এবং ১০,৫০০ প্রজাতি লইয়া গঠিত, উহাদের মধ্যে কিছু প্রজাতি বর্তমানে জীবাশ্মে পরিণত হইয়াছে।

ইহাদের সচরাচর জলে অথবা আর্দ্র এবং স্যাঁতসেঁতে, ভিজা স্থানে পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশ প্রজাতিই আর্দ্র স্থলজ পরিবেশে জন্মায়, কিন্তু অনেক প্রজাতি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ অথবা পরাশ্রয়ীরূপে (epiphytes) বসবাস করে। টেরিডোফাইটার উদ্ভিদ-দেহটি **রেণুধর উদ্ভিদ** (sporophytic plant) এবং প্রধানতঃ সুগঠিত মূল (root), কাণ্ড (stem) এবং পাতার (leaf) দ্বারা গঠিত। পাতাগুলি পত্ররন্ধ্রযুক্ত ত্বক্ এবং ক্লোরফিলযুক্ত মেসোফিল কলার দ্বারা গঠিত হওয়ায় সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতি প্রধানতঃ পাতাতেই সম্পন্ন হয়। মূল, কাণ্ড এবং পাতার সংবহনকার্য, জাইলেম এবং ফ্লোয়েম কলার সাহায্যে হইয়া থাকে।

রেণুধর উদ্ভিদকে (2n, ডিপ্লয়েড) অযৌন (asexual) অথবা রেণুসংগঠনকারী জণুরূপে অভিহিত করা হয়। ইহা **সমরেণুপ্রসূ** (homosporous) অথবা **অসমরেণুপ্রসূ** (heterosporous) উভয় প্রকারই হইতে পারে। সমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদ **একই আকৃতির রেণু** উৎপাদন করে যাহা অঙ্কুরিত হইয়া উভয়প্রকার যৌনাঙ্গ বহনকারী **সহবাসী লিঙ্গধর উদ্ভিদ** গঠন করে। অসমরেণুর ক্ষেত্রে, রেণুধর উদ্ভিদ দুইপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতির রেণু বহন করে—যথা, **ক্ষুদ্রাকৃতি পুংরেণু** (microspore) এবং **বৃহদাকার স্ত্রীরেণু** (megaspore or macrospore)। পুংরেণু অঙ্কুরিত হইয়া **পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ** (male gametophyte) এবং স্ত্রীরেণু **স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদ** (female gametophyte) গঠন করে। সুতরাং অসমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইট কর্তৃক উদ্ভূত লিঙ্গধর উদ্ভিদ স্বভাবতই **ভিন্নবাসী**।

রেণুগুলি **রেণুস্থলীর** (sporangia) মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং যে বিশেষ প্রকার পত্র উহা বহন করে উহাকে **রেণুপত্র** (sporophyll) বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিণত পল্লবপত্র (foliage leaves) এবং রেণুপত্রগুলির মধ্যে কোন আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায় না। রেণুপত্রগুলি কাণ্ডের উপর পল্লবপত্রের সহিত একত্রে শিথিলভাবে অথবা কাণ্ড বা শাখার বিশেষ স্থানে ঘনসন্নিবিষ্টরূপে অবস্থান করিয়া সুস্পষ্ট **শঙ্কু** (cone) বা রেণুপত্রমঞ্জরী (strobilus) গঠন করে। সমরেণুপ্রসূ টেরিডোফাইটার ক্ষেত্রে রেণুগুলি একই প্রকার আকৃতির এবং উহারা এক ধরনের রেণুস্থলীর মধ্যেই বাহিত হয়। কিন্তু অসমরেণুপ্রসূর ক্ষেত্রে দুই প্রকার রেণুস্থলী—যথা, পুংরেণু বহনকারী **পুংরেণুস্থলী** এবং স্ত্রীরেণু বহনকারী **স্ত্রীরেণুস্থলী** যথাক্রমে **পুংরেণুপত্র** এবং **স্ত্রীরেণুপত্র** দ্বারা বাহিত হয়।

টেরিডোফাইটার জীবন-ইতিহাসে রেণুধর ও লিঙ্গধর জনু দুইটি **পরস্পরের** সহিত **নিয়মিতভাবে** পর্যায়ান্বিত হয় এবং উহাদের **অসম প্রকৃতির নির্দিষ্ট জনুঃক্রম** (heteromorphic alternation of generations) দেখা যায়। ইহাদের উদ্ভিদ দেহটি **রেণুধর** (sporophytic) এবং ডিপ্লয়েড (2n) এবং যৌনজননের সময় দুইটি হ্যাপ্লয়েড (haploid) গ্যামীটের মিলনের **ফলে** ইহার উৎপত্তি হয়। **লিঙ্গধর** (gametophyte) উদ্ভিদের উৎপত্তি, রেণুধর উদ্ভিদ-দেহে হ্যাপ্লয়েড (n) রেণু উৎপন্নের সাথে সাথে শুরু হয়।

বিভিন্ন বিজ্ঞানী টেরিডোফাইটাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন প্রকার করিয়াছেন। উহাদের প্রধান কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইল।

এ জে ইম্স (১৯৩৬) : বিজ্ঞানী ইম্স উদ্ভিদ জগৎ-এর ট্রেকীওফাইটাগোষ্ঠীকে চারিভাগে বিভক্ত করেন
১। **সাইলপসিডা** (Psilopsida)
২। **লাইকপসিডা** (Lycopsida)
৩। **স্ফেনপ্সিডা** (Sphenopsida)
৪। **টেরপ্সিডা** (Pteropsida)

জি. এম. স্মিথ্ (১৯৫৬)
১। **সাইলোফাইটা** (Psilophyta)
২। **লেপিডোফাইটা** (Lepidophyta)
৩। **কেলামোফাইটা** (Calamophyta)
৪। **টেরোফাইটা** (Pterophyta)

পিচি সারমোলি (১৯৫৮)
১। **লাইকপসিডা** (Lycopsida)
২। **স্ফেনপ্সিডা** (Sphenopsida)
৩। **নোয়েগেরাথিয়প্সিডা** (Noeggerathiopsida)
৪। **সাইলোটপসিডা** (Psilotopsida)
৫। **সাইলোফাইটপসিডা** (Psilophytopsida)
৬। **ফিলিকপসিডা** (Filicopsida)

টেরিডোফাইটার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা : আদিকাল হইতেই টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদগোষ্ঠী হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য মানুষ তাহার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে—যথা,

১। **মনুষ্যখাদ্যরূপে** : ড্রায়পটেরিসের অপরিণত বিটপ এবং শুষ্নি শাক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। **পশুখাদ্যরূপে** : **ড্রায়পটেরিস্** এবং অন্যান্য টেরিডোফাইটাগোষ্টীভুক্ত উদ্ভিদের পাতা গবাদিপশুর খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রচলন আছে।

৩। **ঔষধরূপে** : *লাইকোপডিয়ামের চূর্ণ—চর্মরোগে, ইহার রস—হজমের গণ্ডগোলে, বুকে রক্ত পরিশোধন ক্রিয়া উন্নতার্থে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে ব্যবহৃত হয়। মূত্রনালীর বিভিন্ন রোগে এবং রক্ত পরিশোধনার্থে ইকুইসিটাম হইতে উদ্ভূত "Herba Equiseti" নামক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগ আছে।*

৪। **জ্বালানিরূপে** : **লাইকোপডিয়ামের** স্পোর অতীব দাহ্য এবং কোন কোন দেশে আতসবাজী নির্মাণের কাজে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা **"উদ্ভিদজাত চক্‌মকি"** নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

৫। **রাসায়নিক দ্রব্যের উৎস** **ড্রায়পটেরিসের** ছাই হইতে "পটাশ" এবং **ইকুইসিটাম এরভেন্স** হইতে কার্যকরী রোগনিরোধক "সিলিকা" পাওয়া যায়।

৬। **পালিশের কাজে** : এক সময় **ইকুইসিটাম**, কাঠের তৈয়ারি আসবাবপত্র পালিশের কাজে ব্যবহৃত হইত।

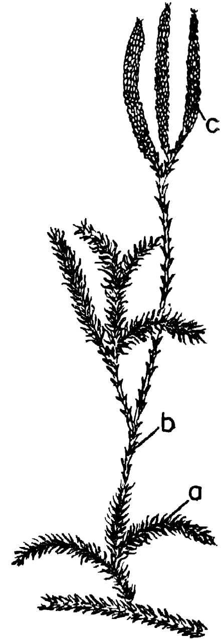
৭। **সৌন্দর্য্যবর্ধক উদ্ভিদরূপে** : বিভিন্ন বাগানে বা ঘর সাজানোর কাজে ইহাদের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium)

ইহা টেরিডোফাইটা শ্রেণীভুক্ত অবীজ উদ্ভিদ। স্পোরানজিয়ামগুলি **ইউস্পোরানজিয়েট** অর্থাৎ স্পোরোফিলের কক্ষ হইতে ৬—১২টি কোষ বার বার বিভক্ত হইয়া প্রাথমিক স্পোরানজিয়াম সৃষ্টি করে। এই সকল কোষ প্রস্থে বিভক্ত হইয়া বাহিরের ও ভিতরের কোষ সৃষ্টি করে। ভিতরেয় কোষগুলি স্পোরসৃষ্টিকারী কলা গঠন করে এবং বাহিরের কোষ হইতে স্পোরানজিয়ামের প্রাচীর তৈয়ারি হয়। এই প্রকার স্পোরানজিয়াম গঠনকে **ইউস্পোরানজিয়েট** বলে।

লাইকোপোডিয়াম সচরাচর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বনজঙ্গলে ও পাহাড়ের পাদদেশে এবং কিছু প্রজাতি শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যায়।

ভারতে কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়—যেমন, **লাইকোপোডিয়াম হ্যামিলটোনাই** (Lycopodium hamiltonii), **লাইকোপোডিয়াম সিলাগো** (Lycopodium selago), **লাইকোপোডিয়াম ক্ল্যাভেটাম** (Lycopodium clavatum), **লাইকোপোডিয়াম সারনাম** (Lycopodium cernum), **লাইকোপোডিয়াম ফ্লেগমেরিয়া** (Lycopodium phlegmaria)।



লাইকোপোডিয়াম
a = পাতা, b = কাণ্ড,
c = স্ট্রোবাইলাস।

রেণুধর উদ্ভিদ

ইহাদের কাণ্ড দুর্বল ও সরু এবং হার্ব অথবা গুল্মের ন্যায় রেণুধর উদ্ভিদ। অনেক প্রজাতি মাটির উপর বা নিচে শায়িত থাকে। অনেক প্রজাতিতে কাণ্ড খাড়াভাবে থাকিয়া, পরে মাটির উপর দিয়া অগ্রসর হয়। কিছু প্রজাতি বায়বীয় হয়। ইহাদের কাণ্ড দ্ব্যগ্রভাবে (dichotomous) শাখা বিন্যাস করে। পাতাগুলি সরল ও ছোট ২—৬ mm, কখন কখন ১৫—১৬ mm হয়। পাতাগুলি সর্পিল আকারে বা আবর্তে কাণ্ডের উপর সাজান থাকে। প্রাথমিক মূল বেশী দিন

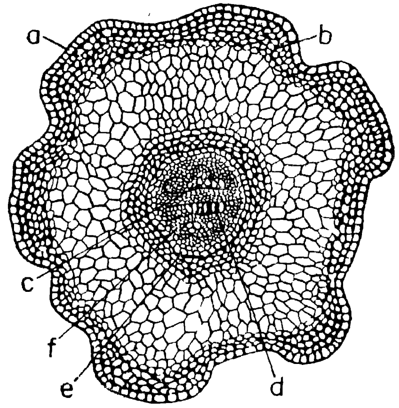
বাঁচে না, পরে বহু অস্থানিক মূল জন্মায় এবং মূলেও দ্বাগ্র শাখা বিন্যাস দেখা যায়। শাখামূল জন্মায় না কিন্তু বহুমূল রোম থাকে।

লাইকোপোডিয়াম সিলাগোতে, কাণ্ডের উপর ছোট ছোট প্রত্যেক পাতার উপর দিকে একটি বড় রেণুস্থলী (sporangium) জন্মায়। এই ক্ষেত্রে সমগ্র রেণুধরটি যেন রেণুপত্রমঞ্জরীর মত। কোন কোন প্রজাতিতে কাণ্ডের নিচের দিকে থাকে সাধারণ পাতা ও উপর দিকে পাতাগুলি আকারে ছোট ও জননক্রিয়ার জন্য রেণুস্থলী বহন করে। এই রেণুস্থলীগুলি রেণুপত্রমঞ্জরী বা স্ট্রোবাইলাস গঠন করে।

কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

ইহার প্রস্থচ্ছেদে ভিতরে স্টীল ও বাহিরে কর্টেক্স থাকে। ইহার স্টীলের বাহিরে ৩।৪স্তরের পেরিসাইকল। ভিতর দিকে জাইলেম প্রোটোস্টীল ও এক্স আর্ক। জাইলেম তারকার মতও কয়েকটি জাইলেমের ছটা থাকে। ছটার মাঝে মাঝে ফ্লোয়েম থাকে এবং কিছু প্যারেনকাইমা। উন্নত ধরণের প্রজাতিতে টুকরা টুকরা ভাবে থাকে।

কর্টেক্সের বাহিরের দিকে, একস্তরের এপিডারমিস ও উহাতে পত্ররন্ধ্র থাকে। কর্টেক্স কয়েক স্তরের প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু প্যারেনকাইমা ও কিছু ভিতর দিকে স্কেলেরেনকাইমা থাকে অথবা সম্পূর্ণ স্কেলেরেনকাইমার দ্বারা তৈয়ারি হয়।

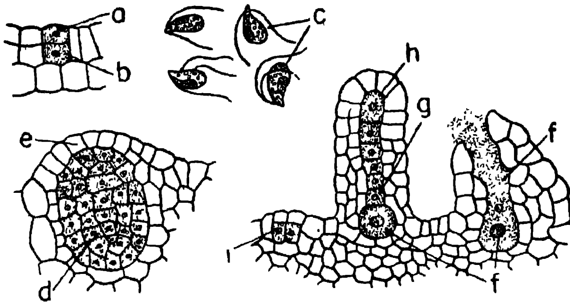


লাইকোপোডিয়ামের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ
a = এপিডারমিস, b = কর্টেক্স, c = ফ্লোয়েম, d = জাইলেম, e = এন্ডোডারমিস, f = পেরিসাইকেল।

জনন

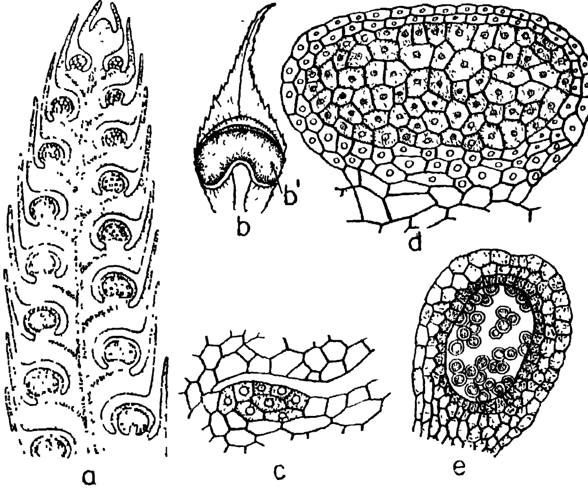
ইহার অঙ্গজ জনন ও যৌন জনন হয়।

অঙ্গজ জনন—রাইজোমের পুরাতন অংশ মৃত হয় এবং নূতন অংশ অগ্রসর হইতে



লাইকোপোডিয়াম : a = প্রাথমিক আবরণ, b = প্রাথমিক এনথেরিডিয়াম কোষ, c = পুং জননকোষ, d = পাকা এনথেরিডিয়াম পুং জনন মাতৃকোষ, e = আবরণ, f = ডিম্বাণু বা এগ্, g = ভেনট্রাল নালীকোষ, h = নালীকোষ, i = আরকিগোনিয়াম প্রাথমিক কোষ, f আরকিগোনিয়াম।

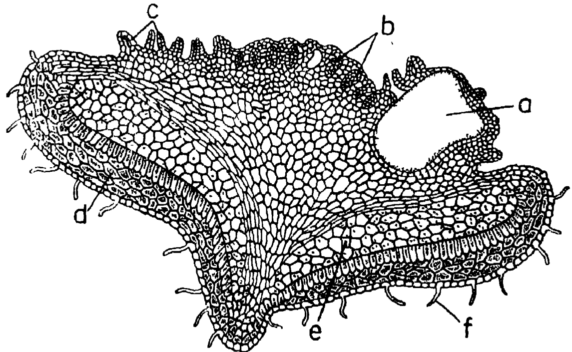
থাকে। শাখাগুলি পৃথক হইয়া নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। কাণ্ডের শাখার অগ্রভাগ চেপ্টা হইয়া বালবিল গঠন করে। প্রতি বৎসর এই প্রকার বালবিল বা গেমা মাটিতে পড়িয়া মূল জন্মায় এবং নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। কয়েক প্রজাতি শীতকালে মৃত হয় কিন্তু অগ্রভাগ জীবিত থাকে শীতের পর, নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।



লাইকোপোডিয়াম : a=স্ট্রোবাইলাসের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ, b=স্পোরোফিল ও স্পোরানজিয়াম (b') c=স্পোর মাতৃকোষ বা প্রাথমিক কোষ, d=স্পোরানজিয়াম ও স্পোর মাতৃকোষ, e=স্পোরানজিয়াম।

বালবিলের পাতা ও মূল পৃথক হইয়া নূতন উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে।

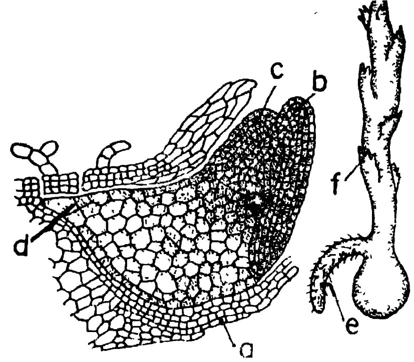
লাইকোপোডিয়ামে একপ্রকার রেণু সৃষ্টি হয়, সুতরাং সমরেণুপ্রসূ (homosporous)। রেণুগুলি বৃক্কের ন্যায় রেণুস্থলীতে জন্মায়। ইহাদের বৃন্ত ছোট। রেণুধর পত্রের উপরে রেণুস্থলী গঠন করে। রেণুধর পত্রগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া রেণুধরমঞ্জরী বা স্ট্রোবাইলাস বা কোন্ (cone) সৃষ্টি করে। রেণুস্থলী ইউস্পোরানজিয়েট ভাবে জন্মায়। রেণুসৃষ্টিকারী কলার চারিদিকে টেপটাম্ (tapetum) থাকে। ইহা পুষ্টিদান করে। রেণুমাতৃকোষ মায়োসিস দ্বারা চারিটি স্পোর টেটরাড্ গঠন করে। মায়োসিস দ্বারা স্পোর বা রেণুর সৃষ্টি হইল



লিঙ্গধর উদ্ভিদ—লাইকোপোডিয়াম : a=ভ্রূণ, b=এনথেরিডিয়া, c=আরকিগোনিয়া, d=মাইকোরাইজা অঞ্চল, e=সঞ্চয়ী কলা, f=রাইজয়েড।

লিঙ্গধর বা হ্যাপ্লয়েড অবস্থার সূচনা। প্রত্যেক রেণুতে তিনকোণের উচ্চতা থাকে এবং রেণু প্রাচীর মসৃণ অথবা নানাভাবে মোটা বা স্থূল হইতে পারে।

রেণুস্থলী (sporangium) পাকিলে উহার উপরদিকে কতকগুলি কোষ ফাটিয়া রেণু বাহির হইয়া পড়ে। অনুকূল অবস্থায় প্রত্যেক রেণু অঙ্কুরিত হইয়া **লিঙ্গধর** সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রজাতিতে অল্পকাল স্থায়ী লিঙ্গধর হয় কিন্তু লতান (creeping) ও বায়বীয় প্রজাতিতে কিছুকাল বিশ্রাম (২—৮ বৎসর) করিবার পর অঙ্কুরিত হয়—যথা, লাইকোপোডিয়াম ক্লেভেটাম। রেণু অঙ্কুরিত হইবার পর একটি ছোট, খণ্ডিত সবুজ রঙের লিঙ্গধর জন্মায়। তলার দিক কেবল সবুজ নহে। লাইকোপোডিয়াম ক্লেভেটামের লিঙ্গধর বেশ বড়, আকারে গাজরের মত এবং পাকিতে প্রায় ৫—১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়। লিঙ্গধরের মাটির উপরের অংশ খণ্ডিত এবং উহাতে **জনন অঙ্গ** সৃষ্টি হয়। দুই প্রকার লিঙ্গধরের মধ্যেই অন্তঃছত্রাক (endophytic) থাকে, ইহাকে **মাইকোরাইজা** (mycorrhiza) বলে।



লাইকোপোডিয়ামের ভ্রূণ a—ফুট, b=বীজপত্র, c=কাণ্ড, d—সাসপেনসর, e=মূল, f=শল্কপত্র।

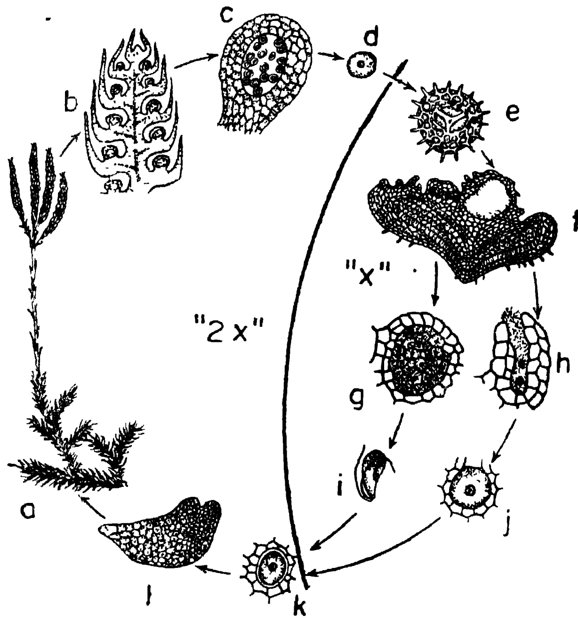
লাইকোপোডিয়ামের লিঙ্গধর **সহবাসী** (monoecious) এবং এনথেরিডিয়াও আরকিগোনিয়া খণ্ডিত অংশের মাঝে মাঝে জন্মায়। কয়েকক্ষেত্রে লিঙ্গধরের কিছু ভিতরে ঐগুলি গঠন করে।

এনথেরিডিয়াগুলি কিছু বাহির হইয়া থাকে অথবা লিঙ্গধরের মধ্যে অবস্থিত হয়। এনথেরিডিয়ামের প্রাচীর এক স্তরের এবং ভিতরে অনেকগুলি শুক্রাণু মাতৃকোষ থাকে। প্রত্যেক শুক্রাণু মাতৃকোষ একটি শুক্রাণুতে পরিণত হয়।

আরকিগোনিয়া লিঙ্গধরের মধ্যে জন্মায় কিন্তু গ্রীবাটি উপর দিকে বাহির হয়। সুপক্ক আরকিগোনিয়ামে একটি ডিম্বাণু, একটি অক্ষীয় নালীকোষ ও ৬—১২টি গ্রীবা নালীকোষ থাকে। ছোট আরকিগোনিয়ামে একটি গ্রীবা নালীকোষ পাওয়া যায়। আরকিগোনিয়াম পাকিলে গ্রীবা নালীকোষ ও অক্ষীয় নালীকোষ বিনষ্ট হইয়া একটি পথ সৃষ্টি করে ; এই পথে একটি শুক্রাণু প্রবেশ করিয়া, ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাকে নিষেক বলে। এনথেরিডিয়াম ভাঙ্গিয়া শুক্রাণুগুলি বাহির হয় ও ডিম্বাণুর দিকে সাঁতার কাটিয়া যাইতে থাকে।

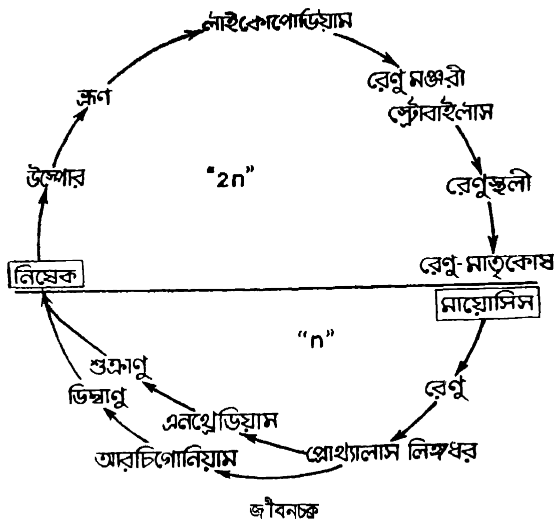
নিষেকের পর ডিম্বাণু উস্পোরে পরিণত হয়। উস্পোর ডিপ্লয়েড এবং ইহা হইতে রেণুধর উদ্ভিদের সূচনা।

উস্পোর ক্রমাগত কোষ বিভাজন করিয়া **ভ্রূণ** সৃষ্টি করে। ভ্রূণে একটি **সাসপেনসর কোষ** (suspensor cell), ফুট (foot) নামে পুষ্টি শোষণ অঙ্গ, কাণ্ড, একটি পাতা ও ধীরে ধীরে মূল জন্মায়। ভ্রূণ হইতে ক্রমে রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় এবং



লাইকোপোডিয়ামের জীবনচক্র . a = রেণুধর উদ্ভিদ, b = স্ট্রোবাইলাস, c = স্পোরানজিয়াম, d = স্পোর মাতৃকোষ, e = স্পোর, f = লিঙ্গধর উদ্ভিদ, 2x = ডিপ্লয়েড, x = হ্যাপ্লয়েড, g = এনথেরিডিয়াম, h = আরকিগোনিয়াম, i = পুং জননকোষ, j = ডিম্বাণু, k = জাইগোট, l = ভ্রূণ ।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ কয়েক বৎসর ইহার পুষ্টি দান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি রেণুধর উদ্ভিদ, একই লিঙ্গধর উদ্ভিদের উপর গঠন করে ।



জীবনচক্র

সিলাজিনেলা (Selaginella)

সিলাজিনেলা অবীজ উদ্ভিদ বা **ক্রিপটোগ্যাম দলভুক্ত টেরিডোফাইটার** অন্তঃগত লাইকোপোডিনী শ্রেণীর উদ্ভিদ।

ফ্যামিলী –সিলাজিনেলাসী

ইহা গরমপ্রধান স্থানের আর্দ্র বনে, ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মায়। বহু প্রজাতি পাহাড়ের ছায়ায় পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রজাতি আরোহী হয়। ইহারা বেশীর ভাগ বহুবর্ষ-জীবী এবং কয়েকটি বর্ষজীবী।

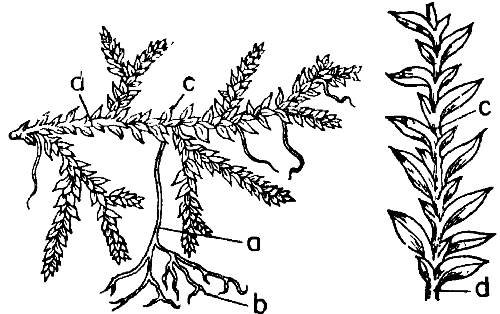
সিলাজিনেলা রেণুধর উদ্ভিদ। ইহা চিরহরিৎ গুল্ম। কান্ড শাখাযুক্ত, বিষমপৃষ্ঠ ও শায়িত কিন্তু অগ্রভাগ উন্নত। ইহাদের শাখা ডাইকোটোমাস বা দ্ব্যগ্র। পাতা দুই রকমের—বড় এবং ছোট। পাতাগুলি চারি সারিতে দুইটি যুগ্ম অবস্থায় সাজান থাকে। ছোটপাতা উপর দিকে দুই সারিতে এবং বড় পাতা নিচের দিকে দুই সারিতে থাকে। পাতার গোড়ায় উপরের দিকে ছোট **লিগিউল** থাকে। পাতা সরল ও শাখাহীন মধ্যশিরা থাকে। একটি শিরা থাকায়, ইহাকে মাইক্রোফাইলাস (microphyllous) বলে। কান্ডের উপর যে স্থানে পাতা বাহির হয়, সেই স্থানের নিকট দীর্ঘ, পত্রহীন রাইজোফোর জন্মায়। রাইজোফোরের প্রান্তদেশে মূল বাহির হয়। মূলগুলি দ্ব্যগ্র শাখাযুক্ত। মূলগুলি অস্থানিক।

মূলের প্রস্থচ্ছেদ

ইহার বাহিরের স্তরকে পাইলিফেরস স্তর বলে। ইহার উপর এককোষী মূলরোম থাকে। ইহার অধঃত্বক্ স্কেলেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ইহার ভিতরে এন্ডোডারমিস এবং উহার ভিতর দিকে একস্তরবিশিষ্ট পেরিসাইকল। ইহার বান্ডিল প্রোটোস্টেল ও মনার্ক।

রাইজোফোরের প্রস্থচ্ছেদ

রাইজোফোরের বাহিরের স্তরে মূল রোম থাকে না। ভিতরে অন্তঃত্বক্, এন্ডোডারমিস ও একস্তরের পেরিসাইকেল। ইহার মূলের ন্যায় বান্ডিল প্রোটোস্টেল ও মনার্ক।

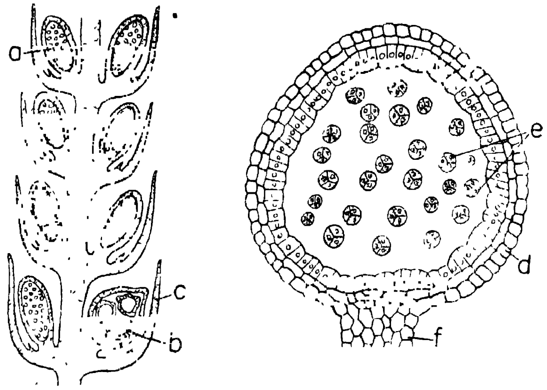


a=সিলাজিনেলার রাইজোফোর, b=মূল, c=পাতা, d=কান্ড।

কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

ইহার বাহিরের ত্বক্ একস্তরের এবং বাহিরের প্রাচীর কিউটিকলযুক্ত। ইহা প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ত্বকের ভিতরে বহুস্তরের কর্টেক্স। কর্টেক্সের বাহির দিক স্কেলেরেনকাইমা দ্বারা তৈয়ারি এবং ভিতরে প্যারেনকাইমা দ্বারা সাধারণ কর্টেক্স গঠিত। ইহার এন্ডোডারমিসের স্থানে সরু, দীর্ঘ ট্রাবেকুলাতে পরিণত হইয়াছে

ট্রাবেকুলা স্টেলিগুলিকে কর্টেক্সের সহিত যুক্ত রাখে। ইহার স্টেলি একটি (মনোস্টেলিক) বা একাধিক স্টেলি (পলিস্টেলিক) হয়। প্রত্যেক স্টেলির চারিদিকে বাতাবকাশ (air space) পাওয়া যায়। ইহা ভ্যাসকুলার বাণ্ডিলকে ঘিরিয়া থাকে। ইহার বাণ্ডিলের জাইলেম এসার্ক এবং প্রোটোস্টিল।



সিলাজিনেলার কোনের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ : a=মাইক্রোস্পোরানজিয়াম, b=মেগাস্পোরানজিয়াম, c=স্পোরোফিল, d=মাইক্রোস্পোরানজিয়াম, e=স্পোর টেট্রাড, f=বৃন্ত।

পাতার প্রস্থচ্ছেদ

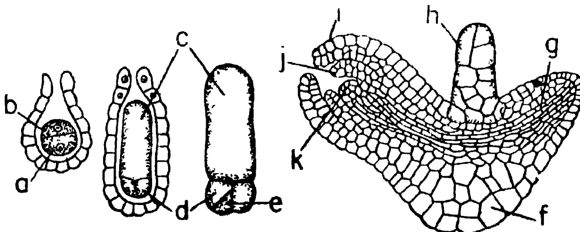
পাতার উপরে ও নিচে একস্তরের ত্বক্। নিচের ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে। ইহার মেজোফিল লম্বা প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ইহার বাণ্ডিলের মধ্যস্থলে জাইলেম থাকে। মেজোফিলে বাতাবকাশ পূর্ণ কলা থাকে।

জনন

অঙ্গজ জনন

ইহাদের শাখাপ্রশাখা ও মাটির নিচের অঙ্গ হইতে টিউবার দ্বারা নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদের বাল্‌বিল্ দ্বারাও নূতন উদ্ভিদ জন্মায়।

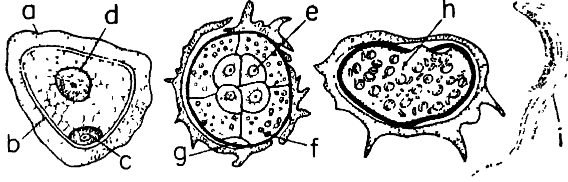
ইহাদের দুই প্রকারের স্পোর দ্বারা উন্নত রকমের সবীজ উদ্ভিদের ন্যায় জনন ক্রিয়া হয়। দুই প্রকারের স্পোর হয় বলিয়া, ইহাকে **অসমরেণুপ্রসূ** (heterosporous) বলে।



a=প্রাথমিক ভ্রূণ, b=প্রাথমিক সাসপেনসর, c=সাসপেনসর, d=ভ্রূণ, e=কাণ্ড, f=ভ্রূণের ফুট, g=রাইজোফোর, h=সাসপেনসর, i=বীজপত্র, j=লিগিউল, k=কাণ্ড।

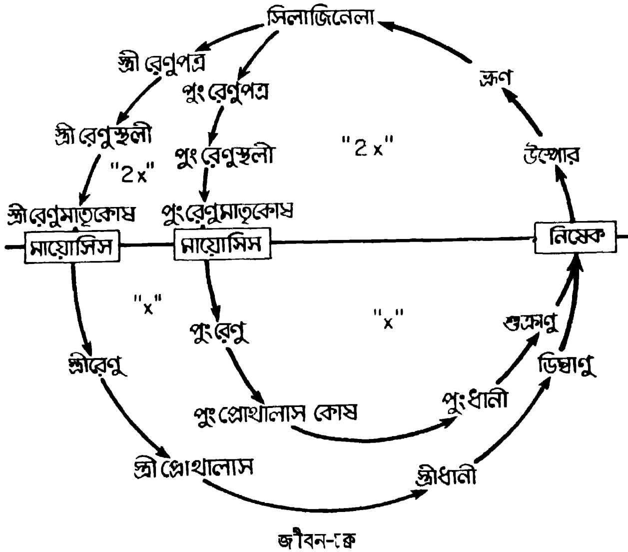
যে সকল কাণ্ড খাড়াভাবে থাকে, তাহাদের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র অক্ষের উপর ঘন সন্নিবেশিত হইয়া **রেণুপত্রগুলি**, একটি **রেণুপত্রমঞ্জরী** (cone বা sporangi-

ferous spike) সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে **স্ত্রীরেণুপত্র** (megasporophyll) **স্ত্রীরেণুস্থলী** (megasporangium) ধারণ করে। **পুংরেণুপত্র** (microsporc-phyll) **পুংরেণুস্থলী** (microsporangium) বহন করে। স্ত্রীরেণুপত্রের কক্ষে স্ত্রীরেণুস্থলী থাকে। স্ত্রীরেণুস্থলীর মধ্যে একটিমাত্র কার্যকরী **স্ত্রীরেণুমাতৃকোষ**



সিলাজিনেলার পুং লিঙ্গধর : a = এক্সাইন, b = ইনটাইন, c = প্রোথ্যালাস কোষ, d = প্রাথমিক এনথেরিডিয়াম, e = প্রাথমিক পুং জননকোষ, f = আবরণ, g = প্রোথ্যালাস কোষ, h = পুং জননকোষ, i = একটি পুং জননকোষ।

(megaspore mother cell) জন্মায়। স্ত্রীরেণুমাতৃকোষ মায়োসিস প্রণালিতে চারিটি বৃহৎ **স্ত্রীরেণু** (megaspore) জন্মায়। পুংরেণু পত্রের কক্ষে পুংরেণুস্থলী (microsporangium) থাকে। ইহার ভিতর অনেকগুলি পুংরেণু মাতৃকোষ



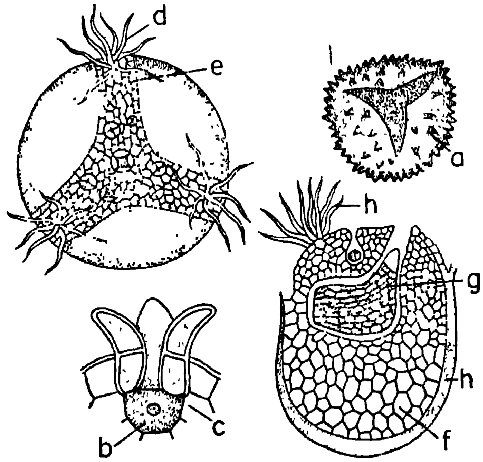
জীবন-চক্র

সৃষ্টি হয়। পুংরেণুমাতৃকোষগুলি মায়োসিস প্রণালিতে চারিটি করিয়া বহু পুংরেণু (microspore) সৃষ্টি করে। পুংরেণু ও স্ত্রীরেণু চারিটি তলবিশিষ্ট (tetrahedral) অর্থাৎ ইহাদের তিনটি উঁচু প্রান্ত আছে (triradiate ridges) রেণুগুলি হ্যাপ্লয়েড (haploid) এবং ইহা হইল লিঙ্গধর জনুর (gametophyte) প্রথম সূত্রপাত।

পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ (male gametophyte)—পুংরেণুস্থলীর মধ্যে থাকিবার সময় হইতেই পুংরেণুর অংকুরোদ্গম হয়। রেণুস্থলীর প্রদগপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া, ইহা বাহির হয়। পুংরেণুর অংকুর হইতে একটি **প্রোথ্যালাস কোষ** (prothallial cell) সৃষ্টি হয়। অবশিষ্ট বৃহৎ কোষটি **পুংধানীমাতৃকোষ** (antheridial mother cell) এবং পরে ইহা হইতে বহু **শুক্রাণু** মাতৃকোষ জন্মায় এবং ইহাদের চারিদিকে চারিটি বড় আবরণী কোষ (jacket cells) থাকে। প্রতিটি মাতৃকোষ হইতে দ্বিফ্লাজেলামযুক্ত শুক্রাণু জন্মায়। পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদটি পাকিলে, মাতৃকোষ ফাটিয়া যায় এবং শুক্রাণু বাহির হইয়া পড়ে। ইহার পর রেণুপ্রাচীর ফাটিয়া শুক্রাণুগুলি ছড়াইয়া যায়।

স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ

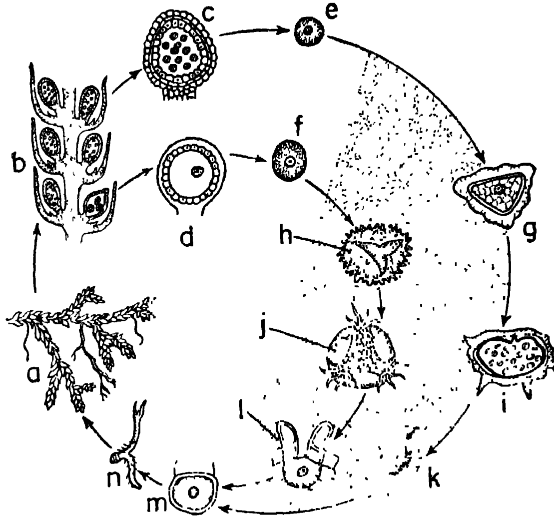
স্ত্রীরেণু স্ত্রীরেণুস্থলীর ভিতর অংকুরিত হয়। স্ত্রীরেণুর প্রোটোপ্লাস্ট সংকুচিত হয় এবং মুক্ত বিভাজন করিয়া নিউক্লিয়াসটি বহু-নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে; ইহার মধ্যস্থলে একটি বড় ভ্যাকুওল গঠন করে। ক্রমে প্রোটোপ্লাজম বৃদ্ধিলাভ করে ও ভ্যাকুওল অদৃশ্য হয়। উঁচু দিকের নিউক্লিয়াসগুলি প্রাচীর তৈয়ারি করিয়া কতকগুলি কোষ গঠন করে। ইহাকে **স্ত্রীপ্রোথ্যালাস** বলে। ইহার নিচের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং ডায়াফ্রাম (diaphragm) সৃষ্টি করে। উঁচু দিকের কোষগুলি বড় হইয়া **স্ত্রীধানী** (archegonium) গঠন করে। স্ত্রীধানীর গ্রীবা ও অংক থাকে। গ্রীবাতে গ্রীবানালী কোষ, অংকে অংকীয় নালী কোষ ও ডিম্বাণু জন্মায়। স্ত্রীধানী পাকিলে গ্রীবানালী কোষগুলি ও অংকীয় নালী কোষটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং একটি পথ সৃষ্টি হয়। ইহার পর পুংধানী হইতে শুক্রাণুগুলি বাহির হইয়া জলের সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া স্ত্রীধানীর নিকটে পোঁছায়। একটিমাত্র শুক্রাণু ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। এই **নিষেকের** ফলে ডিম্বাণুর চারিদিকে প্রাচীর তৈয়ার হয় এবং ইহা উস্পোরে পরিণত হয়। উস্পোর হইতে **রেণুধর** জনুর বা ডিপ্লয়েড জনুর সৃষ্টি।



a = সিলাজিনেলার মেগাস্পোর, b = ডিম্বাণু, c = ভেনটার, d = রাইজয়েড, e = আর্কিগোনিয়া, f = এন্ডোস্পারম বা সস্য, g = ভ্রূণ, h = রাইজয়েড।

ভ্রূণ

উস্পোর কোষ বিভাজন করিয়া ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ভ্রূণে মূল, কাণ্ড, দুইটি বীজপত্র, ফুট ও সাসপেনসর থাকে।



সিলাজিনেলার জীবনচক্র . a = রেণুধর উদ্ভিদ, b = স্ট্রোবাইলাস, c = মাইক্রোস্পোরানজিয়াম, d = মেগাস্পোরানজিয়াম, e = মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ, f = মেগাস্পোর মাতৃকোষ, g = মাইক্রোস্পোর, h = মেগাস্পোর, i = পুং লিঙ্গধর, j – স্ত্রী লিঙ্গধর, k = পুং জননকোষ l = ডিম্বাণু m = জাইগোট, n = রেণুধর ভ্রূণ।

ইকুইসিটাম (Equisetum)

ইকুইসিটাম টেরিডোফাইটা দলভুক্ত অবীজ (cryptogam) উদ্ভিদ। ইহাকে সাধারণতঃ "হরস টেল" বলে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছাড়া পৃথিবীর সকল স্থানে ইহাদের পাওয়া যায়। সচরাচর শীতল, শীতপ্রধান স্থানে জন্মায়। পাহাড়ে, ভিজা মাঠে ও অন্ধকার জলাভূমিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় প্রজাতি হইল **ইকুইসিটাম ডিফিউসাম, ইকুইসিটাম রোবাসটাম ও ইকুইসিটাম ডিবাইল।**

রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte)

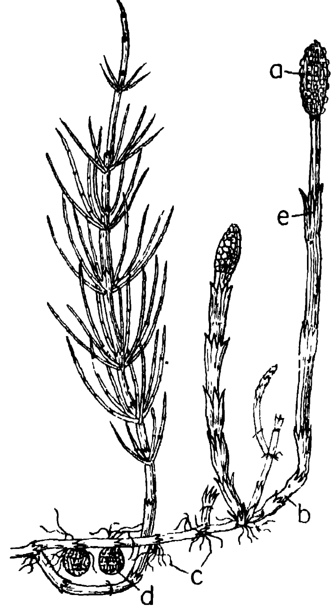
উদ্ভিদটি বহুবর্ষজীবী হার্ব। ইহার দৈর্ঘ্য ৬ সেন্টিমিটার হইতে প্রায় এক মিটার কেবল দক্ষিণ আমেরিকার ইকুইসিটাম জাইগ্যানটাম প্রায় ১০ –১৫ মিটার দীর্ঘ হয়।

কান্ডটি বহুশাখাযুক্ত শায়িত রাইজোম। রাইজোম হইতে বহু অন্তর্বায়বীয় বিটপ জন্মায়। ইহাদের দুই প্রকার বায়বীয় বিটপ—কতকগুলি উর্বর (fertile) এবং কতকগুলি বন্ধ্যা (sterile)।

বন্ধ্যা বিটপগুলি সবুজ বর্ণের ও শাখাযুক্ত এবং ইহারা জায়মান বা বর্ধনসাধক (vegetative)। উর্বর বিটপগুলি বাদামী বা ফিকা রঙের, শাখাহীন এবং অল্পদিন স্থায়ী। ইহারা স্পোর বহন করে ও পরে অবলুপ্ত হয়। কান্ডের পর্ব ও পর্বমধ্য আছে এবং পর্বমধ্যের গাত্র খাঁজযুক্ত (ribbed) থাকে। প্রত্যেক পর্বে ছোট

ছোট শল্কপত্র থাকে। পাতাগুলি সবুজ নহে এবং নিচের দিকে যুক্ত হইয়া পর্বমধ্যকে বেষ্টন করে। ইহাদের সালোক-সংশ্লেষ কাণ্ড ও শাখা সম্পাদন করে। বন্ধ্যা বিটপের শাখাগুলি ও পাতাগুলি বৃত্তাকারে সাজানো থাকে। শাখা ও পাতা কাণ্ডের উপর পর্যায়ান্বিত ভাবে থাকে।

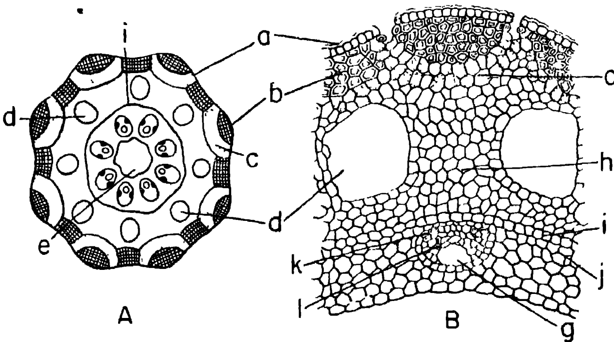
ইহাদের মূল অস্থানিক ও গুচ্ছাকার। মূল রাইজোম হইতে অথবা পার্শ্বশাখার নিচে জন্মায়। ইহা ভিতরের কলা হইতে সৃষ্টি হয় (endogenous)।



ইকুইসিটাম a=স্ট্রোবাইলাস, b রাইজোম, c=অস্থানিক মূল, d টিউবার, e - শল্কপত্র।

কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

বাহিরের একস্তর ত্বক এবং খাঁজযুক্ত তরঙ্গাকার। ত্বকের বাহিরের প্রাচীরে সিলিকা থাকে। ত্বকের খাঁজে খাঁজে পত্ররন্ধ্র আছে। ত্বকের ভিতর কর্টেক্স ও স্টীল। কর্টেক্সে তিনটি অঞ্চল (ক) হাইপোডারমিস, (খ) সাধারণ কর্টেক্স ও (গ) এণ্ডোডারমিস। হাইপোডারমিস স্কেলেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত; সাধারণ কর্টেক্স প্যারেনকাইমার এবং মাঝে মাঝে বায়ু গহ্বর অথবা "ভ্যালিকুলার গহ্বর" থাকে। ইহা প্রত্যেক খাঁজের নিচে অবস্থিত। বায়ু গহ্বর ভ্যাসকুলার বাণ্ডিলের জলপূর্ণ গহ্বর বা "ক্যারিনেল" গহ্বরের সহিত পর্যায়ান্বিত। সাধারণ কর্টেক্সের সীমানায়



A—ইকুইসিটামের প্রস্থচ্ছেদ-কাণ্ড, B—উহার একঅংশ ; a—এপিডার্মিস, b—হাইপোডারমিসের স্কেলেরেনকাইমা, c—ক্লোরেনকাইমা, d—ভেলিকিউলার কেভিটি, f—পিথ কেভিটি, g—ক্যারিনেল কেভিটি h—ভিতরের কর্টেক্স, i—এণ্ডোডারমিস, j—পেরিসাইকেল, k—মেটাজাইলেম, l—ফ্লোয়েম।

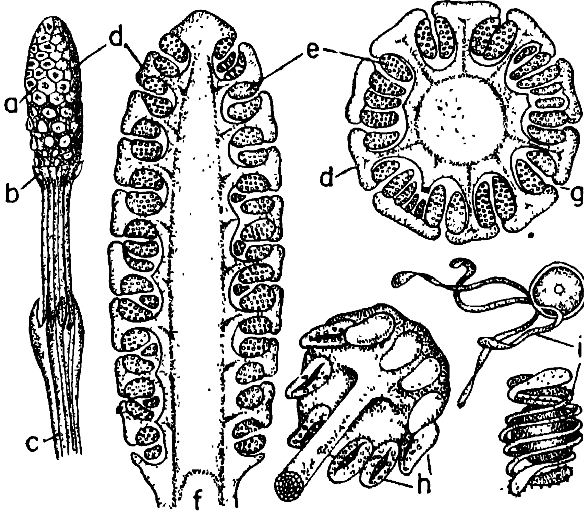
সবুজকণাযুক্ত প্যারেনকাইমা থাকে। এণ্ডোডারমিস স্টীলকে বেষ্টন করে। ইহার পেরিসাইকেল একস্তরের প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ভ্যাসকুলার বাণ্ডিলগুলি

সমপার্শ্বীয় যুক্ত ও বন্ধ। এই বান্ডিলগুলির মধ্যে ক্যারিনেল গহবর থাকে। *বান্ডিলগুলি প্যারেনকাইমা দ্বারা পৃথক থাকে। প্রোটোজাইলেম এণ্ডার্ক।* ক্যারিনেল গহবরের বাহিরে ফ্লোয়েম। ফ্লোয়েম সীভনল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ফ্লোয়েমের দুই ধারে মেটাজাইলেম অবস্থিত। ইহাতে কেবল ট্রাকিড থাকে। কেন্দ্রে থাকে মজ্জা এবং একটি বড় গহবর কেন্দ্রের মজ্জায় অবস্থিত।

মূলের প্রস্থচ্ছেদ

বাহিরের দিকে একস্তরের এক্সোডারমিস। ইহার ভিতর কয়েক স্তরের কর্টেক্স। ইহার দুই স্তরের এণ্ডোডারমিস থাকে। ভিতরের এণ্ডোডারমিস পেরিসাইকেলের পরিবর্তে থাকে। চারিটি প্রোটোজাইলেমের সমষ্টি ও চারিটি ফ্লোয়েম সমষ্টির সহিত পর্যায়ান্বিত। কেন্দ্রে একটি বড় মেটাজাইলেম পাওয়া যায়।

উর্বরশাখার অগ্রভাগে **রেণুপত্রমঞ্জরী** (cone or strobilus or sporangiferous spike) তৈয়ারি হয়। ইহার মধ্যে অক্ষের উপর কতকগুলি রেণুস্থলী জন্মায়। রেণুস্থলীবহনকারী বৃন্তকে স্পোরানজিয়োফোর বলে। এইগুলি বৃত্তাকারে অক্ষের উপর থাকে। প্রধান অক্ষের সহিত ৯০° কোণ সৃষ্টি করিয়া স্পোরানজিওফোর একটি চাকতির মত অংশ বহন করে। স্পোরানজিয়োফোরের নিচের তলে

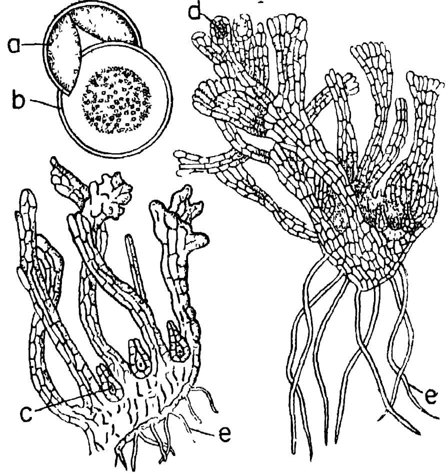


a—স্ট্রোবাইলাস, b—এনিউলাস, c—স্পোরবহনকারী কোণ, d—স্পোরানজিওফোর, e স্পোরানজিয়া, f—দৈর্ঘ্যচ্ছেদ, g—প্রস্থচ্ছেদ, h—স্পোরানজিয়া, i—ইলেটার ও স্পোর।

৫-১০ রেণুস্থলী জন্মায়। প্রত্যেক রেণুস্থলীতে অনেকগুলি স্পোরমাতৃকোষ থাকে। প্রত্যেক মাতৃকোষ হইতে মায়োসিস দ্বারা চারিটি স্পোর জন্মায় ; প্রত্যেক সুপক্ক রেণুস্থলীতে বহু স্পোর থাকে। এই স্পোর হইতে লিঙ্গধর উদ্ভিদের সূচনা হয়।

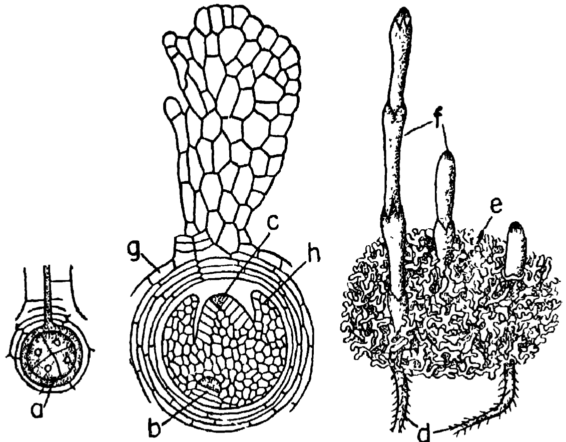
লিঙ্গধর উদ্ভিদ

রেণুস্থলী বিদীর্ণ হইয়া স্পোর বাহির হয়। স্পোরগুলি সবুজ রঙের এবং স্পোরের দুইটি আবরণ থাকে। একটি কিউটিকেল স্তর এবং দ্বিতীয়টি পেরিস্পোর (peris-pore)। পেরিস্পোর হইতে চারিটি ফিতার মত ইলেটার জন্মায়। ইলেটারের অগ্রভাগ চামচের মত এবং একই স্থানে ইহারা আবদ্ধ থাকে। ইলেটার আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে সক্ষম (hygroscopic) ; ইলেটার বাতাস শুষ্ক থাকিলে খুলিয়া যায় এবং আর্দ্র হইলে স্পোরকে বেষ্টন করে। ইহার দ্বারা বোধ হয় স্পোর বিস্তারে সাহায্য হয়। স্পোরগুলি একই প্রকারের সুতরাং **সমরেণুপ্রসূ** (homosporous)। স্পোর অঙ্কুরিত হইয়া ছোট, সবুজ বর্ণের প্রোথ্যালাস গঠন করে। প্রোথ্যালাস কয়েক স্তরের কলার দ্বারা তৈয়ারি এবং উপর দিকে কতকগুলি এককোষ পুরু শাখা সৃষ্টি করে। নিচের দিকে রাইজয়েড থাকে।



ইকুইসিটাম : a = স্পোরের একসাইন, b = ইনটাইন d = পুং লিঙ্গধর এনথেরিডিয়া e = রাইজয়েড c = আরকিগোনিয়া।

এনথেরিডিয়া এই সকল খাড়া শাখার প্রান্তে জন্মায়। আরকিগোনিয়া এই সকল শাখার নিচের দিকে জন্মায়। প্রোথ্যালাস সহবাসী। কিছুকাল পূর্বে লিঙ্গধর ছোট এবং একস্তর পুরু হইলে কেবল এনথেরিডিয়াম দেখা যাইত এবং মনে হইত ভিন্নবাসী। সম্ভবতঃ পুষ্টির অভাবের জন্য ইহা হইত। **ইকুইসিটাম আরভেনসিতে**, গবেষণাগারে অর্ধেকগুলি স্পোর পুংলিঙ্গধর ও অপর অর্ধেক সংখ্যক স্পোর হইতে স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন প্রজাতির ইকুইসিটামে এইরূপ কখন সহবাসী এবং কখন বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবে

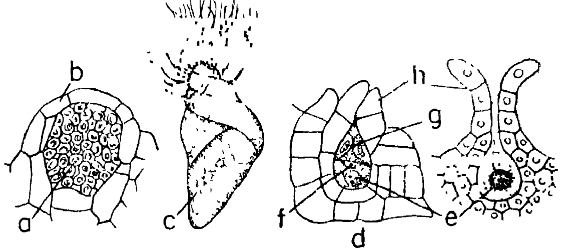


a = ভেনটারের ভিতর ভ্রূণ, b = মূল, c = কাণ্ড, d = মূল, e = প্রোথ্যালাস, f = কাণ্ড।

ভিন্নবাসী লিঙ্গধর উদ্ভিদ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উক্ত আচরণকে সুপ্ত-অসমরেণু প্রসীতা বা incipient heterospory বলে।

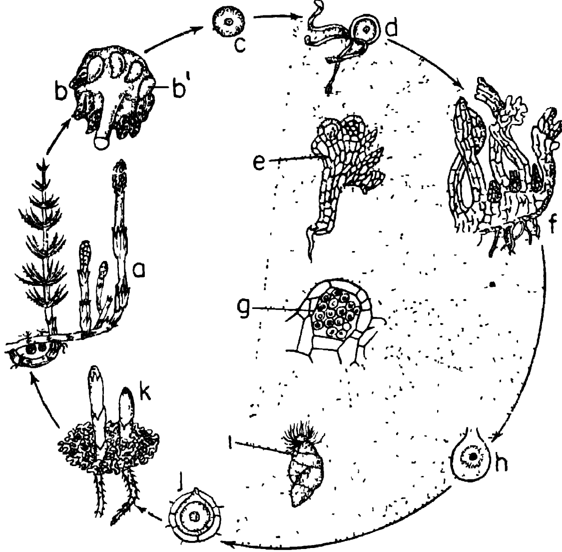
প্রোথ্যালাসের আয়ুঃকাল দুই বৎসরও হইতে পারে।

প্রত্যেক এনথেরিডিয়ামে এক কোষস্তর বিশিষ্ট বাহিরের আবরণ থাকে। ইহার ভিতরে কতকগুলি শুক্রাণু মাতৃকোষ থাকে। শুক্রাণু মাতৃকোষ একটি বহু ফ্ল্যাজেলামযুক্ত শুক্রাণুতে পরিণত হয়। শুক্রাণু পাকান ও সর্পিল আকারের হইয়া থাকে।



ইকুইসিটাম a = এনথেরিডিয়াম, b = আবরণ, c = শুক্রাণু, d = আরকিগোনিয়াম, e = ডিম্বাণু f = অঙ্কীয় কোষ, g = নালী, h = গ্রীবা।

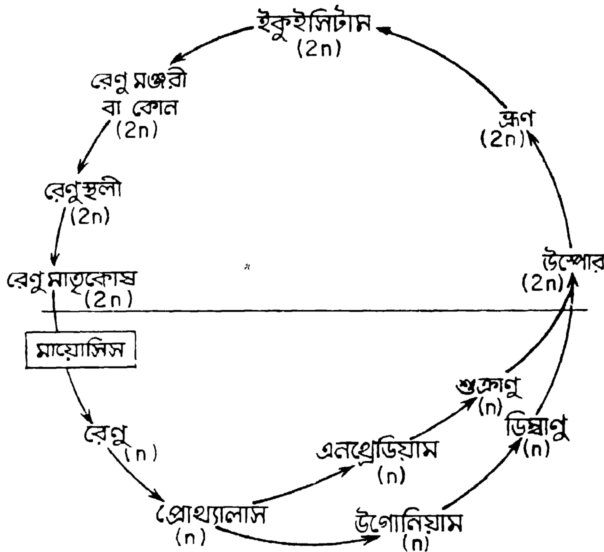
আরকিগোনিয়ামের গ্রীবা দৈর্ঘ্যে ৩।৪ কোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার একটি কেন্দ্রের কোষ প্রোথ্যালেসের উপর পর্যন্ত উঠে। এই কেন্দ্রীয় কোষ বিভক্ত হইয়া একটি



ইকুইসিটামের জীবন-চক্র। a = বেণুধর উদ্ভিদ, b ও b_1 = স্পোরানজিওফোর ও স্পোরানজিয়াম c = স্পোর মাতৃকোষ, d = স্পোর e = এনথেরিডিয়াম লিঙ্গধর, f = আরকিগোনিয়াম লিঙ্গধর, g = পুংধানী বা এনথেরিডিয়াম h = স্ত্রীধানী ও ডিম্বাণু i = শুক্রাণু j = জাইগোট, k = নূতন বেণুধর উদ্ভিদ।

প্রাথমিক নালী কোষ ও একটি অঙ্কীয় কোষ সৃষ্টি করে। প্রাথমিক নালী কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি গ্রীবানালী কোষ ও অঙ্কীয় কোষ বিভাজিত হইয়া একটি অঙ্কীয় নালী কোষ ও একটি ডিম্বাণু বা ওভাম গঠন করে। পরিপক্ক হইলে নালী কোষগুলি বিনষ্ট হয় এবং নিষেকের জন্য ডিম্বাণু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইবার নিষেক হয়। অনেকগুলি শুক্রাণুর মধ্য হইতে একটিমাত্র শুক্রাণু নালীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় এবং ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাকে নিষেক বলে। নিষেকের পর ডিম্বাণুর মোটা প্রাচীর সৃষ্টি হয় এবং ইহাকে জাইগোট বা উস্পোর বলে। উস্পোর ডিপ্লয়েড (২x) এবং ইহা হইল রেণুধর অবস্থার প্রথম ধাপ।



ইকুইসিটামের জীবন চক্র

উস্পোর হইতে ভ্রূণ জন্মায়। ভ্রূণের কাণ্ড, বীজপত্র, পদ ও মূল থাকে। ইহার বিশ্রাম অবস্থা থাকে না এবং ধীরে ধীরে **ইকুইসিটাম** উদ্ভিদে পরিণত হয়।

টেরিস (Pteris) বা ফার্ণ

টেরিস, পলিপোডিয়েসী-গোত্রভুক্ত টেরিডোফাইটা

বাসস্থান—ইহা শীতল, ভিজা, ছায়াযুক্ত স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়।

কয়েকটি ভারতীয় টেরিস—**টেরিস গ্রান্ডিফোলিয়া, টেরিস লঙ্গিফোলিয়া, টেরিস ক্রিটিকা, টেরিস এন্সিফরমিস**।

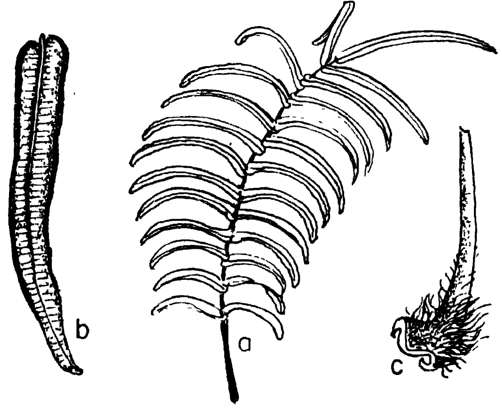
রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte)

ইহার দেহ রাইজোম, মূল ও পাতা দ্বারা গঠিত। রাইজোম ছোট ও সোজা হইতে পারে যেমন টেরিস **এন্সিফরমিস, টে. লঙ্গিফোলিয়া, টে, ক্রিটিকা** অথবা রাইজোম দীর্ঘ ও শায়িত, যেমন টে. গ্রান্ডিফোলিয়া।

রাইজোমের প্রস্থচ্ছেদ

বাহিরে একস্তরের ত্বক। ত্বক প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। ত্বকের ভিতরে বহুস্তরের হাইপোডারমিস। ইহার কোষে লিগনিন থাকে। ইহার ভিতরে

প্যারেনকাইমা গঠিত বিস্তৃত আদি কলা। ইহার ভিতর অনেকগুলি স্টেলী অবস্থিত। শায়িত রাইজোমের স্টেলী—সলেনোস্টেলী (solenostele) কিন্তু খাড়া রাইজোমে পলিসাইক্লিক ডিকটিওস্টীল এবং পত্রাবকাশ (leaf gaps) থাকে। ইহার ভ্যাসকুলার বাণ্ডিল, হ্যাড্রোসেণ্ট্রিক।



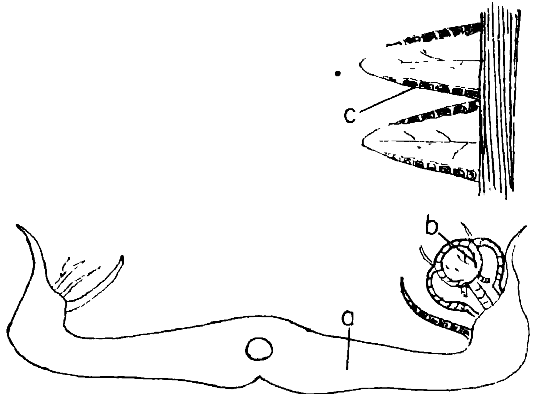
টেরিস : a—যৌগিক পত্র, b—পত্রক, c—রাইজোম।

রাইজোম হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। মূলের স্টেলী এক্সআর্ক ও ডাইআর্ক।

পাতাগুলি পক্ষাকার যৌগিক। পত্রঅক্ষের প্রস্থচ্ছেদ—ত্বক্, হাইপোডারমিস ও অশ্বক্ষুরের মত ভ্যাসকুলার বাণ্ডিল দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ভ্যাসকুলার বাণ্ডিল এণ্ডোডারমিস ও পেরিসাইকল দ্বারা বেষ্টিত। ইহার বাণ্ডিল হ্যাডরোসেনট্রিক ও জাইলেম এক্সআর্ক। ইহার পত্রমূল ও রাইজোমের উপর রোম ও আঁইসের মত রামেনটা (ramenta) থাকে।

ইহাদের পত্রকগুলি পত্রঅক্ষের দুই ধারে সাজান থাকে। ইহার পাতা সচূড় যৌগিকপত্র এবং বিষমপৃষ্ঠ। পত্রকের প্রস্থচ্ছেদে ত্বকের দুইদিকেই পত্ররন্ধ্র থাকে। পত্রকের মেজোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

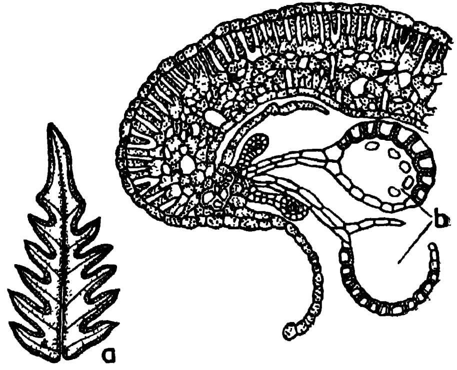
পত্রকের কিনারায় লম্বালম্বি (linear) ভাবে স্পোরানজিয়াম সৃষ্টি হয়। ইহাকে সিনোসোরাই বলে। প্রত্যেক সোরাস পত্রকের কিনারা দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া ইহাকে মিথ্যা বা অলীক ইনডুসিয়াম (false indusium) বলে। যে সকল পাতায় সোরাস জন্মায় তাহাকে স্পোরোফিল অথবা ফ্রণ্ড (frond) বলে। সোরাসের ভিতর দিয়া পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিলে বহু রেণুস্থলী পাওয়া যায়। ইহা অমরা কলা হইতে উঠিয়া থাকে। প্রত্যেক রেণুস্থলীতে দণ্ড ও মুণ্ড থাকে। স্ফীত অংশকে ক্যাপসুল বলে। প্রতিটি ক্যাপসুলের বাহিরে থাকে



a—পত্রকের ছেদ, b—রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়াম, c—লম্বালম্বি কিনারায় স্পোরানজিয়াম।

বলয় এবং বলয়ের একটি অংশে পাতলা কোষ থাকে। ইহাকে ভেদনস্থান বা স্টোমিয়াম বলে। রেণুস্থলী পাকিলে, ভেদনস্থান ভাঙ্গিয়া যায় এবং রেণু বাহির হইয়া পড়ে।

সবৃন্তক রেণুস্থলী একটিমাত্র মাতৃকোষ হইতে জন্মায়, ইহাকে **লেপটোস্পোরানজীয়েট** বলে। আদি রেণুস্থলী কোষ (sporangial initial) বাহিরের দিকে প্রসারলাভ করে এবং একটি প্রস্থপর্দার সাহায্যে দুইটি কোষে ভাগ হয়। বাহিরের কোষ হইতে রেণুস্থলী সৃষ্টি হয়। এই কোষ বিভাজিত হইয়া বৃন্ত এবং মাথার অংশ হইতে আদি প্রাচীর কোষ (jacket initial) এবং



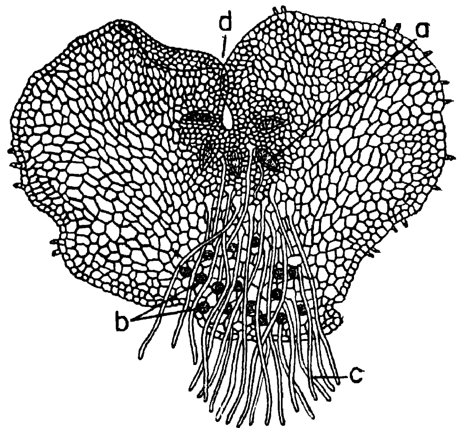
a = স্পোরোফিল b = স্পোরানজিয়াম।

ভিতরে আর্চিস্পোরিয়াম কোষ সৃষ্টি হয়। আদি প্রাচীর কোষ হইতে একস্তর কোষবিশিষ্ট আবরণী এবং আর্চিস্পোরিয়াম (archesporium) বিভাজিত হইয়া দুই স্তরের খাদ্য সরবরাহকারী টেপটাম (tapetum) এবং ভিতরে স্পোরোজেনাস কলা তৈয়ারি হয়। স্পোরোজেনাস কোষ হইতে ১৬টি রেণুমাতৃ কোষ সৃষ্টি হয়। ইহাদের কতকগুলি রেণু মাতৃ কোষ (2n) হইতে মায়োসিস দ্বারা প্রায় ৬৪টি (n) রেণু তৈয়ারি হয়। রেণু হইল লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রথম অবস্থা কারণ, ইহা হ্যাপলয়েড।

রেণুস্থলী সবৃন্তক এবং ক্যাপসুলের মত দেখিতে। ইহার ক্যাপসুলের প্রাচীর একস্তর বিশিষ্ট। প্রাচীরের দুই পাশের গাত্র বেশ পুরু এবং কিউটিনযুক্ত। ইহাকে নিক্ষেপ বলয় (annulus) বলে।

রেণুস্থলী পাকিলে, শুষ্ক হয় এবং ভেদনস্থান (stomium) বিদীর্ণ হইয়া রেণুগুলি বাহির হইয়া যায়। টেরিস সমরেণুপ্রসূ (homosporous) অর্থাৎ সমস্ত রেণুগুলি দেখিতে একই প্রকারের হয়।

রেণু চারিটি তলবিশিষ্ট (tetrahedral) এবং ইহা মাটিতে অংকুরিত হইয়া সবুজ, বহুকোষী, একস্তর বিশিষ্ট প্রোথ্যালাস (prothallus) তৈয়ারি করে। প্রোথ্যালাস তাম্বুলাকার এবং



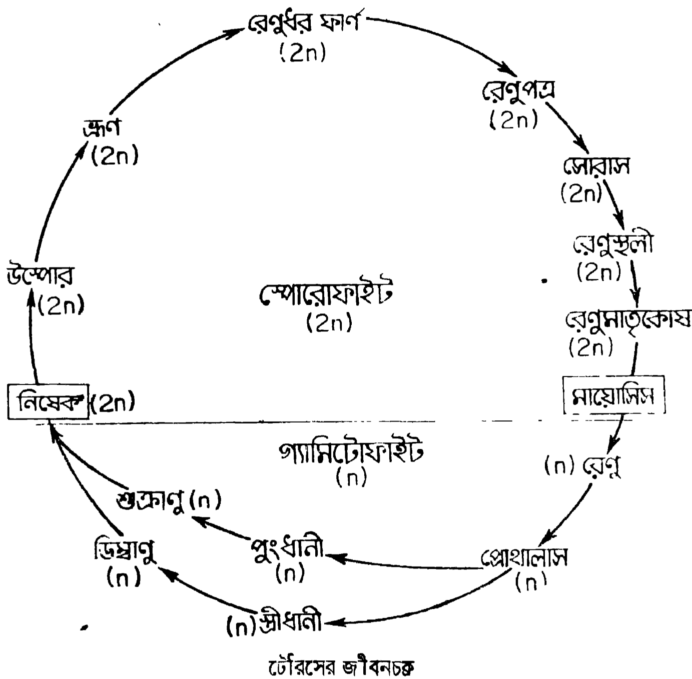
a = স্ত্রীধানী, b = পুংধানী, c = রাইজয়েড, d = প্রোথ্যালাস।

খাঁজবিশিষ্ট। প্রোথ্যালাসের নিচের দিকে অর্থাৎ খাঁজের নিচে বহু স্ত্রীধানী জন্মায়।

প্রোথ্যালাসের নিচের দিকে বহু রাইজয়েড জন্মায় এবং ইহার সাহায্যে মাটিতে আবদ্ধ হয় ও জল শোষণ করে। রাইজয়েডের মাঝে মাঝে কতকগুলি পুংধানী জন্মায়। প্রোথ্যালাস সবুজকণার সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ করে সুতরাং স্বাবলম্বী হয়।

পুংধানী উপরতলের কোষ হইতে সৃষ্টি হয়। ইহা বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ তৈয়ারি করে। একটি ফানেল কোষ ও অপরটি রিং কোষ। ফানেল কোষ বিভাজিত হইয়া বাহিরে ডোম কোষ ও ভিতরে এণ্ড্রোগোনিয়াল কোষ সৃষ্টি করে। আদি এণ্ড্রোগোনিয়াল কোষ হইতে প্রায় ২০টি এণ্ড্রোসাইট বা শুক্রাণু মাতৃকোষ (sperm mother cell) তৈয়ারি হয়। প্রতিটি এণ্ড্রোসাইট বহু সিলিয়াযুক্ত শুক্রাণুতে পরিণত হয়। পুংধানী দেখিতে গোলাকার এবং ইহার আবরণ কোষ বিদীর্ণ হইয়া শুক্রাণু বাহির হইয়া পড়ে।

স্ত্রীধানীর প্রাথমিক কোষ হইতে, বিভাজন দ্বারা আদি আচ্ছাদন কোষ, মধ্যকোষ ও পাদদেশের কোষ গঠন করে। আদি আচ্ছাদন কোষ ৪টি প্রাথমিক গ্রীবা কোষ এবং পরে বিভাজন করিয়া ৬/৭ টি কোষস্তর বিশিষ্ট গ্রীবা তৈয়ারি করে। মাঝের কোষ হইতে গ্রীবানালী কোষ, একটি অঙ্কনালী কোষ ও অঙ্কের মধ্যে একটি ডিম্বাণু গঠন করে। পাদকোষ হইতে পদ সৃষ্টি হয়। নিচের অংশটি অঙ্ক ও তাহার উপর গ্রীবা।



টেরিসের জীবনচক্র

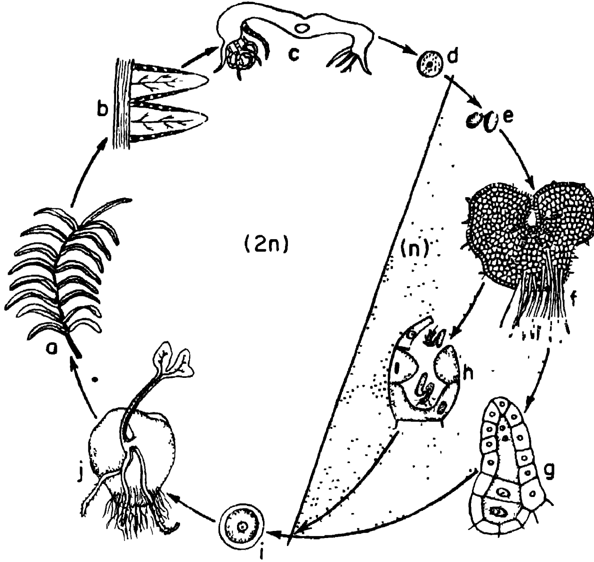
নিষেক

স্ত্রীধানী পাকিলে গ্রীবা ও অঙ্কীয়নালী কোষগুলি দ্রবীভূত হয় এবং একটি পথ জন্মায়। এই পথে মিউসিলেজ ও ম্যালিক এসিড বাহির হয়। এই দুইটি পদার্থ

শুক্রাণুগুলিকে আকর্ষণ করে এবং একটি শুক্রাণু অঙ্কের ভিতরে যাইয়া ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাকে নিষেক বলে। নিষেকের পর জাইগোট জন্মায় অর্থাৎ ডিম্বাণুর চারিদিকে পুরু প্রাচীর সৃষ্টি হয়। জাইগোট হইল ডিপলয়েড এবং রেণুধর উদ্ভিদের প্রথম অবস্থা।

নূতন রেণুধর উদ্ভিদ

জাইগোট কোষ বিভাজন দ্বারা ভ্রূণ সৃষ্টি করে। প্রথমে দীর্ঘ বিভাজন দ্বারা জাইগোট দুইটি কোষ এবং পরে আর একটি দীর্ঘচ্ছেদ হয়। এই চারিটি কোষ প্রস্থ বিভাজন দ্বারা ৮টি কোষ তৈয়ারি করে। এই ৮টি, দুইকোষ বিশিষ্ট ৪টি quadrant সৃষ্টি করে। উপরের এপিবেসাল quadrant হইতে মূল ও বীজপত্র হয় এবং নিচের quadrant হইতে কাণ্ড ও পদ তৈয়ারি হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধির সহিত প্রোথ্যালাস শুকাইয়া যায় এবং মূল মাটির দিকে যাইতে থাকে এবং বীজপত্র ও কাণ্ড ধীরে ধীরে রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।



টেরিসের জীবন-চক্র। a = রেণুধর টেরিস, b = দুইটি পত্রক c = পত্রকের ছেদ ও রেণুস্থলী, d = রেণুমাতৃকোষ, e = রেণু f = প্রোথ্যালাস, g = ডিম্বাণু, h = শুক্রাণু, i = জাইগোট, j = ভ্রূণ উদ্ভিদ।

মারসিলিয়া (Marsilea)

মারসিলিয়া জলজ ফার্ণ এবং ইহা পুকুর, ডোবা ও শীতল জলাভূমিতে পাওয়া যায়। ইহার তিনটি জেনেরা এখনও জীবিত—যথা, মারসিলিয়া (প্রায় ৬০টি প্রজাতি), পিলুলেরিয়া (৬টি প্রজাতি) ও রেজিনেলিডিয়াম। মারসিলিয়া ও পিলুলেরিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে পাওয়া যায় এবং রেজিনেলিডিয়াম কেবল ব্রেজিল দেশে (endemic) দেখা যায়।

ভারতীয় প্রজাতিগুলি হইল— মারসিলিয়া কোয়াড্রিফোলিয়া, মারসিলিয়া কনডেনসেটা, মারসিলিয়া মাইনুটা ও মারসিলিয়া পুনেনসিস।

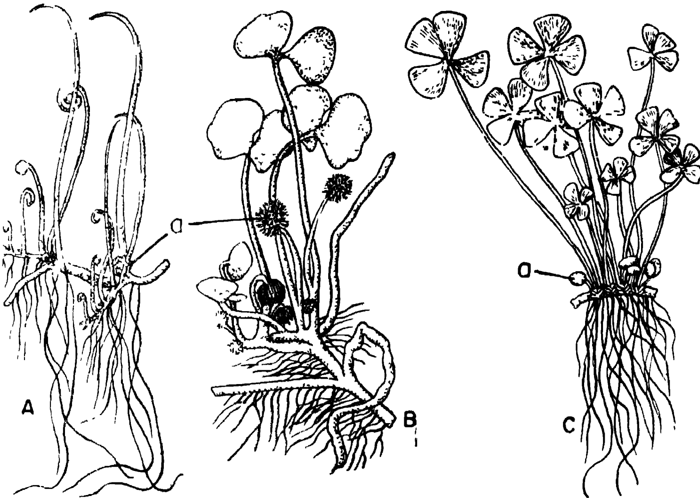
রেণুধর উদ্ভিদ

ইহার কাণ্ড রাইজোম এবং দ্ব্যগ্র শাখাবিন্যাস দ্বারা মাটির উপরে অথবা অল্প নিচে লতাইয়া (creeps) চলিতে থাকে। ইহাদের পর্বমধ্য ছোট বা দীর্ঘ হয়। রাইজোমের উপর দিকে দুই সারি, খাড়া পাতা জন্মায়। পাতার কক্ষ হইতে অথবা নিচে হইতে শাখা জন্মায়। রাইজোমের পর্ব হইতে বাহিরের দিকে মূল দেখা যায়। পাতাগুলি চারিটি ফলকের যৌগপত্র। পাতা মুকুল অবস্থায় সারসিনেট ভাবে সজ্জিত থাকে। পত্রকের শিরাবিন্যাস দ্ব্যগ্র। শিরাগুলি যুক্ত হইয়া জালিকায় পরিণত হয়।

রাইজোমের প্রস্থচ্ছেদ

বাহিরে একস্তরের ত্বক বা এপিডারমিস। ত্বকের ভিতরে কর্টেক্স। কর্টেক্সে বায়ুস্থান আছে এবং ভিতরে স্কেলেরেনকাইমার কিছু অংশ থাকে। ইহার ভিতর দিকে এণ্ডোডারমিস। ইহার স্টীল (stele) এম্ফিফ্লোইক সাইফনোস্টীল। বাহিরে ও ভিতর দিকে দুইটি এণ্ডোডারমিস স্তর থাকে। কেন্দ্রে মজ্জা বা পিথ। মজ্জা স্কেলেরেনকাইমা বা প্যারেনকাইমার দ্বারা গঠিত।

বাহিরের এণ্ডোডারমিসের ভিতরে পেরিসাইকেল এবং ইহার ভিতর দিকে বাহিরের ফ্লোয়েম এবং ইহার ভিতরে জাইলেম। জাইলেমের ভিতরে পুনঃবার ফ্লোয়েম এবং ইহার ভিতর পেরিসাইকেল ও ভিতরের এণ্ডোডারমিস। কেন্দ্রে মজ্জা থাকে।



A—মারসিলিয়া, a = স্পোরোকার্প ; B– রাইজোম ; C- মূল।

রেণুধর উদ্ভিদ

রেণুধর উদ্ভিদে বিশেষ জনন অঙ্গ সৃষ্টি হয়। ইহাকে স্পোরোকার্প (sporocarp) বলে। ছোট বা দীর্ঘ বৃন্তযুক্ত স্পোরোকার্প পত্র বৃন্তের তলদেশ হইতে জন্মায়।

এইগুলি বৃন্তযুক্ত ও আকারে ডিম্বাকার বা সীমের বীজের মত। ইহাদের কঠিন আবরণ থাকে এবং ইহার দ্বারা প্রতিকূল বহিঃজগতের অবস্থা হইতে রক্ষা পায়। ইহা কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার একটি বৃন্তের উপর একটি স্পোরোকার্প থাকিতে পারে অথবা বৃন্তের শাখা বাহির হইয়া ১৫/২০টি স্পোরোকার্প বহন করিতে পারে। একদল বিজ্ঞানীর মতে ইহাকে পাতার সহিত সমসংস্থ বলা হয় এবং আর একটি মতে পাতার নিম্ন অংশ হইতে রূপান্তরিত হইয়া এই জনন অঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। স্পোরোকার্পের ভিতর দুই স্তরের সোরাই একটি দীর্ঘ অক্ষের দুই ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রত্যেক সোরাসেই ইনডুসিয়ামের আবরণ দেখা যায়। ইহা অসমরেণুপ্রসূ বা হেটেরোস্পোরাস। প্রতিটি সোরাসে একসারি মেগাস্পোরানজিয়া বহু মাইক্রোস্পোরানজিয়া দ্বারা বেষ্টিত থাকে। ইহাদের বাহিরে পিচ্ছিল মিউসিলেজের কলা পাওয়া যায়। অংকুরিত হইবার সময় জলের সংস্পর্শে উহা স্ফীত হয়। মাইক্রোস্পোরানজিয়ামের ভিতর উহার মাতৃকোষগুলির মায়োসিস প্রক্রিয়ায়

মারসিলিয়া (2n)
স্পোরোকার্প (2n)
মাইক্রোস্পোরানজিয়া (2n)
মেগাস্পোরানজিয়া (2n)
পুং রেণুমাতৃকোষ (2n)
স্ত্রী রেণুমাতৃকোষ (2n)
মায়োসিস
মায়োসিস
(n) পুং রেণু
পুং প্রোথ্যালাস কোষ (n)
স্ত্রীরেণু (n)
শুক্রাণু (n)
নিষেক
স্ত্রী প্রোথ্যালাস (n)
ডিম্বাণু (n)
উস্পোর (2n)
ভ্রূণ (2n)

মার্সিলিয়া জীবনচক্র

বিভাজিত হয়। ইহার ফলে মাইক্রোস্পোর সৃষ্টি হয়। মেগাস্পোরানজিয়ামের ভিতর একটিমাত্র মাতৃকোষ বৃদ্ধিলাভ করে। মায়োসিস প্রণালীতে চারিটি টেটরাড জন্মায় কিন্তু একটিমাত্র মেগাস্পোর থাকে এবং অপর তিনটি বিনষ্ট হয়। মায়োসিস প্রক্রিয়ার পর, মাইক্রোস্পোর ও মেগাস্পোর হইতে, ইহার হ্যাপ্লয়েড বা লিঙ্গধর অবস্থার সূচনা হয়।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ

স্পোরোকার্প সুপক্ক হইলে, ইহা অংকুরিত হয় এবং জলের মধ্যে অংকীয় দেশ ও অগ্রভাগ হইতে খুলিয়া যায়। ইহার ভিতরের মিউসিলেজ কলা জল শোষণ করে এবং বাহির হইয়া সোরাইগুলিকে টানিয়া রাখে। ইহার পর আবরণ বা ইনডুসিয়াম

জিলাটিনে পরিণত হয়। স্পোরগুলি প্রথম অবস্থায় জিলাটিনের মধ্যে থাকে এবং অঙ্কুরিত হয়।

পুংলিঙ্গধর

পুংরেণু, পুংরেণু প্রাচীরের মধ্যেই অংকুরিত হয়। ইহা হইতে একটি ক্ষুদ্র পুংপ্রোথ্যালাস কোষ সৃষ্টি হয়। অপর বৃহৎ কোষটি পুংধানী মাতৃকোষ (antheridial moth·r cell)। ধীরে ধীরে বিভক্ত হইয়া, দুইটি শুক্রাণু মাতৃকোষ গঠন করে। ইহাদের চারিদিকে চারিটি আবরণী কোষ থাকে। একটিমাত্র এনথেরিডিয়াম গঠন করে। ইহাতে ১৬টি বহুফ্ল্যাজেলামযুক্ত, সর্পিলাকার শুক্রাণু জন্মায়। অবশেষে স্পোর প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া শুক্রাণুগুলি বাহির হয়।

স্ত্রীলিঙ্গধর

জলের সংস্পর্শে মেগাস্পোর অঙ্কুরিত হয়। ইহার নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়। একটি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া, একটি অগ্রকোষ গঠন করে। নিম্নের বড় কোষটির নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয় না। ইহাতে প্রচুর খাদ্য ও স্টার্চ দানা থাকে। ইহা পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। ছোট অগ্রকোষটি মেগাস্পোর প্রাচীরের অল্প বাহিরে যায়। ইহা হইতে কতকগুলি কোষ সৃষ্টি হয় এবং ইহাই প্রকৃত লিঙ্গধর। ইহাতে একটি ছোট আরচি-গোনিয়াম জন্মায়। আরচিগোনিয়াম আকারে প্রশস্ত এবং একটিমাত্র গ্রীবা নালী কোষ দ্বারা গঠিত।

নিষেক

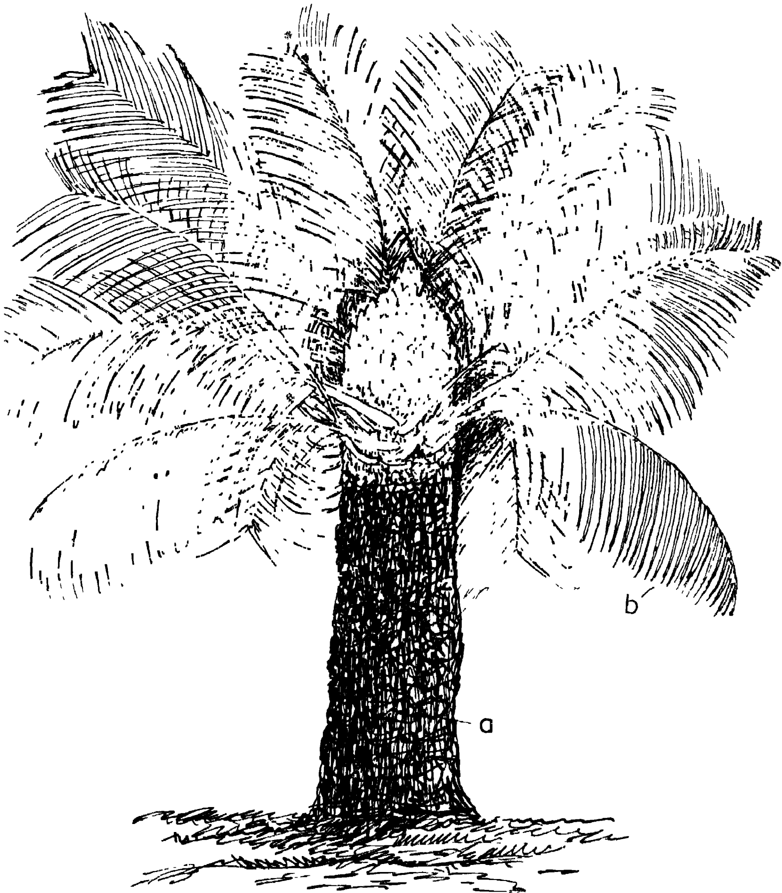
বহু শুক্রাণু, আরচিগোনিয়ামের দিকে সাঁতার কাটিয়া যায় কিন্তু একটিমাত্র শুক্রাণু গ্রীবায় প্রবেশ করিয়া ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাকে নিষেক বলে। নিষেকের পর উস্পোর সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর উস্পোর হইতে ডিপ্লয়েড বা রেণুধর উদ্ভিদের সূচনা হয়। উস্পোর কোষ বিভাজনের দ্বারা ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ভ্রূণের কাণ্ড, পাতা, মূল ও পদ থাকে। এই ভ্রূণ হইতে মারসিলিয়া উদ্ভিদ জন্মায়।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperms)

সাইকাস (Cycas)

সাইকাস গণটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ গোষ্ঠীর সাইকাডেলিস নামক বর্গের অন্তর্গত। সাইকাস ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও পলিনেসিয়ায় পাওয়া যায়। হুকার সাহেবের মতে ভারতে ছয়টি সাইকাসের প্রজাতি পাওয়া যায়। **সাইকাস সারসিনেলিস** (Cycas circinalis), **সাইকাস রুমফি** (C. rumphii), **সাইকাস রেভোলিউটা** (C. revoluta), **সাইকাস বেডোমি** (C. beddomeii), **সাইকাস পেকটিনেটা** (C. pectinata) ও **সাইকাস সায়ামেনসিস** (C. siamensis)।



সাইকাস—স্ত্রী উদ্ভিদ : a = কাণ্ড, b = যৌগ পাতা।

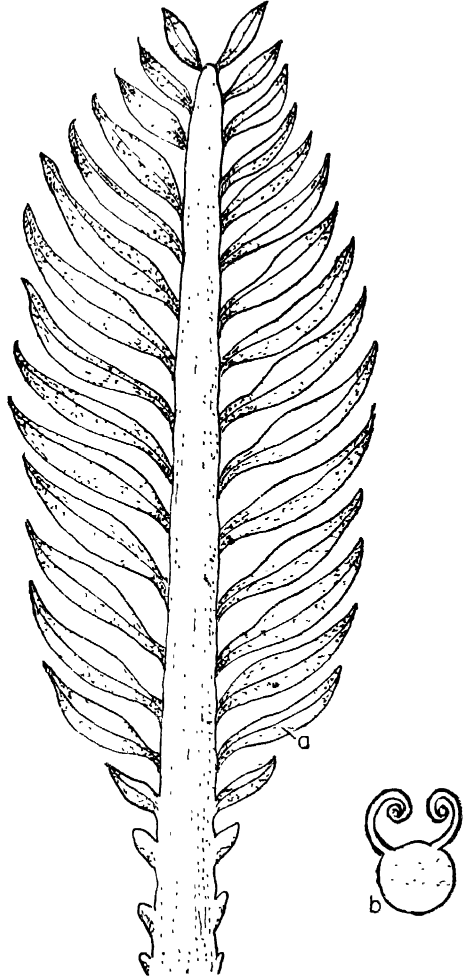
ইহাদিগকে বাগানে সাজাইবার জন্য রাখা হয় এবং ইহার পাতা উৎসবে সাজাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

রেণুধর উদ্ভিদ (Sporophyte)

সাইকাসের রেণুধর উদ্ভিদটি কিছুটা পাম (palm) গাছের মত দেখিতে। কাণ্ডের শাখা নাই, বেলনাকার, মোটা, ছোট এবং কাণ্ডের উপর পাতার পত্রমূলের কাঁটার মত অংশ থাকে। কাণ্ডের অগ্রভাগে একগোছা মুকুটের মত পাতা থাকে।

ইহার পাতা **পক্ষল যৌগপত্র**। পাতা প্রায় দৈর্ঘ্যে ৩ মিটার এবং বেশ শক্ত এবং কাণ্ডের অগ্রভাগে **সর্পিল** আকারে সাজান থাকে। ইহার পত্রমুকুল বিন্যাস **সারসিনেট** এবং ফার্ণের মত। প্রত্যেক পত্রকে (leaflet) একটিমাত্র মধ্যশিরা থাকে।

প্রধান মূল কয়েকটি শাখামূল বহন করে। শাখামূল অনেকগুলি শাখা সৃষ্টি করিয়া মাটির নিচেই **করালয়েড** সৃষ্টি করে। ইহাদিগকে **মূলের গুটি** (root tubercles) বলে। মূলের গুটির মধ্যে ব্যাকটিরয়েড প্রবেশ করে এবং ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করে। এই সকল স্থানে নসটক্ জাতীয় শৈবাল বাস করে। ইহার দ্বারা পুষ্টি ও বায়ু আদানপ্রদান হয়।

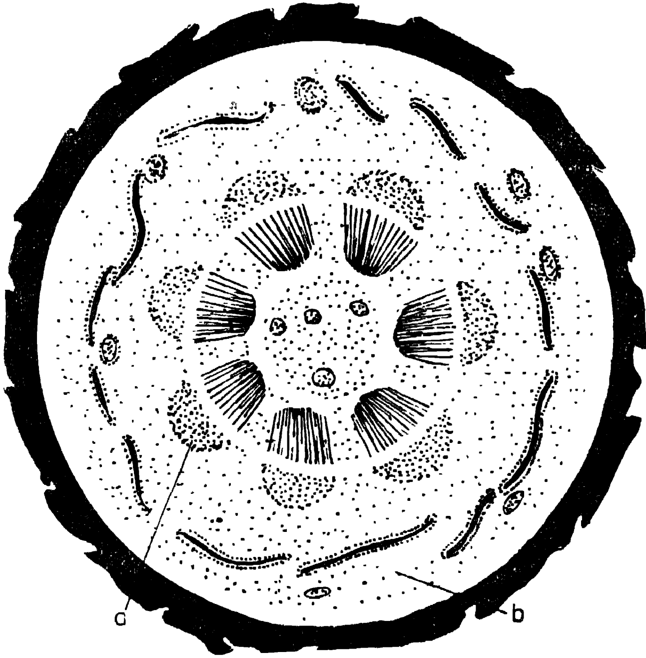


a = সাইকাসের পাতা, b = পত্রের দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ ও পত্রকের সারসিনেট অবস্থা।

সাইকাস কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

ইহার প্রস্থচ্ছেদের মধ্যস্থলে প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত মজ্জা বেশ বড়। বাহিরের দিকে **ত্বক** (epidermis) থাকে। ইহার কর্টেক্স বেশ বড়। কর্টেক্স প্যারেনকাইমার মধ্যে ষ্টার্চদানা ও মিউসিলেজ নালী থাকে। ইহার নালিকাবাণ্ডিলগুলি বলয় আকারে সাজান ও ইহারা সংযুক্ত, মুক্ত ও সমপার্শ্বীয়। কর্টেক্সের মধ্যে কতকগুলি লিফট্রেস (leaftrace) থাকে। লিফট্রেস নালিকাসিলিণ্ডার হইতে শাখা পাতার মধ্যে নালিকা পাঠায়। প্রত্যেক পাতার জন্য সচরাচর চারিটি লিফট্রেস থাকে।

ইহার স্টিলিকে পলিফ্যাসিকুলার **সাইফোনোস্টিলি** (siphonostele) বলে। এই স্টিলির বাহিরে একস্তরবিশিষ্ট এণ্ডোডারমিস ও ইহার ভিতরে পেরিসাইকল। স্টিলির মধ্যে অনেকগুলি **সংযুক্ত, মুক্ত, সমপার্শ্বীয় এণ্ডআর্ক** নালিকাবাণ্ডিল বলয় আকারে সজ্জিত থাকে। ইহার ফ্লোয়েম, **সিভনল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** দ্বারা তৈয়ারি। ফ্লোয়েমের পরে **ক্যামবিয়াম** ও ইহার ভিতরে **জাইলেম**। জাইলেম দীর্ঘ ট্রেকিডের দ্বারা তৈয়ারি। প্রাথমিক ক্যামবিয়াম ক্ষণস্থায়ী, এই কারণে দ্বিতীয় পর্যায় বৃদ্ধি (secondary growth) বিশেষ শক্তিশালী হয় না।

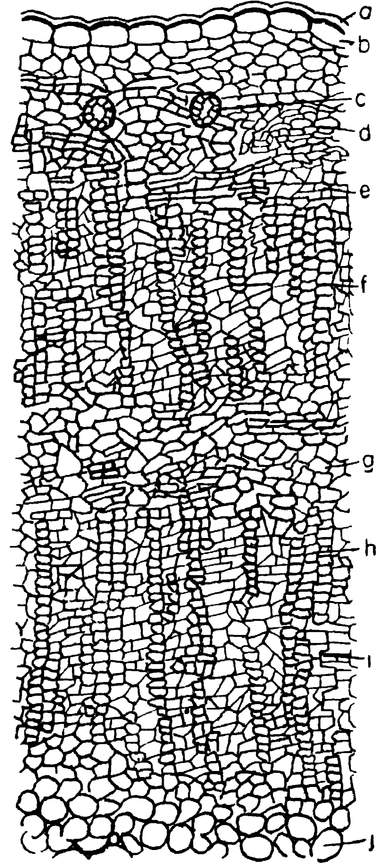


সাইকাসের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ : a=নালিকাবাণ্ডিল, b=কর্টেক্স।

দ্বিতীয় পর্যায় সেকেণ্ডারী নালিকা কলা অল্প জন্মায়। সেকেণ্ডারী জাইলেমে অনেক প্যারেনকাইমা গঠিত রেখা পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে বাণ্ডিলের ক্যামবিয়াম লুপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় ক্যামবিয়াম জন্মায়। ইহার দ্বারা পরিচক্রের নিকট (pericycle) একটি দ্বিতীয় নালিকাসিলিণ্ডার জন্মায়। ইহা প্রাথমিক সিলিণ্ডারের মত। ইহার পর তৃতীয় নালিকাসিলিণ্ডার জন্মাইতে পারে। পর পর বলয় আকারের সেকেণ্ডারী কলাকে **পলিজাইলিক** (polyxylic) বলে; কিন্তু ইহা দ্বিবীজপত্রীর **এনুয়েল রিং** (annual rings) নহে। এই উদ্ভিদে মজ্জাংশের মধ্যে সাবুদানার মত ষ্টার্চ দানা পাওয়া যায়, এই কারণে ইহাকে "সেগো" বলে।

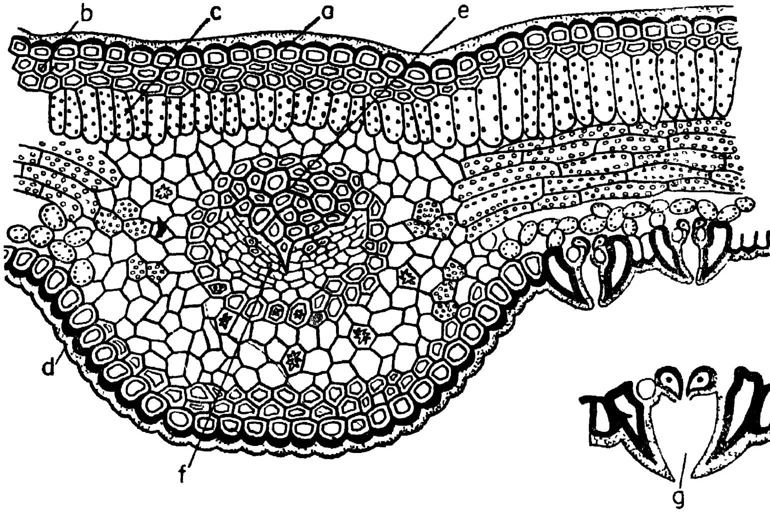
পত্রক (leaflet)—**প্রস্থচ্ছেদ**

ইহার পাতা **বিষমপৃষ্ঠ** (dorsiventral) এবং ইহার বৈশিষ্ট্য **জেরোফাইট** (xerophyte); **পত্রকের প্রস্থচ্ছেদের মধ্যস্থলে** মধ্যশিরা। ইহার নালিকাবাণ্ডিল কেবল মধ্যশিরায় থাকে। মধ্যশিরার দুই ধারে শিরা কলা নাই। ইহার উপর দিকে ঊর্ধ্বত্বক। ঊর্ধ্বত্বকের কোষ প্রাচীরে বাহিরের দিকে কিউটিকল বেশ পুরু এবং বাষ্পমোচন বন্ধ করে। ইহার ভিতরে স্কেলেরেনকাইমা গঠিত হাইপোডারমিস। ইহা পাতার বাষ্পমোচন রোধ করে ও পাতাকে শক্ত করে। উপরের ত্বক ও নিচের ত্বকের মধ্যস্থলে **মেজোফিল কলা**। মেজোফিল দুই প্রকার প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত: যথা (ক) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** – ইহা উপরের ত্বকের দিকে অবস্থিত। (খ) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** — ইহা নিচের ত্বকের দিকে অবস্থিত এবং কতকগুলি কোষান্তর রন্ধ্রবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি ক্লোরোপ্লাসটিডযুক্ত হয়। মধ্যশিরায় ত্রিকোণাকার সেনট্রিপিটাল (exarch) এবং দুইটি সেনট্রিফিউগাল (endarch) প্রাথমিক জাইলেম পাওয়া যায়। ইহার পর পেরিসাইকল। নিচের ত্বকের দিকে প্রোটোজাইলেম এবং ইহার চারিদিকে মেটাজাইলেম। জাইলেমের নিচে ক্যাম্বিয়াম এবং ইহার পর ফ্লোয়েম। ফ্লোয়েমে সীভনল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। নালিকাবাণ্ডিলের দুই দিকে কতকগুলি ট্রেকাইডকোষ থাকে। নালিকাবাণ্ডিলের দুই দিকে বর্ণহীন কতকগুলি কোষ প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমার মধ্যস্থলে থাকে। ইহাকে **ট্রান্সফিউশন** কলা বলে। ইহা ওয়ারসডেলের (Worsdel) মতে ১৮৯৭, সেনট্রিপিটাল জাইলেমের বিস্তারিত অংশ ; ১৯১১ সালে কার্টার (Carter) ইহাকে রূপান্তরিত পত্র প্যারেনকাইমা বলেন ; ১৯১৩ সালে টাকেডা (Takeda) বলেন, মেজোফিল অংশ রূপান্তরিত হইয়া খাদ্য সঞ্চিত করে। নিচের ত্বকে পত্ররন্ধ্রগুলি নিমজ্জিত থাকে (sunken stomata)। পত্ররন্ধ্রের দুইটি



সাইকাস কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ a = কিউটিকল, b = ত্বক, c - কর্টেক্সে মিউসিলেজ নালী, d – ফ্লোয়েমের দ্বিতীয় পর্ব, e সেকেণ্ডারী ফ্লোয়েম, g = জাইলেম, h = সেকেণ্ডারী জাইলেমের প্রথম পর্ব, i = মেডুলারীরে, j = মজ্জা।

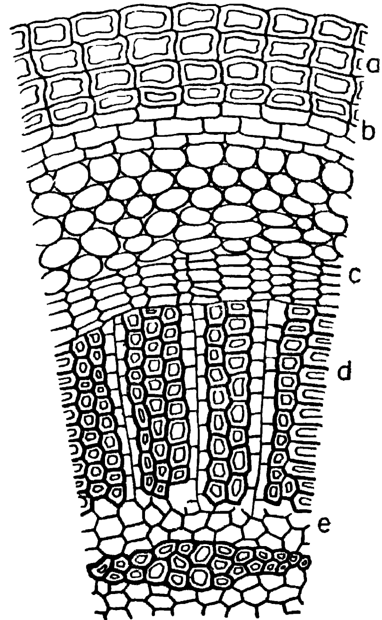
রক্ষীকোষের দুইটি সাহায্যকারী কোষ থাকে। **এই প্রকার পত্ররন্ধ্রকে অ্যামফিসাইক্লিক** (amphicyclic) বলে।



সাইকাস পত্রকের প্রস্থচ্ছেদ a = এপিডারমিস, b = হাইপোডারমিস, c = প্যালিসেড, d = নিম্নত্বক, e = জাইলেম, f = ফ্লোয়েম, g = স্টোমা।

মূলের ছেদ

সাইকাসের সাধারণ মূল দ্বিবীজপত্রীর মূলের ন্যায় ও ইহার সেকেণ্ডারী বৃদ্ধি হয়। ইহাতে ডাইআর্ক হইতে টেটরাআর্ক জাইলেম নালিকা দেখা যায়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম অরীয় প্রকার সাজান। এক্সআর্ক প্রোটোজাইলেম সর্পিল আকারের ও মেটা-জাইলেম স্কেলেরিফরম বা পিটযুক্ত। বাণ্ডিলের ক্যামবিয়াম পরিচক্রের নিকট হইতে সেকেণ্ডারী জাইলেম ও সেকেণ্ডারী ফ্লোয়েম তৈয়ারি করে। ইহা সেকেণ্ডারী বৃদ্ধির জন্য হয়। মধ্যস্থলে অর্থাৎ কেন্দ্রে অল্প মজ্জা থাকে। মধ্যস্থিত সিলিণ্ডারের বাহিরে পাৎলা প্যারেনকাইমা দেখা যায়। বাহিরের দিকে থাকে কর্ক ক্যামবিয়াম। ইহা বাহিরে কর্ক তৈয়ারি করে ও ভিতর দিকে সেকেন্ডারী প্যারেন-কাইমা সৃষ্টি করে।

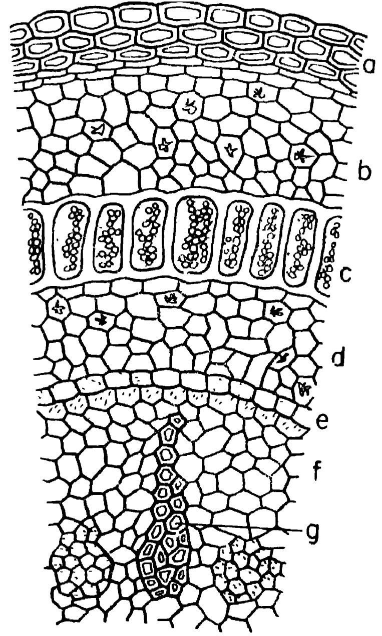


সাইকাসের সাধারণ মূলের প্রস্থচ্ছেদ. a = কর্ক, b = কর্ক ক্যামবিয়াম, c = সেকেণ্ডারী ফ্লোয়েম d = জাইলেম, e = কনজাংকটিভ কলা।

কোর‍্যালয়েড মূল

এই প্রকার মূলের প্রস্থচ্ছেদে বাহিরে থাকে

কর্ক ও তাহার ভিতর দিকে কর্ক ক্যামবিয়াম। ইহার ভিতর দিকে প্যারেনকাইমা কোষ নির্মিত কর্টেক্স। কর্টেক্সের দুইটি ভাগ—ভিতর ও বাহিরের অংশ। ইহার মধ্যস্থলে শৈবাল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের ফাঁকা স্থানে এনাবেনা ও নসটক বাস করে। স্টিল ডাই আর্ক বা টেটরাআর্ক। ইহার চতুর্দিকে এন্ডোডারমিস এবং তাহার ভিতর দিকে পেরিসাইকল। ইহার ভিতর চারিটি জাইলেম ও চারিটি ফ্লোয়েম অরীয় ভাবে থাকে।



সাইকাসের কোবালয়েড মূলের প্রস্থচ্ছেদ
a—কর্ক, b=কর্টেক্স, c=শৈবাল অংশ, d=কর্টেক্স, e=এন্ডোডারমিস, f=কনজাঙ্কটিভ কলা, g=মেটাজাইলেম।

জনন

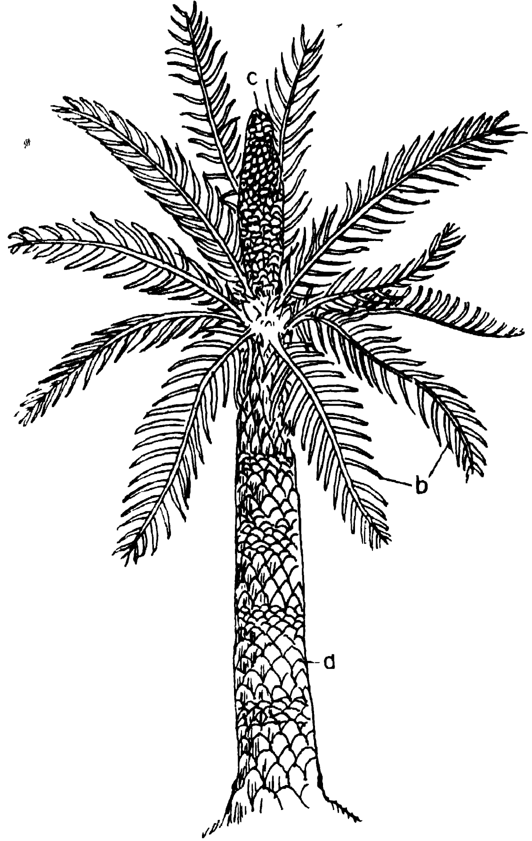
সাইকাস ভিন্নবাসী উদ্ভিদ অর্থাৎ পুং ও স্ত্রীরেণুপত্রগুলি ভিন্ন উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন হয় এবং দুই প্রকার রেণু, পুংরেণু বা মাইক্রোস্পোর ও স্ত্রীরেণু বা মেগাস্পোর দুইটি পৃথক উদ্ভিদে জন্মায়। সাইকাসে পুংরেণুপত্রগুলি একত্রে পুংরেণুপত্রমঞ্জরী গঠন করে। স্ত্রীরেণুপত্রগুলি সর্পিল আকারে অগ্রভাগে পত্রমুকুলের চতুর্দিকে সাজান থাকে। পুংরেণুপত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে অগ্রভাগের শেষপ্রান্ত মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা অগ্রভাগের ধারে জন্মায়।

পুংরেণুপত্রমঞ্জরী (Male or staminate strobilus)—ইহার মধ্যস্থলে একটি দণ্ড ও দণ্ডের উপর পর পর অনেকগুলি **পুংরেণুপত্র** ঘন, দীর্ঘ, ডিম্বাকার মঞ্জরী বা স্ট্রোবাইলাস গঠন করে। এক বা একাধিক মঞ্জরী অগ্রভাগে জন্মায়। ইহা প্রায় ৫০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ। শেষের ও অগ্রভাগের মঞ্জরী বন্ধ্যা অর্থাৎ রেণু জন্মায় না। অবশিষ্ট মঞ্জরীপত্রের নিচের দিকে ৭০০ বা অধিক পুংরেণুস্থলী (microsporangia) জন্মায়।

পুংরেণুস্থলী ৫, ৪ বা ৩, কখন কখন দুইটি একত্রে সোরাই গঠন করে। পুংরেণুপত্র (microsporophyll) আকারে নিচের দিকে সরু এবং উপরদিক বেশ বড়। রেণুস্থলী **ইউস্পোরানজিয়েট** (eusporangiate) এবং প্রতিটি রেণুস্থলীর বাহিরে কয়েকটি আবরণী স্তরের (jacket) ভিতর রেণুমাতৃকলা (sporogenous tissue) এবং ইহার চারিদিকে পোষক স্তর (tapetum) থাকে। প্রত্যেক **পুংরেণুমাতৃকোষ** মিয়োসিস প্রণালীতে চারিটি **পুরেণু** (microspores) বা **পরাগ রেণু** (pollen grains) উৎপন্ন করে। **স্ত্রীরেণুপত্র** (megasporophyll)– ইহাতে ঘন

স্ত্রীরেণুপত্রমঞ্জরী (strobilus) উৎপন্ন হয় না। এই **স্ত্রীরেণুপত্র পৃথকভাবে থাকে।** ইহার কিছুটা সাধারণ পাতার মত দেখিতে, যথা—**সাইকাস রেভোলিউটা, সাইকাস সারসিনেলিস** ; সবুজকণা থাকে না এবং বাদামী রঙের রোমদ্বারা আবৃত থাকে। স্ত্রীরেণুপত্রের কিনারায় কতকগুলি **ডিম্বক** বা স্ত্রীরেণুস্থলী জন্মায়। **সাইকাস সারসিনেলিসের** ডিম্বক আকারে ৬×৪ সেন্টিমিটার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, যথা- সাইকাস রেভোলিউটায় ঘন রোম দ্বারা আবৃত থাকে।

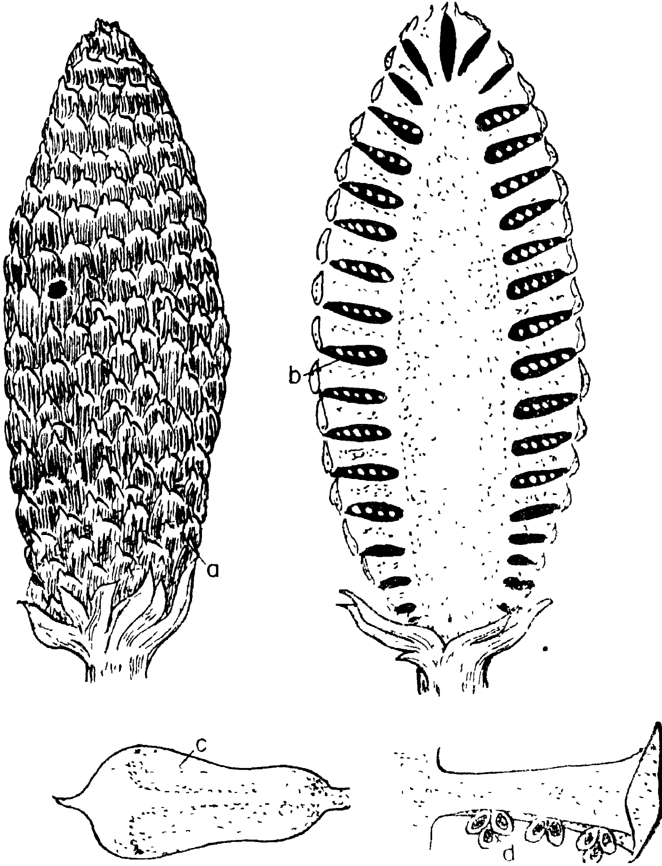
ডিম্বকের (ovule) মধ্যে **ভ্রূণপোষক** (nucellus) এবং পুরু একস্তরযুক্ত **ডিম্বকত্বক** (integument) তাহার চতুর্দিকে থাকে। এই ডিম্বকত্বক পরে তিনস্তর-যুক্ত **বীজত্বকে** (testa) পরিণত হয়। বাহিরের স্তর রসাল, মধ্যস্তর কাষ্ঠল এবং ভিতরের স্তর রসাল। বীজ পাকিলে বহিঃস্তরটি রঙ্গীন এবং অন্তঃস্তরটি পাতলা পর্দায় পরিণত হয়। ভ্রূণ-পোষক ডিম্বক ত্বকের সহিত যুক্ত থাকে, কেবল অগ্রভাগ মুক্ত এবং ইহাকে পাখীর ঠোঁটের মত বলিয়া, **ভ্রূণপোষক চঞ্চু** (nucellar beak) বলে ; ইহা ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে অবস্থিত। ভ্রূণপোষক গ্রীবা বা ঠোঁটের মধ্যে **রেণু বা পরাগ ঘর** (pollen chamber) থাকে। এই ঘরে পরাগ সঞ্চিত হয়। ভ্রূণপোষক কলার মধ্যে স্ত্রী-রেণু মাতৃকোষ (megaspore mother cell) মায়োসিস প্রক্রিয়ায় এক রেখাতে চারিটি **স্ত্রীরেণু** (megaspores) গঠন করে। ভিতরের স্ত্রীরেণুটি কার্যকর হয় এবং অপর তিনটি বিনষ্ট হইয়া যায়।



সাইকাস– পুং উদ্ভিদ a—কাণ্ড b=যৌগ পাতা, c=পুং কোন্।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ (gametophytes), **পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ** (male gametophyte) **পরাগ বা** পুংরেণু, পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রথম কোষ। ইহার দুইটি আবরণ, বাহিরে এক্সাইন (exine) এবং ভিতরে ইনটাইন (intine)। পুংরেণুস্থলী হইতে বাহির

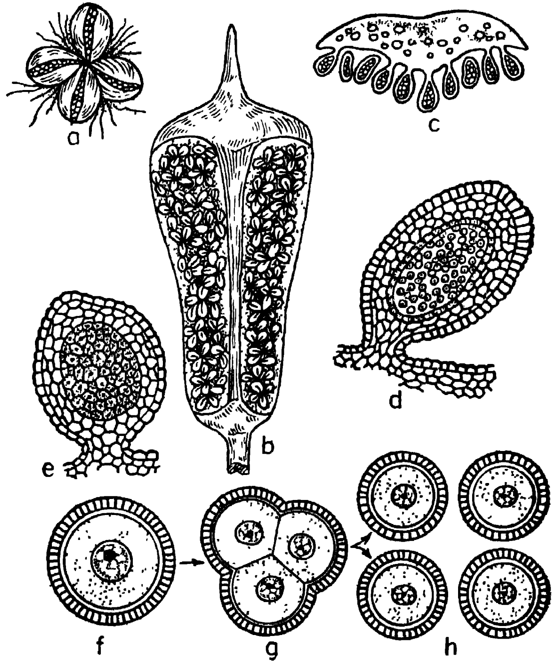
হইবার পূর্বেই, ইহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয়। ইহার নিউক্লিয়াস ভাগ হইয়া, দুইটি অসমান কোষসৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে ছোট কোষটি **প্রথম প্রোথ্যালীয় কোষ** (first prothallial cell) বলা হয়। বৃহৎ কোষটি ভাগ হইয়া, দুইটি অসমান কোষ সৃষ্টি করে। প্রথম প্রোথ্যালীয় কোষটির নিকটবর্তী দ্বিতীয় প্রোথ্যালীয় কোষ এবং অপর বৃহৎ কোষটি হইল **পুংধানী কোষ** (antheridial cell)। প্রোথ্যালীয়



a - সাইকাসের পুং কোন্, b মাইক্রোস্পোবানজিযা, c - উপব দিক হইতে মাইক্রোস্পোরোফিল, d = মাইক্রোস্পোরানজিয়া।

কোষ দুইটির সঠিক কাজ অজ্ঞাত। লিঙ্গধর উদ্ভিদের সৃষ্টির সঙ্গে ইহারা বিনষ্ট হয়। পুংধানী কোষ পুনরায় বিভাজিত হয় এবং একটি ছোট **জনন কোষাধার** (generative cell) ও একটি বৃহৎ **নালী নিউক্লিয়াস** (tube nucleus) বা **নালী কোষ** (tube cell) সৃষ্টি করে। এই তিনকোষী অবস্থায় পরাগ বা পুংরেণু বাহির হইয়া পড়ে। পরাগথলী হইতে বায়ু দ্বারা পরাগ ছড়াইয়া যায়। সাইকাস বায়ুপরাগী। নিকটবর্তী স্ত্রী উদ্ভিদের ডিম্বকের উপর পরাগ স্থানান্তরিত হয়।

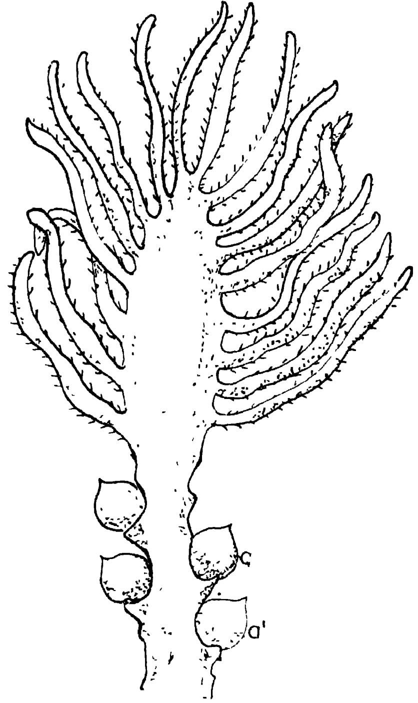
ডিম্বকের ডিম্বকরন্ধ্রের আঠাল রসের দ্বারা ইহা (পরাগ) আবদ্ধ হয়। এই রস শুকাইবার সময় পরাগধরে শোষিত হয়। নালী কোষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া ভ্রূণপোষকে প্রবেশ করে এবং পরাগ নালী গঠন করে। নালী কোষ পরাগনালীতে প্রবেশ করে। জনন কোষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, একটি **বৃন্তকোষ** (stalk cell) ও একটি **দেহকোষ** (body cell) উৎপন্ন করে। **দেহনিউক্লিয়াস** ভাগ হইয়া দুইটি **শুক্রাণু নিউক্লিয়াস** (sperm nucleus) বা পুংনিউক্লিয়াস (male nuclei) গঠন করে। বৃন্তনিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে প্রাচীর গঠন করিয়া **বৃন্তকোষে** পরিণত হয়। পুংনিউক্লিয়াস, শুক্রাণুতে পরিণত হয়। ইহা আকারে বড়, সর্পিল এবং বহু ফ্ল্যাজেলামযুক্ত। ইহাদের মত বড় শুক্রাণু, উদ্ভিদ জগতে বিরল।



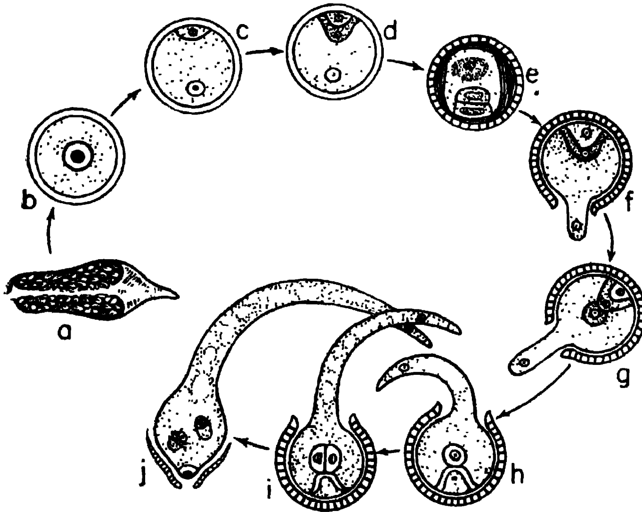
সাইকাস a = মাইক্রোস্পোরানজিয়া, b = মাক্রোস্পোরোফিলে স্পোরানজিয়া, c = মাইক্রোস্পোরানজিয়া, d = সুপক্ক স্পোরানজিয়াম, e = স্পোর মাতৃকোষগুলি, f = স্পোর মাতৃকোষ, g = স্পোব টেটরাড, h = মাইক্রোস্পোর।

স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ (female gametophyte)—**স্ত্রীরেণু** বা মেগাস্পোর স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রথম কোষ। ইহা স্ত্রীরেণুস্থলীর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। স্ত্রীরেণুস্থলী বা ওভিয়ুলের (ovule or megasporangium) ভিতর হইতে মেগাস্পোর বাহিরে আসে না। স্ত্রীলিঙ্গধরের বৃদ্ধি পাঁচটি অবস্থায় হয়—স্ত্রীরেণুর নিউক্লিয়াস বড় হয় এবং অবাধ নিউক্লীয় বিভাজনের জন্য (free nuclear division) বহু সংখ্যায় নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীরেণুর সাইটোপ্লাজমে ছড়াইয়া থাকে। মধ্যস্থলে একটি গহ্বর গঠন করে এবং নিউক্লিয়াসগুলির ধারে (periphery) সাজান থাকে। অবাধ নিউক্লিয়াস বিভাজন চলিতে থাকে। নিউক্লিয়াসগুলির চারিদিকে প্রাচীর গঠন করিয়া, **সস্য** (endosperm) নামক কলা, স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে জন্মায়। এই কলা ক্রমে মেগাস্পোর পূর্ণ করে। এই সস্য কলা, নিষেকের পূর্বে গঠিত হয়। এই সস্যে প্রচুর স্টার্চ দানা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে দুই প্রকার কোষ গঠন হয়, নিচের দিকে বড় কোষগুলি পুষ্টিদান করে এবং ডিম্বক রন্ধ্রের দিকে ছোট ছোট কোষগুলির মধ্যে ২—৮ আরচিগোনিয়া

(সাইকাস রেভোলিউটা) বা স্ত্রীধানী গঠন করে। লিঙ্গধর উদ্ভিদের বাহিরের কোষ হইতে স্ত্রীধানী সৃষ্টি হইতে পারে। এই প্রাথমিক কোষ (archegonium initial) ভাগ হইয়া প্রাথমিক গ্রীবা কোষ (primary neck cell) ও ভিতরের কেন্দ্রীয় কোষ (inner central cell) সৃষ্টি করে। প্রাথমিক গ্রীবা কোষ ভাগ হইয়া দুইটি গ্রীবা কোষ তৈয়ারি করে। কেন্দ্রীয় কোষ বড় হয় এবং চারিদিকে পোষ্টিক কোষের দ্বারা আবৃত হয়। ইহাকে স্ত্রীধানী আবরণ বলে। কেন্দ্রের কোষ বিভক্ত হইয়া, একটি অংকীয় নিউক্লিয়াস (ventral nucleus) ও একটি ডিম্বাণু নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রাচীর থাকে না এবং ইহা উন্নত প্রকারের বৈশিষ্ট্য। ডিম্বাণু এইভাবে জন্মায় এবং ইহার নিউক্লিয়াস উদ্ভিদ জগতের মধ্যে বেশ

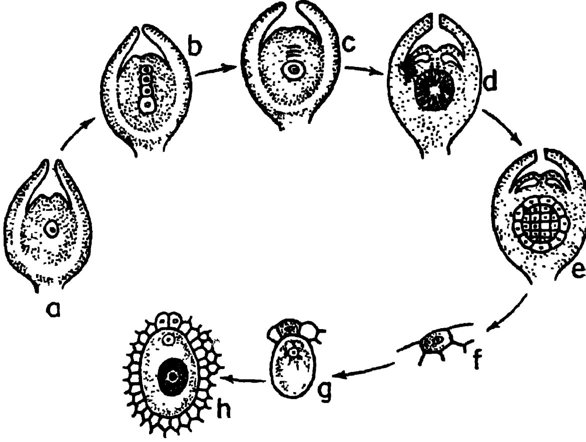


সাইকাসের মেগাস্পোরোফিল a, c = ডিম্বক ;

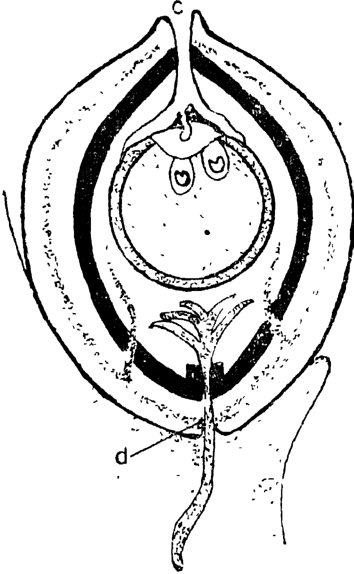


সাইকাস a = মাইক্রোস্পোরোফিল, b = মাইক্রোস্পোর, c = মাইক্রোস্পোর অঙ্কুরিত, d = তিন কোষের অবস্থা, e = পরাগ সংযোগের পর পরাগ, f = পরাগ-নল, g = বৃন্ত ও দেহকোষ, h = পরাগ-নল, i, j = দুইটি শুক্রাণু ও নালী নিউক্লিয়াস।

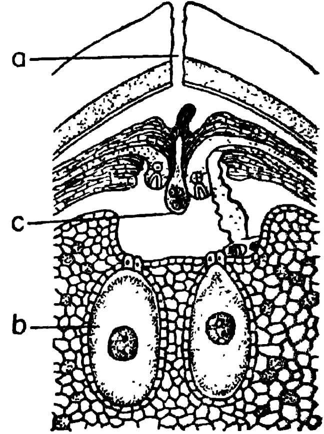
বড় আকারের হয়। স্ত্রীধানী গঠনকালে, নিকটবর্তী কোষগুলি উপরদিকে বৃদ্ধিলাভ করে এবং একটি স্ত্রীধানীঘর (archegonial chamber) গঠন করে।



সাইকাস. a = মেগাস্পোর মাতৃকোষ, b = চারিটি মেগাস্পোর, c = তিনটি লুপ্ত ও একটি কার্যকরী. d = স্ত্রী লিঙ্গধর, e = সস্যকলা, f = প্রাথমিক আরচিগোনিয়াম, g = ডেণ্টাব, h = ডিম্বাণু।



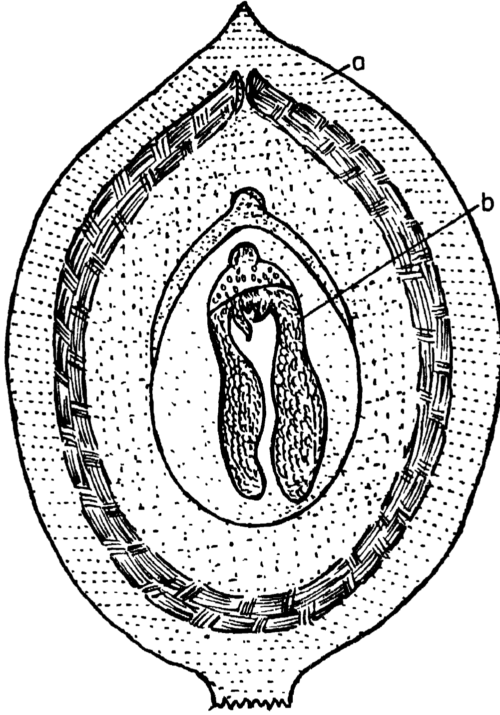
= মাইক্রোপাইল, d = ভ্রূণ।



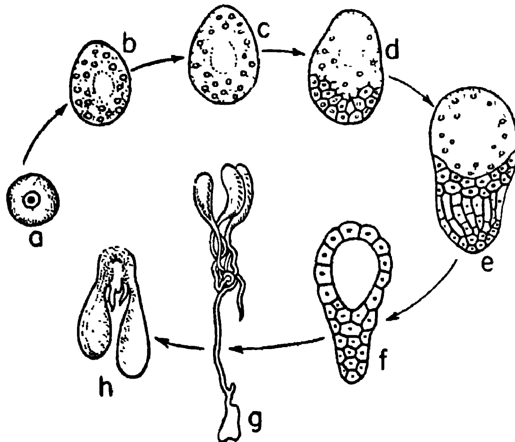
সাইকাসের নিষেক ডিম্বকের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ: a = মাইক্রোপাইল, b = আরচিগোনিয়াম, c = পুং লিঙ্গধর।

পরাগ-নল নিউসেলাস ভেদ করিবার পর ফাটিয়া যায় এবং পুংজনন কোষগুলি, স্ত্রীধানীঘরে ছড়াইয়া পড়ে। পুংজনন কোষ স্ত্রীধানীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং একটি শুক্রাণু বা পুংজনন কোষ ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ইহাই নিষেক। নিষেকের

পূর্বে অঙ্কীয় নালীকোষটি বিনষ্ট হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া উস্পোর সৃষ্টি করে।



সাইকাস . a বীজত্বক, b = ভ্রূণ ও বীজপত্র।

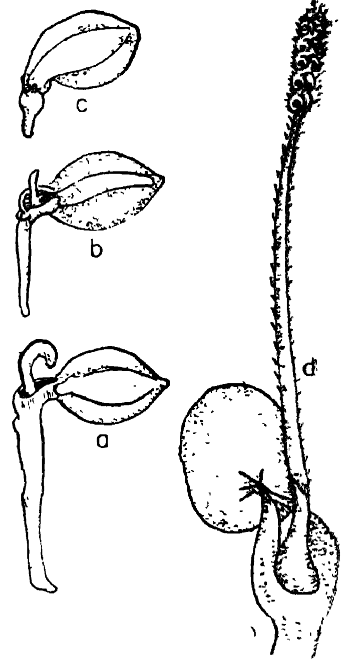


সাইকাসের ভ্রূণের সৃষ্টি . a = উস্পোর, b, c, d = নিউক্লিয়াস বিভাজন, e = ভ্রূণকোষ f = প্রোএমব্রিও, ভ্রূণ, g ভ্রূণ, h = বীজপত্র, ভাবীকাণ্ড ও মূল।

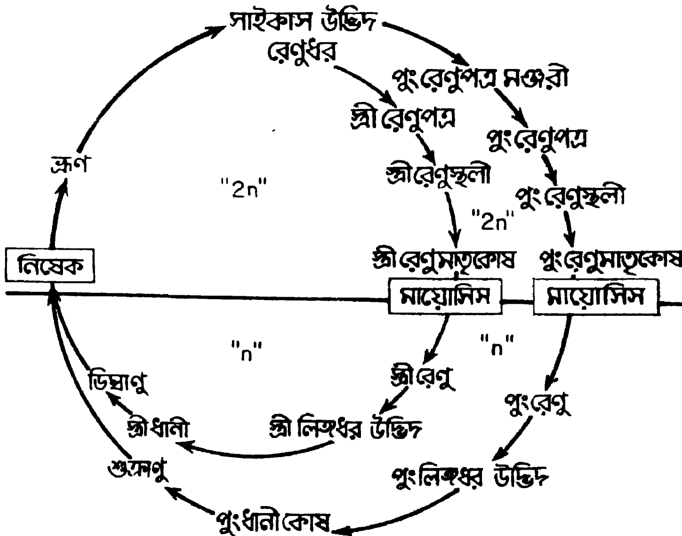
নূতন রেণুধর উদ্ভিদ (new sporophyte)

উস্পোরের সৃষ্টি হইল, নূতন রেণুধর অবস্থার প্রথম ডিপ্লয়েড (2x) এবং ইহার নিউক্লিয়াস বড় হইয়া, অবাধ বিভাজন (free cell formation) দ্বারা—২৫৬ বা অধিক সংখ্যক নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে (সাইকাস রেভোলিউটা) এবং উস্পোরের মধ্যস্থলে একটি বড় **গহ্বর** দেখা যায়। এই উস্পোরে **প্রোএমব্রিও** (proembryo) বা **আদিভ্রূণ** নামক কলা সৃষ্টি হয়। প্রোএমব্রিওর অগ্রভাগের কোষগুলি একটি দীর্ঘ ভ্রূণধর (suspensor) গঠন করে। অগ্র কোষগুলি একটি **দ্বিবীজপত্রী ভ্রূণ** গঠন করে। ভ্রূণ ও সস্য, ত্রিনত্বক যুক্ত আবরণের মধ্যে থাকে এবং বীজে পরিণত হয়।

ইহার অংকুরোদ্গম মৃদ্গত (hypogeal) এবং নূতন চারাগাছটি হইল **রেণুধর** (sporophyte) উদ্ভিদ।



সাইকাস a = ভ্রূণ, b = **বীজপত্র**, c = ভ্রূণ, d = **পাতা**।



সাইকাসের জীবন-চক্র

পাইনাস (Pinus)

পাইনাস ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং কনিফেরেলিস্ গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতে পাইন বৃক্ষ পশ্চিম হিমালয়ে বেশীর ভাগ পাওয়া যায় এবং **পাইনাস** খাসিয়া, আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে জন্মায়। হুকারের মতে ভারতে, ইহার চারিটি প্রজাতি দেখা যায়—যথা, **পাইনাস লঙ্গিফোলিয়া, পাইনাস এক্সেলসা, পাইনাস খাসিয়া ও পাইনাস জিরারডিয়ানা।**

রেণুধর উদ্ভিদ (sporophytic plant)— পাইন গাছ বৃহৎ বৃক্ষ এবং পিরামিড আকারের শাখাপ্রশাখা যুক্ত। পাতা সূচের মত সরু। কাণ্ড শক্ত ও বেলনাকার। ইহাদের অগ্রমুকুল পরিষ্কার দেখা যায়। ইহাদের বিটপ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। কতকগুলি বিটপ শল্কপত্র বহন করে এবং ইহারা **দীর্ঘ বিটপ** (long shoot)। শল্কপত্রের কক্ষ হইতে এক প্রকারের ছোট বিটপ বাহির হয়; ইহাদের আগায় দুই বা বেশী সূচের মত পাতা সৃষ্টি হয়। ইহারা হইল **খর্বাকার বিটপ** (dwarf shoot)। ইহাদের প্রধান মূল মাটির মধ্যে বহু শাখাপ্রশাখা বহন করে।

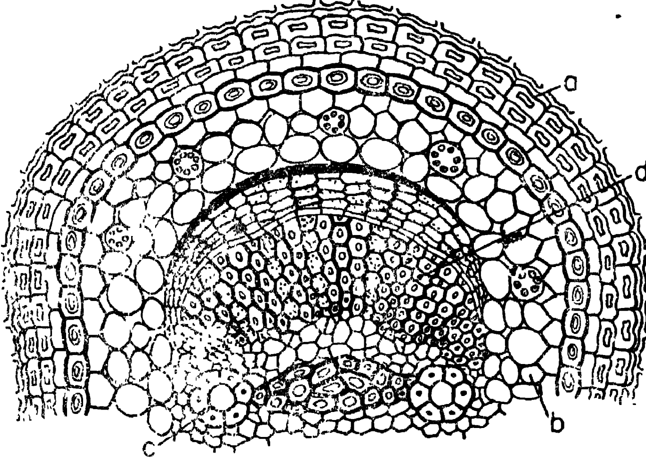


পাইনাস a = দীর্ঘ বিটপ, b = ছোট বিটপ, c = স্ত্রী কোন্, d = পুং কোন্, e' ও e = পাতা সূচের মত।

মূলের প্রস্থচ্ছেদ— ইহা প্রায় দ্বিবীজপত্রী মূলের মত। বাহিরে এপিব্লেমা ও এককোষী রোম থাকে। ইহার ভিতরে কর্টেক্স। কর্টেক্স প্যারেনকাইমা কলা দ্বারা গঠিত। কর্টেক্সের ভিতরের প্রান্তস্তর ট্যানিন যুক্ত এণ্ডোডারমিস। ইহার ভিতর বহুস্তরের পেরিসাইকেল। ইহার মধ্যে স্টার্চদানা ও ট্যানিন্ থাকে। স্টিলের কেন্দ্রস্থলে ২—৬টি 'Y' আকারের প্রাথমিক জাইলেম বাণ্ডিল ও পৃথক ব্যাসার্ধে সমসংখ্যায় ফ্লোয়েম বাণ্ডিল। জাইলেম কেবল ট্রেকিড দ্বারা গঠিত। ফ্লোয়েমে সীভনল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। কেন্দ্রে কিছু মজ্জা থাকে এবং জাইলেমের পাশে রেজিন নালী থাকে।

মূলের বৃদ্ধির সহিত কতক অংশ (প্রাথমিক জাইলেম ও প্রাথমিক ফ্লোয়েমের মধ্যে) ক্যাম্বিয়ামের মত কাজ করে। এইভাবে প্রাথমিক জাইলেমের চারিদিকে বলয়

আকারে ক্যামবিয়াম গঠন করে। এই ক্যামবিয়াম ভিতরের দিকে সেকেণ্ডারী জাইলেম ও বাহিরের দিকে সেকেণ্ডারী ফ্লোয়েম সৃষ্টি করে। পেরিসাইকেলের বাহির স্তর, কর্ক ক্যামবিয়াম গঠন করে। ইহা বাহিরের দিকে কর্ক সৃষ্টি করে। এই কর্ক বাহিরে জল ও খাদ্য যাইতে বাধা দেয় এবং কর্টেক্স ও বাহিরের ত্বক মৃত হয় এবং বিনষ্ট হয়। পেরিসাইকেলের দ্বিতীয় স্তর হইতে শাখা মূল জন্মায়।



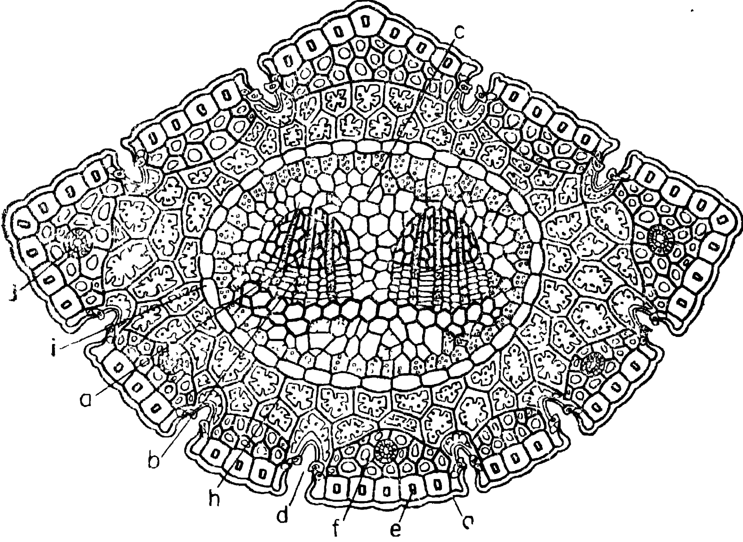
পাইনাস মূলের প্রস্থচ্ছেদ a = কর্ক, b = প্যারেনকাইমা, c = রেজিন-কোষ ও নালী, d = নালিকাবাণ্ডিল।

কাণ্ড - ইহা প্রস্থচ্ছেদে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের মত দেখিতে এবং আকারে বাহিরের দিক তরঙ্গের মত (wavy)। প্রাথমিক অবস্থায় তিনটি অংশে ভাগ করা যায়—এপিডারমিস, কর্টেক্স ও স্টিল। স্টিলের কেন্দ্রস্থলে প্যারেনকাইমার মজ্জা। মজ্জার চারিদিকে বলয় আকারে নালিকাবাণ্ডিল। নালিকাবাণ্ডিলের মাঝে মাঝে মজ্জাংশু। প্রত্যেক নালিকাবাণ্ডিল সংযুক্ত, মুক্ত ও সমপাশ্বীয়। জাইলেমে ট্রাকিড থাকে। ফ্লোয়েম সীভ—নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ফ্লোয়েম ও জাইলেমের মধ্যস্থলে ক্যামবিয়াম, ভাজক কলা থাকে। কর্টেক্সে প্যারেনকাইমা ও রেজিন নালী পাওয়া যায়। বাহিরের দিকে এপিডারমিস ও ইহার বাহিরের প্রাচীর মোটা কিউটিকলযুক্ত। ইহার সেকেণ্ডারী বৃদ্ধির সময়, ক্যামবিয়াম সেকেণ্ডারী জাইলেম ও সেকেণ্ডারী ফ্লোয়েম সৃষ্টি করে। ইহার ফলে এনুয়েল রিং (annual ring) দেখা যায়। রেজিন নালী সেকেণ্ডারী জাইলেমে থাকে। স্টিলের ভিতর সেকেণ্ডারী বৃদ্ধির সময়, বাহিরের কর্টেক্স কর্ক ক্যামবিয়াম গঠন করে। ইহার ফলে পেরিডারম (periderm) জন্মায়। কয়েকবার এইভাবে কর্ক ক্যামবিয়াম জন্মিয়া বাহিরের দিকে পুরু বা মোটা বাৰ্ক গঠন করে।

পাইন পাতার প্রস্থচ্ছেদ

পাতার বাহিরে একস্তরযুক্ত এপিডারমিস। কোষের বাহিরের প্রাচীর কিউটিকলযুক্ত। পত্ররন্ধ্রগুলি ত্বকে নিমজ্জিত থাকে (sunken)। ত্বকের ভিতরদিকে দুই বা তিন

স্তরযুক্ত হাইপোডারমিস বা অধঃত্বক। ইহা স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। অধঃত্বকের ভিতরদিকে মেজোফিল। ইহা দীর্ঘপ্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ইহা ক্লোরোফিলযুক্ত এবং কোষ প্রাচীরগুলির কিছু অংশ ভিতর দিকে ভাঁজযুক্ত (infolded)। ইহার মধ্যে রঞ্জন নালী থাকে। একস্তরযুক্ত এণ্ডোডারমিস



পাইনাস - পাতার প্রস্থচ্ছেদ a = জাইলেম, b = ফ্লোয়েম, c = নালিকাবাণ্ডিল, d = পত্ররন্ধ্র, e = এপিডারমিস f = মেজোফিল, g = কিউটিকল, h = ট্রান্সফিউশন প্যারেনকাইমা, i = এণ্ডোডারমিস, j = রেজিন-নালী।

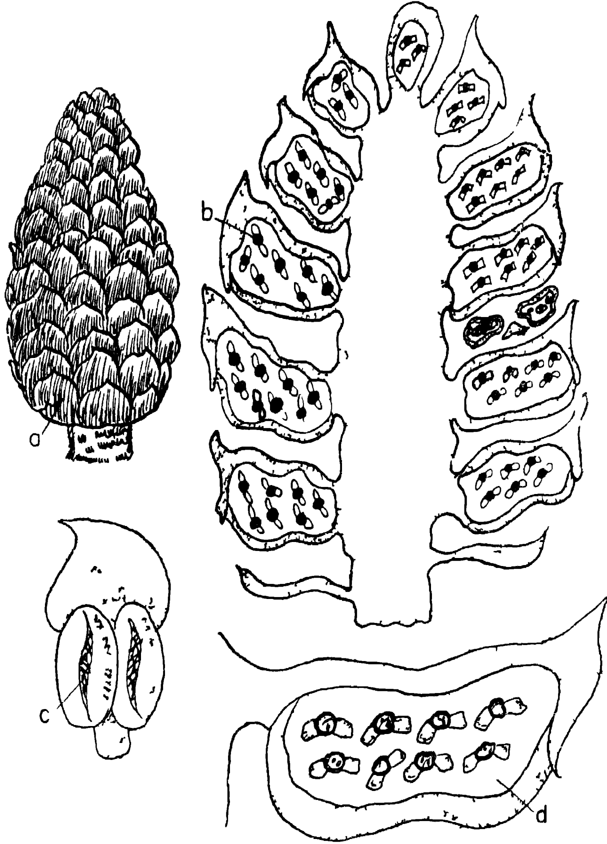
নালিকাবাণ্ডিলকে বেষ্টন করিয়া রাখে। পাতার মধ্যস্থলে দুইটি নালিকাবাণ্ডিল থাকে। নালিকাবাণ্ডিলের উপর দিকে জাইলেম ও নিচের দিকে ফ্লোয়েম। নালিকাবাণ্ডিলগুলি পাতার পরিচক্রে অবস্থিত। পরিচক্রে অ্যালবুমিনাস ও ট্রাকীডাল কোষ দ্বারা তৈয়ারি। অ্যালবুমিনাস কোষ জীবিত এবং মেজোফিলে খাদ্য পাঠায়। ট্রাকীডাল কোষ মৃত ও সপাড়কূপ থাকায়, ইহা দ্রব খনিজ লবণ পরিবহণ করে। এই প্রকার পরিচক্রের (pericycle) কলাকে ট্রান্সফিউশন কলা বলে।

জনন-অঙ্গ

পাইন বৃক্ষ রেণুধর উদ্ভিদ। ইহা সহবাসী অর্থাৎ পুংরেণুপত্র ও স্ত্রীরেণুপত্র একই বৃক্ষে জন্মায়। পুংরেণুপত্র মঞ্জরী (male strobilus) ও স্ত্রীরেণুপত্র মঞ্জরী (female strobilus) দুইই গঠন করে।

পুংরেণুপত্র মঞ্জরী—ইহা খর্বাকার শাখার অগ্রভাগে জন্মায়। ইহা গোলাকার, ঘনবিন্যস্ত ও ২-৩ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ। পুংরেণুপত্র মঞ্জরীতে একটি দণ্ডের উপর পুংরেণুপত্রসকল সর্পিলভাবে সাজান থাকে। পুংরেণুপত্র উপরিভাগে শল্কের ন্যায় বিস্তৃত থাকে। পুংরেণুপত্রের নিম্নতলে দুইটি অবৃন্তক পুংরেণুস্থলী (microsporangium)

অবস্থিত। পুংরেণুস্থলী বহুকোষী ও আয়তাকার। পুংরেণুস্থলীর ভিতর অনেক **পুংরেণুমাতৃকোষ** (microspore mother cell) গঠন করে এবং ইহার চারিদিকে **পোষকস্তর** (tapetum) সাজান থাকে। পুংরেণুমাতৃকোষ মায়োসিস প্রণালী দ্বারা বিভাজিত হয় এবং বহু **পুংরেণু** বা **পরাগরেণু** (**pollen** grain) সৃষ্টি করে। পরাগরেণুর বাহিরের আবরণকে **বহিঃত্বক** (exine) ও

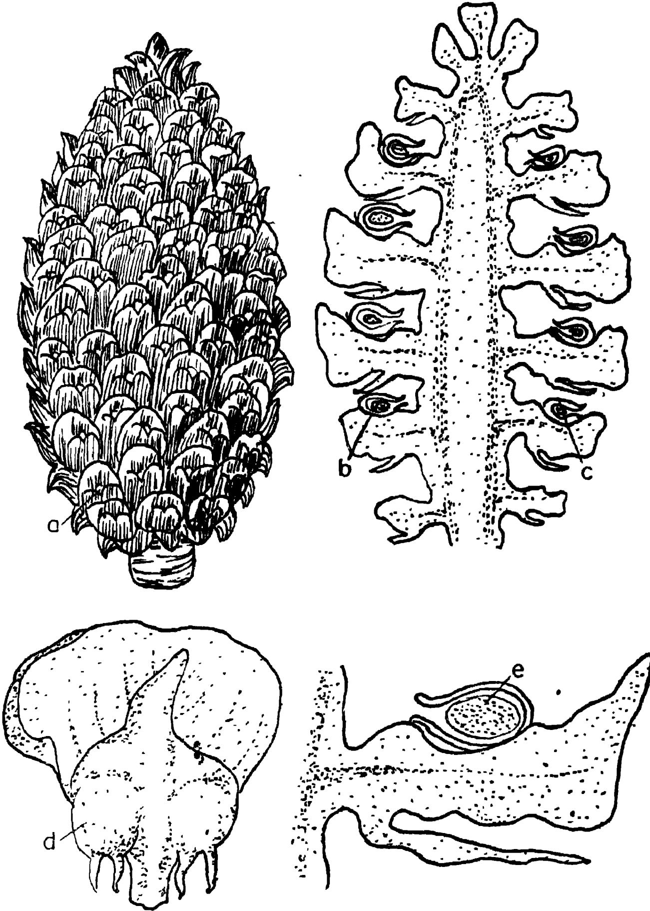


পাইনাস a পুং কোন; b—মাইক্রোস্পোরানজিয়াম, c পরাগ থলি d=পরাগ।

ভিতরের ত্বককে **অন্তঃত্বক** (intine) বলে। এই উদ্ভিদের পরাগরেণুর বহিঃত্বক দুইস্থানে ফুলিয়া দুইটি বেলুনের মত বায়ুপূর্ণ ডানা বা পক্ষ গঠন করে। পুংরেণু বা পরাগ পাকিলে পুংরেণুস্থলীর প্রাচীর ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পরাগের পক্ষ বাতাসে ভাসিবার সাহায্য করে।

স্ত্রীরেণুপত্র মঞ্জরী (female or carpellate strobilus)—ইহার স্ত্রীরেণুপত্রগুলি ঘন সন্নিবেশিত হইয়া শঙ্কুর আকার গঠন করে। ইহা দীর্ঘ বিটপের শল্কপত্রের কক্ষে (1—4টি) জন্মায়। পাকিলে পিঙ্গল লোহিত বর্ণ হয়। স্ত্রীরেণুপত্র মঞ্জরী কাষ্ঠল ও শুষ্ক। ইহার একটি প্রধান অক্ষের উপর সর্পিল আকারে স্ত্রীরেণুপত্র

সাজান থাকে। স্ত্রীরেণুপত্রের একটি শল্কের ন্যায় পুষ্পধর পত্র বা ব্রাক্ট (bract scale) ও একটি **ডিম্বধর পত্র** (ovuliferous scale) থাকে। ডিম্বধর শল্কের নিচের তলে শল্কবৎ পুষ্পধর পত্রটি যুক্ত থাকে। **স্ত্রীরেণুস্থলী** বা **ডিম্বক** (megasporangia) শল্কের উপরিতলের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত।

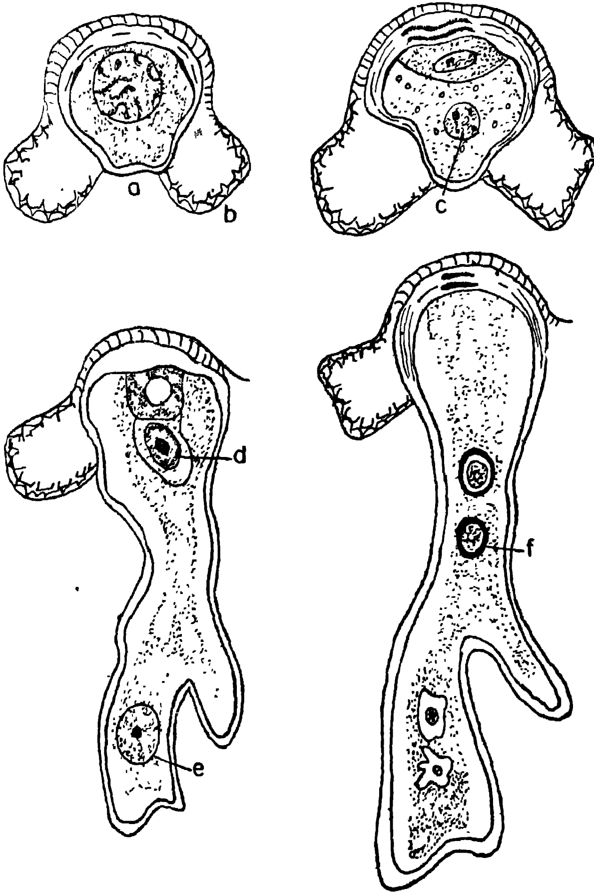


a = স্ত্রী কোন্, b = ডিম্বক-স্কেল, c = ডিম্বক, d = ডিম্বক, e = ডিম্বকের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।

প্রত্যেক ডিম্বক স্ত্রীরেণুস্থলীতে বৃহৎ **ভ্রূণপোষক** (nucellus) এবং তাহার চারিদিকে এক স্তরের **ডিম্বক-ত্বক** (integument) গঠন করে। **ডিম্বক-রন্ধ্র** (micropyle) নিম্নাভিমুখী বা এনাট্রোপাস। ভ্রূণপোষকের ভিতরে একটি **স্ত্রীমাতৃকোষ** (megaspore mother cell) জন্মায়। ইহা মায়োসিস প্রণালীতে চারিটি **স্ত্রীরেণু** (megaspore) সৃষ্টি করে। এই কোষগুলি একই সরল রেখায় থাকে। **ডিম্বক রন্ধ্রের প্রান্তে** তিনটি স্ত্রীরেণু নষ্ট হয় এবং দূরের বড় **স্ত্রীরেণুটি** কার্যকারী হয়।

লিঙ্গধর উদ্ভিদ (gametophytes)

পরাগরেণু হইল পুংরেণুধর উদ্ভিদের প্রথম অংশ। পরাগের অঙ্কুর পুংরেণুস্থলী হইতে বাহির হইবার পূর্বেই হয়। পুংরেণুর নিউক্লিয়াস ভাগ হইয়া দুইটি অসমান কোষ সৃষ্টি করে। ইহার ক্ষুদ্র কোষটি প্রথম **প্রোথ্যালীয় কোষ** (first prothallial cell) এবং বৃহৎ কোষটি পুনঃবার অসমান ভাবে ভাগ হয়। প্রথম প্রোথ্যালীয় কোষের নিকট দ্বিতীয় প্রোথ্যালীয় কোষ এবং বৃহৎ কোষটি হইল **পুংধানী কোষ** (antheridial cell)। প্রোথ্যালীয় কোষ দুইটির কাজ অজ্ঞাত এবং লিঙ্গধর

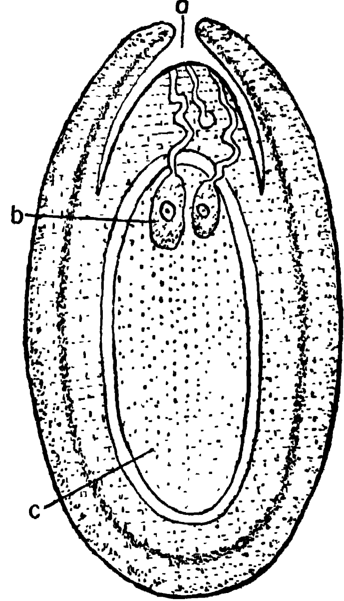


পাইনাস a=মাইক্রোস্পোর, b=পরাগ-ডানা, c=নালী কোষ, d=দেহ কোষ, e=নালী কোষ, f=পুং নিউক্লিয়াস।

উদ্ভিদের জন্মের সহিত, ইহারা নষ্ট হয়। পুংধানী কোষ একটি ছোট **জনন কোষাধার** (generative cell) ও একটি বড় **নালী কোষ** (tube cell) গঠন করে। যখন এই চারিটি কোষ সৃষ্টি হয়, তখন পুংরেণুগুলি রেণুস্থলী হইতে বাহির হয়। বাতাসের

দ্বারা বাহিত হইয়া ডিম্বক রন্ধ্রের মধ্যে অবস্থান করে। প্রতিটি রেণু হইতে ক্ষুদ্র **পরাগনালিকা** (pollen tube) তৈয়ারি হয়। সুতরাং বাতাসের সাহায্যে পরাগ-সংযোগ হয় এবং স্ত্রীরেণুপত্র মঞ্জরীর ভিতর স্ত্রীরেণুপত্রের কিছুটা খোলা অংশ দিয়া ডিম্বক রন্ধ্রে প্রবেশ করে।

ইহার পরে বসন্তকালে ভ্রূণপোষকের মধ্যে পরাগনালিকাগুলি বৃদ্ধিলাভ করে। জননকোষটি দুইটি কোষ সৃষ্টি করে—একটি **বৃন্ত কোষ** (stalk cell) ও অপরটি **দেহ কোষ** (body cell) এবং দুইটি কোষ পরাগনালিকার ভিতর প্রবেশ করে। উপরি-উক্ত দেহ কোষটি ভাগ হইয়া দুইটি ফ্লাজেলাবিহীন, নিশ্চল **পুংজনন কোষ** (male gametes) সৃষ্টি করে।



পাইনাসের নিষেক .
a = মাইক্রোপাইল, b = আরর্কিগোনিয়া,
c = স্ত্রী লিঙ্গধর।

স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ (female gametophyte)

ইহা আরম্ভ হয় **স্ত্রীরেণু হইতে**। স্ত্রীরেণু স্ত্রীরেণুস্থলীর মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। স্ত্রীরেণুর নিউক্লিয়াস, অবাধ বিভাজন প্রণালীতে বহু মুক্ত নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই সকল নিউক্লিয়াস স্ত্রীরেণুর সাইটোপ্লাজমে ছড়ান থাকে। নিউক্লিয়াসগুলির চারিদিকে প্রাচীর গঠন করিয়া **সস্য** (endosperm) তৈয়ারি হয়। এই সস্যকলা ডিম্বক-রন্ধ্রের দিকে ২—৩টি **স্ত্রীধানী** (archegonia) সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক স্ত্রীধানীর গলায় ৮টি কোষ থাকে। অঙ্কের দিকে একটি অঙ্কীয় নালী কোষ ও **ডিম্বাণু** পাওয়া যায়। ইহার গ্রীবা-নালীকোষ জন্মায় না। বৃদ্ধির সহিত অঙ্কীয় নালীকোষ নষ্ট হয়।

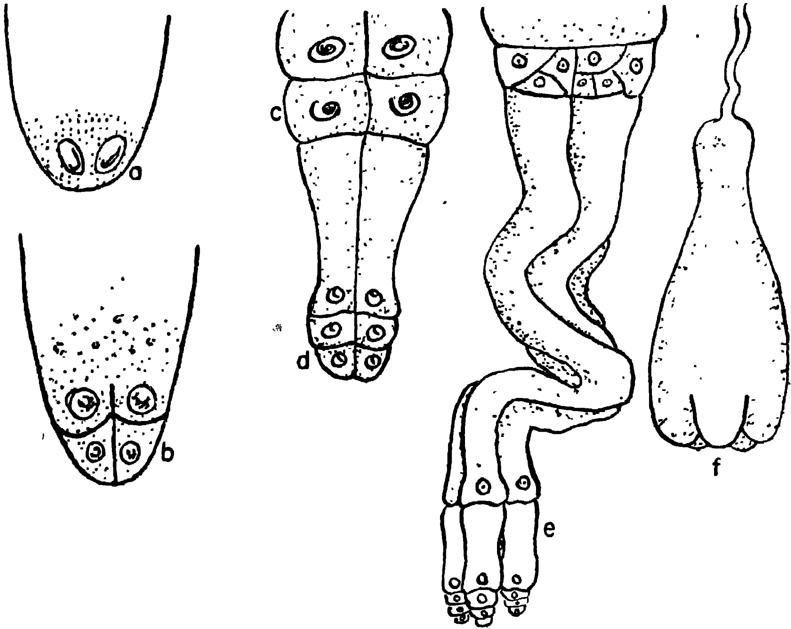
নিষেক

পরাগনালী স্ত্রীধানীর গ্রীবার অগ্রভাগে পৌঁছাইয়া ফাটিয়া যায় এবং পুংনিউক্লিয়াসগুলি বাহির হয়। একটি পুংনিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হইয়া নিষেক সম্পন্ন করে। নিষেকের পর একটি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া **ভ্রূণাণু** (oospore) গঠন করে। ভ্রূণাণু হইল রেণুধর উদ্ভিদের প্রথম অবস্থা।

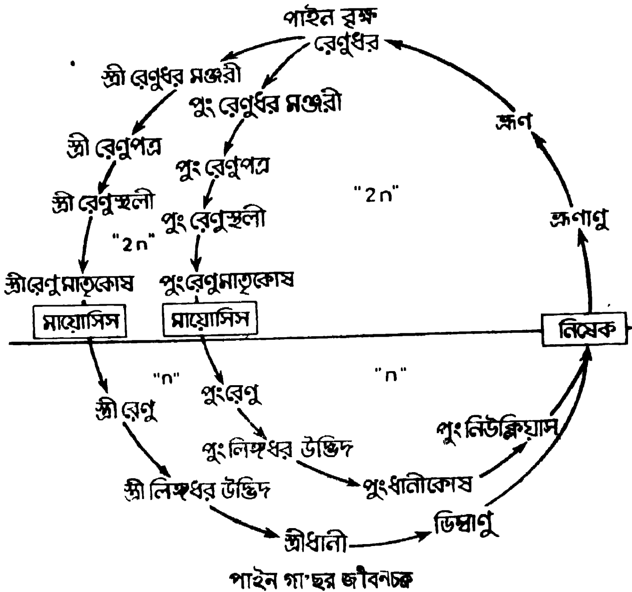
নুতন রেণুধর উদ্ভিদ

ভ্রূণাণুর নিউক্লিয়াস দুইবার ভাগ হইয়া চারিটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহারা একটি রেখায় সাজান থাকে। ইহারা আবার বিভাজিত হয় ও ১৬টি নিউক্লিয়াস তৈয়ারি হয়। ইহারা চারিটি স্তরে সাজান থাকে। নিচের তিনটি স্তরের কোষগুলিতে প্রাচীর সৃষ্টি

হয়। এই স্তরের উপরের স্তরটি **রোজেট স্তর** (rosette tier), **পরের স্তরটি ভ্রূণধর স্তর** (suspensor tier) ও নিচের স্তর **ভ্রূণ স্তর** (embryo tier)।



পাইনাস . a=প্রোএম্ব্রিও, b=চারিটি নিউক্লিয়াস, c=রোজেট, d=ভ্রূণকোষ, e=সাসপেনসর ও ভ্রূণকোষ, f=ভ্রূণ, বীজপত্র, ভাবী মুকুল, ভাবী মূল, সাসপেনসর।



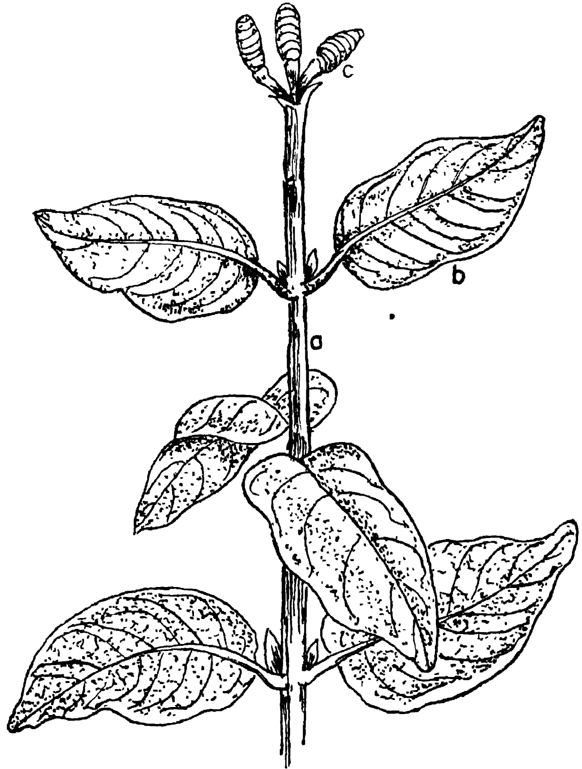
পাইন গা'ছর জীবনচক্র

তিনটি স্তর একত্রে বলা হয়, **আদিভ্রূণ** (pro-embryo)। **ভ্রূণটি** (embryo) ভ্রূণস্তর হইতে জন্মায়। অপর স্তরগুলি ভ্রূণের পুষ্টি যোগায়। ভ্রূণ সৃষ্টি হইবার পর ভ্রূণস্তর বৃদ্ধিলাভ করে এবং ভ্রূণগুলিকে সস্যের মধ্যে প্রবেশ করায়। ইহাতে ভ্রূণের পুষ্টির সাহায্য করে। সচরাচর ভ্রূণস্তর হইতে চারিটি ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ইহাকে **বহুভ্রূণবীজতা** (polyembryony) বলে। একই ডিম্বকের মধ্যে বহু ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। যদিও ইহা পাইন গাছের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু একটিমাত্র ভ্রূণ কার্যকারী হয়। প্রত্যেক ভ্রূণ, ভ্রূণমুকুল (plumule), তিন বা অধিক বীজপত্র (cotyledons) ও ভ্রূণমূল (radicle) দ্বারা গঠিত। ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় সস্য নষ্ট হইয়া একটি সূক্ষ্ম **পরিভ্রূণ** (perisperm) সৃষ্টি করে। নিষেকের জন্য ডিম্বক বীজে পরিণত হয় এবং ডিম্বকত্বক বীজত্বকে পরিণত হয়। ইহার বীজ মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম করিয়া রেণুধর বৃক্ষ সৃষ্টি করে।

নিটাম (Gnetum)

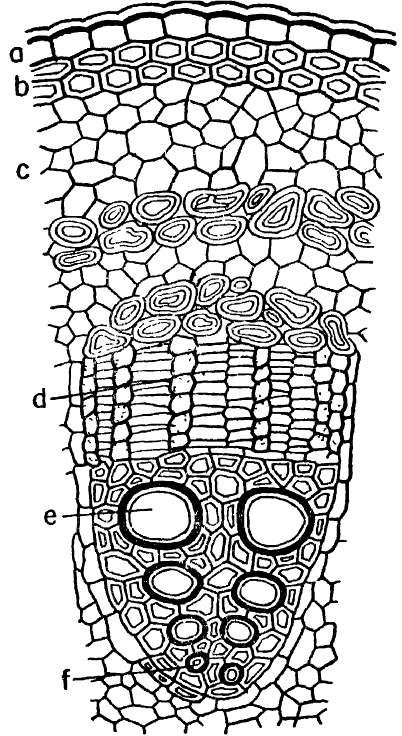
নিটাম নিটোফাইটা গোষ্ঠীর ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ। নিটাম আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতে কেবল পাঁচটি প্রজাতি পাওয়া যায়—**নিটাম নিমন**, **নিটাম লেটিফোলিয়াম**, **নিটাম মনটানাম**, **নিটাম কনট্রাকটাম** ও **নিটাম উলা**। নিটাম বেশীর ভাগই **রোহিণী** বা **লাএনা** (climber or lianas) এবং এই সকল রোহিণী কখন কখন ১০০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ জড়াইয়া উপরে উঠে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ এবং কতকগুলি গুল্ম (shrubs)।

নিটামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মত পাতা ও জাল শিরা বিন্যাস। প্রাথমিক কাণ্ডের পাতার কক্ষ হইতে একাধিক বিটপ জন্মায়। এই সকল বিটপ দুই প্রকারের কতকগুলি সীমাবদ্ধ (limited growth) বৃদ্ধিযুক্ত এবং কতকগুলি অসীমবৃদ্ধিযুক্ত বিটপ। যে-সকল নিটাম রোহিণী-



নিটাম a = কাণ্ড, b = পাতা, c = পুং কোন্।

গুলির পাতা সীমাবদ্ধ শাখা বা বিটপে জন্মায় এবং কিছু শল্কপত্র অসীম বৃদ্ধিযুক্ত শাখায় পাওয়া যায়। সীমাবদ্ধ বৃদ্ধির শাখায় ৯—৬০টি পাতা (বিপরীত) অভিমুখ ও তির্যকাপন্নভাবে সাজান থাকে। পাতার আকার ও দৈর্ঘ্য একই উদ্ভিদে নানাপ্রকার হইতে পারে। পাতার উপপত্র থাকে না এবং ইহারা ডিম্বাকার ও ছোট বৃন্তযুক্ত এবং কিনারা অখণ্ডিত। পাতার শিরাবিন্যাস, জালিকা ও একশিরাল অর্থাৎ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মত হয়। মধ্যশিরার দুই ধারে পাঁচটি শাখা শিরা থাকে। মূল মাটির বেশী গভীরে প্রবেশ করে না এবং প্রধান মূল চারি বৎসর থাকে পরে অস্থানিক মূল এই কার্যভার গ্রহণ করে।



কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ : a=এপিডারমিস, b=হাইপোডোরমিস, c=কর্টেক্স, d=ফ্লোয়েম, e=মেটাজাইলেম, f=প্রোটোজাইলেম।

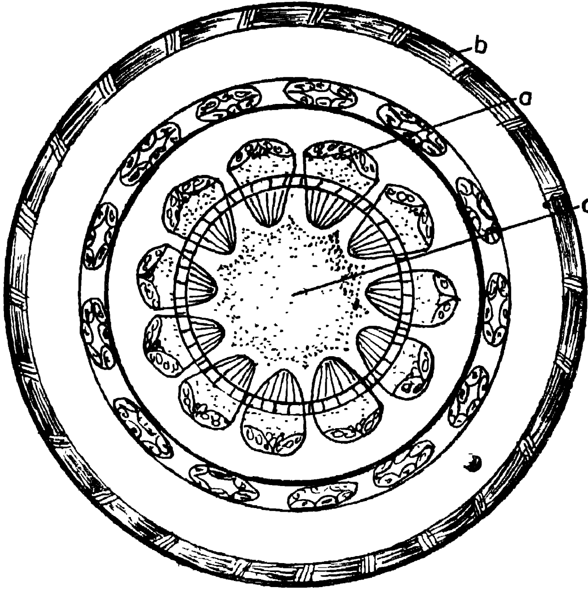
মূলের প্রস্থচ্ছেদ

মূলে **ডাইআর্ক** (diarch) গঠন দেখা যায়। বাহিরে একস্তরযুক্ত এপিডারমিস। ইহার ভিতর হাইপোডারমিস ; হাইপোডারমিস স্কেলেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত এবং ইহার ভিতর প্যারেনকাইমার সাধারণ কর্টেক্স। প্রাথমিক মূলের স্টিলে দুইটি অরীয় প্রকার নালিকাবাণ্ডিল থাকে। ইহাদের মাঝে কিছু প্যারেনকাইমা পাওয়া যায়। মূল সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ করিলে, জা ই লা মে র অখণ্ডভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু ইহাতে দুইটি প্রোটোজাইলেম অংশ থাকে। জাইলেমে ট্রাকিড থাকে। ফ্লোয়েমে সীভনল ও সঙ্গীকোষ থাকে। ইহা দুই প্রকার ক্যামবিয়াম কোষ হইতে জন্মায় কারণ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের মত একপ্রকার কোষ হইতে সৃষ্টি হয় না।

দত্ত (১৯৬৪ সালে) **নিটাম উলার** মূলে এনোমেলাস বৃদ্ধির উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

প্রাথমিক কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে—২০—২৪টি সমপার্শ্বীয়, মুক্ত, সংযুক্ত, নালিকাবাণ্ডিল পাওয়া যায়। ইহা এণ্ডআর্ক অর্থাৎ প্রোটোজাইলেম মজ্জার দিকে অবস্থিত। দুইটি বাণ্ডিলের মজ্জাংশু বেশ বড়। একবারে বাহিরে এপিডারমিস ও পত্ররন্ধ্রগুলি নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে (sunken)। কর্টেক্স বহুকোষী এবং প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। কোষের মধ্যে স্কেলরাইড ও ক্যালসিয়াম অকসালেটের ছুঁচের মত কেলাস পাওয়া যায়।

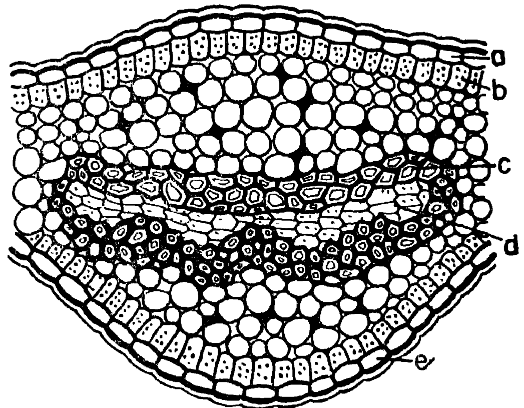


কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ . a=নালিকাবাণ্ডিল, b=এপিডারমিস, c=মজ্জা ।

ইহার মজ্জায় কেন্দ্রের দিকে প্যারেনকাইমা ও তাহার বাহিরে স্কেলেরেনকাইমা থাকে ।

পাতার ছেদন

ইহার আকার দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মত হয়। ইহার উপরিত্বক ও নিম্নত্বক থাকে (বিসমপৃষ্ঠ)। নিম্নত্বকে দ্বিবীজপত্রীর মত পত্ররন্ধ্র থাকে এবং উহাকে সিনডিটোচেলিক (syndetochellic) পত্ররন্ধ্র বলে। মেজোফিল-কলা, উপরে ও নিচে একস্তর -- প্যালিসেড ও বহু স্তরের স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ইহার ভিতর কতকগুলি দানাযুক্ত কোষ থাকে। বাণ্ডিল নালিকা অর্ধবৃত্তাকারে (arch-like) সাজান। বাণ্ডিলনালিকার চারিদিকে স্কেলরাইড থাকে এবং কিছু স্কেলরাইড মেজোফিলের মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রোটোজাইলেম উপর দিকে থাকে অর্থাৎ এণ্ডার্ক।



পাতার প্রস্থচ্ছেদ · a=উপরের ত্বক, b=উপরের প্যালিসেড, c=জাইলেম, d=ফ্লোয়েম, e=নিচের ত্বক।

জনন

নিটাম সচরাচর ভিন্নবাসী (dioecious)। **পুং ও স্ত্রী শঙ্কু** (male and female cone) প্যানিকেলের (panicle) মত পুষ্পমঞ্জরী সৃষ্টি করে। কখন কখন অগ্রভাগেও শঙ্কু পাওয়া যায়। সবুজ পাতার কক্ষে প্যানিকল মঞ্জরী জন্মায়। পাতাগুলি মঞ্জরীর বৃদ্ধির সহিত পড়িয়া যায়। পুং ও স্ত্রী শঙ্কু কয়েক সেণ্টিমিটার দীর্ঘ হয়।

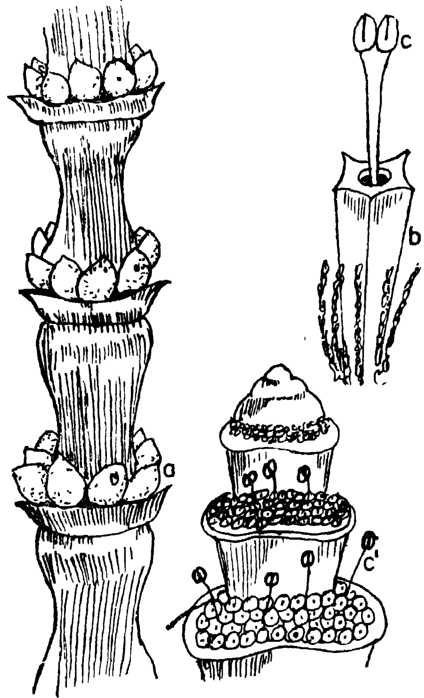
শঙ্কুর মধ্যে একটি দণ্ড থাকে এবং এই দণ্ডের নিচের দিকে দুইটি মঞ্জরীপত্র (bracts) থাকে। ইহার উপরে চক্রাকারে কতকগুলি মঞ্জরীপত্র থাকে। ইহাদিগকে **কলার** (collar) বলে।

পুংশঙ্কু (male cone)

পুংশঙ্কুর প্রায় ১২টির উপর **কলার** (collar) থাকে এবং প্রত্যেক কলারের উপর ৩-৪টি বৃত্ত থাকে। প্রত্যেক বৃত্তে ২৫-৩০টি পুংপুষ্প থাকে। প্রতিটি পুংপুষ্পে একটি বৃন্ত ও বৃত্তাকার পেরিএনথ্ (perianth) এবং দুইটি পরাগধানী বহন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১, ২ বা ৩টি পরাগধানী পাওয়া যায়। পাকিলে বৃন্ত দীর্ঘ হইয়া পরাগধানী কলারের উপর পেরিএনথ্ ভেদ করিয়া উপরে উঠে।

স্ত্রীশঙ্কু (female cone)

প্রত্যেক কলারের উপর কেবল এক সারি স্ত্রীপুষ্প পাওয়া যায়। প্রত্যেক সারিতে ৩-১০টি ডিম্বক (ovules) পাওয়া যায়। প্রত্যেক ডিম্বকই স্ত্রীপুষ্প এবং ইহারা দুই প্রকারের (dimorphic) হয়। ছোট ফুলগুলি বিনষ্ট হয়। প্রত্যেক ডিম্বকের নিউসেলাস থাকে এবং ইহার তিনটি আবরণ। বাহিরের আবরণটি শাঁসাল (fleshy) মাঝেরটি কঠিন (stony) এবং ভিতরেরটি দীর্ঘ হইয়া ডিম্বকরন্ধ্রের নল (micropylar tube) তৈয়ারি করে।



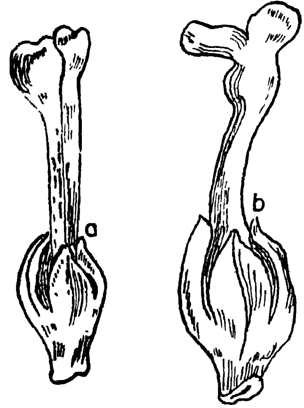
নিটাম : a = স্ত্রী পুষ্প ও ডিম্বক, b = পুং পুষ্প ও পেরিএনথ্, c = মাইক্রোস্পোরানজিয়া।

মাইক্রোস্পোর

পরাগধানীর ভিতর কোষ বিভাজিত হইয়া, একটি বহিঃঅঞ্চল ও একটি অন্তঃঅঞ্চল সৃষ্টি করে। অন্তঃঅঞ্চল হইতে পরাগসৃষ্টিকারী স্পোরোজেনাস (sporogenous)

কলা গঠিত হয়। স্পোরোজেনাস কলা বিভাজিত হইয়া মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ সৃষ্টি হয়। মায়োসিস প্রণালীতে মাতৃকোষ বিভাজিত হয় এবং মাইক্রোস্পোর গঠিত হয়। প্রত্যেক মাইক্রোস্পোরের বাহিরের প্রাচীর একসাইন ও ভিতরে ইনটাইন। পরাগধানী বিদারিত হইয়া পরাগ বাহির হয়।

মাইক্রোস্পোর বিভাজিত হইয়া, একটি ছোট প্রোথ্যালিয়াল কোষ ও একটি বড় কোষ তৈয়ারি করে। বড় কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস জন্মায়। ইহাদের একটির নিউক্লিয়াস বড় হয়। ইহাকে টিউব নিউক্লিয়াস বলে। অপর ছোট নিউক্লিয়াসটি জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস। মাইক্রোস্পোরে তিনটি নিউক্লিয়াস জন্মায়, একটি সৃষ্টি করে প্রোথ্যালিয়াল কোষ, দ্বিতীয়টি টিউব নিউক্লিয়াস ও তৃতীয়টি জেনারেটিভ কোষ।



নিটাম : a ও b = পুষ্প ও পরাগধানী।

মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু

ডিম্বকের মধ্যে কোষ বিভাজিত হইয়া দুইটি স্তর সৃষ্টি হয়। বাহিরের স্তর ও ভিতরের স্তর। রেণুস্তর বিভাজিত হইয়া ৮-১০টি স্ত্রীরেণু-মাতৃকোষ গঠন করে। স্ত্রীরেণুমাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং নিউসেলাস হইতে একটি ক্ষুদ্র পরাগ-প্রকোষ্ঠ (pollen-chamber) সৃষ্টি হয়।

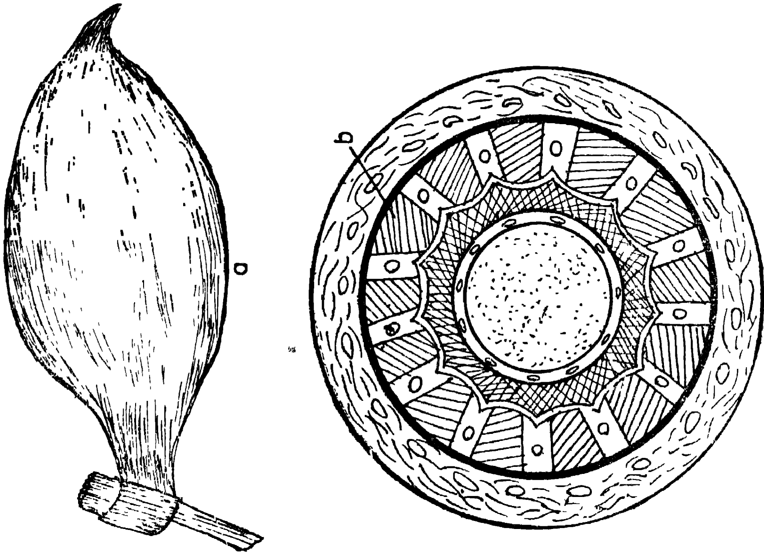
স্ত্রী রেণুটি ৪টি নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং ডিম্বাকার। চারিটি নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে অবস্থিত। সচরাচর একটি ব্যতীত সকল স্ত্রীরেণুমাতৃকোষ বিনষ্ট হয়। সুতরাং চারিটি নিউক্লিয়াসযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে দেখা যায়। স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে অনেকগুলি মুক্ত নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। এই সময়ে ইহা দেখিতে উল্টান কলসীর মত। উপরদিক মোটা ও নিচের দিক সরু ; ধীরে ধীরে নিচের দিকে কোষ বিভাজনের ফলে সস্য (endosperm) জন্মায়। সস্যে এক নিউক্লিয়াস ও বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ থাকে। এই সময় পরাগ-সংযোগ ঘটে এবং কয়েকটি পরাগ-নল, স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে প্রবেশ করে।

পরাগ-সংযোগের পর ডিম্বক-রন্ধ্রনলের মুখ বন্ধ হয় এবং পরাগ শোষিত হইয়া পরাগ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। পরাগ অঙ্কুরিত হয় এবং ইনটাইন একটি পরাগ-নল তৈয়ারি করে। পরাগ হইতে পরাগ-নল বাহির হইয়া ভ্রূণপোষক কলার মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। টিউব নিউক্লিয়াস প্রথমে পরাগ-নলে প্রবেশ করে এবং ইহার পর, প্রবেশ করে জনন-কোষ। জনন-কোষ ভাগ হইয়া দুইটি শুক্রাণু সৃষ্টি করে। নালী কোষ শুক্রাণুর পিছনে থাকিয়া যায়।

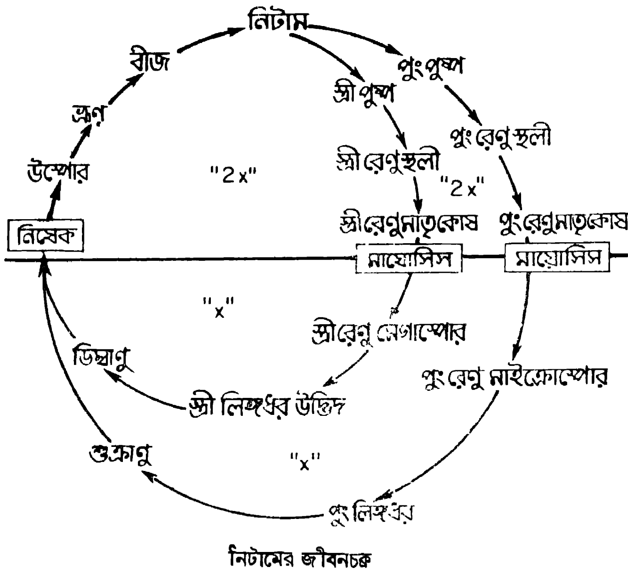
নিষেক

যখন স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে ৭০০-৮০০ নিউক্লিয়াস থাকে তখন নিষেক হয়। নিচের দিকে কোষ কলার সস্য ও কয়েকটি ডিম্বাণু থাকে।

নিষেকের পর, অনেক নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয় কিন্তু অবশিষ্ট নিউক্লিয়াসের প্রাচীর হয় এবং ডিম্বক-রন্ধ্রের দিকেও সস্য জন্মায়।



a—নিটামের বীজ, b—বীজের প্রস্থচ্ছেদ—তিনটি স্তর ও কেন্দ্রে সস্য।



নিটামের জীবনচক্র

ভ্রূণের বৃদ্ধি—জ্যাইগোটে ঘন সাইটোপ্লাজম ও বড় নিউক্লিয়াস থাকে। একটি স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে ১-৪টি জাইগোট থাকে। ভ্রূণকোষগুলি সস্য হইতে পুষ্টি গ্রহণ

করিয়া, বড় হয়। ভ্রূণকলা হইতে ভ্রূণমুকুল, দুইটি কমলা রঙের বীজপত্র ও ভ্রূণমুকুলের বিপরীত দিকে ভ্রূণমূল জন্মায়। নিটামে বীজপত্রের নিচে, একটি অংশ জন্মায়। ইহাকে ফিডার (feeder) বলে।

নিটামে বহুভ্রূণবীজতা (polyembryony) হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহার একটিমাত্র ভ্রূণ বৃদ্ধিলাভ করে এবং অপরগুলি বিনষ্ট হয়।

নিটামের বীজ লাল বা সবুজ রঙের হয়। নিউসেলাস বা ভ্রূণধর কলা অগ্রভাগে ছোট অংশে পরিণত হয়। বীজের উপর তিনটি স্তর থাকে।

ইহার অঙ্কুরোদ্গম মৃদভেদী।

জীবাশ্ম ও উহার সৃষ্টি

সূর্য হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় এবং ইহার বহু কাল পরে, পৃথিবীর ত্বক ঠাণ্ডা হইয়া বিবিধ শিলাস্তর গঠিত হইতে থাকে। রূপান্তরিত শিলা, আগ্নেয় শিলা ও স্তরীভূত বা পাললিক শিলার মধ্যে কেবলমাত্র স্তরীভূত শিলার মধ্যে নানাবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। স্তরীভূত বা পাললিক শিলার রাসায়নিক প্রক্রিয়াও চাপের প্রভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ প্রস্তরীভূত হয়। এই প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ বা প্রাণীকে **জীবাশ্ম** বা **ফসিল** (fossil) বলে।

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বৎসর। ইহাকে পাঁচটি অধিকল্পে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অধিকল্প আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পৃথিবীর অধিকল্প (era) বুঝা যাইবে।

অধিকল্পগুলি হইল—

(১) প্রোটেরোজোইক, (২) প্যালিওজোইক, (৩) মেসোজোইক, (৪) সিনোজোইক এবং (৫) সাইকোজোইক।

	সময় কোটি বৎসর	উদ্ভিদ
প্রোটেরোজোইক—	৫০-৩০০	শৈবাল, ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া।
প্যালিওজোইক—	১৮-৫০	বড় বড় ব্যক্তবীজী ও টেরিডোফাইটার অবসান; বৃহৎ লাইকোপোডিয়াম ও ইকুইসিটামের বাস।
মেসোজোইক—	৬-১৮	ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ধীরে ধীরে পতন ও আবৃতবীজীর উন্নতি।
সিনোজোইক—	০·৫-৬	আবৃতবীজী উদ্ভিদের উন্নতি।
সাইকোজোইক—	বর্তমান কাল	বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার।

জীবাশ্মসৃষ্টির প্রণালী (Methods of fossilization)

প্রাচীন কালের উদ্ভিদ প্রোটেরোজোইক কাল হইতে জীবাশ্মে পরিণত হইতেছে। ৩০০ কোটি বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও জীবাশ্ম সৃষ্টি হইতেছে।

জলাভূমি বা হ্রদের উদ্ভিদ জীবাশ্মে পরিণত হইতে পারে অথবা নদী দ্বারা উদ্ভিদ বাহিত হইয়া সমুদ্রের মোহানায় শিলায় পরিণত হইতে পারে। ভারতের কয়লার গনডোয়ানা শিলা এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল।

জীবাশ্ম সৃষ্টির সময় প্রোটোপ্লাজম ও কোমল অংশ অদৃশ্য হয়। জীবাশ্ম সৃষ্টির সময় জীবাণুর দ্বারা জীবদেহের ধ্বংস এবং স্তরীভূত প্রস্তরের কঠিন চাপ প্রধান অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। এই সকল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সুন্দর কলাযুক্ত জীবাশ্ম সংরক্ষিত এবং সৃষ্টি হয়। জীবাশ্ম নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হয় :

(১) **শিলীভূত জীবাশ্ম** (petrification)—ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ জীবাশ্ম কিন্তু বিরল। ইহাতে জৈবপদার্থ প্রস্তরে পরিণত হয়। কলার মধ্যে সিলিকা, ক্যালসিয়াম কারবনেট, ম্যাগনেসিয়াম কারবনেট, আইরণ সালফাইড প্রবেশ করে। কাণ্ডের টুকরা, বীজ, রেণুথলি, জীবাশ্মে পরিণত হয়। গোলাকার কয়লার জীবাশ্ম 'কোল বল' নামে পরিচিত।

(২) **ছাঁচে** পরিণত বা কাস্ট (cast)—উদ্ভিদের দেহাংশ প্রথমে বালি বা কর্দমে আবৃত হয় এবং কালক্রমে দেহাংশ পচিয়া যায় এবং ভিতরে গহ্বর সৃষ্টি হয়। এই গহ্বর প্রস্তরে পরিণত হয়। এই ছাঁচ উদ্ভিদের আকার সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করে। এইরূপ ছাঁচে ভিতরের অংশ পাওয়া যায় না।

(৩) **ছাপ** (impression)—পাতা বা অন্য অংশ নরম মাটির উপর পড়িয়া, উহার ছাপ সৃষ্টি করে। কালক্রমে এই ছাপ প্রস্তরে পরিণত হয়।

(৪) **চাপ** (compression)—এই প্রণালীতে অধিক চাপে উদ্ভিদ দেহ প্রস্তরে পরিণত হয়। যদিও চাপের জন্য উদ্ভিদ দেহ চেপ্টা হইয়া যায় তথাপি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ইহাকে কিছুটা স্বাভাবিক করা যায়।

(৫) প্রাচীন কনিফার জাতীয় বৃক্ষের রেজিন, এমবার (amber) নামক জীবাশ্মে পরিণত হয়। ইহার ব্যবহারিক জগতে বিশেষ চাহিদা আছে। কয়লা প্রাচীনকালের উদ্ভিদ অরণ্যের জীবাশ্ম বলা যাইতে পারে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
(Economic uses of Gymnosperms)

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। ইহার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি কাঠ, ঘর-বাড়ীর জানালা, দরজা, নানা প্রকার আসবাবপত্র তৈয়ারিতে ব্যবহার হয়। ঘর-বাড়ী সাজাইবার জন্য ও উৎসবের স্থান ইত্যাদিতে এই সকল উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়। **সাইকাডের** টিউবার হইতে আরারুট পাওয়া যায়। বহু পাইন গাছ হইতে কাগজের মণ্ডপ তৈয়ার করা হয়। পাইন গাছের কাঠ হইতে দেশলাই কাঠি তৈয়ারি হয়। পাইন গাছের আর এক প্রকার বস্তু হইল, মিথাইল কোহল। ইহা হইতে কাঠ কয়লা, রজন, কাষ্ঠ গ্যাস, টারপিন তৈল ও কয়েক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। **থুজা কেনেডেনীসস** (Thuja canadensis) গাছের ছাল হইতে যে টেনিন পাওয়া যায়, তাহা কাঁচা চামড়া ট্যান করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা হইতে কালি ও কয়েক প্রকার ঔষধ তৈয়ারি হয়।

পাইনাস জিরাডিআনার বীজ ও আর কয়েক প্রকার পাইনাসের বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাইনের জীবাশ্ম অ্যামবার হইতে গহনা ও সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খচিত আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়।

এফিড্রিন নামক ঔষধ **এফিড্রা** নামক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে **নিটাম নিমনের** কোমল পাতা ও পুষ্পমঞ্জরী সব্জি হিসাবে লোকে খাইয়া থাকে। **নিটাম ল্যাটিফোলিয়ার** বীজের কার্ণেল সিদ্ধ বা ভাজিয়া লোকে ভক্ষণ করে। এই উদ্ভিদের ছাল হইতে দড়ি ও জাল তৈয়ারি হয়। বহু ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জীবাশ্ম হইতে কয়লা সৃষ্টি হইয়াছে।

পাইন, সেডরাস ও **এবিসের** কাঠ হইতে ঘর-বাড়ী তৈয়ারির কাঠ, জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র, প্যাকিং বাক্স, দেশলাইয়ের বাক্স, পেন্সিল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperms)

ইহারা বহু প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর সবীজ (spermatophyta) উদ্ভিদ। ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) কথাটি প্রথমে এরিস্টটলের ছাত্র থিওফ্রেসটাস (Theophrastus) খৃষ্টীয় ৩০০ বৎসর পূর্বে ব্যবহার করেন। ইহাদের বীজ হয় কিন্তু ফলের অভাবে বীজগুলি ব্যক্ত বা নগ্ন অবস্থায় থাকে। জিমনোস্পার্ম'স কথাটির উৎপত্তি জিমনস (gymnos) মানে ব্যক্ত এবং স্পারমা (sperma) মানে বীজ হইতে। উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসে ইহারা টেরিডোফাইটা ও অ্যানজিওস্পারমের মধ্যস্থান অধিকার করে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ স্থলজ (terrestrial)। ইহাদের বাসস্থান গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ, উত্তর ও পূর্ব ভূখণ্ডে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের দেহ সকল সময়ে **রেণুধর** (sporophyte) হইয়া থাকে। ইহারা বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ কাষ্ঠল বৃক্ষ। ইহাদের দেহে কাণ্ড, মূল ও পাতা দেখা যায়। ইহারা **অসমরেণুপ্রসূ** (heterosporous)—অর্থাৎ দুই প্রকার রেণু সৃষ্টি করে।

সচরাচর দুই প্রকার পাতা পাওয়া যায়—আঁইশের ন্যায় **শল্কপত্র** (scale leaves) ও **পল্লবপত্র** (foliage leaves); পল্লবপত্র পুরু কিউটিকল (cuticle) যুক্ত ও চিরহরিৎ (evergreen)।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ফুলগুলি সরল, একলিঙ্গ (unisexual) এবং ফুলের পুষ্পপুট (perianth) প্রায়ই থাকে না। **পুংপুষ্প** পুংকেশর (stamen) **পুংরেণুপত্র** (microsporophyll) দ্বারা তৈয়ারি এবং **স্ত্রীপুষ্প** **গর্ভপত্র** (carpel) **স্ত্রীরেণুপত্র** (megasporophyll) দ্বারা তৈয়ারি।

পুংরেণুগুলি একত্রে **রেণুপত্রমঞ্জরী** (strobilus) বা **শঙ্কু** (cone) গঠন করিয়া থাকে।

সচরাচর স্ত্রীরেণুপত্রগুলিও একত্রে রেণুপত্রমঞ্জরী গঠন করে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের স্ত্রীরেণুপত্রগুলি পৃথক থাকে অর্থাৎ রেণুপত্র প্রকোষ্ঠে (closed chamber) করিয়া ডিম্বাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড তৈয়ারি হয় না। ডিম্বকগুলি রেণুপত্রের উপর অনাবৃত অবস্থায় থাকে।

ইহাদের গর্ভদণ্ড, গর্ভমুণ্ড না থাকায়, পরাগ সংযোগের সময় বাতাস দ্বারা পরাগ সরাসরি ডিম্বকের ডিম্বক-রন্ধ্রের উপর পড়ে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে দুই প্রকার **লিঙ্গধর** (gametophytes) দেখা যায়। পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ ও স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ আকারে ক্ষুদ্র ও হ্রাসপ্রাপ্ত। স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ বহুকোষী এবং এক বা একাধিক **স্ত্রীধানী** (archegonia) বহন করে। পুংজনন কোষ সিলিয়াযুক্ত অথবা সিলিয়াবিহীন হয়।

ইহাদের একটি বিশেষত্ব **সস্যকলা** (endosperm) নিষেকের পূর্বেই সৃষ্টি হয় এবং ইহা হ্যাপলয়েড কারণ হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণুর অঙ্কুরোদ্গম হইবার পরই উহার অংশ হইতে সস্যকলা জন্মায়।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ভ্রূণের প্রথম বিভাজন প্রস্থ বা দৈর্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা হয় না। ইহার ভ্রূণ সূত্রাকার, দীর্ঘ ভ্রূণধরের (suspensor) অগ্রভাগে জন্মায় এবং সচরাচর সস্য-কলার মধ্যে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ডিম্বকে একাধিক ভ্রূণ জন্মায়। ইহাকে **বহুভ্রূণবীজতা** (polyembryony) বলে। ভ্রূণের বীজপত্রের সংখ্যা ১, ২ এবং অধিক হইতে পারে।

ইহাদের **বীজ** বর্তমান। ইহাদের বদ্ধ ফল হয় না। বীজগুলি **অনাবৃত বা নগ্ন** থাকে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস
(Classificatiom of Gymnosperms)

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কতকগুলি অর্ডার (orders) আছে। উদ্ভিদের মধ্যে বহুব্যক্ত-বীজী উদ্ভিদ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া জীবাশ্ম অবস্থায় পাওয়া যায়।

বেনথাম ও হুকার (Bentham and Hooker) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের তিনটি ভাগ করেন (১৮৬৬-৮৩)—সাইকাডেসি (Cycadaceae), নিটেসি (Gnetaceae) ও কনিফেরি (Coniferae)।

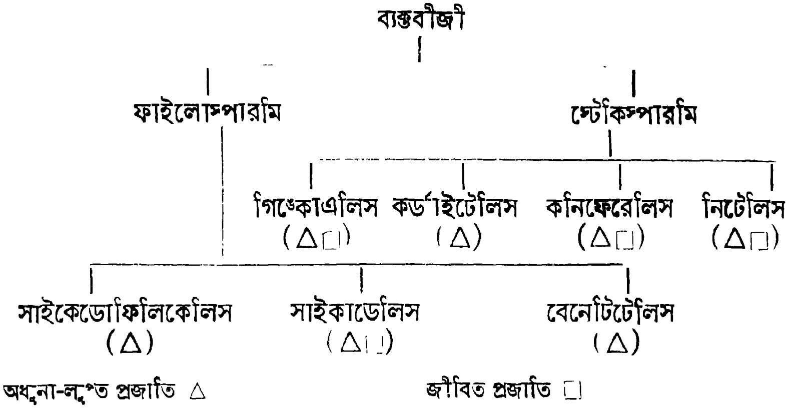
চেম্বারলেন (Chamberlain) ১৯৩৪ সালে ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের দুইটি ভাগ করেন—সাইকেডোফাইটা (Cycadophyta) ও কনিফেরোফাইটা (Conifero-phyta)। সাইকেডোফাইটার তিনটি অর্ডার (order)—যথা, সাইকেডোফিলি-কেলিস (Cycadofilicales), সাইকাডেলিস (Cycadales) ও বেনেটিটেলিস (Bennettitales)।

কনিফোরোফাইটার চারিটি অর্ডারে ভাগ করেন—যথা, গিংকোএলিস (Ginkgoales), কর্ডাটেলিস (Cordiatales), কনিফেরেলিস (Coniferales) ও নিটেলিস (Gnetales)।

অধ্যাপক সাহনী ১৯২০ (Sahni) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের দুইটি ভাগ করেন।

১। ফাইলোস্পারমস (Philosperms)—বীজ রূপান্তরিত পাতায় জন্মায়।

২। স্টেকিস্পারম—কাণ্ডের উপর বীজ সৃষ্টি হয়।



ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রধান প্রধান পার্থক্য (Difference between Gymnospetms and Angiosperms)

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ	গুপ্তবীজী উদ্ভিদ
ইহারা রেণুধর দেহ দ্বারা গঠিত।	ইহারাও রেণুধর দেহ দ্বারা গঠিত।
স্থলে বাস করে।	জলে, স্থলে উভয় স্থানেই পাওয়া যায়।
বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল বৃক্ষ।	বর্ষজীবী ও বহু বর্ষজীবী লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ।
ইহাদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতা দ্বারা গঠিত।	ইহাদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতা দ্বারা গঠিত।
উদ্ভিদে দুই প্রকার রেণু জন্মায় -অসমরেণুপ্রসূ (heterosporous)	উদ্ভিদ অসমরেণুপ্রসূ
ইহাদের বীজ নগ্ন বা আবরণ (ফলত্বক) থাকে না।	ইহাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে।

দেহ-ভিতরের গঠন

নালিকাবাণ্ডিলগুলি বলয়াকারে সাজান, বাণ্ডিলগুলি সমপাশ্বীয় (collateral), মুক্ত (open) ও সংযুক্ত (conjoint)।	নালিকাবাণ্ডিলগুলি বলয়াকারে সাজান, বাণ্ডিলগুলি, সমপাশ্বীয়, মুক্ত ও সংযুক্ত।
জাইলেম কলায় ট্রাকাইড সপাড়কূপ (bordered pit) ও জাইলেম প্যারেনকাইমা থাকে। সচরাচর ট্রাকীয়া থাকে না।	জাইলেম কলা ট্রাকীয়া ও ট্রাকাইড ও জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা তৈয়ারি।
ফ্লোয়েম কলা সীভ্‌নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত, ইহাতে সঙ্গীকোষ থাকে না।	ফ্লোয়েম কলা সীভ্‌নল, সঙ্গীকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা তৈয়ারি।

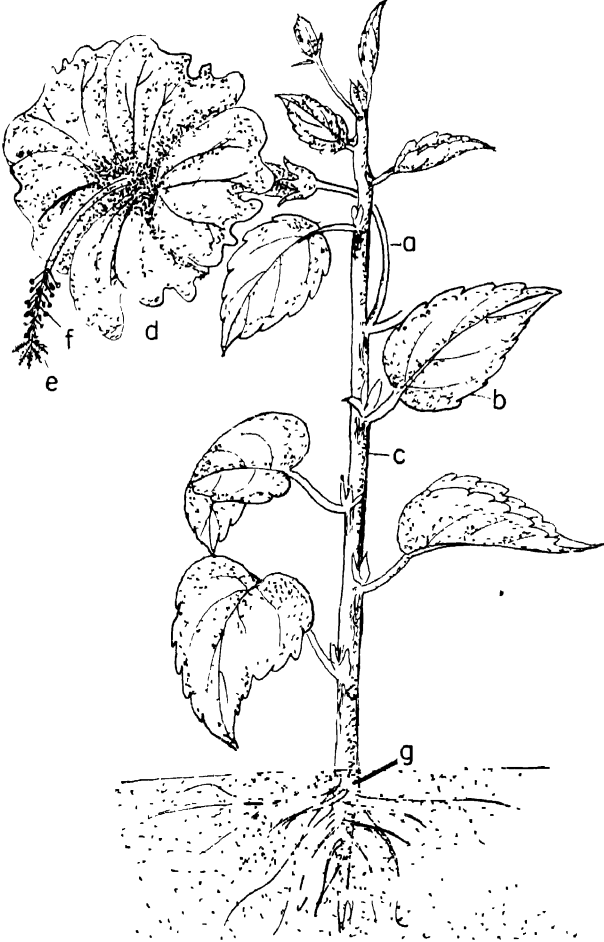
ব্যক্তবীজী	গুপ্তবীজী
পুষ্প	
ইহাদের ফুল একলিঙ্গ, বৃতি ও দল থাকে না অর্থাৎ নগ্ন ; সাহায্যকারী স্তবক (accessory whorls) থাকে না।	ইহাদের ফুল অধিকাংশ দ্বিলিঙ্গ কিছু উদ্ভিদ একলিঙ্গ। ইহাদের বৃতি ও দল থাকে।
পুংরেণুপত্রগুলি পুংরেণুমঞ্জরী তৈয়ারি করে এবং স্ত্রীরেণুপত্র যুক্ত হয় না অর্থাৎ ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় গঠন করে না। স্ত্রীরেণুস্থলীগুলি অর্থাৎ ডিম্বক অনাবৃত অবস্থায় স্ত্রীরেণুপত্রের উপর সাজান থাকে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড না থাকায়, পরাগ সংযোগের সময় রেণু সরাসরি ডিম্বকের ডিম্বক-রন্ধ্রের উপর বাতাসের সাহায্যে পড়িয়া থাকে।	ইহাদের পুংকেশর চক্র সচরাচর একাধিক পুংকেশর দ্বারা তৈয়ারি ; ইহাদের স্ত্রীরেণুপত্র যুক্ত হইয়া গর্ভাশয় গঠন করে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড থাকে এবং পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়িয়া পরাগ-সংযোগ হয়।
ইহাদের দুইপ্রকার লিঙ্গধর উদ্ভিদ জন্মায়। পুং ও স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদের আকার ছোট এবং স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদে আর্চিগণিয়া বা স্ত্রীধানী জন্মায়।	ইহাদের দুই প্রকার লিঙ্গধর উদ্ভিদ জন্মায়। পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ রেণুনল (pollen-tube) উহাতে পুংজনন কোষ থাকে। ইহাদের আর্চিগণিয়া হয় না কারণ ডিম্বাশয়ের মধ্যে ভ্রূণথলির ভিতর ডিম্বাণু জন্মায়।
নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে সচল পুংজনন কোষ ও উচ্চশ্রেণীতে নিশ্চল পুংজনন কোষ পাওয়া যায়।	গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পরাগনালীর ভিতর নিশ্চল পুংজনন কোষ থাকে।
নিষেকের পূর্বেই সস্যকলা গঠিত হয় সুতরাং ইহা হ্যাপলয়েড।	নিষেকের পরে সস্যকলা গঠিত হয় সুতরাং ইহা 3n কারণ পোলার বডি 2n বা ডিপলয়েড, ইহাকে দ্বিনিষেক (double fertilization) বলে ; ইহা কেবল সস্যল বীজে হয়।
ডিম্বকে একাধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হয়।	ডিম্বকে একটি ভ্রূণ উৎপন্ন হয়।
ফল হয় না।	ফল জন্মায় এবং ফলের মধ্যে বীজ থাকে।

গুপ্তবীজী (Angiosperm)

একটি সবীজ উদ্ভিদের দেহের অংশ

(Parts of a Spermatophyte)

সবীজ উদ্ভিদের দুইটি প্রধান অংশ যথা ঃ মূল ও বিটপ (shoot) ; মূল মাটির ভিতর থাকে এবং বিটপ মাটির উপরে থাকে। বিটপ বলিতে বুঝায় **কাণ্ড** (stem),



সবীজপত্রী উদ্ভিদ জবা : a = ফুল, b = পাতা, c = কাণ্ড, d = পাপড়ি, e = গর্ভমুণ্ড, f = পুংকেশর, g = প্রধান মূল।

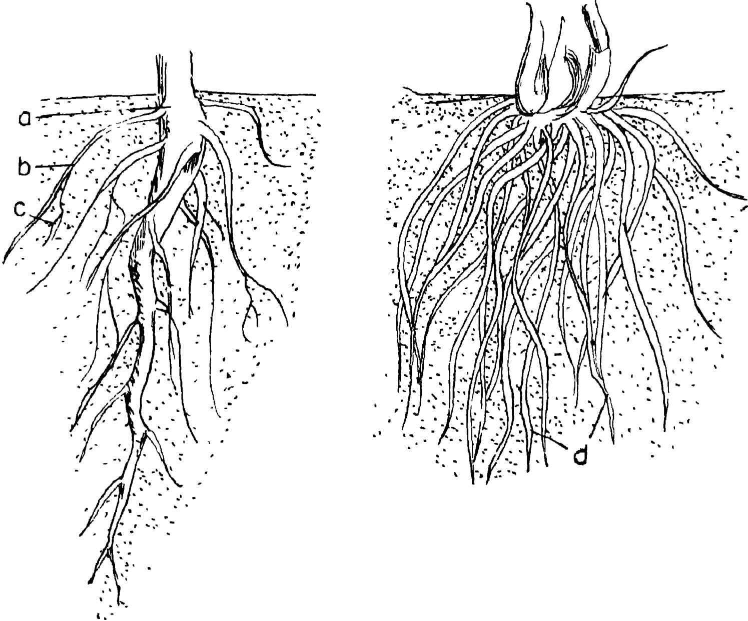
পাতা (leaf) ও **ফুল** (flower) ইত্যাদি। কাণ্ড কয়েকটি পর্ব (node) ও পর্বমধ্য (internode) লইয়া গঠিত। পর্ব হইতে পাতা বাহির হয়। পাতা কাণ্ডের

সহিত উপরের দিকে যে **কোণ** (axil) সৃষ্টি করে তাহাকে **কক্ষ** বলে (axil)। কোণের ভিতর হইতে যে **মুকুল** (bud) বাহির হয় তাহাকে **কাক্ষিক মুকুল** (axillary bud) বলা হয়। মুকুল শাখা বা ফুল সৃষ্টি করে। গাছের অগ্রভাগে আর এক প্রকার মুকুল থাকে। এই মুকুলকে **অগ্রমুকুল** (apical bud) বলে। গাছটি দৈর্ঘ্যে অগ্রমুকুল দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে। মূল মাটির নিচে সরাসরি যাইতে পারে, ইহাকে **প্রধান মূল** বলে এবং প্রধান মূল হইতে **শাখামূল** ও **শাখামূল** হইতে **প্রশাখামূল** বাহির হয়।

উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা হইল **জায়মান অঙ্গ** (vegetative organs) এবং পরে উদ্ভিদে **ফুল, ফল** ও **বীজ** জন্মায়। ইহাদিগকে **জনন অঙ্গ** (reproductive organs) বলে।

মূল

বীজের মধ্যে **উদ্ভিদ ভ্রূণ** (embryo) সুপ্ত (dormant) অবস্থায় থাকে। ভ্রূণের মধ্যে **ভ্রূণ অক্ষটি** (axis) দুইটি প্রধান অংশ দ্বারা তৈয়ারি। বীজ হইতে **অঙ্কুর** বাহির হইবার সময়, প্রথমে ভ্রূণ মূল (radicle) বাহির হয় এবং **ভ্রূণমুকুল** উপরে উঠিয়া কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে।



a=প্রধান মূল, b=শাখা মূল, c=প্রশাখা মূল, d=গুচ্ছ মূল।

সুতরাং মূল সাধারণ ক্ষেত্রে ভ্রূণমূল হইতে জন্মায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে ভ্রূণমূল বর্ধিত হয় না এবং বহু সুতার মত মূল ইহার কিনারা হইতে বাহির হয়।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ভ্রূণমূল হইতে একটি **প্রধান মূল** (tap or primary root) বাহির হয়। প্রধান মূল হইতে **শাখামূল** (branch root) এবং শাখা মূল হইতে **প্রশাখামূল** (tertiary) বাহির হয়। ইহাকে **প্রধান মূল তন্ত্র** (tap root system) বলে। সকল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন : আম, সরিষা, গোলাপ ইত্যাদিতে ইহা পাওয়া যায়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রধান মূল বৃদ্ধি লাভ করে না, ইহার পরিবর্তে সূতার মত মূল থাকে। ইহাকে **গুচ্ছমূলতন্ত্র** (fibrous root system) বলে। ঘাস, নারিকেল ইত্যাদির মূল গুচ্ছমূল।

প্রধানতঃ মূল দুই রকমের দেখা যায়—(১) **প্রকৃত** (true) মূল ও (২) **অস্থানিক** (adventitious) **মূল**।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল, ভ্রূণমূল হইতে জন্মায় এবং ইহাকে **প্রকৃতমূল** বলে। প্রকৃত মূলে শাখা, প্রশাখা জন্মায়। মটর, ছোলা, গোলাপ ইত্যাদির মূল হইল প্রকৃত মূল।

অস্থানিক মূল ভ্রূণমূল হইতে না জন্মিয়া, পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি হইতে জন্মায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল অস্থানিক। অতএব মোটামুটি মূল দেখিয়া উদ্ভিদটি দ্বিবীজপত্রী বা একবীজপত্রী বলা যায়। পাথরকুচি, হিমসাগর গাছের পাতা হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। কাণ্ডের অস্থানিক মূল, যথা : বটগাছের ঝুরি ও স্তম্ভমূল। বাঁশ, আম, ভুট্টা গাছের গোড়া হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। থানকুনি, আমরুল ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। জবা, গোলাপ, গাঁদা গাছের শাখা কাটিয়া বর্ষাকালে মাটিতে রোপন করিলে, খুব শীঘ্রই অস্থানিক মূল বাহির হয়।

মূলের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ –(১) **মূলত্র** (Root cap), (২) **বর্ধিষ্ণু অঞ্চল** (Growing region), (৩) **প্রসারণ অঞ্চল** (Region of elongation), (৪) মূল **রোম অঞ্চল** (Region of root hairs) এবং (৫) **স্থায়ী অঞ্চল** (Permanent region).

মূলত্র—মূলের অগ্রভাগে একটি কোমল অংশ থাকে। ইহার উপর যে ঢাকনা থাকে তাহাকে **মূলত্র** বলে। মূল মাটির ভিতর কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়, মূলত্র কোমল অগ্রভাগকে রক্ষা করে। মূলত্রের বাহির অংশ পিচ্ছিল থাকে, ইহাতে মাটির ভিতর প্রবেশ সহজ হয়। মূল যতই অগ্রসর হয় ততই নূতন মূলত্র জন্মাইতে থাকে। ভাজক কলা মূলের অগ্রভাগে থাকে এবং ঐ ভাজক কলা হইতে মূলত্র জন্মায়। বটগাছের ঝুরিতে ও সরিষার মূলত্র বেশ স্পষ্ট। কেয়া গাছে একটি মূলত্রের উপর আরও কয়েকটি মূলত্র দেখা যায়। ইহাকে **বহুমূলত্র** (multiple root cap) বলে।

বর্ধিষ্ণু অঞ্চল (Growing region)—মূলত্র অঞ্চলের পিছনে ছোট অংশের নাম বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। এই অঞ্চলে কোষগুলি ক্রমাগত (মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়) বিভাজিত হয়।

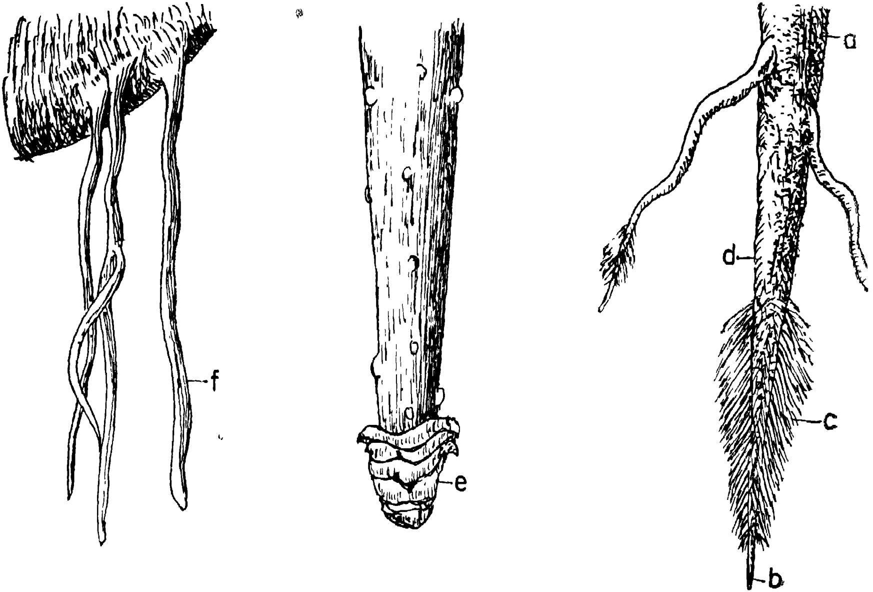
প্রসারণ অঞ্চল (Region of elongation) – এই অঞ্চল বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের পিছনে অবস্থিত। কোষগুলি বিভাজিত হইয়া এই অঞ্চলে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে মূল লম্বা হইয়া যায়।

মূলরোম অঞ্চল (Region of root hairs)—এই অঞ্চল প্রসারণ অঞ্চলের পিছনে থাকে। মূলের উপরে বহু এককোষী **মূলরোম** (root hairs) জন্মায়।

এই মূলরোম মাটি হইতে জল শোষণ করে এবং উদ্ভিদকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বা আটকাইয়া রাখে।

স্থায়ী অঞ্চল (Permanent region)—এই অঞ্চল মূলরোম অঞ্চলের পিছনের অংশ এবং মূলের গোড়া পর্যন্ত অবস্থিত। এই অঞ্চল হইতে মূলের শাখা প্রশাখা বাহির হয়।

এই অঞ্চল হইতে মাটির জল উপরে কাণ্ডের মধ্যে যায় এবং শাখা প্রশাখার সাহায্যে উদ্ভিদকে মাটিতে আটকাইয়া রাখে।

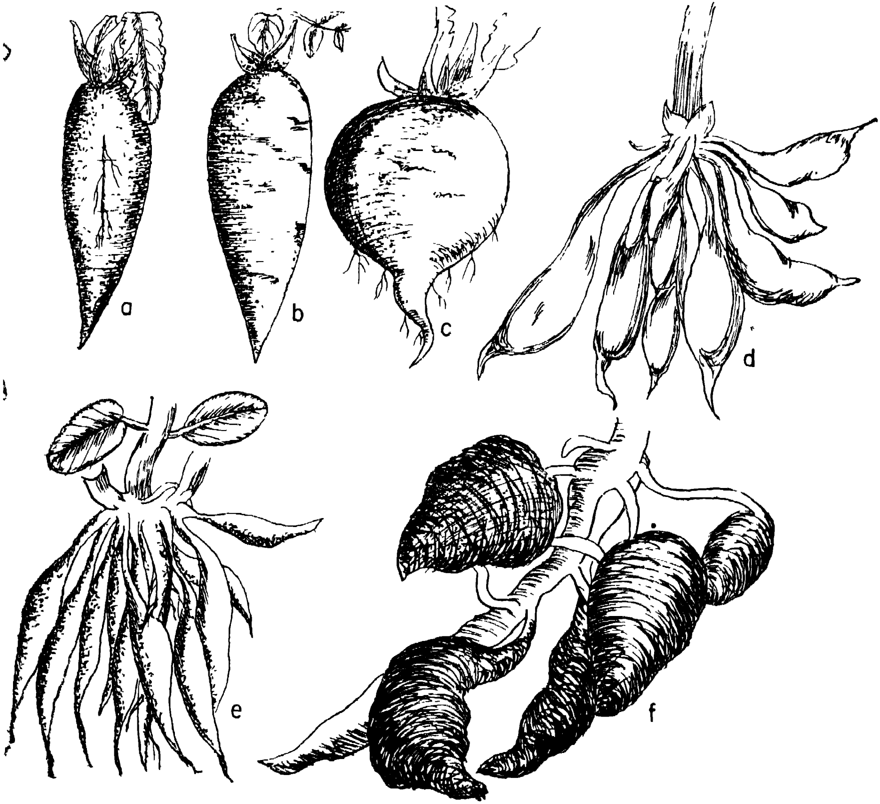


a = প্রধান মূল, b = মূলত্র, c = মূল রোম, d = স্থায়ী অঞ্চল, e = কেয়ার মূলত্র, f = অস্থানিক মূল।

নানা প্রকার মূল (Kinds of roots) : (ক) **ভ্রূণ মূল** (radicle) হইতে যে মূল বাহির হয় তাহাকে **প্রধান মূল** (primary root) বলে। প্রধান মূল হইতে **শাখা মূল** (secondary root) এবং শাখা মূল হইতে **প্রশাখা** (tertiary) মূল বাহির হয়। প্রশাখার শাখা হইলে তাহাও প্রশাখা মূল। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল হইল প্রধান মূল। একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণমূল বেশী বৃদ্ধিলাভ করে না এবং ভ্রূণ মুকুলের (plumule) তলদেশ হইতে সরু সূতার মত মূল বাহির হয়। ইহাকে **গুচ্ছমূল** (fibrous) বলে। এই গুচ্ছমূল **অস্থানিক** (adventitious)

এবং ইহা মূলের সকল কাজ করিয়া থাকে। (খ) প্রকৃত মূল ভ্রূণমূল হইতে জন্মায় কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল অস্থানিক এবং বহু উদ্ভিদে কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়।

পাতার অস্থানিকমূল—পাথরকুচি গাছের পাতা হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া নটেশাকের বৃন্ত হইতে অস্থানিক মূল বাহির করা যায়। কাণ্ড হইতে বহু উদ্ভিদে অস্থানিক মূল বাহির হয়, যথা : বটগাছের ঝুরি, গজপিপুল, থানকুনির লতান কাণ্ড, বাঁশ গাছের গোড়া, আখের, ভুট্টার গোড়া হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়।



পরিবর্তিত মূল : a—মূলাকার, b—শাঙ্কবাকার, c—শালগমাকার, d—গুচ্ছিত, e—গুচ্ছিতমূল, f—কন্দাল মূল।

জবা, গোলাপ, গাঁদা ইত্যাদি গাছের কাণ্ড কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিলে, অস্থানিক মূল বাহির হয় এবং একটি নূতন গাছ জন্মায়।

প্রধান মূল খাদ্য সঞ্চয় করিয়া পরিবর্তিত (modified) আকার ধারণ করে। মূলা হইল পরিবর্তিত মূল—ইহাকে **মূলাকার** (fusiform) বলে। মূলার দুই প্রান্ত অল্প সরু এবং মধ্যস্থান মোটা। মূলার কাণ্ড ছোট এবং উপরের অংশ পাতা।

দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তিত প্রধান মূল হইল **শাঙ্কবাকার** (conical), ইহার উদাহরণ গাজর, গাজর উপর প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। গাজরের কাণ্ড ছোট এবং উপরের অংশ পাতা। আর একপ্রকার পরিবর্তিত প্রধান মূল বীটে পাওয়া যায়। ইহা বেশ মোটা এবং হঠাৎ সরু হইয়া নিচের দিকে যায়। বীটকে **শালগমাকার** (napiform) বলে। শীতপ্রধান দেশে বীটের মূল হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয় ; কারণ আখের চাষ সকল দেশে হয় না।

কোন কোন উদ্ভিদের শাখামূল খাদ্য সঞ্চয় করিয়া মোটা হয়, যথা : রাঙা আলু, শাঁক আলু। ইহাকে **কন্দাল মূল** (tuberous) বলে।

শতমূলী, ডালিয়া ইত্যাদির মূল, একগোছা মোটা মূলে পরিণত হয়। ইহাকে **গুচ্ছিত মূল** (fasciculated) বলে।

বটগাছে তিনপ্রকার মূল পাওয়া যায়। মাটির নিচে বটগাছের স্বাভাবিক প্রধান মূল এবং বটের শাখা হইতে বাতাসে ঝুলিতে থাকে বটের অস্থানিক **বায়বীয়** (aerial)



মূল : A—কেয়াগাছের মূল, a—ঠেসমূল, B—b ও b₁– বায়বীয়, C—স্তম্ভ, d গুঁড়ি বটগাছ।

ঝুরিমূল এবং কাণ্ডের শাখাকে রক্ষা করিবার জন্য বহুমূল মাটিতে যুক্ত হইয়া থামের মত কাজ করে। ইহাকে **স্তম্ভমূল** (prop root) বলে।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রায় দুইশত বৎসরের একটি বটগাছ আছে, ইহার মাটির উপরে ৮০০ স্তম্ভমূল আছে।

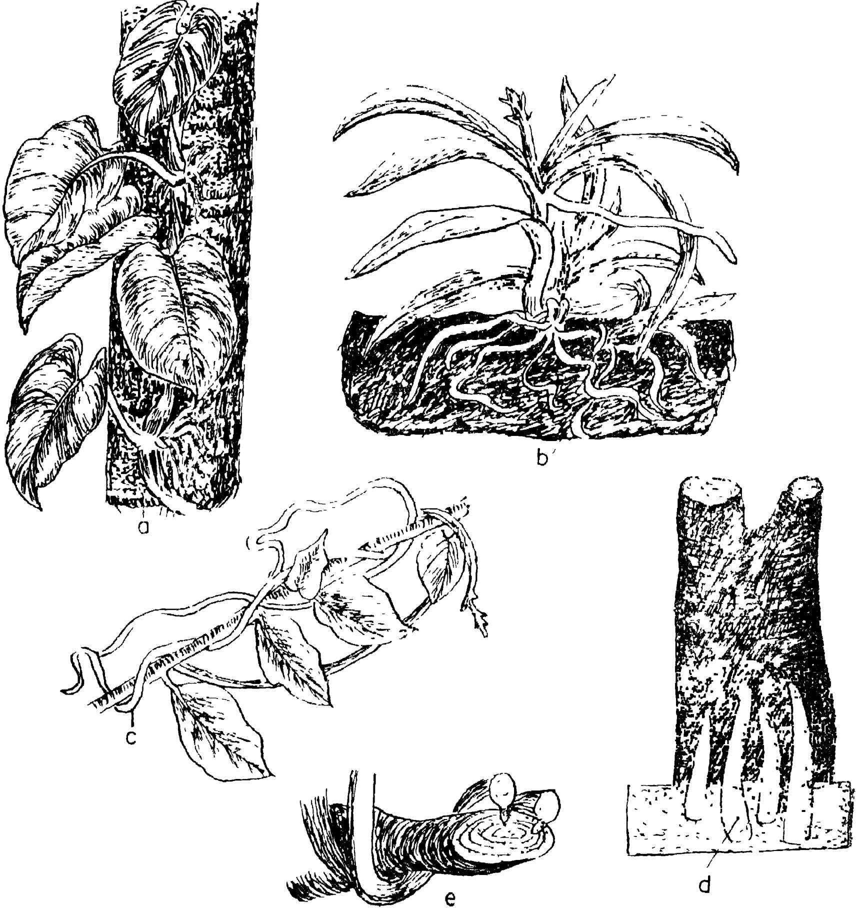
কতকগুলি গাছের কাণ্ড হইতে তির্যকভাবে মূল বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে এবং গাছটিকে পড়িতে দেয় না। ইহাকে **ঠেসমূল** বলে যথা—কেয়া, রাইজোফোরা।

বহু লতান গাছে, আশ্রয় বস্তুকে ধরিবার জন্য অস্থানিক মূল বাহির হয়। ইহাকে **আরোহী মূল** বলে। গজপিপুল, পান ইত্যাদিতে আরোহী মূল পাওয়া যায়।

আমআদা, অ্যারারুট ইত্যাদির মূলের অগ্রভাগ মোটা ও প্রায় গোলাকার হয়, ইহাকে **গুটিকা** (nodulose) মূল বলে।

কোন কোন **মূল** পর্যায়ক্রমে বহুবার স্ফীত হয় এবং মালার মত দেখায়। ইহাকে **মালাকার** (moniliform) বলে। ইহা দুর্বাঘাস, কাকরোল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ঃ

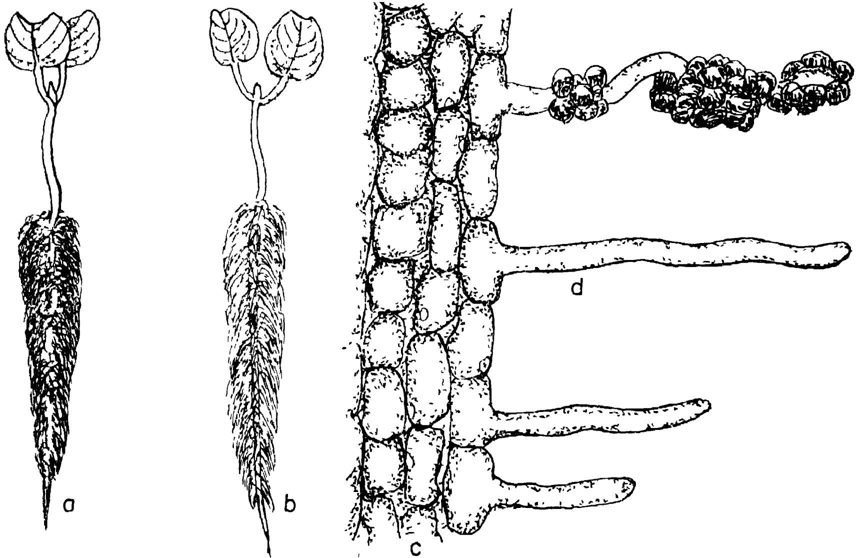
পরজীবী (parasite) উদ্ভিদ, **পোষক** (host) উদ্ভিদ হইতে অস্থানিক মূলের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাকে **চোষক মূল** (haustoria বা sucking) বলে. যথা : স্বর্ণলতা।



a—আরোহী মূল, b—অর্কিডের বায়বীয় মূল, c—শোষক মূল, d—শ্বাস মূল, e—আশ্রয় উদ্ভিদের উপর পরভোজী।

কোন কোন উদ্ভিদে **বায়বীয়** বা পরাশ্রয়ী (epiphytic) মূল পাওয়া যায়। রাস্না বা অর্কিড গাছ (Orchid) বন জঙ্গলে বড় বড় গাছের কাণ্ডের উপর জন্মায়। অর্কিডের মূল বাতাস হইতে জল সংগ্রহ করে, ইহারা পোষকের (host) কোন ক্ষতি

করে না কেবল আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সকল মূলের ওপর **ভেলামেন** (velamen) নামক এক প্রকার আস্তরণ থাকে। এই সকল উদ্ভিদে অতি সুন্দর ফুল পাওয়া যায়।
লবণ হ্রদ ও লবণাক্ত জমিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং গরান, সুন্দরী, কেওড়া গাছের মূল হইতে শাখামূল বাহির হইয়া মাটির উপরে উঠে। এই সকল মূলের গাত্রে বহু ছিদ্র থাকে এবং ঐ ছিদ্রগুলি শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। ইহাকে **শ্বাসমূল** বা **নিউম্যাটোফোর** (breathing roots or pneumatophores) বলে। সুন্দর বনে এই সকল উদ্ভিদ পাওয়া যায়।
কয়েকটি গাছের মূল হইতে মুকুল বাহির হইয়া গাছ সৃষ্টি করে। ইহাকে **প্রজনন মূল** (reproductive) বলে। ইহা রাঙা আলু, পটল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।
কয়েকটি উদ্ভিদ যেমন গুলঞ্চ ইত্যাদি রোহিণী জাতীয় গাছের কাণ্ড হইতে সবুজ মূল জন্মায়। ইহা সবুজ কণা ও সূর্যালোকের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ করে। ইহাকে খাদ্য প্রস্তুতকারী বা **অ্যাসিমিলেটারী মূল** বলে।
কোন কোন জলজ উদ্ভিদে ভাসমান মূল বা **ভেলক মূল** বা ফ্লোটিং রুট পাওয়া যায়। এই মূলের মধ্যে বাতাস থাকে ও শাখা কাণ্ড হইতে মূল বাহির হইয়া উদ্ভিদটিকে জলে ভাসাইয়া রাখে, যথাঃ কেশর দাম।



a, b—মূল রোম, c—কর্টেক্স, d—এককোষী মূল রোম।

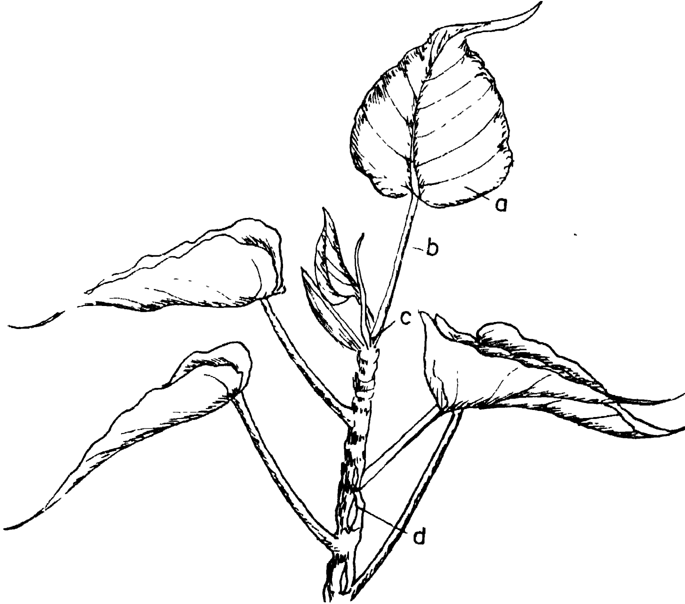
মূলের কাজ (Functions of root) : মূল সাধারণ ও বিশেষ কাজ করে। সাধারণ কাজ, মাটি হইতে জল ও জল মিশ্রিত যৌগ পদার্থ সংগ্রহ করা। ইহা **মূলরোম** করিয়া থাকে। কেবলমাত্র মূলরোম অঞ্চল হইতে জল শোষণ করে। জলজ উদ্ভিদে মূলের সকল অংশ হইতে জল শোষণ হইতে পারে এবং মূলরোম আবশ্যক হয় না। এই জৈবনিক শোষণ কার্য উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক। সকল মূলেই কিছু খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

খাদ্য সঞ্চয় উদ্ভিদের মূলের আর একটি জৈবনিক সাধারণ কার্য। মূল উদ্ভিদকে মাটির সহিত আবদ্ধ রাখে। ইহা মূলের সাধারণ যান্ত্রিক কাজ। ইহা ছাড়া মূলের বিশেষ বিশেষ কার্য হইল :—(ক) বিশেষ যান্ত্রিক কার্য—(১) অধিক ভার বহনে সাহায্য করে—বটগাছের স্তম্ভমূল, (২) অধিক পারিমাণে গাছকে দাঁড়াইতে সাহায্য করে—কেয়া গাছের ঠেসমূল, (৩) গাছকে আশ্রয়ের উপর উঠিতে সাহায্য করে – পান, গজ পিপুল ইত্যাদি।

(খ) বিশেষ জৈবনিক কার্য—(১) অধিক পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় যথা মূলাকার, শালগমাকার, গাজরাকার, অস্থানিক রাঙা আলুর শাখামূল (root tuber), (২) শ্বাসমূল—সুন্দরী গাছ, (৩) বাতাস হইতে বাষ্প শোষণ – আঁকড়ের বায়বীয় মূল (epiphytic), (৪) পরভোজী উদ্ভিদের চোষক মূল, (৫) খাদ্য সংশ্লেষকারী গুলঞ্চের মূল।

বিটপ (Shoot)

ভ্রূণ মুকুল বৃদ্ধি লাভ করিয়া **বিটপ** সৃষ্টি করে। বিটপ বলিতে কাণ্ড, কাণ্ডের শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল ইত্যাদি বুঝায়। বিটপের কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি বহন করে। কাণ্ড পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত থাকে। কাণ্ড **অগ্রমুকুল** (apical bud) দ্বারা দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিলাভ করে এবং **কাক্ষিক মুকুল** হইতে শাখা বা ফুল জন্মায়।



বিটপ : a—পাতা, b—বৃন্ত, c—অগ্রমুকুল, d—কাণ্ড।

মুকুল—মুকুল হইল খর্বাকৃতি বা ছোট আকারের বিটপ (condensed shoot) এবং ইহাতে একটি ছোট অক্ষ (axis) থাকে। অক্ষ পর্ব ও পর্বমধ্য দ্বারা তৈয়ারি এবং বহু ছোট ছোট পাতা ইহাতে থাকে। কক্ষের মধ্যে সচরাচর একটি মুকুল থাকে।

একটির বেশী থাকিলে তাহাকে অতিরিক্ত বা অ্যাকসেসারি (accessory) মুকুল বলে। বাঁধাকপি হইতে মুকুলের আকৃতি সম্মান্ধ ধারণা করা যায় কারণ ইহা পত্র মুকুল।

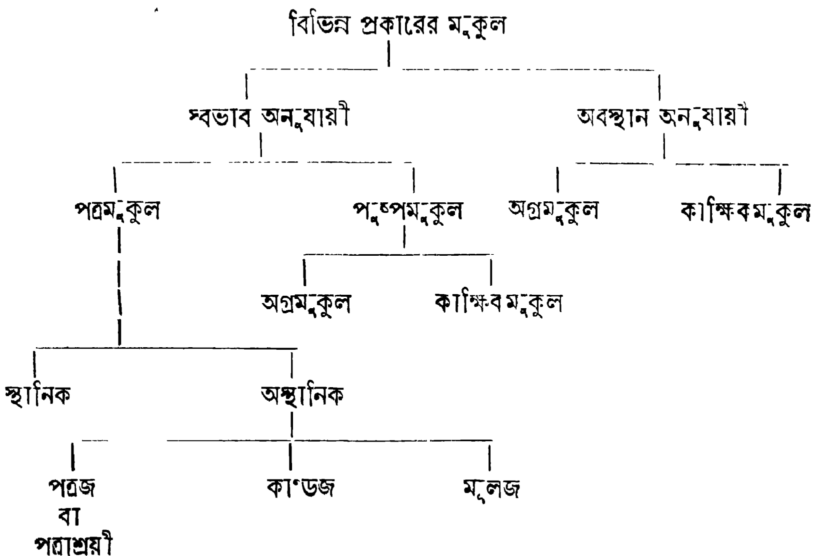
সাধারণ ও অস্থানিক মুকুল—অগ্রমুকুল ও কাক্ষিক মুকুল সাধারণ কারণ ইহারা অগ্রভাগ ও কক্ষ হইতে জন্মায়। কোন কোন ক্ষেত্রে **অস্থানিক মুকুল** (adventitious buds) দেখা যায়। পাথরকুচির পাতায় (Bryophyllum) অস্থানিক মুকুল থাকে, কাণ্ড ও মূলেও কখন কখন অস্থানিক মুকুল জন্মায়। অস্থানিক মুকুল পাতায় জন্মাইলে তাহাকে **পত্রজ** (epiphyllous), কাণ্ডের পর্বমধ্য হইতে জন্মাইলে, কাণ্ডজ (cauline) এবং মূলের উপর জন্মাইলে মূলজ (radical) বলে।

সুপ্ত (dormant) ও **পতনশীল** (deciduous) মুকুল—কোন কোন ক্ষেত্রে মুকুল না খুলিয়া সুপ্ত থাকে এবং আবশ্যক হইলে তখন পাতা ইত্যাদি বাহির করে। কখন কখন মুকুল খুলিবার পূর্বে পড়িয়া যয়ে, ইহাকে পতনশীল মুকুল বলে।

পত্রমুকুল ও পুষ্পমুকুল—পত্রমুকুল বড় হইলে কাণ্ড ও পাতা বহন করে এবং পুষ্প মুকুল ফুলে পরিণত হয়।

বালবিল—ইহা রূপান্তরিত পত্র মুকুল অথবা পুষ্পমুকুল। ইহারা গোল ও মোটা হয়। কখন কখন পরিণত অবস্থায় **বালবিল** (bulbil) হইতে মাটিতে পড়িয়া নূতন উদ্ভিদ জন্মায়। ইহার উদাহরণ চুপরি আলু বা খাম আলু (Dioscorea)।

মুকুলের আবরণ—যখন মুকুলে আবরণ থাকে না, তাহাকে মুক্ত বা অনাবৃত মুকুল বলে। কোন কোন উদ্ভিদের মুকুলে আঁইসের মত আবরণ থাকে ইহাকে **স্কেলি** (scaly) মুকুল বলে, যথা : বট, রবার। বহু ক্ষেত্রে মুকুল রোম দ্বারা আবৃত থাকে অথবা মোমের ন্যায় (wax) আবরণ দেখা যায় ; ইহার দ্বারা জল সঞ্চিত থাকে এবং বাষ্পে পরিণত কম হয়, যথা : কুল (Zizyphus) ; মুকুল বৃষ্টি ও তাপ হইতে ভাঁজ (folded) দিয়া রক্ষা পায়।



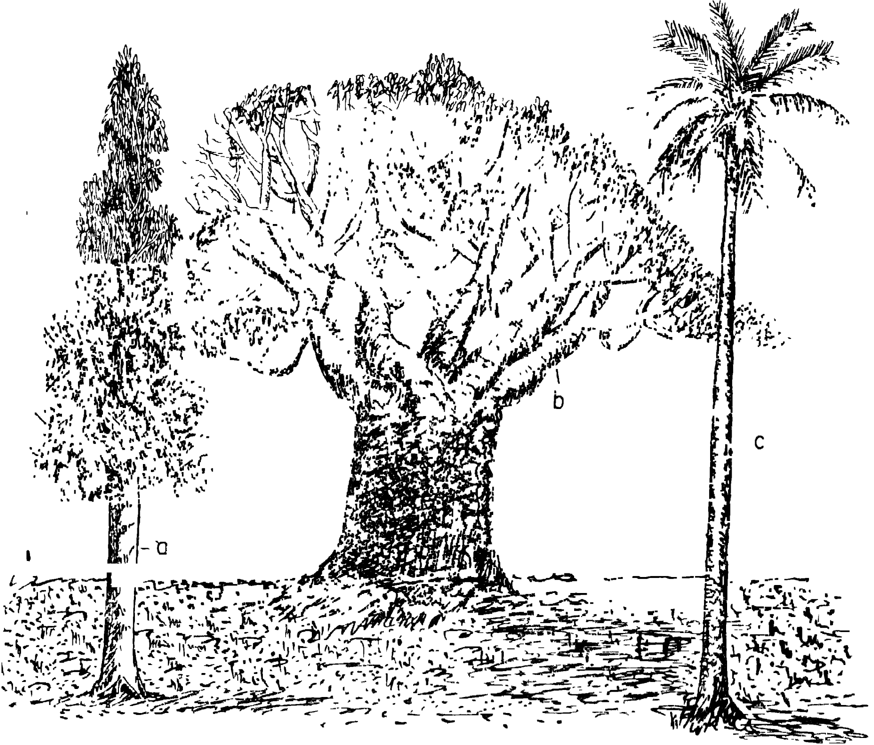
কাণ্ড (Stem)

কাণ্ড ভ্রূণ মুকুল হইতে জন্মিয়া সচরাচর মাটির উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং কাণ্ড **পর্ব** ও **পর্বমধ্যে** বিভক্ত হয়। **পর্ব** হইতে পাতা বাহির হয়। ছোট ছোট কোমল উদ্ভিদের কাণ্ড সবুজ কিন্তু বৃক্ষের প্রধান কাণ্ড সবুজ নহে। পাতার **কক্ষে** থাকে মুকুল ; এই মুকুল শাখায় পরিণত হয় অথবা পুষ্প মুকুল হইলে পুষ্প জন্মায়।

বিভিন্ন প্রকারের কাণ্ড

বহু উদ্ভিদের কাণ্ড শক্ত ও গাছকে খাড়াভাবে দাঁড়াইতে সাহায্য করে। ইহাদিগকে সবল কাণ্ড বলে। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও দাঁড়াইতে পারে না, ইহাদিগকে দুর্বল কাণ্ড বলে।

সবল কাণ্ড—কাণ্ডের প্রকৃতি, শাখা-বিন্যাস এবং আয়ুষ্কাল অনুযায়ী উদ্ভিদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—**বীরুৎ** বা **হার্ব** ঃ এই সকল উদ্ভিদ ছোট, কোমল ও



a—এক্সকারেন্ট, b—ডেলিকয়েসেন্ট, c—কডেক্স।

দুর্বল কাণ্ড যুক্ত হয়। ইহারা এক ঋতুতে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ সৃষ্টি করিয়া জীবন শেষ করে। ইহাদিগকে **বর্ষজীবী** বা অ্যানুয়াল বীরুৎ বলে। ধান, গম, ভুট্টা, মুগ, মুশুর ইত্যাদি ডাল হইল **বর্ষজীবী হার্ব**। আর এক প্রকার

বীরুৎ, দুই ঋতুতে জীবন শেষ করে। প্রথম ঋতুতে মূল, কাণ্ড, পাতা ও পরের ঋতুতে ফুল, ফল ও বীজ সৃষ্টি করিয়া জীবন শেষ করে। ইহাদিগকে **দ্বিবর্ষজীবী** (biennial) বীরুৎ বলে। শীত প্রধান দেশে মূলা, গাজর দ্বিবর্ষজীবী কিন্তু ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা একবর্ষজীবী। অনেক উদ্ভিদ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে **বহুবর্ষজীবী** বীরুৎ বলে, যেমন : আদা, হলুদ, কলাগাছ।

গুল্ম বা স্রাব (shrub)—ইহারা খুব দীর্ঘ হয় না এবং মাটির নিকট হইতে বহু কাণ্ড বাহির হয়। ইহাদের কাণ্ড শক্ত ও কাষ্ঠময়, যথা : গোলাপ, জবা, যুঁই।

বৃক্ষ (tree)—ইহারা আকারে বৃহৎ এবং কাণ্ড শক্ত ও কাষ্ঠময়। মাটির উপর কিছু অংশ গুঁড়ি (trunk) সৃষ্টি করে। উপরে উঠিয়া বহু শাখা, প্রশাখা বহন করে। আম, নিম, বট, দেবদারু হইল বৃক্ষ।

মাটির উপরের কাণ্ড নানাভাবে শাখা বিন্যাস করিয়া থাকে, যথা : **পিরামিডাকার** বা **এক্সকারেন্ট**—শাখাগুলি নিচের দিকে দীর্ঘ এবং ক্রমশঃ উপরদিকে ছোট হইয়া পিরামিডের আকার ধারণ করে, যেমন পাইন, ইউক্যালিপটাস, দেবদারু ; **ডেলিকয়েসেন্ট** যখন প্রধান কাণ্ড অপেক্ষা শাখা কাণ্ডের বৃদ্ধি অধিক হয় এবং উপরদিকে শাখাগুলি মিলিত হইয়া গম্বুজের আকার ধারণ করে, যথা : আম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি ; নারিকেল, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদের সচরাচর শাখা হয় না এবং উপরে অনেকগুলি পাতা বহন করে, ইহাকে **কডেক্স** বলে ; বেত, বাঁশ, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড বহু পর্বযুক্ত হয়, ইহাকে **কালম্** বলে।

দুর্বল কাণ্ড—বহু কাণ্ড দাঁড়াইতে পারে না এবং ইহারা মাটির উপর আনুভূমিক ভাবে থাকে অথবা কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া উপর দিকে আলোক পাইতে উঠে, ইহাদিগকে **দুর্বলকাণ্ড** বলে।

দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ মাটির উপর থাকিলে, তাহাকে **ট্রেলার** (trailer) বলে এবং আশ্রয় ধরিয়া উঠিলে তাহাকে **রোহিণী** বা **ক্লাইম্বার** (climber) বলে। ট্রেলার যদি মাটির উপর পর্ব হইতে অস্থানিক মূল জন্মায় তাহাকে **ক্রীপার** বা **ব্রততী** বলা হয়, যেমন : দুর্বাঘাস (Cynodon) ; যাহাদের পর্ব হইতে মূল বাহির হয় না, তাহাকে **প্রোকামবেন্ট** বলে, যেমন : পুঁইশাক। যদি এই প্রকার ক্রীপারের অগ্রভাগ উপরদিকে উঁচু হয় তাহাকে **ডিকামবেন্ট** (decumbent) বলে, যথা : নুনিয়াশাক (Portulaca).

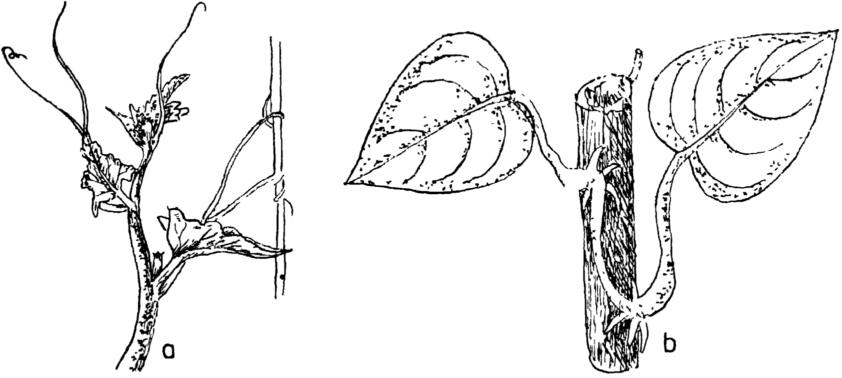
রোহিণী বা ক্লাইম্বার (Climber)

রোহিণী আশ্রয়কে নানা উপায় ধরিয়া উপরে আলোক সন্ধান করে। এই সকল উদ্ভিদ এমনভাবে পাতা সাজায় যাহাতে যথাসম্ভব সূর্যকিরণ পায়। ইহাদের পর্বমধ্যগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। ঘন জঙ্গলে ইহা চমৎকার ভাবে বহু উঁচুতে উঠিয়া থাকে। রোহিণী নানা প্রকার দেখা যায়, যথা : (১) **আকর্ষ ক্লাইম্বার**, (২) টুইনার (twiner), (৩) মূল ক্লাইম্বার (root climber), (৪) স্ক্রাম্বলার (scrambler) এবং (৫) লায়েনা (lianas).

আকর্ষ ক্লাইম্বার (tendril climbers) এই সকল দুর্বল উদ্ভিদ আকর্ষ দ্বারা আশ্রয় ধরিয়া উপরে উঠে। আকর্ষ কোন আশ্রয় পাইলে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উদ্ভিদের নানা অংশ আকর্ষে পরিবর্তিত হয়, যথা : জঙ্গলিমটরের (Lathyrus) পাতা

আকর্ষে পরিণত হয়, মটর শুঁটির যৌগপত্রের অগ্রপত্রকগুলি আকর্ষে রূপান্তরিত, ঝুমকোলতার (Passiflora) শাখা, হাড়জোড়ার (Vitis) কাণ্ডের অগ্রভাগ, উলটচণ্ডালের পাতার অগ্রভাগ (Gloriosa), কুমড়া, লাউগাছের আকর্ষ ইত্যাদি।

কাণ্ড বা টইনার (twiner) বহু ক্ষেত্রে আশ্রয়কে ঘিরিয়া থাকে। এই সকল দুর্বল কাণ্ডের অগ্রভাগ চক্রাকারে আশ্রয়কে আলিঙ্গন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল কাণ্ডটি বামদিক হইতে ডানদিকে যায়, ইহাকে **সিনিসট্রোজ** (Sinistrose) বলে, যথা : কনভলভিউলাস (Convolvulus), তরুলতা (Ipomoea quamoclit)।



a = আকর্ষ ক্লাইম্বার, b = মূল ক্লাইম্বার।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ডান দিক হইতে বাম দিকে ইহাকে **ডেক্সট্রোজ** (dextrose), যথা : সোনামুগ (Phaseolus), শিম (Dolichos)।

কোন কোন উদ্ভিদ অস্থানিক মূলের সাহায্যে আশ্রয়কে অবলম্বন করে, যথা : পান (Piper betle), গজপিপুল (Scindapsus), স্বর্ণলতা (Dodder)।

স্ক্রাম্বলার (scrambler)—এই সকল উদ্ভিদ আশ্রয়কে কাঁটার দ্বারা ধরিয়া থাকে, যথা : লতান গোলাপ, বেত (cane), কাঁঠালি চাঁপা।

লাএনা (lianas)—ঘন জঙ্গলে দুর্বল কাণ্ড আলোকের জন্য অন্য বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উপরে উঠে এবং আলোক পাইয়া বেশ বলিষ্ঠ হয়, যথা মাধবীলতা (Hiptage madhabilata).

শাখাবিন্যাস (Branching)

কাণ্ডের শাখাগুলি যেভাবে সাজান থাকে তাহাকে শাখাবিন্যাস বলে। শাখাবিন্যাস দুই রকম—**পার্শ্বীয়** (lateral) এবং **দ্ব্যগ্র** (dichotomous)।

কাণ্ডের শাখাবিন্যাস সবীজ উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায়। যখন শাখাগুলি কাক্ষিক মুকুল হইতে জন্মায়, তাহাকে পার্শ্বীয় বলে। পার্শ্বীয় শাখাবিন্যাস দুই রকমের যথা **অনিয়ত** ও **নিয়ত**।

অনিয়ত (indefinite)—এই প্রকার শাখা বিন্যাসে অগ্রমুকুল ক্রমাগত বৃদ্ধিলাভ করে এবং কখন শেষ হইবে বুঝা যায় না, এই কারণে ইহাকে অনির্দিষ্ট বলে। বড়

বড় শাখা নিচ হইতে পর্যায়ক্রমে উপরে ছোট হয় (acropetal order) ; ইহা দেবদারু, পাইন, ঝাউগাছে দেখা যায়।

নিয়ত (definite)—**এই প্রকার শাখা** বিন্যাসে অগ্রমুকুল ক্রমাগত বৃদ্ধিলাভ করে না, ফলে অগ্রভাগের নিচের দিকের কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধিলাভ করে এবং সেই সকল শাখা হইতে প্রশাখা বাহির হয় এবং উদ্ভিদকে গম্বুজের মত দেখায়, যথা : বট, কাঁঠাল, টগর। নিয়ত শাখাবিন্যাস, **একপার্শ্বীয়** (uniparous), **দ্বিপার্শ্বীয়** (biparous) ও **বহুপার্শ্বীয়** (multiparous) হয়।

একপার্শ্বীয়—এই ক্ষেত্রে শাখা, প্রশাখা একদিকে জন্মায় এবং ইহা ডানদিক অথবা বামদিক হইতে পারে, যথা : হাড়জোড়া, আঙুর।

একপার্শ্বীয়—শাখা বিন্যাস যদি একদিকে কেবল শাখা জন্মায় তাহাকে **শুণ্ডা** বা হেলিকয়েড বলে (helicoid) যথা অশোক।

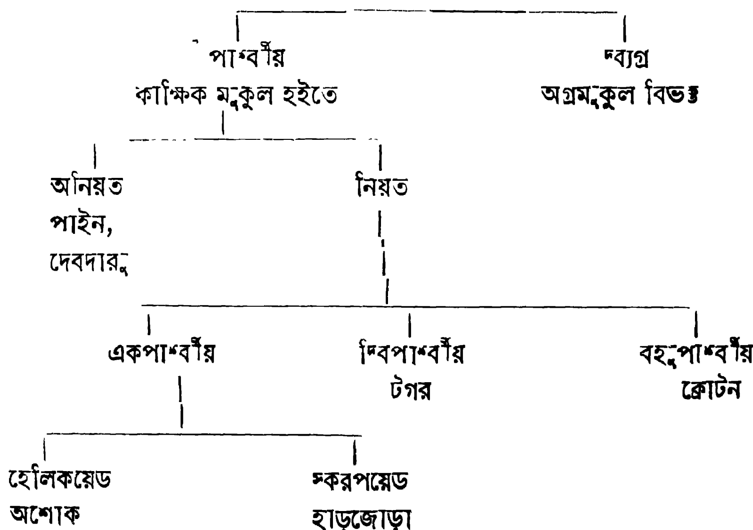
যদি শাখাগুলি একবার ডানদিক এবং পরের বার বাম দিক হয়, তাহাকে **বৃশ্চিকাকার** বা স্কোরপয়েড (scorpioid) বলে, যথা : হাড়জোড়া।

দ্বিপার্শ্বীয় (biparous)—যদি দুইপার্শ্বে শাখা জন্মায় এবং শাখা হইতে আবার দুই পার্শ্বে প্রশাখা জন্মায়, তাহাকে **দ্বিপার্শ্বীয়** বলে, যথা : কৃষ্ণকলি, টগর।

বহুপার্শ্বীয়—যদি পর্ব হইতে দুই না হইয়া অনেকগুলি শাখা জন্মায় তাহাকে **বহুপার্শ্বীয়** বলে, যথা : ক্রোটন।

দ্ব্যগ্রশাখাবিন্যাস (dichotomous)—যখন অগ্রমুকুল দুইটি শাখায় পরিণত হয় এবং শাখাগুলিও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমাগত একইভাবে দুইটি শাখায় পরিণত হয়, তাহাকে দ্ব্যগ্র বলে, যথা : মারকেনসিয়া (Marchantia), রিকসিয়া (Riccia), লাইকোপডিয়াম (Lycopodium)।

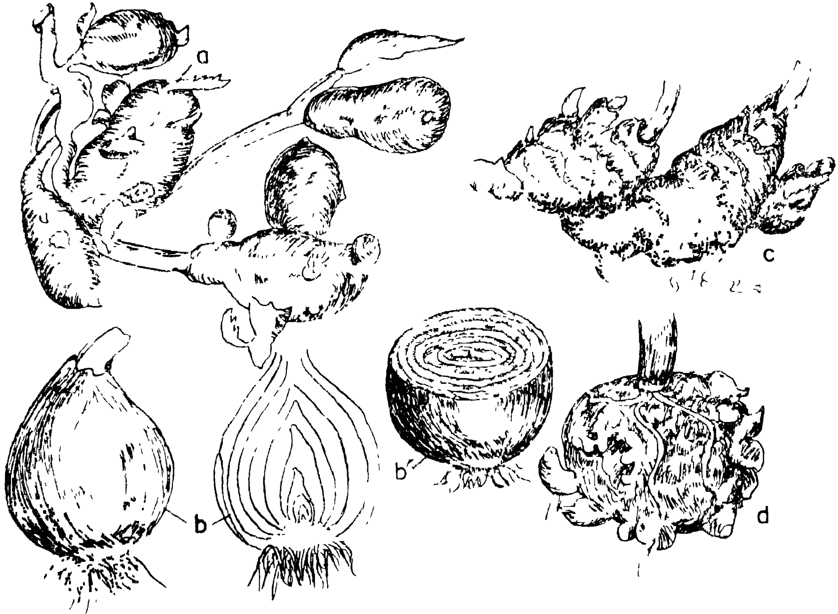
শাখাবিন্যাস



পরিবর্তিত কাণ্ড (Modification of Stems)

বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য কাণ্ডের রূপান্তর ঘটে। তিন প্রকার পরিবর্তিত কাণ্ড পাওয়া যায় : **মৃদ্গত** (underground), **অর্ধবায়ব** (subaerial) এবং **বায়ব** (aerial)।

মৃদ্গত – এই সকল কাণ্ড মাটির নিচে জন্মায় এবং ইহাদের সবুজ রং থাকে না। খাদ্য সঞ্চয় করিয়া, ইহারা আকারে বড় হয়। মৃদ্গত কাণ্ড নানা আকার ধারণ করে। ইহারা উদ্ভিদের অনুকূল অবস্থায় মাটির উপর পাতা, ফুল ইত্যাদি জন্মায়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় যেমন অতিরিক্ত গরম ইত্যাদি হইলে, উপরের অংশ শুকাইয়া যায় বটে কিন্তু মাটির নিচের ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের জন্য অনুকূল অবস্থা পাইলে অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে পুনঃবার পাতা ইত্যাদি ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হইতে জন্মায়। চারিপ্রকার মৃদ্গত বা ভূনিম্নস্থ কাণ্ড, যথা : **গ্রন্থিকন্দ** বা **রাইজোম**, **স্ফীতকন্দ** বা **টিউবার** **কন্দ** বা বাল্ব এবং করম্ (corm)।



মৃদ্গত কাণ্ড : a—টিউবার, b—কন্দ, b´—কন্দের প্রস্থচ্ছেদ, c—রাইজোম, d—করম্

রাইজোম – হলুদ, আদা, কলাবতী ইত্যাদি গাছের রাইজোম মাটির নিচে সমান্তরাল ভাবে বর্ধিত হয়। মূলের মত আকার হইলেও, ইহারা প্রকৃতপক্ষে সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্যযুক্ত কাণ্ড। পর্বে **শল্কপত্র** বা **স্কেলীলফ** থাকে। শল্কপত্রের কক্ষ হইতে কাক্ষিক মুকুল বাহির হয় এবং নূতন শাখা, প্রশাখা উৎপন্ন হয়। কেবল অনুকূল ঋতুতে মাটি হইতে শাখা, প্রশাখা বাহির হইয়া মাটির উপরে বিস্তার করে। অনুকূল অবস্থা না থাকিলে, মাটির উপরের অংশ মরিয়া যায় কিন্তু মাটির নিচে রাইজোম বাঁচিয়া থাকে। রাইজোম হইতে বহু অস্থানিক মূল জন্মায়, মানকচুর রাইজোম মাটির

মধ্যে সমান্তরালভাবে না থাকিয়া, খাড়াভাবে থাকে। ইহাতে পর্ব ও পর্বমধ্য দেখা যায় এবং ইহাকে **মূলাকার কাণ্ড বা রুটস্টক** বলে। **স্ফীতকন্দ বা টিউবার**—আলু গাছের মাটির ভিতরের কাণ্ড হইতে শাখা বাহির হয় এবং শাখার অগ্রভাগ গোল ও স্ফীত হয়। ইহাকে **স্ফীতকন্দ** বা টিউবার বলে। স্ফীতকন্দে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে এবং আলুর উপর পর্ব হইতে শল্ক পত্র বাহির হয়। কক্ষের মুকুলকে আলুর চোখ বলে। আলুর মধ্যে শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে এবং মানুষ ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। আলুর চাষ উপযুক্ত সময়ে আলু কাটিয়া টুকরাগুলি মাটিতে রাখিলে, নূতন গাছ জন্মায়। ইহাকে **অঙ্গজ জনন** বলে।

কন্দ বা বাল্ব—ইহা একপ্রকার ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। ইহার প্রকৃত কাণ্ড খুব ক্ষুদ্র এবং চাকতির মত কাণ্ডের উপর শল্কপত্রগুলি উপর উপর সাজান থাকে। শর্করা সঞ্চিত করিয়া শল্কপত্র মোটা হয়। বাহিরের শল্কপত্রগুলি শুষ্ক কিন্তু ভিতরের শল্কপত্র রসালো, ইহাকে **পুটিত্বু কন্দ** বা **টিউনিকেটেড** বাল্ব বলে, যথা : পিয়াজ, রসুন। অনেক বাল্বে বাহিরে শল্কপত্র থাকে না, তাহাকে **শল্কিত কন্দ** বা স্কেলিবাল্ব বলে, যথা : লিলি।

গুঁড়িকন্দ বা করম—এই প্রকার কন্দ বৃহৎ, শক্ত এবং দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থে অধিক আয়তন। ইহার পর্ব ও পর্বমধ্য বিশেষ বুঝা যায় না। পর্বে শল্কপত্র ও মুকুল থাকে। কাক্ষিক মুকুল হইতে অনেক ক্ষেত্রে অপত্য গুঁড়িকন্দ বাহির হয়। ইহাকে "মুখী" বলে। গুঁড়িকন্দের পাশ্বর্ ও নিচে অস্থানিক মূল থাকে, ইহার উদাহরণ ওল।

ভূনিম্নস্থ কাণ্ড নিম্নলিখিত কাজ করে :—

(১) **খাদ্য সঞ্চয়**—আমরা আলু, পিয়াজ, আদা, ওল হইতে খাদ্য পাই।

(২) **অঙ্গজ জনন**—সচরাচর ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়।

(৩) **প্রতিকূল অবস্থা যাপন** বা পেরিনেশন—জলবায়ু ও তাপ প্রতিকূল হইলে, এই সকল উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ কাণ্ড বাঁচিয়া থাকে এবং অবস্থা অনুকূল হইলে নূতন পাতা ইত্যাদি বাহির হয়।

ভূনিম্নস্থ কাণ্ড মূল হইতে পৃথক কারণ—

(১) ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে, মূলে ইহা থাকে না।

(২) কাণ্ডের উপর শল্কপত্র থাকে, মূলে থাকে না।

পরিবর্তিত অর্ধবায়ব কাণ্ড (Subaerial modification of stem)

এই সকল কাণ্ডের কিছুটা মাটির উপর এবং কিছু অংশ মাটির নিচে থাকে। চারিপ্রকার অর্ধবায়ব কাণ্ড দেখা যায় : **ধাবক** বা **রানার**—ইহাদের কাণ্ড সরু, পর্ব এবং পর্বমধ্য আছে। কাণ্ড হইতে কাক্ষিক মুকুল বাহির হয় এবং উহার শাখা মাটির উপর দিয়া যায়। মাঝে মাঝে অস্থানিক মূল বাহির হয় এবং উপর দিকে পাতা জন্মায়। পাতার কাক্ষিক মুকুল হইতে ধাবক বাহির হয় এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যথা থানকুনি, আমরুল, শুষনি।

বক্রধাবক বা স্টোলন—এই প্রকার ধাবক, দ্রুতবৃদ্ধিলাভের ফলে পর্বমধ্য বাঁকিয়া কিছুটা মাটির উপরে থাকে এবং মাঝে মাঝে মাটি স্পর্শ করিয়া সেইস্থানে অস্থানিক

মূল বাহির হয়, যথা ঃ মেন্থা, থানকুনি (Hydrocotyl) ; **খর্বধাবক** বা **অফসেট**—ইহারা রানারের মত কিন্তু স্থূল ও খর্ব, যথা ঃ কচুরিপানা, পানা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

ঊর্ধ্বধাবক বা সাকার—ইহারাও এক প্রকার ধাবক কিছুদূর মাটির মধ্যে যাইয়া উপরে উঠিয়া পাতা বহন করে এবং নিচে অস্থানিক মূল বাহির হয়, যথা ঃ চন্দ্রমল্লিকা।



a—রানার, b—বক্রধাবক, c—খর্বধাবক, d—সাকার,

রূপান্তরিত বায়ব কাণ্ড (Aerial modification) বহু উদ্ভিদে কাণ্ড উপরে উঠিয়া সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়, ইহাকে **মেটামরফোজড্** বা **পরিবর্তিত** (metamor-phosed) কাণ্ড বলে। যথা ঃ **শাখা কণ্টক (thorn)**, **আকর্ষ** (stem tendril), **পর্ণকাণ্ড** (phylloclade), **ক্ল্যাডোড** (cladode), **বাল্‌বিল** (bulbil) প্রভৃতি।

শাখাকণ্টক—**কণ্টক** নানা প্রকার হয়, যথা : রূপান্তরিত কাণ্ডকে, **শাখাকণ্টক** বা থর্ণ (thorn) বলে, আবার ফণিমনসা বা কুল কাঁটাকে পর্ণকণ্টক (spine) এবং

গোলাপ গাছের কাঁটাকে প্রিকিল বলে। পাতা বা পাতার অংশের কাঁটা হইল স্পাইন এবং ত্বক্ হইতে উৎপন্ন হইলে প্রিকিল বলে। শাখাকণ্টক পাওয়া যায়, বিলাতী মেহেদী (duranta), বেল (wood apple), বৈঁচি ইত্যাদিতে।

শাখা—আকর্ষ (stem tendril)—ঝুমকালতার শাখা, আকর্ষে রূপান্তরিত হইয়া আশ্রয় ধরিয়া উপরে উঠিতে সাহায্য করে। কুমড়ার আকর্ষ প্রকৃত রূপান্তরিত শাখা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন না।

পর্ণকাণ্ড (phylloclade)—মরুভূমি বা সমুদ্রতটে কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড পাতার মত দেখায় এবং জল সঞ্চয় করিয়া বেশ রসাল হয়। ফণিমনসা, ক্যাকটাস ইত্যাদি উদ্ভিদে এই সকল কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বলে। ইহাদের পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। যদি পর্ণকাণ্ডে একটি মাত্র পর্ব থাকে, তাহাকে ক্ল্যাডোড (cladode) বলে, যথা ঃ শতমূলির শাখা কাণ্ড।



a—আকর্ষ, b—ণ্টক, c—পর্ণকাণ্ড, d—ক্ল্যাডোড, d′—ক্ল্যাডোড।

বাল্‌বিল (bulbil)—বহু উদ্ভিদে পত্রমুকুল বা পুষ্পমুকুল, গোলাকার বাল্‌বিলে পরিণত হয়। বাল্‌বিল মাটিতে পড়িয়া নূতন উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে অর্থাৎ অঙ্গজ-জনন সম্পাদন করে। ইহা চুপরি আলু (Dioscorea) নামক উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

বহিরাকৃতি হইতে মূল ও কাণ্ডের প্রভেদ

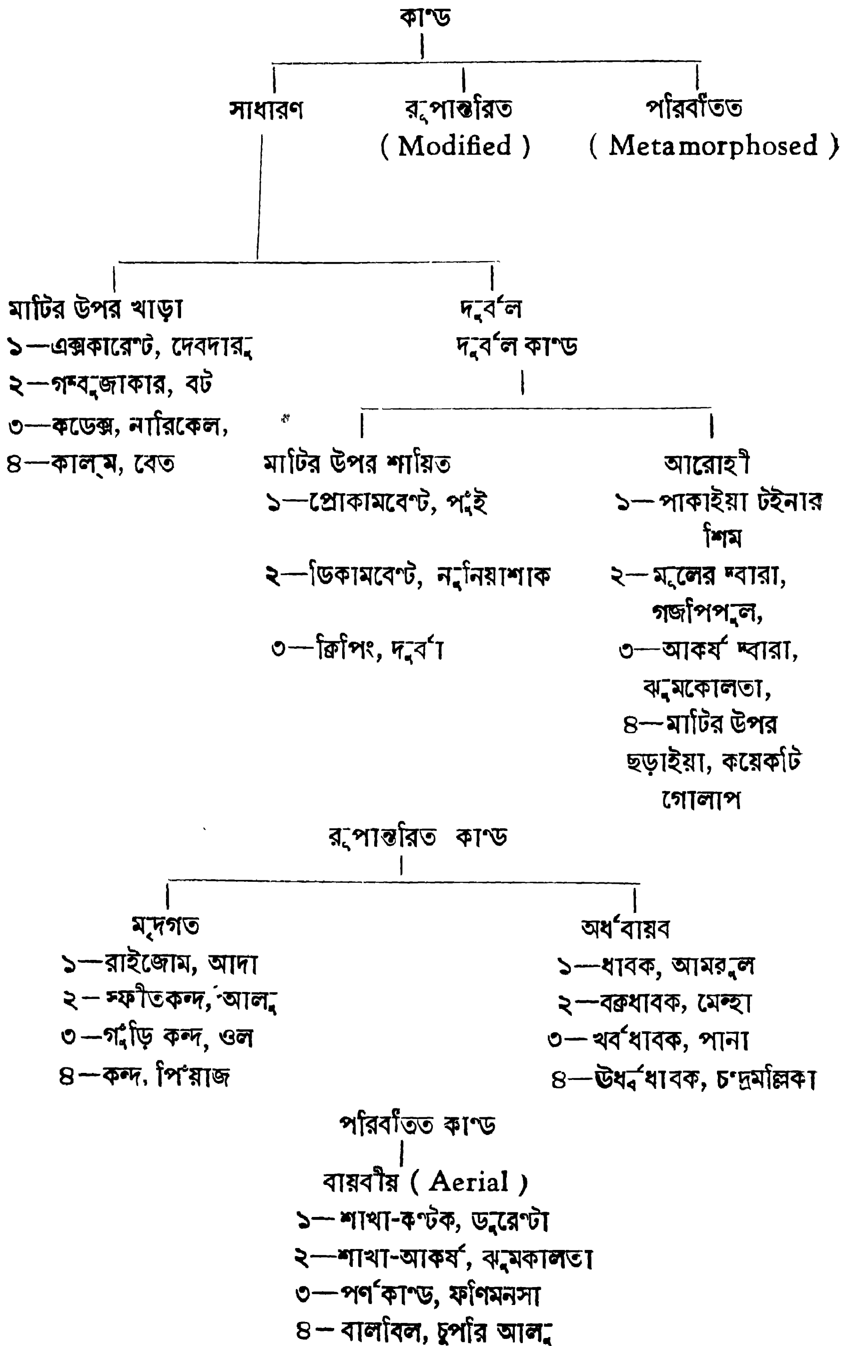
কাণ্ড	মূল
১। সচরাচর কাণ্ড ভ্রূণমুকুল হইতে জন্মায়। ইহা মাটির উপর দিকে উঠে।	১। ইহা সচরাচর ভ্রূণমূল হইতে বাহির হয়। ইহা নিম্নগামী।
২। ইহা বাতাসের দিকে আলোক অভিমুখে এবং জলের বিপরীত দিকে বৃদ্ধিলাভ করে।	২। সচরাচর আলোকের বিপরীত দিকে জল খুঁজিতে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।

কাণ্ড	মূল
৩। ইহা পর্ব ও পর্বমধ্যে বিভক্ত।	৩। মূলে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে না।
৪। ইহা পাতা, ফুল, ফল বহন করে।	৪। ইহা পাতা, ফুল, ফল বহন করে না।
৫। কাণ্ডের অগ্রভাগে অগ্রমুকুল থাকে।	৫। মূলের অগ্র ভাগে, মূলত্র থাকে।
৬। কাণ্ডের শাখা দেহের বাহির হইতে জন্মায় (exogenous)	৬। মূলের শাখা ভিতর হইতে জন্মায় (endogenous)
৭। কাণ্ডের উপর রোম থাকিলে, উহা চারিদিকে থাকে।	৭। মূলের মূল রোম কেবল নির্দিষ্ট মূল রোম অঞ্চলে থাকে।
৮। কাণ্ডের রোম বহুকোষী।	৮। মূলরোম সর্বদা এককোষী।

কাণ্ডের কাজ—দুইটি প্রধান কাজ—একটি কাজ মাটি হইতে মূলের ভিতর দিয়া জাইলেম নালিকার মধ্যে যে জল কাণ্ডে পৌছায় তাহা শাখা, প্রশাখা, পাতা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে পাঠান। কাণ্ড পাতা, ফুল ইত্যাদি অঙ্গ বহন করে। কাণ্ডের উপর পাতা এমনভাবে সাজান থাকে যাহাতে প্রচুর সূর্যালোক পায়। কাণ্ড ফুল, ফল বহন করে। কাণ্ডের ভিতর আর এক প্রকার ফ্লোয়েম কলার সাহায্যে পাতায় প্রস্তুত করা শর্করা জাতীয় খাদ্য তরল অবস্থায় উদ্ভিদ দেহের নানা স্থানে যায়।

উপরি-উক্ত কার্যছাড়া পরিবর্তিত কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, যেমন আদা, আলু ইত্যাদি। ফণিমনসা, ক্যাকটাস প্রভৃতির কাণ্ডে জল সঞ্চিত হয় ; কয়েকটি উদ্ভিদে যেমন ফণিমনসা, শতমূলির ফাইলোক্লেড ও ক্ল্যাডোডে সবুজকণা সালোক-সংশ্লেষ করে ; গোলাপ, জবা ইত্যাদির কাণ্ড অঙ্গজ জনন করে ; বেল, বিলাতী মেদীর শাখা—কণ্টক উদ্ভিদের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে ; ঝুমকালতা, হাড়জোড়ার কাণ্ড রূপান্তরিত হইয়া আশ্রয় আরোহণ করে।

পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন রকম কাণ্ড ছকের সাহায্যে দেওয়া হইল :



পঞ্চম অধ্যায়

পাতা

পাতা পর্ব হইতে উৎপন্ন চ্যাপ্টা, কাণ্ড হইতে ভিন্ন আকারের, অঙ্গ। সবুজকণা বা ক্লোরোফিল থাকার জন্য, ইহা সবুজ। পাতার কক্ষে, কাক্ষিক মুকুল থাকে। পাতা কাণ্ডের বহিরাংশ হইতে জন্মায়।

নানাপ্রকার পাতা

নানারকমের পাতা, নানাপ্রকার কাজ করে।

(১) **সবুজপাতা** কাণ্ডের পর্ব হইতে জন্মায় এবং কক্ষে মুকুল বহন করে।

(২) **বীজপত্র**, ইহা ভ্রূণের প্রথম পাতা। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে দুইটি বীজপত্র থাকে এবং একবীজপত্রী স্কুটেলাম নামক অংশই বীজপত্রকে বুঝায়।

(৩) **ক্যাটাফিল** বা শল্কপত্র—ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে থাকে।

(৪) **মঞ্জরীপত্র** বা হিপশোফিল, ইহার কক্ষ হইতে ফুল জন্মায়।

(৫) **প্রোফিল**, উদ্ভিদের প্রথম পাতাগুলিকে প্রোফিল বলে।

(৬) **পুষ্পপত্র**, ফুলের বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর সকলই রূপান্তরিত পাতা।

সবুজ পাতার কাজ

সবুজ পাতার তিনটি প্রধান কাজ, যথা—**সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পীমোচন** ও **শ্বসন।** সালোকসংশ্লেষ দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে। সূর্যালোকের ফোটন, সবুজ কণা, কার্বনডাইঅক্সাইড, মাটি হইতে জল লইয়া, উদ্ভিদ শর্করা এবং শ্বেতসার জাতীয় জৈব পদার্থ তৈয়ারি করে।

মাটি হইতে জল ও জলমিশ্রিত ধাতব পদার্থ উদ্ভিদ, মূল রোমের সাহায্যে শোষণ করে। অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পাতা হইতে বাহির হইয়া যায়, ইহাকে বাষ্পীমোচন বলে।

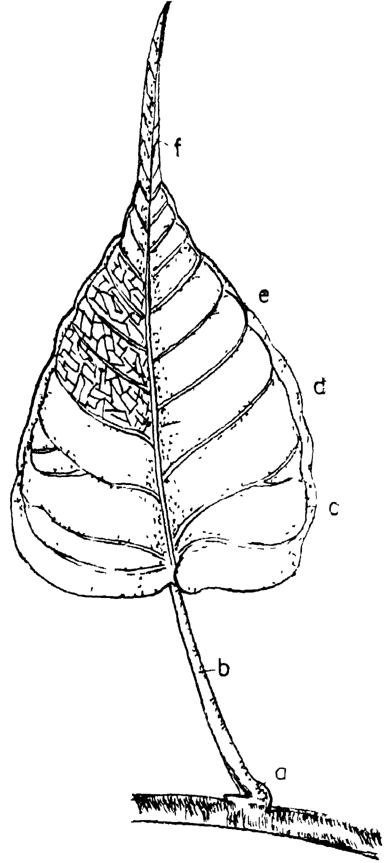
পাতা হইতে পত্ররন্ধ্র দ্বারা দিবারাত্র উদ্ভিদ শ্বাসকার্য করে। ইহাকে শ্বসন বলে। ঐ তিনটি কাজ ছাড়া, কোন কোন পাতায় খাদ্য সঞ্চিত থাকে যেমন বাঁধাকপি ; কোন কোন পাতা হইতে অঙ্গজ জনন হয়, যথা পাথরকুচি।

পাতার বিভিন্ন অংশ

আম, অশ্বত্থ ইত্যাদি আদর্শ পাতায় তিনটি অংশ থাকে, যথা—**ফলক** বা ব্লেড বা এপিপোডিয়াম, **বৃন্ত** বা পিটিওল বা মেজোপোডিয়াম এবং **পত্রমূল** বা হাইপোডিয়াম। পাতার চেপ্টা অংশটি ফলক। পত্রের দুই ধারকে, **কিনারা** এবং পাতার আগাকে

পত্রাগ্র বলে। পাতায় নানা প্রকার কিনারা ও পত্রাগ্র দেখা যায়। ফলকের আকার কোন ক্ষেত্রে গোল, ডিম্বাকার ইত্যাদি হয়। ফলকের মধ্যে বহু **শিরা**, **উপশিরা** দেখা যায়। আম পাতায় ফলকের মধ্যস্থলে যে মোটা শিরা থাকে তাহাকে **মধ্যশিরা** বা **মিড্‌রিব** বলে। শিরা উপশিরার সাহায্যে কাণ্ড হইতে জল পাতার শিরা উপশিরার মধ্যে যায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য সালোক-সংশ্লেষ দ্বারা তৈয়ারি হইয়া শিরার ফ্লোয়েম নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ফ্লোয়েম কাণ্ডের ভিতর পাঠাইয়া দেয়। শিরা-উপশিরা পাতার আকার এবং কোমল অংশকে কাঠামোর ন্যায় যথাস্থানে রাখে। ফলকের নিচের অংশকে **বৃন্ত** বলে। যে পাতায় বৃন্ত থাকে তাহাকে **সবৃন্তক**, যেমন আম পাতা ও বৃন্ত না থাকিলে **অবৃন্তক** পত্র বলে, যথা আকন্দ, শিয়ালকাঁটা—বৃন্ত ফলকের সহিত উপরদিকে যুক্ত হয় এবং নিচের দিকে **পত্রমূলের** সহিত যুক্ত। বৃন্তের মধ্য দিয়া জল ও খাদ্য যাতায়াত করে।

পাতার যে অংশ কাণ্ডের সহিত যুক্ত, তাহাকে **পত্রমূল** বলে। পত্রমূলের দুই ধারে পাতার মত অংশকে **উপপত্র** (Stipule) বলে। সকল পাতায় উপপত্র থাকে না।

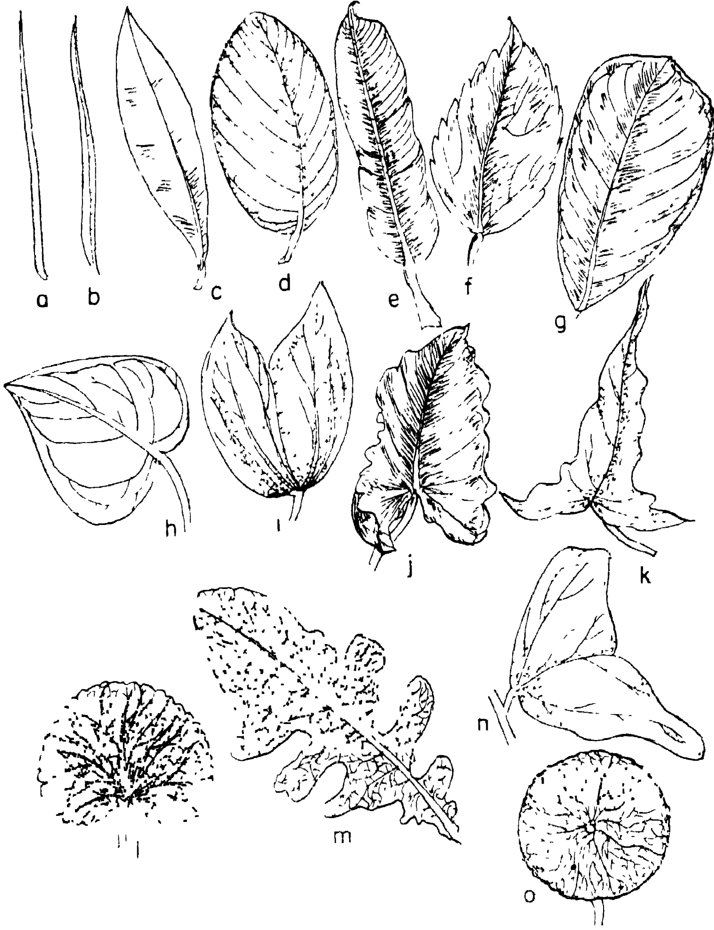


অশ্বথ পাতা a—পত্রমূল, b—বৃন্ত, c—ফলক, d--শিরা, e—কিনারা, f—অগ্র।

পত্র ফলক

ফলক নানা প্রকারের হয়। নিম্নলিখিত আকারের ফলক পাওয়া যায় ঃ—

(১) **গোলাকার** বা অর্বিকিউলার যথা, পদ্মপাতা (Nelumbium), (২) সরু ও লম্বা (Linear) ধান, ঘাস, (৩) বল্লমাকৃতি, (Lanceolate), দেবদারু, (৪) ইলিপসের ন্যায় (Elliptical) গোলাপজাম, নয়নতারা, (৫) প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘে বেশী (Oblong) কলাপাতা, (৬) ডিমের মত (Ovate) বটপাতা, (৭) ডিম্বাকারের উল্টা (Obovate) দেশী বাদাম, (৮) **স্পাচুলার মত** (Spatulate) ড্রসেরা, (৯) **হৃদয়াকৃতি** বা হরতনাকৃতি (Cordate) পানের পাতা, (১০) **বাণাকৃতি** (Sagittate) কচুপাতা, (১১) **বৃক্কের মত** (Reniform) থানকুনি, (১২) **হংসপদাকৃতি** (Crisped) লাউ, কুমড়া, (১৩) **সূচাকৃতি** (Acicular) পাইন পাতা, (১৪) হৃদয়াকৃতির উল্টো (Obcordate) কাঞ্চন।



পাতার আকার a— সূচাকৃতি, b—লম্বা, c— বল্লমাকৃতি, d—ইলিপসের ন্যায়, e— প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘ, f—ডিমের মত, g— অবওভেট, h—হৃদয়াকৃতি, i—অবকডেট, j— বাণাকৃতি, k—হেসটেট, l— বৃক্কের মত, m—লাইরেট, n—লিউনেট, o—গোলাকার।

পাতার কিনারা (Margin of Leaf)

পাতার কিনারা বা ধার নানা প্রকার দেখা যায়ঃ

১। **অখণ্ড** (entire), যথা—আম, জাম, মটর।

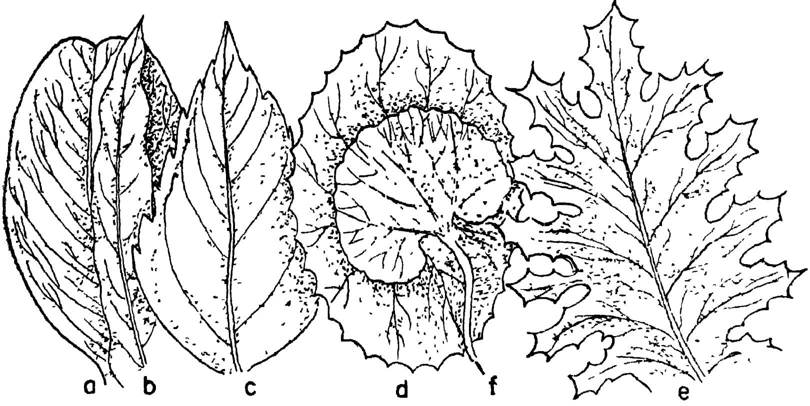
২। **দন্তুর** (dentate), যথা—আনারস, শালুক পাতার কিনারা দাঁতের মত।

৩। **ক্রকচ** (Serrate), যথা—জবা, নিম, দোপাটির পাতা করাতের মত খাঁজ থাকে।

৪। **সভঙ্গ** (Crenate) থানকুনি, পাথরকুচি পাতার খাঁজগুলি গোল হয়।

৫। **কণ্টক** (Spiny) অনেক পাতার কিনারা কাঁটার মত, যথা—আনারস, শিয়ালকাঁটা।

৬। **টুকরা টুকরা** (lobed), যথা—মূলাপাতার খাঁজ টুকরা টুকরা।



পাতার কিনারা . a—অখণ্ড, b— রিপাণ্ড, c—ক্রকচ, d—দন্তুর, f—সভঙ্গ, e—কণ্টক .

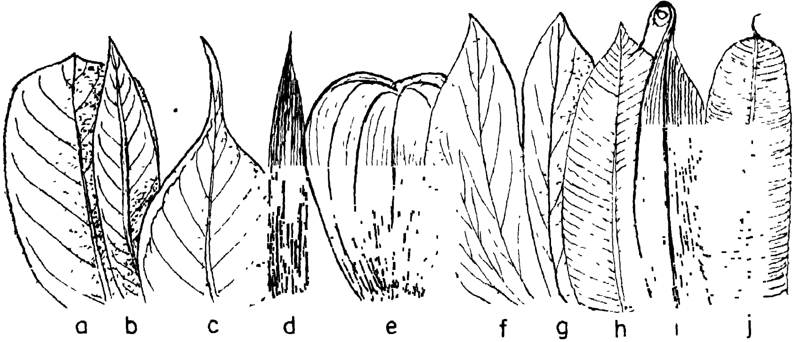
পাতার আগা (Apex of leaf)

১। **সূক্ষ্মাগ্র** (acute) পাতার অগ্র সূক্ষ্ম বিন্দুর ন্যায়, যথা—আম, জাম।

২। **দীর্ঘশীষ** (acuminate), অশ্বত্থ, পাতার অগ্র লম্বা ও সরু।

৩। **স্থূলাগ্র** (obtuse), বটপাতার অগ্রভাগ প্রায় গোল, ইহাকে স্থূলাগ্র বলে।

৪। **সামান্য খাতাগ্র** (retuse), অতসী, অপরাজিতার পাতার অগ্রভাগ চওড়া ও অল্প খাঁজ থাকে।



পাতার আগা : a—স্থূলাগ্র, b—সূক্ষ্মাগ্র, c—দীর্ঘশীষ, d—কাসপিডেট, e—সামান্য খাতাগ্র, f—খাতাগ্র, g—খাতাগ্র, h—সূক্ষ্ম খর্বাগ্র, i—আকর্ষ, j—সিরোজ।

(৫) **খাতাগ্র** (emarginate)—পাতার অগ্রভাগ গভীর খাঁজযুক্ত, যথা—কাঞ্চন, আমরুল।

(৬) **সূক্ষ্ম খর্বাগ্র** (mucronate)—অগ্রভাগ সূক্ষ্ম কিন্তু পাতাটি চওড়া, যথা রবার, রঙ্গন।

(৭) **আকর্ষযুক্ত অগ্র**—পাতার অগ্রভাগ আকর্ষে পরিণত, যথা উলট চণ্ডাল।

ফলকের পৃষ্ঠ [Surface of leaf]

ফলকের পৃষ্ঠ নানা প্রকারের হয় ঃ—

(১) **রোমশ** (hairy), উপরের পৃষ্ঠে রোম যুক্ত, যথা ডুমুর, আকন্দ।

(২) **মসৃণ** (glabrous), ফলকের পৃষ্ঠ মসৃণ, যথা আম।

(৩) **চকচকে** (glaucous), যখন পাতাটি চকচকে, যথা পদ্ম, কচু।

(৪) **আঠালো** (viscose), যথা তামাক, হুড় হুড়ে (cleome) পাতা আঠালো।

(৫) **কণ্টকিত** (spiny), বেগুন পাতায় কাঁটা থাকে।

ফলকের গ্রথন (texture)

১। **ফলক রসাল** (succulent), যথা পাথরকুচি, ঘৃত কুমারীর ফলক বেশ রসালো ও পুরু।

২। **তৈলগ্রন্থিযুক্ত** (glandular), লেবু, কমলালেবু, বাতাবী লেবুর পাতায় তৈলগ্রন্থি দেখা যায়।

৩। **চর্মবৎ** (coriaceous), পাতা শক্ত ও চামড়ার মত হইলে চর্মবৎ, যথা—চাঁপা, বকুল ইত্যাদি।

৪। **ঝিল্লীময়** (membranous), ফলক পাতলা ও আঁইসের মত, যথা—জবা, গোলাপ।

পত্রমূল—সচরাচর পত্রমূল ছোট এবং আকারে নগণ্য। কখন কখন পত্রমূল স্ফীত, ইহাকে **পালভাইনাস্** (pulvinus) বলে যথা লজ্জাবতী, আম পাতা। কলাপাতা, ধনিয়া, নারিকেল ও ঘাসের পত্রমূল কিছুটা পর্বকে ঢাকিয়া রাখে, ইহাকে সিদিং (sheathing) বলে। ঘাসের ফলকের পত্রমূলের সংযোগ স্থলে লিগিওল নামক ছোট অংশ থাকে।

উপপত্র (Stipules)

পত্রমূলের দুইধারে ছোট সবুজ রঙের **উপপত্র থাকে**। যে পাতায় উপপত্র থাকে তাহাকে **সোপপত্রিক পত্র** (stipulate) বলে। বহু পাতায় উপপত্র থাকে না, তাহাকে **অনুপপত্রী** (exstipulate) বলে, যথা আম, পেয়ারা।

উপপত্র যদি পাতা যতদিন থাকে, ততদিন স্থায়ী হয়, তাহাকে **স্থায়ী** (persistent) উপপত্র বলে ; যদি পত্র মুকুল হইতে **বাহির** হইবার পূর্বেই পড়িয়া যায়, তাহাকে **অস্থায়ী উপপত্র** (deciduous) বলে।

নানা প্রকার উপপত্র (Types of Stipule)

মুক্তপার্শ্বীয় (free lateral) জবা, ঢেঁড়স, কার্পাস ইত্যাদির পাতার পত্রমূলের দুই পাশে দুইটি সরু, সবুজ বর্ণের উপপত্র থাকে। ইহাকে **মুক্তপার্শ্বীয়** বলে।

বৃন্তমধ্যক (interpetiolar), কদম, রঙ্গন ইত্যাদির দুইটি অভিমুখ পত্রের মধ্যস্থলে উপপত্র থাকে, ইহাকে **বৃন্তমধ্যক** বলে।

বৃন্তলগ্ন (adnate)—পত্রমূলের দুইপাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃন্তের সহিত যুক্ত হয় এবং দেখিতে পাখীর ডানার মত। ইহাকে **বৃন্তলগ্ন** বলে, যথা গোলাপ।

কাক্ষিক (intrapetiolar), উপপত্র দুইটি যুক্ত হইয়া পাতার কক্ষে থাকে, যথা গন্ধরাজ।



উপপত্র : a—মুক্তপার্শ্বীয়, b—বৃন্তলগ্ন, c—বৃন্তমধ্যক, d—কাণ্ড বেষ্টক, e—কাক্ষিক, f—আকর্ষ উপপত্র, g—কণ্টক, h—ফলকাকাব।

কাণ্ডবেষ্টক (ochreate), যদি উপপত্র দুইটি যুক্ত হইয়া কাণ্ডকে কিছুটা ঘিরিয়া থাকে, যথা চুকাপালং, পানিমরিচ।

মুকুলীয় শল্কপত্র (bud scales), কোন কোন পাতার পত্রমুকুলে থাকাকালীন দুইটি পাতলা শল্কপত্রের আবরণ থাকে, ইহাকে **মুকুলীয় শল্কপত্র** বলে। মুকুল হইতে পাতা বাহির হইবার সময়, এই প্রকার শল্কপত্র পড়িয়া যায়, যথা বট, কাঁঠাল। উপপত্রের প্রধান কাজ পাতাকে মুকুল অবস্থায় রক্ষা করা। ইহা ছাড়া আকার পরিবর্তন করিয়া উপপত্র ভিন্ন প্রকার কাজ করে।

পরিবর্তিত উপপত্র

ফলকাকার (foliaceous), মটর, জংলী মটর ইত্যাদির পাতায় বেশ বড় ফলকের মত উপপত্র দেখা যায়, ইহাকে **ফলকাকার** বলে। জংলী মটরের পাতা আকর্ষে রূপান্তরিত হয় এবং উপপত্র দুইটি পাতার কাজ করে। মটর শুঁটির যোগপত্রে কতকগুলি **পত্রক** আকর্ষে রূপান্তরিত হয় এবং আরোহণ করিতে সাহায্য করে। মটরশুঁটির ফলকাকার উপপত্র ফলকের কাজ করে।

কণ্টক উপপত্র (spiny), কোন কোন উপপত্র কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। ইহা গাছকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে, যথা কুল, বাবলা, লজ্জাবতী।

আকর্ষ উপপত্র (tendrillar), কুমারিকার পাতার উপপত্র দুইটি আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। ইহা আশ্রয় ধরিয়া গাছকে আরোহণে সাহায্য করে।

সবৃন্তক ও অবৃন্তক পাতা

পাতার বৃন্ত থাকিলে, তাহা **সবৃন্তক**, যথা জবা, আম, অশ্বত্থ। বহুপাতার বৃন্ত থাকে না, তাহাকে **অবৃন্তক** বলে, যথা—শিয়াল কাঁটা। যদি বৃন্ত পাতার ফলকের নিচের পৃষ্ঠে যুক্ত হয়, তাহাকে **ছত্রবন্ধ** (peltate) বলে, যথা পদ্ম।

বৃন্তের রূপান্তর

পর্ণবৃন্ত (phyllode), কোন কোন পাতার ফলক বড় না হইয়া পড়িয়া যায় এবং বৃন্ত চেপ্টা ও সবুজ হইয়া ফলকের কাজ করে, ইহাকে পর্ণবৃন্ত বলে, যথা—আকাশমনি ও অন্যপ্রকার বাবলা।

সপক্ষবৃন্ত (winged petiole)—যখন বৃন্তটি পাখীর ডানার মত আকার ধারণ করে, তাহাকে সপক্ষবৃন্ত বলে, যথা—বাতাবীলেবু, লেবু।

স্ফীত বৃন্ত (swollen petiole), কচুরীপানার বৃন্তটি মোটা ও রসালো, ইহাকে স্ফীতবৃন্ত বলে।

আরোহীবৃন্ত, কলস উদ্ভিদ, ছাগলবাটির বৃন্ত আরোহণে সাহায্য করে।

বৃন্তের কাজ—প্রধানতঃ পাতাকে এমন ভাবে রাখে যাহাতে প্রচুর সূর্য কিরণ পায়। বৃন্ত জাইলেম নালিকার সাহায্যে ফলকে জল পাঠায় এবং তরল অবস্থায় পাতা হইতে শর্করা জাতীয় খাদ্য ফলক হইতে ফ্লোয়েম নলের সাহায্যে কাণ্ডে পাঠায়।

পাতার শিরাবিন্যাস (Venation)

ফলকের মধ্যে যে ভাবে শিরা, উপশিরা সাজান থাকে, তাহাকে **শিরাবিন্যাস** বলে। শিরাবিন্যাস দুই রকমের—**জালিকা** (reticulate) ও **সমান্তরাল** (parallel)।

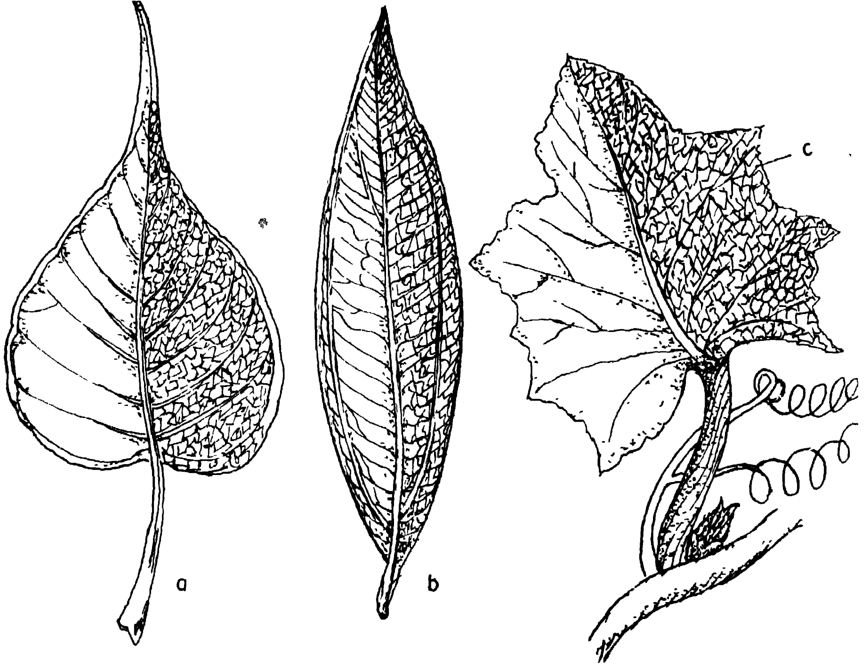
জালিকা শিরাবিন্যাস—যখন পাতার ফলকের শিরা, উপশিরাগুলি যুক্ত হইয়া, জালের আকার ধারণ করে, তাহাকে জালিকা শিরাবিন্যাস বলে, যথা আম, কুমড়া ইত্যাদি। জালিকা শিরা বিন্যাস দুই প্রকার—

একশিরাল (pinnate or unicostate), যদি পাতার ফলকের মধ্যস্থলে একটি

মধ্যশিরা থাকে এবং মধ্যশিরার দুইধারে পাখীর পালকের মত শিরা বাহির হয়, তাহাকে **একশিরাল** বলে, যথা আম, পিয়ারা।

বহুশিরাল (multicostate), ফলকের নিচ হইতে প্রায় সমান শিরা উৎপন্ন হইলে, বহুশিরাল বলে, যথা লাউ, কুমড়া। বহুশিরাল দুই রকমের পাওয়া যায়ঃ—

অপসারী—যদি শিরাগুলি ফলকের কিনারায় যায় এবং একটি বিন্দুতে যুক্ত না হয়, যথা কুমড়া, লাউ।



a—জালিকা, b—একশিরাল, c—জালিকা বহুশিরাল।

অভিসারী—যদি শিরাগুলি ফলকের আগায় এক বিন্দুতে মিলিত হয়, তাহাকে অভিসারী বলে, যথা কুল, তেজপাতা।

সমান্তরাল শিরাবিন্যাস—ফলকে শিরাগুলি সমান্তরালভাবে সাজান থাকে এবং জাল সৃষ্টি করে না, যথা, ঘাস, ধান, কলা।

ইহা আবার দুই প্রকারের হয়—

একশিরাল—যদিও শিরাগুলি সমান্তরালভাবে সাজান থাকে, তবে একটি মধ্যশিরা থাকে এবং ইহার দুইধারে সমান্তরালভাবে শিরাগুলি সাজান থাকে, যথা কলা, আদা, হলুদ।

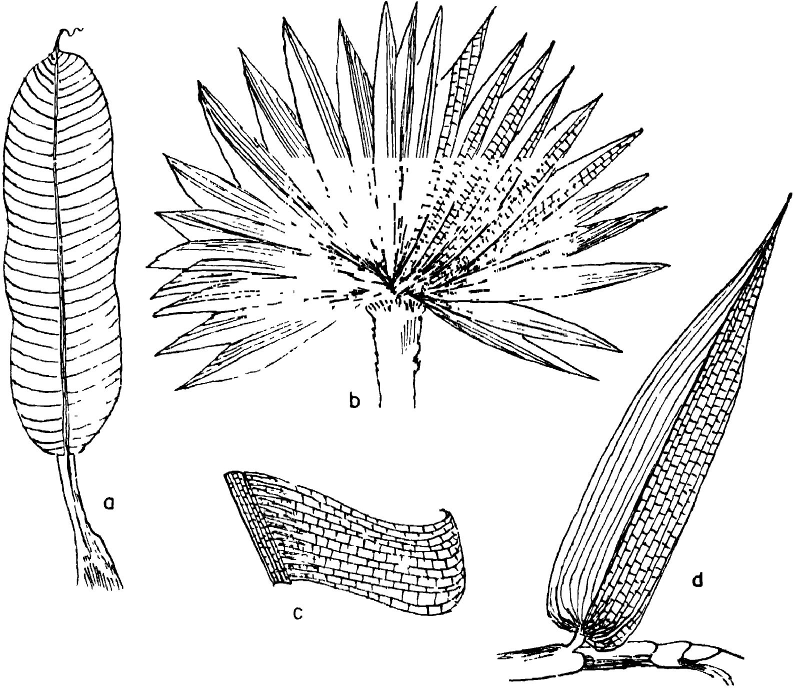
বহুশিরাল—পাতার-নিচ হইতে কিনারা পর্যন্ত অনেকগুলি সমান আকারের শিরা থাকে, যথা তাল।

বহুশিরাল, দুই প্রকারের হয়—

অপসারী—শিরাগুলি ফলকের নিচ হইতে কিনারায় চলিয়া যায়, যথা তালপাতা।

অভিসারী—যদি সমান্তরাল শিরাগুলি পাতার আগায় একবিন্দুতে মিলিত হয়, যথা ঘাস, কচুরীপানা।

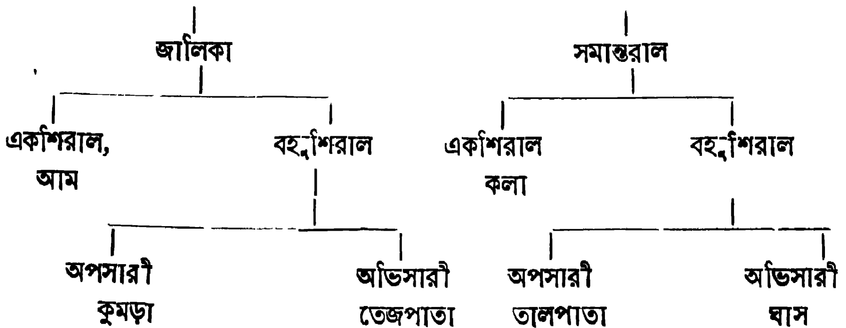
মোটামুটি দ্বিবীজ উদ্ভিদে জালিকা শিরাবিন্যাস এবং একবীজ উদ্ভিদে সমান্তরাল শিরা বিন্যাস দেখা যায়।



a– সমান্তরাল, b—বহুশিরাল, c—একশিরাল ও শিরা, d—সমান্তরাল বহুশিরাল।

শিরার কাজ—শিরাগুলি পাতার নরম অংশকে কাঠামোর মত যথাস্থানে রাখে এবং পাতাকে শক্ত করে। শিরার মধ্য দিয়া জল ও তরল আকারে খাদ্য যাতায়াত করে।

শিরাবিন্যাস



পত্রবিন্যাস (Phyllotaxy)

কাণ্ড বা শাখার উপর একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পাতাগুলি সাজান থাকে। এই পদ্ধতিকে পত্র বিন্যাস বলে। ইহার উদ্দেশ্য যাহাতে প্রত্যেক পাতা যথেষ্ট সূর্যকিরণ পায় এবং তাহার দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

তিন প্রকার পত্র বিন্যাস দেখা যায়—**একান্তর** (alternate), **অভিমুখ** (opposite) ও **আবর্ত** (whorled) ;

একান্তর—একটি পর্ব হইতে একটি পাতা বাহির হয়। পাতা পর পর বিপরীত দিকে সাজান থাকে, যথা আম, সরিষা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

অভিমুখ—যদি দুইটি পাতা একই পর্ব হইতে জন্মায় ও বিপরীত দিকে সাজান থাকে, যথা আকন্দ।

অভিমুখ দুই প্রকারের—**উপরিপন্ন** (superposed) ও **তির্যক** (decussate) ;

উপরিপন্ন—অভিমুখ পত্র বিন্যাসে যদি পাতা দুইটি ঠিক উপরে বা নিচে সাজান থাকে, যথা পিয়ারা।

তির্যক—যদি পর্বের পাতা দুইটি ঠিক উপরে না জন্মিয়া, আর একটি তলে থাকে তাহাকে তির্যক বলে, যথা আকন্দ, তুলসী।

আবর্ত—যদি পর্ব হইতে দুইটি পাতার অধিক অর্থাৎ তিন, চার, ইত্যাদি জন্মায়, তাহাকে **আবর্ত** বলে, যথা করবী, ছাতিম।

একান্তর পত্র বিন্যাসে পাতাগুলি কান্ডের উপর সপুল (spiral) আকারে সাজান থাকে, ইহাকে সপুলও বলে, যথা আম, তামাক, জবা। একটি সরল রেখা পত্রমূল হইতে টানিলে উপরের পাতা পর্যন্ত, একটি সপুল সৃষ্টি করে। এই রেখাকে **জেনেটিক সপুল** (genetic spiral) বলে।

কতকগুলি নিয়ম অনুযায়ী পত্র বিন্যাস হয়ঃ (১) কাণ্ডের উপর পাতা চারিদিকে সাজান থাকে, কেবলমাত্র একদিকে নহে।

(২) যদি পত্রমূল হইতে রেখা টানা হয়, তাহা হইলে এই সোজা রেখার উপর পাতা থাকে, ইহাকে **অরথোষ্টিচি** (orthostichies) বলে। (৩) অরথোষ্টিচিগুলি সমান দূরে থাকে। (৪) জেনেটিক সপুলের উপর পাতা সমান দূরত্বে সাজান থাকে, ইহাকে **দূরত্ব** (divergence) বলে। এই দূরত্ব কাণ্ডের কেন্দ্রের সহিত একটি কোণ সৃষ্টি করে, ইহাকে **দূরত্বকোণ** (angular divergence) বলে।

দূরত্বকোণের সংকেত $a/b \times ৩৬০^\circ$। ইহাতে ভগ্নাংশের লব সপুলের সংখ্যা এবং হর দ্বারা পাতার সংখ্যা বুঝায়। কতগুলি সপুল দ্বারা একপাতা হইতে ঠিক তাহার উপরের মধ্যে সপুল সংখ্যা এবং একটি পাতা বাদ দিয়া ঠিক কতগুলি পাতা আছে।

অরথোষ্টিচি সংখ্যা অনুযায়ী সপুল পত্রবিন্যাস নিম্নলিখিত প্রকার হইতে পারেঃ

১। ইহা দুইটি অরথোষ্টিচি দ্বারা তৈয়ারি—ইহাকে ডিস্টিকাস (distichous) বলে—ইহাতে তৃতীয় পাতার ঠিক উপরে প্রথম পাতা থাকে এবং দ্বিতীয় পাতার উপরে চতুর্থ পাতা। ইহার সংকেত $\frac{১}{২}$ এবং ইহা ধান, গম, বাঁশিতে পাওয়া যায়। ইহার দূরত্ব কোণ $= \frac{১}{২} \times ৩৬০^\circ = ১৮০^\circ$

২। তিনটি অরথোষ্টিচি দ্বারা তৈয়ারি পত্রবিন্যাসকে ট্রিস্টটিকাস (tristichous) বলে। প্রথম পাতার উপর চতুর্থ পাতা এবং দ্বিতীয় পাতার উপর পঞ্চম ও তৃতীয় পাতার উপর ষষ্ঠ। ভগ্নাংশ $\frac{১}{৩}$, ইহা মুথাঘাসে (sedges) দেখা যায়। দূরত্ব কোণ $= \frac{১}{৩} \times ৩৬০^{\circ}, = ১২০^{\circ}$

৩। পাঁচটি অর্থোষ্টিচি দ্বারা ঘটিত এবং দুইটি সপূল দ্বারা একটি পাতার ঠিক উপরের পাতায় পৌঁছায়। ইহাকে **পেন্টাষ্টিকাস** (pentastichous) বলে। প্রথম পাতার উপর ৬নং পাতা, দ্বিতীয় পাতার উপর ৭নং পাতা এবং তৃতীয় পাতার উপর ৮নং পাতা। ইহার সংকেত $\frac{২}{৫}$ এবং জবা, বট ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।
ইহার দূরত্ব কোণ $= \frac{২}{৫} \times ৩৬০^{\circ} = ১৪৪^{\circ}$



পত্রবিন্যাস. a—একান্তর, b—অভিমুখ উপরিপন্ন, c—তির্যক, d—আবর্ত।

৪। ৮টি পাতা দ্বারা **ওক্টাটিকাস** এবং ইহার সংকেত $\frac{৩}{৮}$, কলা, পেঁপে ও কলিকাফুল গাছে পাওয়া যায়।

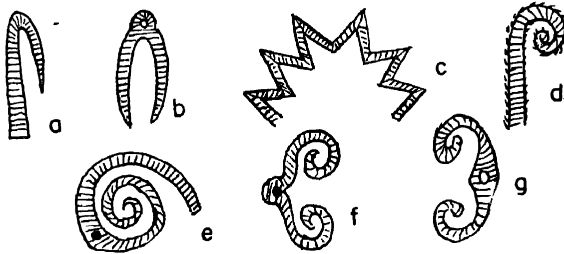
পাতার মোজেক (Leaf mosaic)—গাছের ছায়ায়, গভীর জঙ্গলে একপ্রকার পাতার সমাবেশ দেখা যায়। পাতাগুলি দিনের বেলা অল্প সময় আলোক পাইয়া থাকে এবং পাশাপাশি এমনভাবে সাজান থাকে, যে কিছুটা আলোক প্রত্যেক পাতা পায়। ইহা আমরুল, কৃষ্ণকলি ইত্যাদিতে দেখা যায়। পত্র মুকুলের **পত্রবিন্যাস** (prefoliation) মুকুল খুলিবার পূর্বে যেভাবে পাতা উহার মধ্যে (মুকুলের মধ্যে)

সাজান থাকে, তাহাকে **মুকুলের পত্র** বিন্যাস বলে। ইহা কিভাবে প্রত্যেক পাতা থাকে, তাহাকে টিক্‌সিস্ (ptyxis) বলে এবং পাতাগুলির পরস্পর বিন্যাস হইল **ভারনেসান** (vernation)। **টিকসিস** ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয় ঃ—(১) **রেকলিনেট** (reclinate) পাতার উপরের অংশ নিচের অংশের উপর, যথা পাতা বাহার (croton) ; (২) **প্লাইকেট** (plicate) **কয়েকবার** ভাজ সৃষ্টি করে, যথা তাল, নারিকেল, (৩) **কনডুপলিকেট** (conduplicate) মধ্যশিরা হইতে ভাঁজ করে যথা পিয়ারা, আতা ; (৪) **সারসিনেট** (circinate) যখন পাতার অগ্রভাগ হইতে পাকদিয়া নিচে যায়, যথা ফার্ন ; (৫) **ক্রাম্পল্‌ড** (crumpled) যখন বারবার ভাঁজ করে, যথা বাঁধাকপি ; (৬) **কনভলিউট** (convolute) যখন এক কিনারা হইতে অপর কিনারা পর্যন্ত পাকানো থাকে, যথা কলাপাতা ; (৭) **ইনভোলিউট** (involute) যখন পাতার দুই কিনারা উপরে দুইদিক হইতে গুটাইয়া থাকে, যথা পদ্ম শালুক ; (৮) **রেভোলিউট** (revolute) যদি নিচের দিকে মধ্যশিরা গুটাইয়া থাকে তাহাকে রিভোলিউট বলে, যথা করবী, পানিমরিচ।

ভারনেসন (পরস্পরের সম্বন্ধ)

১। **ভ্যালভেট** (valvate) যখন পাতা পরস্পর নিকটে থাকে কিন্তু কাহারও উপরে থাকে না ;

২। **ইমব্রিকেট** (imbricate) পাতাগুলি একটির উপর আর একটি কিছুটা চাপান থাকে ;



টিকসিস : a—রেকলিনেট, b—কনডুপলিকেট, c—প্লাইকেট, d—সারসিনেট, e—কনভলিউট, f—ইনভোলিউট, g—রেভোলিউট।

৩। পাকান বা **টুইসটেট**, যখন পাতার এক কিনারা অপর পাতার কিনারার উপর থাকে ;

৪। **ইকুইটেন্ট** (equitant) যখন একটি পাতার কিনারা নিয়মিতভাবে অপর পাতার কিনারায় ঢাকা থাকে।

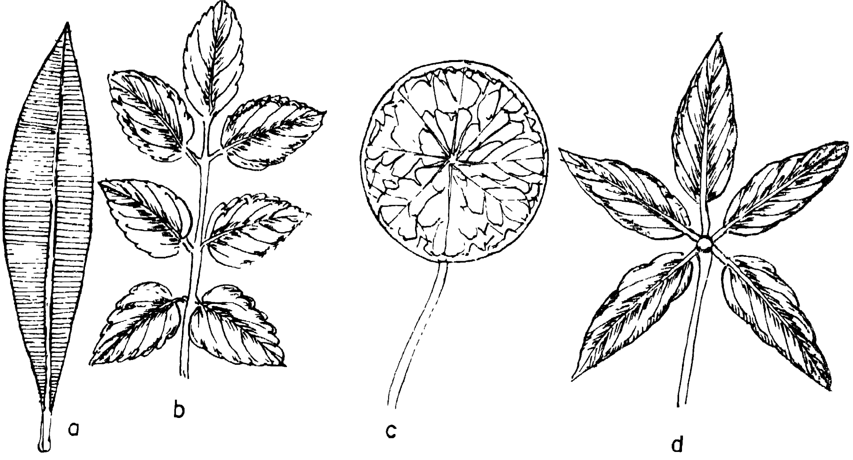
ফুলের মুকুলে পাপড়িও এইভাবে থাকে।

একক ও যৌগিকপত্র (Simple and Compound leaves)

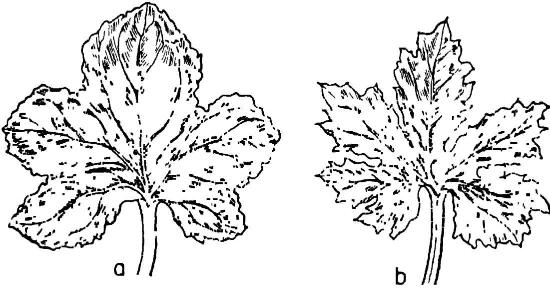
বৃন্তের উপর একটি ফলক থাকিলে, তাহাকে **একক** (simple) পত্র বলে, যথা আম, জবা, পদ্ম, বেলফুল, করবী ইত্যাদি।

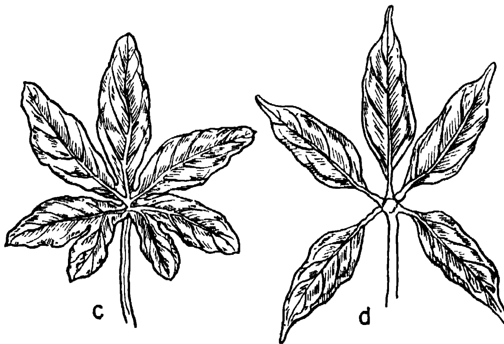
একক পত্র দুই প্রকার, যথা, ১। **পক্ষাকার** (pinnate), আমপাতা ; ২। **করতলাকার** (palmate), যথা কুমড়া, লাউ।

পক্ষাকার পাতার কিনারা অখণ্ড থাকিতে পারে যথা আমপাতা ; এইরূপ পাতার কিনারা অল্প কাটা হইলে, পিনাটিফিড (pinnatifid), যথা চন্দ্রমল্লিকা ; কিনারা যদি



সরল ও যৌগিকপত্র : a—সরল পক্ষাকার, b—যৌগিক পক্ষাকার, c—সরল হস্তাকার বা করতলাকার, d—যৌগিক হস্তাকাব।





a—পামেটিফিড, b—পামেটিপাটাইট, c—পামেটিসেক্ট, d—যৌগ করতলাকার।

মধ্যশিরা পৌঁছিবার অর্ধেক কাটা থাকে, তাহাকে **পিনাটিপার্টাইট** (pinnatipartite) বলে, যথা পানিফল, শিয়ালকাঁটা ; যদি কিনারা খুব বেশী কাটা অর্থাৎ প্রায় মধ্য শিরার নিকট পর্যন্ত কাটা থাকে, উহাকে **পিনাটিসেক্ট** (pinnatisect) বলে, যথা তরুলতা, গাঁদা (ইহা অনেকে যৌগিকপত্র বলিয়া ভুল করে)।

করতলাকার এককপত্র পামেটিফিড (palmatifid) অল্পকাটা, যথা ঢেঁড়স ; **প্যামেটিপাটাইট**, প্রায় অর্ধেক কাটা (কিনারা হইতে মধ্যশিরা অবধি রেখার অর্ধেক), যথা উচ্ছে ; **পামেটিসেক্ট** (palmatisect) যথা রাঙাআলু, গোয়েলালতা।

যৌগিক পত্র

পাতার ফলক বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট পাতার মত অংশ হইলে, তাহাকে **যৌগিকপত্র** (compound) বলে। যৌগিকপত্রের **অক্ষকে** (rachis) রেকিস বলে। অক্ষ একাধিক **পত্রক** (leaflet) বহন করে।

যৌগিকপত্র দুই প্রকার—

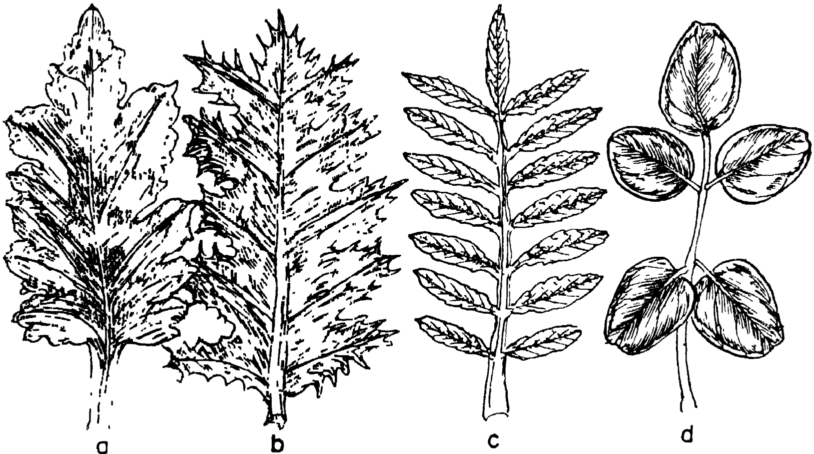
১। পাখীর পালকের মত, অক্ষ পত্রক বহন করিলে তাহাকে **পক্ষল যৌগিক** (pinnately compound) বলে।

২। যদি পত্রকগুলি হাতের করতলের মত হয় তাহাকে **করতলাকার** (palmately compound) বলে।

পক্ষল যৌগিকপত্র

এই প্রকার যৌগিকপত্র বিভিন্ন শ্রেণীর হয়—

১। **একপক্ষল,** ২। **দ্বিপক্ষল,** ৩। **ত্রিপক্ষল,** এবং ৪। বহু যৌগিক।

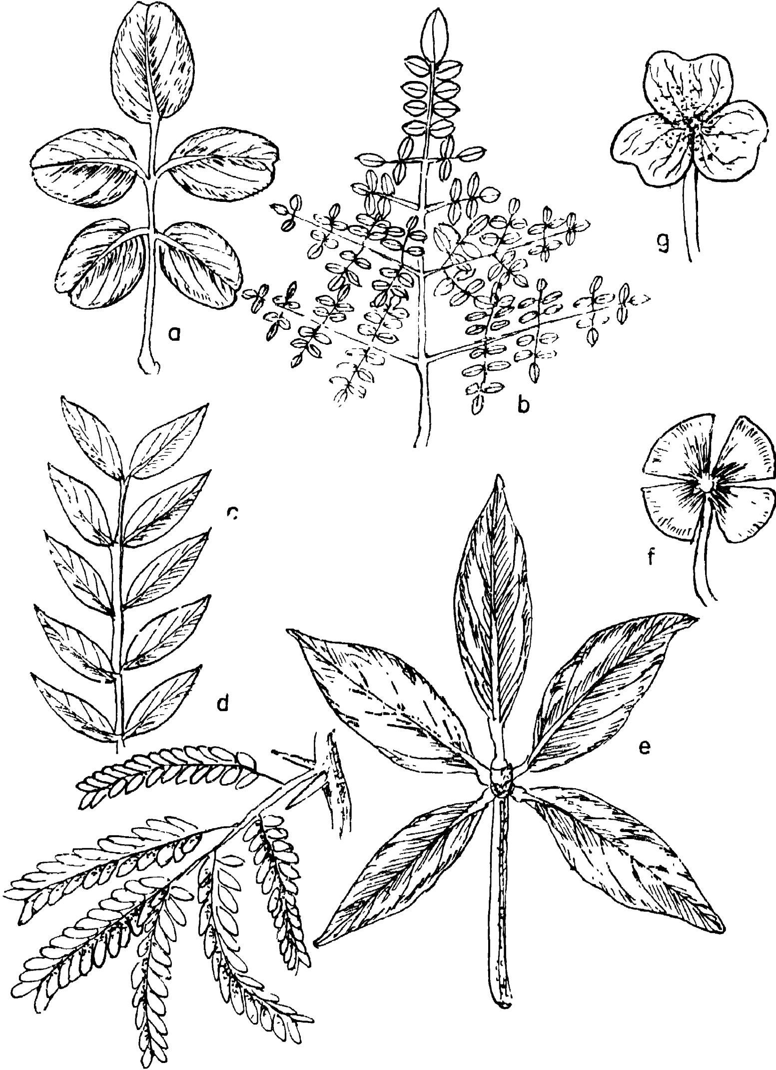


a– পিনাটিফিড, b– পিনাটিপাটাইট, c—পিনাটিসেক্ট, d—যৌগিক পক্ষাকার।

একপক্ষল—পত্রকগুলি অক্ষের উপর পাখীর পালকের মত সাজান থাকে, যথা—গোলাপ, নিম, তেঁতুল, কালকাসুন্দে।

একপক্ষল (unipinnate) যৌগিকপত্রের অগ্রভাগে দুইটি পত্রক থাকিলে (অর্থাৎ

জোড়) তাহাকে **অচূড় পক্ষল** (imparipinnate) বলে, যথা কালকাসুন্দি, তেঁতুল। যদি একপক্ষল যৌগিকপত্রের আগায় একটিপত্রক বা বিজোড় হয়, তাহাকে **সচূড়পক্ষল** (imparipinnate) বলে, যথা গোলাপ, নিম, অপরাজিতা।

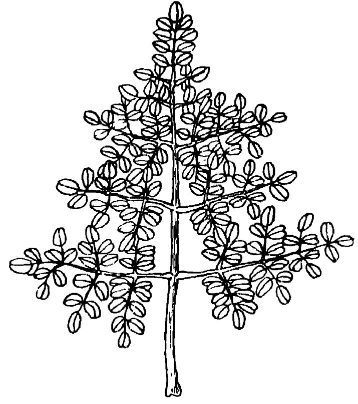


a—একপক্ষল সচূড়, b—ত্রিপক্ষল, c—অচূড়, d—দ্বিপক্ষল, e—অঙ্গুলাকার, f—চতুর্ফলক, g—ত্রিফলক।

দ্বিপক্ষল (bipinnate)—এই প্রকার যৌগিকপত্রের অক্ষটি শাখা বহন করে এবং ঐ শাখা অক্ষের উপর পত্রক সাজান থাকে, ইহা **দ্বিপক্ষল** বলে, যথা রাধাচূড়া, লজ্জাবতী, বাবলা।

ত্রিপক্ষল (tripinnate), যদি পত্রাক্ষ তিনবার বিভক্ত হয় অর্থাৎ পত্র অক্ষের প্রশাখার উপর পত্রক থাকে, তাহাকে ত্রিপক্ষল বলে, যথা সজিনা।

বহুযৌগিক (decompound), কোন কোন পক্ষল যৌগিক পত্রের অক্ষ বহুবার বিভক্ত হয় এবং পত্রক বহন করে, তাহাকে বহুযৌগিক বলে, যথা গাজর, মৌরি, ধনিয়া কসুমস।



a—ত্রিপক্ষল

করতলাকার যৌগিকপত্র

যৌগিকপত্রের বৃন্তের উপর পত্রকগুলি যদি একটি বিন্দু হইতে জন্মায়, তাহাকে করতলাকার বলে। ইহা দেখিতে হাতের করতলের মত। করতলাকার যৌগিকপত্র কয়েকপ্রকার দেখা যায়—১। **একফলক**, ২। **দ্বিফলক**, ৩। **ত্রিফলক** ৪। চতুর্ফলক এবং ৫। অঙ্গুলাকার।

একফলক—যদি করতলাকার যৌগিক পত্রের বৃন্তে একটি ফলক থাকে, তাহাকে একফলক বলে, যথা লেবু, বাতাবি লেবু।

দ্বিফলক—ইহার বৃন্তের উপর দুইটি পত্রক থাকে, যথা হিঙ্গল।

ত্রিফলক—করতলাকার যৌগিক পত্রে তিনটি পত্রক থাকিলে, উহাকে ত্রিফলক বলে, যথা বেলপাতা, আমরুল।

চতুর্ফলক—যদি করতলাকার যৌগিকপত্রে চারিটি পত্রক, একবিন্দুতে থাকে, তাহাকে চতুর্ফলক বলে, যথা সুষনি শাক।

অঙ্গুলাকার—যদি করতলাকার যৌগিকপত্রের আগায় একবিন্দু হইতে অনেকগুলি পত্রক সৃষ্টি হয়, তাহাকে অঙ্গুলাকার (digitate) বলে, যথা শিমুল, সাদা হুড়হুড়ে।

পক্ষল যৌগিকপত্র ও ছোট শাখার তুলনা

পক্ষল যৌগিকপত্র	ছোটশাখা
১। অগ্রমুকুল থাকে না।	১। অগ্রমুকুল থাকে।
২। পত্রকের কক্ষে সচরাচর মুকুল হয় না। মুকুল পর্বাক্ষ হইতে জন্মায়।	২। পাতার কক্ষে মুকুল থাকে।
৩। পর্ব ও পর্বমধ্য হয় না।	৩। পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে।
৪। সচরাচর পত্রকের মূলে উপপত্র হয় না কিন্তু অক্ষের গোড়ায় উপপত্র থাকিতে পারে।	৪। একক পত্রের মূলে উপপত্র থাকিতে পারে।

একক পত্রের সহিত যৌগিক পত্রের তুলনা

একক পত্র	যৌগিক পত্র
১। একটি ফলক দ্বারা তৈয়ারি ; কিনারা অল্প বিস্তর কাটা তবে মধ্যশিরা অবধি পৌঁছায় না।	১। পত্র ফলক কর্তিত হইয়া পত্রক সৃষ্টি করে। পক্ষাকার অথবা করতলাকার হয়।
২। এককপত্রের কাক্ষিক মুকুল হয়।	২। পত্রকের কক্ষে সচরাচর মুকুল হয় না।
৩। পত্রমূলে উপপত্র থাকিতে পারে।	৩। পত্রকের উপপত্র হয় না কিন্তু অক্ষের অর্থাৎ পত্রমূলে উপপত্র হইতে পারে।

পাতার কাজ

পাতার তিনটি প্রধান কাজ, যথা সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পীমোচন ও শ্বসন। এই তিন কাজ ছাড়া পাতা রূপান্তরিত হইয়া নানা কাজ করে।

পাতার রূপান্তর (Modifications of leaf)

পাতার রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদের নানা কাজ করে। সম্পূর্ণপাতা অথবা পাতার অংশ রূপান্তরিত হইতে পারে।

আকর্ষ—সম্পূর্ণ পাতা বা পাতার অংশ আকর্ষে পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদকে আশ্রয় আরোহণ করিতে সাহায্য করে। আকর্ষে স্পর্শ অনুভূতির সাহায্য আশ্রয়কে জড়াইয়া থাকে। জংলী মটরের পাতা আকর্ষে পরিণত হয়। মটরশুঁটির যৌগিক পত্রের শেষের পত্রকগুলি আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। উলটচণ্ডালের পাতার অগ্রভাগ আকর্ষে পরিণত হয়।

পত্রকণ্টক—পাতা বা পাতার অংশ কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। পত্রকণ্টক উদ্ভিদকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে কারণ গরু, ছাগল ইত্যাদি প্রাণী কণ্টকযুক্ত উদ্ভিদ খাইতে চায় না। ফণিমনসার পাতা কাঁটায় পরিণত হয়। শিয়ালকাঁটার পাতার কিনারা কাঁটায় পরিবর্তিত হয়। খেজুর পাতার অগ্রভাগ কাঁটায় পরিণত হয়।

কলস-উদ্ভিদ—কলস উদ্ভিদ এক প্রকার পতঙ্গভূক গাছ। ইহার ফলক কলসে রূপান্তরিত হয় এবং একটি ফাঁদ সৃষ্টি করিয়া পতঙ্গকে কলসের মধ্যে গ্রহণ করে এবং উহা জীর্ণ করিয়া পুষ্টি গ্রহণ করে।

খাদ্য-সঞ্চয়—অনেক পাতার মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত হয় এবং জলও থাকে, ইহাতে পাতা মোটা ও রসালো হয়, যথা পুঁই পাতা, ঘৃতকুমারী, নুনিয়া শাক।

শল্কপত্র—ভূনিম্নস্থকাণ্ডের পাতাগুলি, পাতলা ও আঁইশের মত হয়, ইহাকে শল্কপত্র বলে, যথা আলু, আদার শল্কপত্র ; পিয়াজের শল্কপত্র শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করিয়া মোটা হয়।

ফুলের বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর ইত্যাদি সকলও রূপান্তরিত পাতা।

পর্ণবৃন্ত (phyllode), আকাশমণির পাতার ফলক পড়িয়া যায় এবং উহার বৃন্ত রূপান্তরিত হইয়া, পাতার আকার ধারণ করে ও পাতার কাজ করে। ইহাকে পর্ণবৃন্ত বলে।

অঙ্গজ জনন—পাথর কুচির পাতা হইতে, নূতন গাছ জন্মায়, ইহাকে অঙ্গজ জনন বলে।

সমসংস্থা (Homology) ও সমবৃত্তিতা (Analogy)

উদ্ভিদের যে সকল অঙ্গ একই স্থান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াও বিভিন্ন আকারের হয় অথবা বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে, তাহাকে **সমসংস্থা** বলে। যে সকল অঙ্গ একই আকারের অথবা একই প্রকারের কাজ করে কিন্তু উৎপত্তি স্থল ভিন্ন, তাহাকে **সমবৃত্তি** বলে। জংলী মটরের পাতা আকর্ষে রূপান্তরিত কিন্তু ঝুমকোলতার আকর্ষ রূপান্তরিত কাক্ষিক মুকুল, সুতরাং কাজ একই রকমের, ইহা সমবৃত্তিতার উদাহরণ।

সমসংস্থা ও সমবৃত্তিতার উদাহরণ দেওয়া হইল—

সমবৃত্তিতা—সঞ্চয়ক অঙ্গ—উদ্ভিদের কতকগুলি অঙ্গ, আকারে স্ফীত ও খাদ্য সঞ্চয় করে, উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, সুতরাং ইহারা **সমবৃত্তি অঙ্গ ;**

আলুর, স্ফীত কন্দ, পিঁয়াজের শল্কপত্র, ডালিয়ার গুচ্ছিত মূল. রাঙ্গাআলুর শাখামূল, মূলাকার, শাংকবাকার মূল সবই সমবৃত্তি অঙ্গ।

আলুর স্ফীতকন্দ, আদা, হলুদের রাইজোম, ওলের গুঁড়িকন্দ, একই কান্ডের রূপান্তর সুতরাং ইহারা সমসংস্থা।

রাঙা আলুর রূপান্তরিত কান্দাল মূল (root tuber), মূলা, গাজর, বীট ইত্যাদির মূল, খাদ্য সঞ্চয় করে, অতএব **সমবৃত্তি** অঙ্গ এবং ইহারা মূল হইতে উৎপন্ন সুতরাং একই উৎপত্তি সমসংস্থাও বটে।

আকর্ষ—দুর্বল উদ্ভিদ অর্থাৎ যাহারা খাড়াভাবে দাঁড়াইতে পারে না, তাহারা প্রায়ই আকর্ষের সাহায্যে আশ্রয় আরোহণ করে।

আকর্ষ আরোহণের কাজ করে সুতরাং ইহা সমবৃত্তি অঙ্গ কিন্তু ইহার উৎপত্তি ভিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ কান্ড, পাতা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের রূপান্তর হইতে পারে। জংলী মটরের পাতা, আকর্ষে পরিণত হয়, ইহা পাতার সহিত সমসংস্থ। মটরশুটির পত্রক, আকর্ষে পরিণত হয়, ইহা পাতার সহিত সমসংস্থ। ঝুমকালতার কাক্ষিক মুকুল বা শাখা, আকর্ষে রূপান্তরিত, ইহা শাখার সহিত সমসংস্থ। উলট্‌চন্ডালের পত্রাগ্র আকর্ষে রূপান্তরিত, ইহা পাতার সহিত সমসংস্থ।

কুমারিকার উপপত্র আকর্ষে রূপান্তরিত, ইহা উপপত্রের সহিত সমসংস্থ। ছাগলবটির বৃন্ত আকর্ষে পরিবর্তিত, ইহা বৃন্তের সহিত সমসংস্থ।

কণ্টক (thorn, spine, prickle), উদ্ভিদ, গরু, ছাগল, মহিষ, ইত্যাদি প্রাণী হইতে কাঁটার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করে! কাঁটা বলিতে উদ্ভিদবিদ্যায় তিন প্রকার অঙ্গ বুঝায়, যথা শাখা কণ্টক রূপান্তরিত শাখা। **শাখা কণ্টক,** শাখার বা কান্ডের সহিত সমসংস্থ। সকল কাঁটাই, আত্মরক্ষায় সাহায্য করে, সুতরাং উহারা সমবৃত্তি অঙ্গ। বিলাতী মেহেদী, বেল, বাগানবিলাস ইত্যাদির কণ্টক হইল শাখা কণ্টক।

পত্র কণ্টক (spine) হইল পাতা বা পাতার অংশের রূপান্তর, যথা শতমূলি, খেজুর, কুল, ফণিমনসা, বারবেরি। এই সকল পত্র কণ্টক সমসংস্থ ও সমবৃত্তি। পাণিফলের কাঁটা বৃতিকণ্টক, ইহা সমবৃত্তি বটে কিন্তুসমসংস্থ নহে।

সালোক-সংশ্লেষ অঙ্গ—শতমূলির ক্ল্যাডোড, কাণ্ডের সহিত সমসংস্থ। ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড, কাণ্ডের সমসংস্থ। আকাশমণির পর্ণবৃন্ত পাতার সহিত সমসংস্থ।
পর্ণকাণ্ড, ক্ল্যাডোড, ফলকাকার উপপত্র, প্রত্যেকটি পাতার মত কাজ করে, সুতরাং সমবৃত্ত।

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

তৃণভোজী প্রাণী উদ্ভিদ ভক্ষণ করে। উদ্ভিদ, এই সকল প্রাণী হইতে নানাভাবে আত্মরক্ষা করে।
উদ্ভিদ কাঁটার সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে। এই কাঁটা, তিন প্রকার দেখা যায়, যথা **শাখা কণ্টক, পত্রকণ্টক** ও **গাত্রকণ্টক**।

শাখা কণ্টক—বেল, বিলাতী মেহেদী, কুলেখাড়া, করঞ্জা, বৈঁচী ইত্যাদির কাঁটা, শক্ত ও রূপান্তরিত কাণ্ড।

পত্র কণ্টক—পাতা বা পাতার অংশ বহুক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া আত্মরক্ষায় সাহায্য করে, যথা কুল, মণিমনসা, বাবলা, লজ্জাবতী।

গাত্র কণ্টক—বহুক্ষেত্রে ত্বকের উপর সরু কণ্টক পাওয়া যায়, যথা গোলাপের কাণ্ডের উপর, বেগুন গাছের পাতায়।

গ্রন্থিরোম (Glandular hairs)—বহু উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফলের উপর গ্রন্থিযুক্ত রোম থাকে। ইহা হইতে আঠালো পদার্থ বাহির হয়। তৃণভোজী প্রাণী এই সকল খাইলে, উহাদের মুখে খাদ্য আটকাইয়া যায় এবং অসুবিধার জন্য তাহারা (প্রাণীরা) এই সকল উদ্ভিদকে পরিত্যাগ করে, যথা তামাক, বাগভেরেণ্ডা, লালভেরেণ্ডা।

ঘনরোম—কোন কোন উদ্ভিদের দেহ ঘনরোম দ্বারা ঢাকা থাকে, ইহাতে প্রাণীরা, ঐ সকল উদ্ভিদকে পরিহার করে, যথা সূর্যমুখী, আকন্দ।

দংশক রোম—কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফলের উপর এককোষী বিষাক্ত রোম থাকে। ইহার বিষ ফরমিক অ্যাসিড এবং আগা সিলিকার জন্য শক্ত। তৃণভোজী প্রাণীরা ঐ সকল উদ্ভিদের উপর আসিলে, উহাদের দেহে রোমটি প্রবেশ করে এবং ভাঙিয়া যায়। ফরমিক অ্যাসিড অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় এবং দ্বিতীয় বার প্রাণীরা ঐ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিতে আসে না, যথা বিছুটি, আলকুশি।

বল্কল—বৃক্ষের পুরু বল্কল গাছকে রক্ষা করে, কারণ তৃণভোজী প্রাণী ইহা খাইতে পারে না এবং জীবাণুও ইহাতে প্রবেশ করে না। বহু ক্ষেত্রে বল্কলে বিষাক্ত পদার্থ থাকে।

তরুক্ষীর—বহু গাছে দুধের মত বিষাক্ত তরুক্ষীর থাকে এবং তৃণভোজী প্রাণী ইহা ভক্ষণ করে না, যথা করবী, আকন্দ, কল্কেফুল, ফণিমনসা।

উপক্ষার—বহুক্ষেত্রে উদ্ভিদের মধ্যে বিষাক্ত উপক্ষার থাকে, ইহাতে তৃণভোজী প্রাণী আহার করিতে আসে না, যথা ধুতুরার ড্যাটুরিন, তামাকের নিকোটিন, সিনকোনার কুইনাইন।

কটুগন্ধ—কোন কোন গাছে দুর্গন্ধ থাকে, তাহাতে প্রাণী খাইতে আসে না, যথা গাঁদাল, ঘেঁটু।

তিক্ত স্বাদ—বহু গাছের মধ্যে পাতা, ফল ইত্যাদিতে তিক্তরস থাকে, ইহাতে তৃণভোজী প্রাণী হইতে রক্ষা পায়, যথা উচ্ছে, করোলা, আমলকী, হরীতকী।

ধারালো পাতা—বহু ঘাস জাতীয় পাতার ত্বক সিলিকার দ্বারা শক্ত ও ধারালো হয় এবং নিজেকে রক্ষা করে।

র‍্যাফাইড—ওল, কচু ইত্যাদিতে কোষের ভিতর র‍্যাফাইড থাকে এবং উহা খাইলে গলায় ব্যথা ও মুখে যন্ত্রণা হয়। এই কারণে তৃণভোজী প্রাণী, উহা ভক্ষণ করে না।

অনুকৃতি (Mimicry)—কোন কোন গাছ, হিংস্র জন্তুর আকার অনুকরণ করিয়া নিজেকে রক্ষা করে। তৃণভোজী প্রাণীরা ভয় পাইয়া, উহা ভক্ষণ করে না, যথা কচু পাতা, বন-ওল।

সহকৃতি (Myrmecophily)—বহু ফলের গাছে, যথা আম, জাম, পিয়ারা ইত্যাদিতে, একপ্রকার পিপীলিকা খাদ্য ও আশ্রয় পায় এবং উহার প্রতিদানে তাহারা (পিপীলিকা) দেহরক্ষীর কাজ করে এবং আক্রমণকারী প্রাণীকে দংশন করিয়া উদ্ভিদকে রক্ষা করে। দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রকার বাবলা গাছের ফাঁপা পত্রকণ্টকে পিপীলিকা বাসা তৈয়ারি করে।

রোহিণী জাতীয় উদ্ভিদের আরোহণ প্রণালী

রোহিণী উদ্ভিদের কাণ্ড দুর্বল এবং অভিযোজনের জন্য অন্য আশ্রয় ধরিয়া, এই প্রকার উদ্ভিদ সূর্যালোক পাইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করে।

১। **কাণ্ডের সাহায্যে আরোহণ**—অপরাজিতা, পুঁই ইত্যাদি বল্লী (twiners) কাণ্ডের সাহায্যে আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে উঠে। যখন কাণ্ড ডান দিকে ঘুরিয়া যায়, তাহাকে **দক্ষিণাবর্ত** (dextrose) বলে, যথা চুপড়ি আলু, খাম আলু। কাণ্ড যদি বাম দিক হইতে ঘুরিয়া অবলম্বনকে জড়ায়, তাহাকে **বামাবর্ত** (sinistrose) বলে, যথা লজ্জাবতী।

ঘন জঙ্গলে কাষ্ঠল কাণ্ডযুক্ত লতা যাহাকে বল্লী বলে, বহু উচ্চে উঠিয়া থাকে। ইহারা বহুবর্ষজীবী এবং লাএনা (liana) নামেও পরিচিত, যথা মাধবীলতা।

২। **মূলের** সাহায্যে বহু উদ্ভিদ আরোহণ করে। এই সকল গাছের মূল অস্থানিক এবং মূলের আগা হইতে আঠালো বস্তু বাহির করিয়া আশ্রয়কে জড়াইয়া থাকে, যথা ভারতীয় আইভি। স্বর্ণলতা, চোষক মূলের সাহায্যে আরোহণ করে।

৩। **আকর্ষের** দ্বারা অনেক উদ্ভিদ আরোহণ করে, যথা ঝুমকালতা শাখা রূপান্তরিত আকর্ষের দ্বারা, জংলী মটর সম্পূর্ণ পাতা আকর্ষে পরিণত করিয়া, মটরশুটি পত্রক কয়েকটি আকর্ষে রূপান্তরিত করিয়া এবং কুমারিকার উপপত্র আকর্ষে পরিবর্তন করিয়া অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরে উঠে।

৪। **পাতা** রূপান্তরিত করিয়া বহু রোহিণী আশ্রয় জড়াইয়া থাকে। কলস উদ্ভিদের বৃন্তটি অবলম্বনকে জড়াইয়া থাকে, ছাগলবাটি পাতার বৃন্ত, লম্বা ও সরু এবং আশ্রয়কে সহজেই জড়াইয়া থাকে এবং উলটচণ্ডাল পাতার অগ্রভাগকে রূপান্তরিত করিয়া উপরে উঠে।

৫। **অঙ্কুশের** সাহায্যে বহু উদ্ভিদ উপরে উঠে। অংকুশ দেহের নানা স্থানে জন্মায়। ইহা কেবল আরোহণে সাহায্য করে। বাগানবিলাসের শাখাকণ্টক অংকুশের আকার ধারণ করে অর্থাৎ বাঁকা হইয়া আশ্রয়কে ধরে।

কাঁঠালীচাঁপার ফুলের বৃন্তে অংকুশ জন্মায় ও ইহা উঠিতে সাহায্য করে। আরোহী গোলাপ গাছে ত্বক কন্টক, এই ভাবে কাজ করে অর্থাৎ উঠিতে সাহায্য করে।

পুষ্টিভিত্তিক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of plants according to nutrition)

স্বভোজী (Autophytes)—যে সকল উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নিজের পুষ্টি-সাধন করে, তাহাদিগকে স্বভোজী বলে, যথা সবুজ বর্ণের সকল উদ্ভিদ, আম, জাম, কাঁঠাল।

পরভোজী উদ্ভিদ (Heterophytes)—যে সকল উদ্ভিদ নিজের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না তাহাদিগকে **পরভোজী** বলে, যথা স্বর্ণলতা।

স্বভোজী উদ্ভিদ—স্বভোজী উদ্ভিদের পাতা সবুজবর্ণ এবং বর্ষজীবী উদ্ভিদের কাণ্ডও সবুজ। এই সবুজ বর্ণ, ক্লোরোফিল নামক বস্তু, পাতা ও সবুজ অংশের কোষে থাকে এবং সূর্যকিরণ হইতে ফোটন নামক শক্তি সংগ্রহ করিয়া জৈব পদার্থ তৈয়ারি করিতে সাহায্য করে। স্বভোজী উদ্ভিদ মাটি হইতে জল ও জলমিশ্রিত অজৈব ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া CO_2, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া শর্করা জাতীয় জৈব পদার্থ প্রস্তুত করে। উদ্ভিদের সবুজ কণা ইহাকে খাদ্য তৈয়ারি করিয়া স্বাধীন করিয়াছে। সবুজ উদ্ভিদের এই খাদ্য প্রস্তুতিকে **সালোক-সংশ্লেষ** বলে। স্বভোজী উদ্ভিদ দিবাভাগে খাদ্য প্রস্তুত করে এবং বাতাসের CO_2 গ্রহণ করিয়া O_2 ত্যাগ করে। বাতাসের এই O_2 প্রাণী জগতের শ্বসনক্রিয়ায় অপরিহার্য। সবুজ উদ্ভিদ না থাকিলে, পৃথিবীর প্রাণী লোপ পাইত।

কতকগুলি **স্বভোজী** উদ্ভিদ, অপর উদ্ভিদের কাণ্ডে বা শাখায় আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাদিগকে পরাশ্রয়ী (epiphyte) বলে। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, যথা রাস্না (orchid) আশ্রয় বৃক্ষের কোন ক্ষতি করে না। ইহাদের মূলের উপর এক প্রকার কোষের (ভেলামেন) সাহায্যে বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। এই জলীয় বাষ্পের সাহায্যে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ করে। প্রসঙ্গত রাস্না বা অর্কিড পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর রঙের ফুল সৃষ্টি করে। পুরাতন আমগাছ ও অনেক বৃক্ষের উপর রাস্না বাস করে। শিবপুর উদ্ভিদ বাগানে নানারকম রাস্না সংগৃহীত আছে।

পরভোজী উদ্ভিদ—ইহারা নিজে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না এবং অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণী অথবা পচনশীল দ্রব্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা নানা প্রকার হয়।

পরজীবী (Parasites)—ইহারা খাদ্য প্রস্তুত করে না এবং সবুজ কণাও থাকে না। ইহারা যে-সকল উদ্ভিদের উপর জন্মায়, তাহাদিগকে **আশ্রয় উদ্ভিদ** (host plant) বলে। পরজীবী উদ্ভিদ অস্থানিক মূল, আশ্রয় উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই সকল মূলকে **শোষক মূল** (haustoria) বলা হয়। আশ্রয় উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ করিলে আশ্রয় উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব হয় এবং বহু ক্ষেত্রে আশ্রয় উদ্ভিদ মরিয়া

যায়। পরজীবী উদ্ভিদ, দুই প্রকারের—যথা, **সম্পূর্ণ পরজীবী** (total parasite) এবং **আংশিক পরজীবী** (partial parasite) ; যে-সকল পরজীবী উদ্ভিদ আশ্রয় উদ্ভিদের উপর খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাহাকে সম্পূর্ণ পরজীবী বলে, যথা স্বর্ণলতা বা আলোকলতা (Cuscuta reflexa) ; কতকগুলি পরজীবী কিছু অংশ খাদ্য, আশ্রয় উদ্ভিদ হইতে গ্রহণ করে, ইহাদিগকে আংশিক পরজীবী বলে, যথা বানডা বা মিসিলটো (mistletoe), চন্দন (sandalwood)।

মৃতজীবী (Saprophytes)—যে সকল উদ্ভিদ, মৃত জৈব পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে মৃতজীবী বলে। মৃতজীবী **সম্পূর্ণ মৃতজীবী** বা **আংশিক মৃতজীবী** হইতে পারে। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া বেশীর ভাগ মৃতজীবী। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে সম্পূর্ণ মৃতজীবী পাওয়া যায়, যথা কয়েকপ্রকার রাস্না বা অঁকিড, মনোট্রোপা এবং সারকোডিস। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে জন্মাইলে মাটির জৈব পদার্থ যাহাকে **হিউমাস** (humus) বলে, তাহা হইতে পুষ্টি লাভ করে।

কয়েকটি মৃতজীবী কিছুটা খাদ্য তৈয়ারি করে এবং কিছু জৈব পদার্থ হইতে গ্রহণ করে, ইহারা আংশিক মৃতজীবী, যথা মনোট্রোপা (Monotropa)।

মিথোজীবী (Symbionts)—কতকগুলি উদ্ভিদ, একত্রে বাস করে এবং দুইটি উদ্ভিদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য দেখা যায়। লাইকেন নামক সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের মধ্যে একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সহবাস করে। শৈবাল খাদ্য প্রস্তুত করে এবং ছত্রাক জননক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাকে মিথোজীবী বলে।

কতকগুলি সবীজ উদ্ভিদ, ছত্রাকের সহিত বসবাস করে। ইহাকে **মাইকোরাইজা** (mycorrhiza) বলে। মাইকোরাইজার মূলের বাহিরে ছত্রাক বাসা বাঁধিলে তাহাকে বহিঃমাইকোরাইজা এবং মূলের ভিতর ছত্রাক বাসা করিলে তাহাকে অন্তঃমাইকোরাইজা বলে। বহিঃমাইকোরাইজা ওক, ভূর্যপত্র (birch), পাইন ইত্যাদির মূলে পাওয়া যায়। সবুজ অঁকিডে অন্তঃমাইকোরাইজা পাওয়া যায়। এই সকল অঁকিডের বীজ হইতে অংকুরোদগম হয় না, যদি বীজে ছত্রাক না থাকে। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে এই প্রকার মাইকোরাইজা অধিক পাওয়া যায়।

শিম্বক জাতীয় উদ্ভিদের মূলে ব্যাকটিরিয়া বাসা করে এবং মূলের আকার স্ফীত হয়। ইহাকে মূলের নডিয়ুল (nodule) বলে। এই ব্যাকটিরিয়া, ব্যাসিলাস রেডিসিকোলা অথবা সিউডোমনাস রেডিসিকোলা বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। অন্য উদ্ভিদ বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। এই নাইট্রোজেন প্রোটিন তৈয়ারি করে এবং শিম্বক জাতীয় উদ্ভিদে প্রোটিন সৃষ্টি হয়। ইহা চাষের উপকার করে কারণ মাটির মধ্যে থাকিয়া, ইহা মাটিকে উর্বর করে।

পতঙ্গভুক (Insectivorous)—এই সকল উদ্ভিদের দেহে সবুজ রং থাকে কিন্তু মাটির মধ্যে নাইট্রেট অভাব হয়। এই সকল উদ্ভিদ দেহের কিছু অংশ পরিবর্তন করিয়া পতঙ্গ ইত্যাদি ধরিবার জন্য ফাঁদ সৃষ্টি করে। ঐ ফাঁদে পোকা ধরিয়া, উহার দেহ হইতে প্রোটিন সংগ্রহ করে। প্রোটিন সংগ্রহের জন্য নানা প্রকার শোষণ গ্রন্থি এবং জারক রসের এনজাইম প্রস্তুতকারী গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এই পতঙ্গভুক উদ্ভিদ পাওয়া যায়, কলস-পত্রী (Nepenthes or pitcher plant), সূর্যশিশির

(Drosera or sundew), পাতাঝাঁজি (Utricularia or bladderwort), এলড্রোভানডা (Aldrovanda) ইত্যাদি উদ্ভিদে।

কলস-পত্রী (Pitcher plant)—কয়েক উদ্ভিদগোষ্ঠীতে, যথা নিপেনথেসি, সেরাসিনেসি ইত্যাদির পাতা পরিবর্তিত হয় কলসে। এই কলসের মধ্যে পতঙ্গ ধরা পড়ে। কলস উদ্ভিদ বা নিপেনথিস সিংহল ও আসামে পাওয়া যায়। পাতার বৃন্ত আশ্রয় জড়াইয়া ধরে এবং ফলক কলসে পরিণত হয়। কলসের উপরে একটি ঢাকনা থাকে। কলসটি লইয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে ; কেহ কেহ বলেন, কলস রূপান্তরিত ফলক এবং ঢাকনাটি পত্রাগ্রের রূপান্তর। কেহ কেহ মনে করেন, কলস পত্রবৃন্তের রূপান্তর।যাহা হউক, কলস, পত্র হইতে জন্মায়। কলসের ভিতর বহুগ্রন্থি থাকে। ইহার রসের মধ্যে এনজাইম আছে এবং উহা পতঙ্গের দেহকে বিজারিত করে।

সূর্যশিশির (Sundew)—এই উদ্ভিদ আকারে ছোট এবং বর্ধমান, পরেশনাথ পাহাড় ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদের পত্রফলকগুলি গোল এবং চামচের মত হয়। পতঙ্গ ইত্যাদি পত্রফলকের শর্করা জাতীয় রসের দ্বারা আকৃষ্ট হয় কারণ ঐ সকল যখন সূর্যকিরণ পায়, তখন দূর হইতে ঝিক্ মিক্ করিতে থাকে এবং পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়। এই কারণে ইহাকে সূর্যশিশির বলে। সূর্যশিশিরের পাতার উপর রোম থাকে এবং রোমেতে পতঙ্গের দেহ আবদ্ধ হয়। এই সময় পাতাটি মধ্যশিরার দুই ধার হইতে জারক রস বাহির হয় এবং তাহার ভিতর এনজাইমের সাহায্যে পতঙ্গ দেহ পরিপাক হয়। এইভাবে সূর্যশিশির প্রোটিন খাদ্য সংগ্রহ করে।

ঝাঁজি (Utricularia or bladderwort)—ইহা জলজ উদ্ভিদ ও ইহাদের মূল নাই। পুকুর ও ডোবাতে ইহারা জন্মায়। ইহাদের যৌগিক পত্রের কতকগুলি পত্রক থলিতে রূপান্তরিত হয়। থলির সামনে থাকে ফাঁদের দ্বার। জলের পোকা দ্বার ঠেলিয়া ভিতর প্রবেশ করে এবং আর বাহির হইতে পারে না। থলির প্রাচীরে গ্রন্থি থাকে। কতকগুলি জারকগ্রন্থি হইতে জারক রস বাহির হইয়া পতঙ্গের দেহ পরিপাক করে এবং অপর প্রকার গ্রন্থি ঐ রস শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়।

পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence)

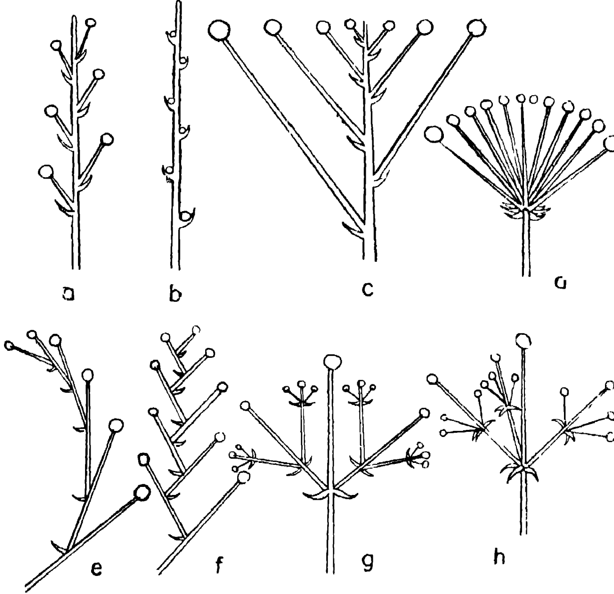
মূল, পাতা ও কাণ্ড জন্মাইবার পর, সচরাচর ফুল জন্মায়। ফুল হইল উদ্ভিদের জনন অঙ্গ। ফুল হইতে ফল ও ফলের মধ্যে থাকে বীজ। বীজে ভ্রূণ বা ভবিষ্যতের উদ্ভিদ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। একটি ফুল, একটি দণ্ডের উপর জন্মাইলে তাহাকে **একক** (single) বলে, যথা গোলাপ, জবা। যদি একটি দণ্ডের উপর একাধিক ফুল জন্মায়, তাহাকে **পুষ্পবিন্যাস** বা **পুষ্পমঞ্জরী** বলা হয়। যে দণ্ডের উপর ফুলগুলি জন্মায় তাহাকে **মঞ্জরীদণ্ড বলে**। মঞ্জরীদণ্ড শাখান্বিত হইতে পারে।

একক ফুলের দণ্ডকে **পুষ্পদণ্ড** (peduncle) বলে। মঞ্জরীদণ্ডের উপর যদি ফুলগুলির বৃন্ত থাকে, তাহাকে **পুষ্পবৃন্তিকা** (pedicel) বলে।

যে ফুলে বৃন্ত থাকে, একক হইলে **পিডানকুলেট** (pedunculate) ; বৃন্ত না থাকিলে **অবৃন্তক** (sessile) বলে। মঞ্জরী ফুলের দণ্ডকে **পেডিসেল** (pedicel) ও তাহা না থাকিলে **অবৃন্তক** (sessile) বলা হয়।

পুষ্পবিন্যাস, তিন প্রকারের দেখা যায়—**অনিয়ত, নিয়ত ও বিশেষ** প্রকার।

অনিয়ত (racemose)—যদি মঞ্জরী দণ্ডের উপর ফুলগুলি ক্রমাগত বড় (নিচ) হইতে ছোট হয় এবং অগ্রভাগ অনির্দিষ্ট থাকে, তাহাকে অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস বলে। ফুলগুলি অগ্রোন্মুখ ভাবে (acropetal) ফোটে। কখন কখন মঞ্জরীদণ্ড ছোট হয় এবং একটি চক্রের মত দণ্ডের উপর ফুলগুলি সাজান থাকে। চক্রের বাহিরের ফুলগুলি বড় এবং কেন্দ্রের ফুলগুলি ছোট। এই অভিকেন্দ্রের দিকে ফোটা (centripetal) অবস্থা সূর্যমুখী, গাঁদা ইত্যাদিতে দেখা যায়।



a—রেসীম, b—স্পাইক, c—করিম্ব, d—আমবেল, e—একপার্শ্বীয় শুণ্ডাকার, f—একপার্শ্বীয় বৃশ্চিকাকার, g—দ্বিপার্শ্বীয়, h—বহুপার্শ্বীয়।

১। সরল অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয় :

(i) **ফুল বৃন্তযুক্ত**—

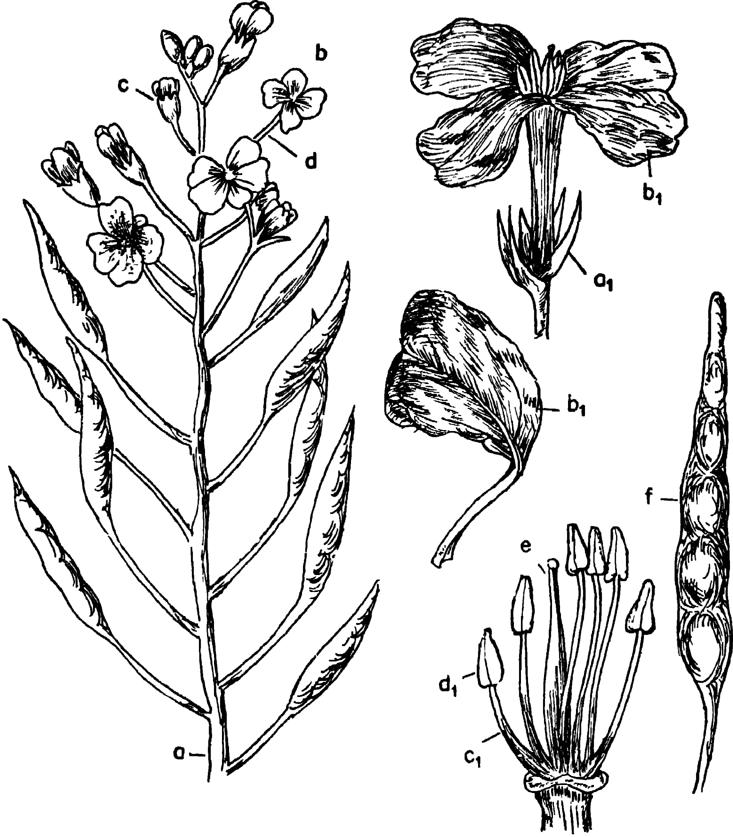
ক। **রেসীম** (Raceme)—মঞ্জরীদণ্ড দীর্ঘ এবং ফুলগুলির বৃন্তিকা বেশ দীর্ঘ, যথা মূলা, সরিষা, অতসী, ক্রুসিফেরী শ্রেণীভুক্ত ফুল।

খ। **করিম্ব** (Corymb)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে বৃন্তিকাগুলি অসমান হইলেও উপরে একতলে অবস্থিত যথা কালকাসিন্দা ক্যাণ্ডিটাফ্ট।

গ। **আমবেল বা ছত্র** (Umbel)—পুষ্পবৃন্তিকাগুলি প্রায় সমান এবং এক তলে অবস্থিত এবং ছাতার মত দেখায়, যথা থানকুনি।

(ii) **ফুলগুলি অবৃন্তক**—

ঘ। **স্পাইক বা মঞ্জরী** (Spike)—ফুলগুলি বৃন্তহীন, যথা আপাং। স্পাইকের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া তিন প্রকারের হয়।



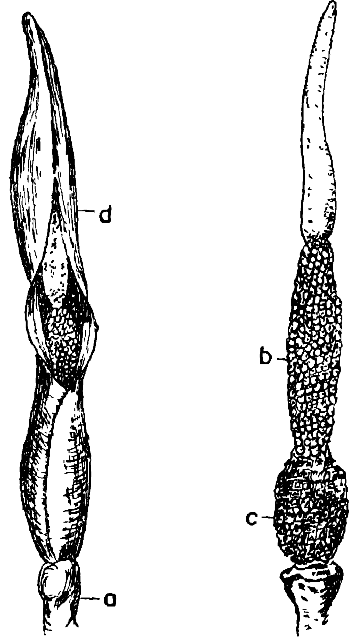
সরিষার রেসীম : a— মঞ্জরীদণ্ড, b— ফুল, c—পুষ্পমুকুল, d—পুষ্পবৃন্তিকা, a_1—বৃতি, b_1—দল ও পাপড়ি, c_1—পুংকেশর, d_1—পরাগধানী, e—গর্ভাশয়, f—ফল।

ঙ। **চমসা মঞ্জরী** (Spadix)—এই প্রকার মঞ্জরীবিন্যাসে, মঞ্জরীদণ্ড মোটা ও রসাল এবং বিশেষ প্রকার বড় মঞ্জরীপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। এই মঞ্জরীপত্রকে **চমসা** (spathe) বলে, যথা কচু, মোচা, তাল। কচুর মঞ্জরীবিন্যাসে, মঞ্জরীদণ্ডের উপর পুংপুষ্পগুলি উপরের দিকে, মধ্যবর্তী ফুলগুলি ক্লীব এবং নিচের ফুলগুলি স্ত্রীপুষ্প।

চ। **অণুমঞ্জরী** (Spikelet)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে অনেকগুলি ফুল থাকে, ধানের অণুমঞ্জরীতে, একটি করিয়া ফুল জন্মায়। এই মঞ্জরীর নিচে চারিটি মঞ্জরীপত্র (bracts) থাকে। সবচেয়ে নিচে দুইটি **নির্মোক** (glumes) ১ ও ২, ১নং তাহার সামান্য উপরে ২নং ; ইহাদের কক্ষে কোন ফুল থাকে না, সেই কারণে **অপুষ্পক নির্মোক** (empty glumes) বলে ; ইহাদের উপরে ৩নং নির্মোকের কক্ষে ফুল থাকে, সুতরাং ইহা সপুষ্পক। সপুষ্পক নির্মোকের কিছু উপরে, ছোট, শিরাবিশিষ্ট মঞ্জরীপত্রটি ৪নং। ইহাকে **শল্কবর্ণ** (palea) বলে।

ছ। **ক্যাটকিন** (Catkin)—ইহার মঞ্জরীদণ্ডটি দুর্বল এবং ঝুলিয়া থাকে। ইহাতে পুংপুষ্প যুক্ত বা স্ত্রীপুষ্পযুক্ত ফুল জন্মায় (unisexual); পুংপুষ্পগুলি পরাগ সংযোগের পর ঝরিয়া পড়ে, যথা ওক (oak), তুঁত।

জ। **শিরমঞ্জরী** বা **মস্তকবিন্যাস** (Capitulum or head)—মঞ্জরী দণ্ডটি চ্যাপ্টা ও উত্তল আকারের হয়। উত্তল **পুষ্পাধারের** (receptacle) উপর বহু পুষ্পিকা (florets) ঘন ভাবে সাজান থাকে। বাহিরের পুষ্পিকাগুলি প্রথমে প্রস্ফুটিত হয় এবং পরে ভিতর দিকের অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে খুলিতে থাকে। সূর্যমুখী ইত্যাদিতে, বাহিরের দিকে পুষ্পিকার পাপড়ি ফিতার মত হয়, ইহাকে **প্রান্তপুষ্পিকা** (ray florets) এবং কেন্দ্রের পুষ্পিকাগুলি পাপড়ি নলের মত এবং উহাকে **চক্রপুষ্পিকা** (disc florets) বলে। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পিকাগুলি এই প্রকারের হয়। শিরমঞ্জরীর চারিদিকে অর্থাৎ বাহিরে **মঞ্জরী-পত্রাবরণ** (involucre of bracts) থাকে।



কচুর চমসা মঞ্জরী a—পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প, d—চমসা, b—পুংপুষ্প, c—স্ত্রীপুষ্প।

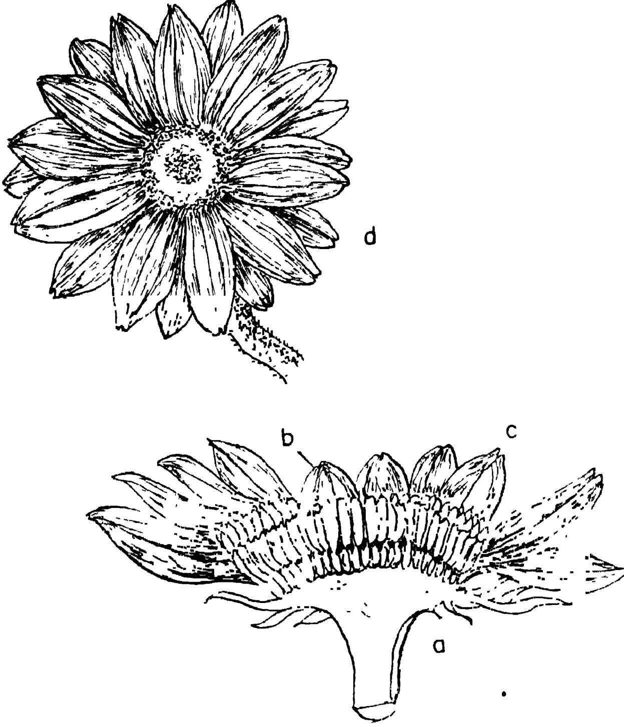
১। **যৌগ অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস** (Compound racemose inflorescence)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে, মঞ্জরীদণ্ডের শাখা থাকে। শাখার উপর সবৃন্তক বা অবৃন্তক ফুল থাকে।

ক। **পানিকল** (Panicle)—ইহাতে মঞ্জরীদণ্ডের উপর রেসীমের মত ফুল দেখা যায় ; আম, নিম (Melia azadirachta), মেহগনি (Swietenia mahagoni)।

খ। **যৌগ মঞ্জরী** (Compound spike)—ইহাতে মঞ্জরীদণ্ডের শাখার উপর মঞ্জরী জন্মায় ; যথা, গম (wheat)।

গ। **যৌগ ছত্র** (Compound umbel)—ইহার পুষ্পবিন্যাসের শাখাগুলির উপর সরল ছত্রের ন্যায় ফুল উৎপন্ন হয়, যথা ধনে (coriander), মৌরী (anise), গাজর (carrot)।

২। **নিয়ত পুষ্পবিন্যাস** (Cymose or definite inflorescence)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে অগ্রভাগে ফুলটি প্রথমে ফোটে, সেইজন্য ইহাকে **নির্দিষ্ট** (definite) পুষ্পবিন্যাস বলে। মঞ্জরীদণ্ডের ফুলগুলি উপর দিক হইতে নিচের দিকে ফুটিতে থাকে, অর্থাৎ নিম্নমুখীভাবে (basipetal)। যদি মঞ্জরীদণ্ডটি লম্বা না হইয়া চ্যাপ্টা হয়, তাহা হইলে ফুলগুলি কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে খুলিতে থাকে, ইহা **অপকেন্দ্র** (centrifugal)। নিয়ত পুষ্পবিন্যাস তিন প্রকার দেখা যায়—



সূর্যমুখীর শিরমঞ্জরী a—পুষ্পাধার, b—প্রান্তপুষ্পিকা, c—চক্রপুষ্পিকা, d—বহুপুষ্প।

ক। **একপার্শ্বীয়** (Uniparous or monochasium)—ইহাতে আগায় একটিমাত্র ফুল জন্মায় এবং ফুলের নিচে একটি শাখা থাকে এবং শাখাও একটি ফুল বহন করে। একপার্শ্বীয় পুষ্পবিন্যাস দুই প্রকার হয়, যথা—(*i*) **শুণ্ডাকার** (Helicoid)—যদি মঞ্জরী দণ্ডের শাখা কেবল একদিকে জন্মায়, তাহাকে শুণ্ডাকার বলে, যথা হামেলিয়া (Hamelia)। (*ii*) **বৃশ্চিকাকার** (Scorpioid)—যদি পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি একবার ডানদিক, পরের বার বামদিক, এইভাবে ক্রমান্বয়ে জন্মায় ; যথা, হাতীশুঁড়।

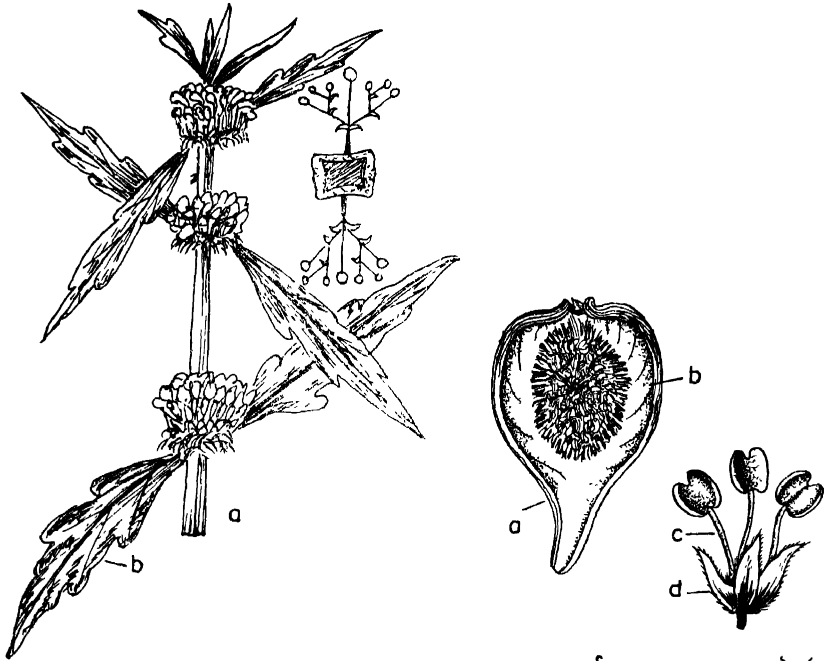
খ। **দ্বিপার্শ্বীয়** (Biparous or dichasium)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে অগ্রভাগে একটি ফুল প্রথমেই জন্মায় এবং উহার নিচে দুইটি শাখায় ফুল দেখা যায়। ইহার শাখা হইতে প্রশাখাদণ্ড বাহির হইতে পারে এবং তাহাদের অগ্রভাগে ফুল জন্মায়, যথা বেল, রঙ্গন, শেফালী।

গ। **বহুপার্শ্বীয়** (Multiparous or polychasium)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে অগ্রভাগের ফুলের নীচ হইতে দুইটির বেশী শাখা জন্মায় ও ফুল বহন করে। এই সকল শাখা-প্রশাখার উপরও ফুল জন্মাইতে পারে, যথা ঘেঁটু, আকন্দ।

মিশ্র পুষ্পবিন্যাস (Mixed inflorescence)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে নিয়ত ও অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস একত্রে মিশ্রিত থাকে। ইহা দুই প্রকার— (*i*) *স্পাইকেট সাইম* (*Spicate cyme*)—*তুলসীর পুষ্পদণ্ডের উপর প্রথমে মঞ্জরী উৎপন্ন হয় কিন্তু শাখাগুলির উপর নিয়ত পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।* (*ii*) *নিয়ত ছত্র* (*Cymose umbel*)—পিঁয়াজের পুষ্পবিন্যাসে কেন্দ্রের ফুলটি সর্বাপেক্ষা আগে ফোটে এবং প্রান্তের ফুলগুলি ছোট এবং পরে ফোটে। পুষ্পবিন্যাসটি দেখিতে ছত্রের মত।

বিশেষ প্রকার পুষ্পবিন্যাস
(Special types of Inflorescence)

(*i*) **ভারটিসিলেস্টার** (Verticillaster)—এই পুষ্পবিন্যাস নিয়ত ও দ্বিপার্শ্বীয়। দুইটি অভিপত্রের কক্ষে স্তবকটি জন্মায়। ফুলগুলি অবৃন্তক বা



a—দ্রোণের ভারটিসিলেস্টার, b—অভিপত্র।

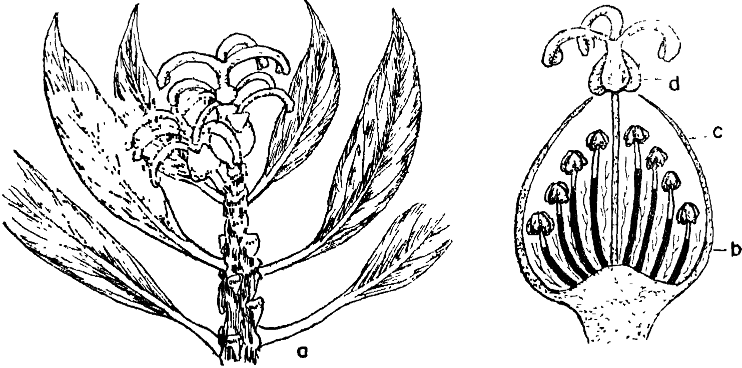
ডুমুরের পুষ্পবিন্যাস : a—ডুমুরের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ, পুংপুষ্পিকা, c—পুংকেশর।

ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত। ইহা রক্তদ্রোণ (Leonurus), শ্বেতদ্রোণ (Leucas) উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

(*ii*) **উদুম্বর** (Hypanthodium)—এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পাধারটি পুষ্পাক্ষ হইতে পরিবর্তিত হইয়া জন্মায়। পুষ্পাধারটি গোলাকার ও ফাঁপা। পুষ্পাধারের মধ্যে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুষ্পাধারের উপর দিকে একটি

গর্ত থাকে। পতঙ্গ ইহার ভিতর দিয়া পুষ্পাধারে প্রবেশ করে, যথা—বট, অশ্বত্থ, ডুমুর।

(*iii*) **স্যায়াথিয়াম** (Cyathium)—এই পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরী পত্রাবরণগুলি পরিবর্তিত হইয়া পুষ্পাধার তৈয়ারি করে। এই পুষ্পাধারের মধ্যস্থলে একটি



লালপাতার সায়াথিয়াম a—সায়াথিয়াম, b পুষ্পাধার, c—পুংপুষ্পিকা, d—স্ত্রীপুষ্পিকা।

স্ত্রীপুষ্পিকা ও উহার চারিদিকে বহু পুংপুষ্পিকা থাকে। পুষ্পাধারের উপর গ্রন্থি থাকে, যথা লালপাতা।

পুষ্পবিন্যাসের ছক

- অনিয়ত
  - —রেসীম (সরিষা)
  - —মঞ্জুরী (আপাং)
  - —সমভূম (আমবেল—কালকাসুন্দি)
  - —ছত্রমঞ্জুরী (থানকুনি)
  - —শিরমঞ্জুরী (সূর্যমুখী)
  - —যৌগিক মঞ্জুরী (কৃষ্ণচূড়া)
  - —অণুমঞ্জুরী (ধান)
  - —যৌগছত্র (ধনে)
  - —পানিকেল (নিম, আম)
- নিয়ত
  - —একপাশ্বীয় (হাতীশুঁড়)
  - —দ্বিপাশ্বীয় (বেলফুল)
  - —বহুপাশ্বীয় (আকন্দ)
- মিশ্র
  - —স্পাইকেট সাইম
  - —নিয়ত ছত্র
- বিশেষ
  - —ভারটিসেলেষ্টার (রক্তদ্রোণ)
  - —উদুম্বর (ডুমুর)
  - —স্যায়াথিয়াম (লালপাতা)

মঞ্জরীপত্র (Bracts)

ফুল মঞ্জরীপত্রের কক্ষে জন্মায় ; মঞ্জরীপত্র নানাভাবে জন্মাইতে পারে।

যে ফুলে মঞ্জরীপত্র থাকে, তাহাকে **মঞ্জরীপত্রযুক্ত পুষ্প** (bracteate), আর মঞ্জরীপত্র না থাকিলে, তাহাকে **মঞ্জরীপত্রবিহীন পুষ্প** (ebracteate) বলে।

মঞ্জরীপত্র নানা রকমের হয়, যথা—

সাধারণ মঞ্জরীপত্র—ফুলের নিচে বৃন্তের নিকট সবুজ রঙের মঞ্জরীপত্র দেখা যায়। ইহারা সচরাচর আকারে ছোট।

উপবৃতি (Epicalyx)—জবা, তুলা, ঢেরস ইত্যাদি ফুলের বৃতির নিচে অনেকগুলি **মঞ্জরীপত্রিকা,** আবর্তে সাজান থাকে।

পত্রাকার (Foliaceous)—যখন মঞ্জরীপত্র সবুজ পাতার মত দেখিতে হয়, তাহাকে পত্রাকার বলে, যথা বাসক, শ্বেত হুরহুরে।

দলসদৃশ—কোন কোন ফুলের মঞ্জরীপত্র পাপড়ির মত রঙীন হয়, ইহাকে দলসদৃশ বলে, যথা বাগানবিলাস লালপাতা।

স্পেদ বা **চমসা** (Spathe)—কচু, কলা ইত্যাদির মঞ্জরীপত্র বেশ বড় হয় এবং অনেকগুলি ফুলকে ঢাকিয়া রাখে। মোচার খোলা হইল, এই প্রকার মঞ্জরীপত্র।

বর্মপত্র বা **নির্মোক** (Glumes)—গম, ধান, ভুট্টার ফুলে কয়েক প্রকার শিরাবিশিষ্ট শক্ত নির্মোক বা গ্লুমস্ পাওয়া যায়। ফুল হইতে ফলে পরিণত হইলে গ্লুমস থাকিয়া যায়। ধান বা গমের খোসা হইল গ্লুমস।

পেলিয়া (Palea)—ধান ফুলের উপরের মঞ্জরীপত্রকে পেলিয়া বলে। **শল্কপত্রাকার**—গাঁদা, সূর্যমুখী জাতীয় চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পিকায় শল্কপত্রের মত মঞ্জরীপত্র থাকে।

কিউপিউল (Cupule)—কোন কোন ফুলে কাঠের মত কঠিন মঞ্জরীপত্র পাওয়া যায়, ইহাকে কিউপিউল বলে, যথা ওক, হেজেল।

মঞ্জরীপত্র নানা প্রকার কাজ করে :—

১। সবুজ মঞ্জরীপত্র সালোক-সংশ্লেষ করে।

২। পুষ্পমুকুলকে ঢাকিয়া রাখিয়া রোদ, বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে।

৩। রঙীন মঞ্জরীপত্র পরাগ সংযোগে সাহায্য করে।

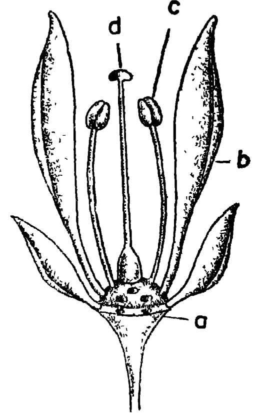
৪। বৃহদাকার স্পেদ (কলা) ফুলকে রক্ষা করে।

আদর্শ ফুল ও ফুলের কাজ
(Typical flower and functions of flower)

সবীজ উদ্ভিদ ফুলের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। ফুল রূপান্তরিত কাণ্ড কিন্তু উহার আকার, রং এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে উহাকে ভিন্ন প্রকার মনে হয়।

ফুলের মধ্যে চারিটি **স্তবক** থাকে। একটি আদর্শ ফুলে চারিটি স্তবক আছে। বাহিরের স্তবকটিকে **বৃতি** বলে। বৃতির এক একটি অংশের নাম **বৃত্যংশ**। বৃত্যংশগুলি **পৃথক** থাকিতে পারে, ইহা **বিযুক্ত বৃতি** অথবা **যুক্ত** থাকে, ইহাকে **যুক্ত**

বৃতি বলে। বৃতির ভিতরে থাকে **দলমণ্ডল**। দলমণ্ডলের অংশকে **পাপড়ি** বলে। পাপড়িগুলি **পৃথক** বা যুক্ত থাকে; উহাকে **বিযুক্ত দল বা যুক্ত দল** বলে। বৃতি ও দলমণ্ডলকে ফুলের **সহকারী** বা সাহায্যকারী অংশ বলে।

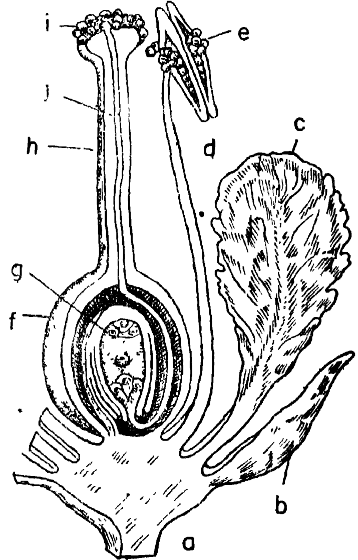


আদর্শ : a—বৃত্যংশ, b—পাপড়ি, c—পুংকেশর, d—গর্ভকেশর।

দলমণ্ডলের ভিতরে থাকে **পুংস্তবক**। পুংস্তবকের এক একটি অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশরের উপরের অংশকে **পরাগধানী** বলে। পরাগধানী সচরাচর দুইটি অংশে তৈয়ারি এবং এক একটি অংশে দুইটি **পরাগথলী** থাকে। পরাগথলির মধ্যে পরাগ মাতৃকোষ, মিয়োসিস প্রণালীতে **পরাগ বা রেণু** সৃষ্টি করে। পুংকেশর হইল ফুলের পুংজনন অঙ্গ। পুংস্তবকের ভিতর দিকে, স্ত্রীজনন অঙ্গ বা **গর্ভকেশর চক্র** থাকে। গর্ভকেশরে সচরাচর তিনটি অংশ—উপরে **গর্ভমুণ্ড,** ইহার নিচে **গর্ভদণ্ড** এবং গর্ভদণ্ডের নিচে **গর্ভাশয়**। গর্ভাশয়ের ভিতর **ডিম্বাশয়** (ovule) থাকে।

বৃতির রং সবুজ হইলে, কিছুটা সালোক-সংশ্লেষ করে। বৃতির প্রধান কাজ, ভিতরের অংশকে রক্ষা করা।

দলমণ্ডলে পাপড়ি রঙিন হয় এবং ইহা কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটায়। পরাগ সংযোগের ফলে পুংজনন কোষ (male gamete) পরাগ নলে জন্মায় এবং গর্ভাশয়ের ডিম্বাণুর (ovum) সহিত মিলিত হয়। এই মিলনকে **নিষেক** বলে। নিষেকের ফলে গর্ভাশয়, ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বাশয় বীজ সৃষ্টি করে।



আদর্শ ফুল। a—পুষ্পাধার বা থ্যালেমাস, b—বৃত্যংশ, c—পাপড়ি, d—পুংকেশর, e—পরাগধানী, f—গর্ভাশয়, g—ভ্রূণথলি, h—গর্ভদণ্ড, i—গর্ভমুণ্ড ও রেণু, j—পরাগ নল।

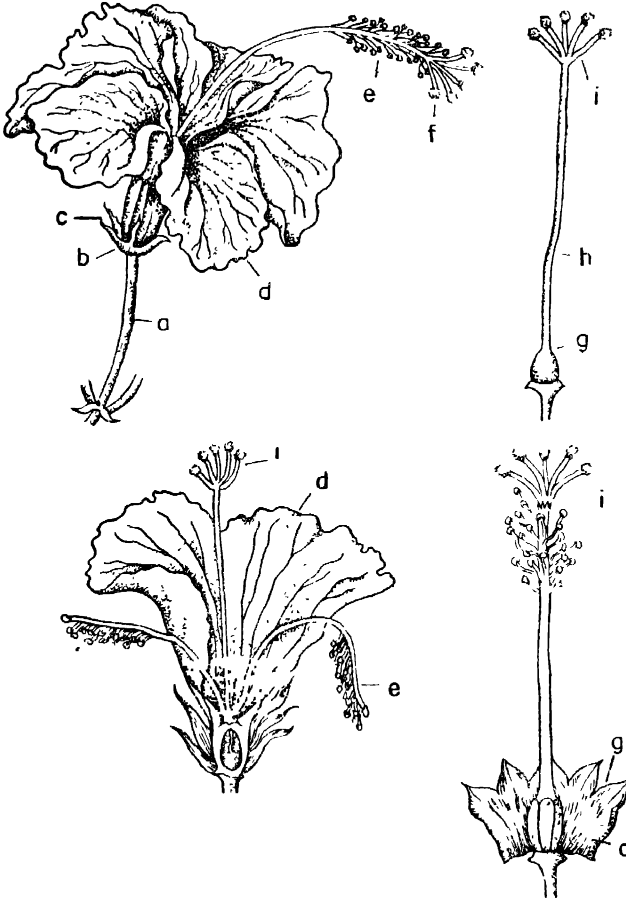
গর্ভশীর্ষপুষ্পী (Epigyny), গর্ভকটিপুষ্পী (Perigyny) ও গর্ভপাদপুষ্পী (Hypogyny)

পুষ্পাক্ষের উপর বৃতি, দল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক যেভাবে সজ্জিত থাকে তাহার ভিত্তিতে তিন প্রকার ফুল দেখা যায়—

গর্ভশীর্ষপুষ্পী—যখন ডিম্বাশয় অবতল পুষ্পাক্ষের মধ্যে থাকে এবং পুষ্পাক্ষ গহ্বরের প্রাচীর ডিম্বাশয়ের বাহিরের প্রাচীরের সহিত যুক্ত হয়, তখন পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ স্ত্রীস্তবকের উপরে

থাকে। ইহাকে **গর্ভশীর্ষপুষ্পী** বলে। এই ফুলে ডিম্বাশয় **অধরিক** (inferior) এবং পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ **অধিগর্ভ** (superior), যথা শশা, কুমড়া, পেয়ারা, রজনীগন্ধা।

গর্ভকটিপুষ্পী—এই সকল ফুলের পুষ্পাক্ষটি চ্যাপ্টা এবং স্ত্রীস্তবকটি মধ্যস্থলে থাকে। স্ত্রীস্তবকটি ঘিরিয়া পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ—একই সমতলে সাজান



জবাফুল : a=পুষ্পদণ্ড, b=উপবৃতি, c=বৃতি, d=পাপড়ি, e=পুংস্তবক, f=স্ত্রীস্তবক, g=গর্ভাশয় ও নিচের ছবিতে বৃতি h=গর্ভদণ্ড i=গর্ভমুণ্ড।

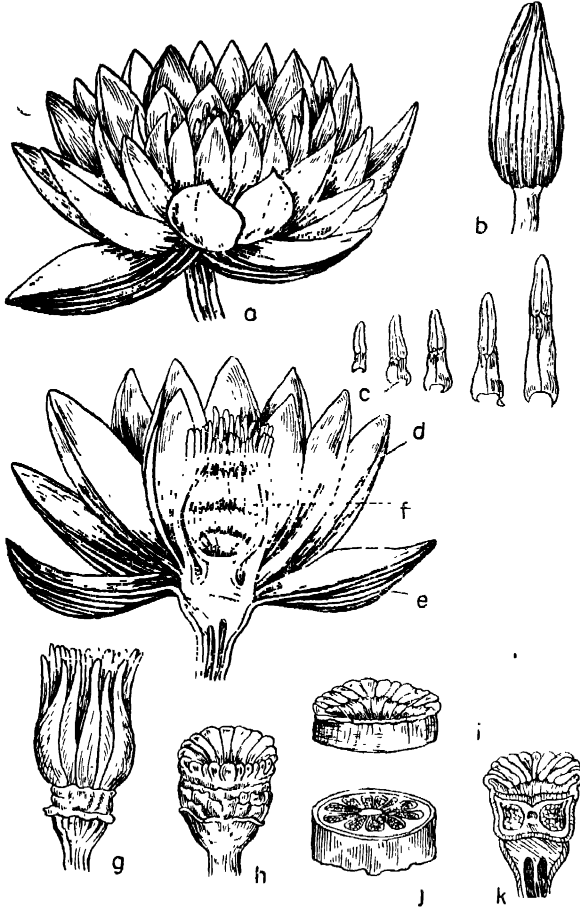
থাকে। এই বিন্যাসকে **গর্ভকটিপুষ্পী** বলে। ডিম্বাশয়টিকে উপরিক ডিম্বাশয় বলিয়া গণ্য করা হয়, যথা বক, মটর, অপরাজিতা, গোলাপ।

গর্ভপাদপুষ্পী—অনেক ফুলে পুষ্পাক্ষ উত্তলাকার অথবা শাঙ্কব আকার ধারণ করে এবং ডিম্বাশয়টি একেবারে পুষ্পাক্ষের উপরে জন্মায়। ইহাকে **গর্ভপাদপুষ্পী** বলে। ডিম্বাশয়টি **উপরিক** এবং পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশগুলি ডিম্বাশয়ের নিচে

অবস্থিত, যথা বেগুন, সরিষা, চাঁপা, আতা, শ্বেত হুড়হুড়ে, আকন্দ, করবী, জবা, নয়নতারা। পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ, অধোগর্ভ।

সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল (Complete and incomplete flowers)

যে-সকল ফুলে চারিটি স্তবক থাকে অর্থাৎ বৃতি, দল, পুংকেশর স্তবক ও গর্ভকেশর স্তবক, তাহাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে, যথা জবা, গোলাপ, ধুতুরা, মটর ইত্যাদি।



শালুক ফুল a—সমাঙ্গফুল, b—পুষ্পমুকুল, c—পুংকেশর, d—দল, e—বৃতি, f—পুংকেশর, g—পুংকেশব, h—গর্ভকেশর ও পুংপাধার, i—গর্ভকেশর, j—গর্ভকেশরের ছেদন, k—পুষ্পাধারের চ্ছেদ।

অনেক ফুলে এক বা একাধিক স্তবক থাকে না, তাহাকে **অসম্পূর্ণ** ফুল বলে, যথা কুমড়া, ভুট্টা, ধান।

কোন কোন ফুলে, বিশেষতঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদে বৃত্যংশ ও পাপড়ির, আকার ও রঙের পার্থক্য থাকে না, ইহাকে **পৌরভ্রংহ** (Perianth) বলে, যথা বাগানবিলাস, রজনীগন্ধা।

বৃতি যুক্ত এবং সমাঙ্গ। তুলসী শ্রেণীর উদ্ভিদে, বৃতি যুক্ত ও অসামঙ্গ (irregular and gamosepalous)। বিযুক্ত ও অসমান বৃতি, একোনাইট ফুলে পাওয়া যায়। পানিফলের বৃতি কাঁটায় পরিণত হয়; গাঁদা, সূর্যমুখীর বৃতি শল্কে বা আঁইসের মত এবং কিছু বৃতি, এই সকল ফুলে সুতোর আকার ধারণ করে, ইহাকে **পেপাস** (Pappus) বলে।

বৃতির স্থায়ী কাল

পাতী বৃতি (Deciduous)—যে-সকল ফুলের বৃতি, ফুল খুলিবার পর থাকিয়া যায় কিন্তু নিষেকের (fertilization) পর ফল জন্মাইবার সময় পড়িয়া যায়, তাহাকে পাতী বলে, যথা গোলাপ, পদ্ম।

অন্তপাতী বৃতি (Caducous)—যদি ফুল খুলিবার পূর্বেই বৃতি পড়িয়া যায়, তাহাকে অন্তপাতী বলে, যথা চাঁপা, শিয়ালকাঁটা, আফিং।

স্থায়ী বৃতি (Persistent)—যদি ফল জন্মাইবার পরও বৃতি ফুলের সহিত লাগিয়া থাকে, তাহাকে স্থায়ী বৃতি বলে। যদি বৃতি ফলের সহিত রসাল হয়, তাহাকে **বৃদ্ধিশীল** (Accrescent) বলে, যথা চালতা, বেগুন। যদি বৃতি ফলের সহিত শুষ্ক অবস্থায় যুক্ত থাকে, তাহাকে **ম্যাকরেসেণ্ট** (Macrescent) বলে, যথা টেপারি, তুলা।

দল (Corolla)

বৃতির ভিতরে দ্বিতীয় স্তবককে দল বলে। দলের অংশগুলিকে পাপড়ি বলে। দল ফুলের ভিতরের অংশগুলিকে বৃতির ন্যায় তাপ, বৃষ্টি, শৈত্য হইতে রক্ষা করে। পাপড়ি সচরাচর রঙীন সুন্দর ও গন্ধযুক্ত হয়। ইহা পতঙ্গকে পরাগ সংযোগের জন্য আকৃষ্ট করে। কোন কোন ফুলের পাপড়ি, বৃতির মত সবুজ বর্ণের হয়। ইহাকে বৃতি সদৃশ (sepaloid) বলে। এই প্রকার পাপড়ি কাঁঠালিচাঁপা (Artabotrys), আতা (Anona), দেবদারু (Polyalthia) ইত্যাদি গাছে পাওয়া যায়। বৃতির ন্যায় পাপড়িরও শিরাবিন্যাস, পত্ররন্ধ্র থাকে।

বিভিন্ন প্রকার দল

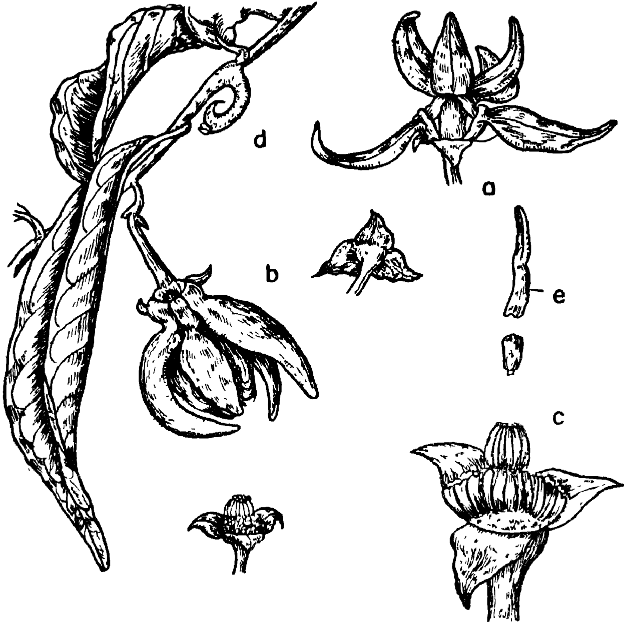
বিযুক্ত দল—যখন পাপড়িগুলি পৃথক ও **সুষম** (regular):

১। **ক্রুশাকার** (Cruciform)—যদি চারিটি পাপড়ি, দল সৃষ্টি করে এবং পাপড়িগুলি ক্রুশের মত সাজান থাকে, তাহাকে ক্রুশাকার বলে। যথা মুলা, সরিষা, ক্রুশাকার উদ্ভিদশ্রেণী (Cruciferae)।

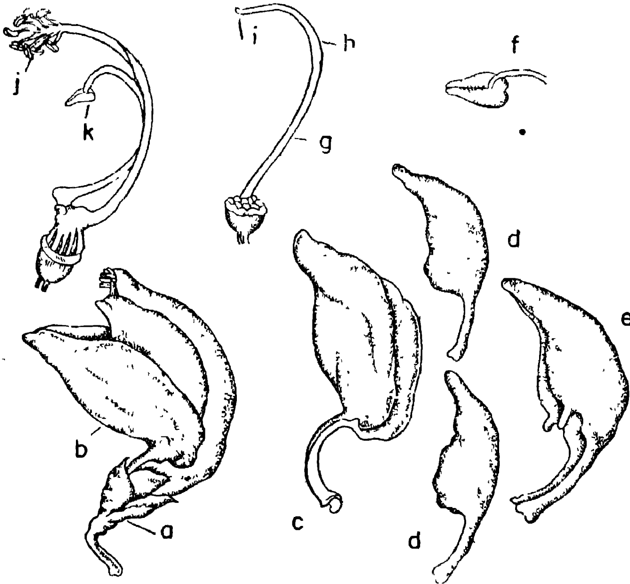
২। **গোলাপাকার** (Rosaceous)—যখন পাপড়িগুলির বৃন্ত (clan) থাকে না অথবা ছোট এবং পাপড়িফলক লম্বভাবে সাজান থাকে, যথা গোলাপ, চা।

৩। **লবঙ্গবৎ** (Caryophyllaceous)—ইহাতে পাঁচটি পাপড়ি থাকে, পাপড়ির বৃন্ত বেশ দীর্ঘ এবং ইহার সহিত পাপড়ি ফলক লম্বভাবে সাজান থাকে, যথা পিঙ্ক ফুল।

বিযুক্ত, বিষম, প্রজাপতিসম (Irregular)—এই প্রকার ফুলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে এবং আকারে অসমান। দলের পশ্চাৎভাগে (posterior) সর্বাপেক্ষা বড় পাপড়ি



কাঁঠালিচাঁপা a—ফুল, b—বৃতিসদৃশ, d—আরোহণের হুক, e—পুংকেশর।



বকফুল : a—বৃতি, b—দল, c—পতাকা, d—পক্ষ, e—তরী, f—পুংকেশর, g—গর্ভকেশর, h—গর্ভদণ্ড, i—মুণ্ড, k—পুংকেশর, j—পুংকেশর।

থাকে, ইহাকে **ধ্বজা** বা পতাকা (vexillum or standard) বলে। **দুই পাশে** দুইটি পাপড়িকে **পক্ষ** বা ডানা (wings) এবং **অক্ষবিমুখ** বা সামনে (anterior) দুইটি পাপড়ি সংলগ্ন হইয়া **তরী** বা নৌকার মত আকার ধারণ করে (keel or carina)। ধ্বজা পক্ষকে কিছুটা ঢাকিয়া রাখে। ইহা অপরাজিতা, বক, অতসী ও প্যাপিলিওনেসী উদ্ভিদ শ্রেণীতে পাওয়া যায়।



দল : a—ক্রুশাকার, b লবঙ্গবৎ, c—গোলাপাকার, d—চক্রাকার, e—রঙ্গনাকার, f—ধুতুরাকার, g—ঘণ্টাকার, h- ওষ্ঠাধরাকৃতি, i - প্রজাপতিসম, j—জিহ্বাকার।

যুক্ত পুষ্পদল (Gamopetalous corolla)—সুষম (regular) :

১। **ঘণ্টাকার** (Bell-shaped or campanulate)— যখন পাপড়িগুলি যুক্ত হইয়া ঘণ্টার আকার ধারণ করে এবং নিচের দিক সরু ও দলের উপর দিক ঘণ্টার মত চওড়া, যথা লাউ, কুমড়া, টেপারী।

২। **নলাকার** (Tubular)—যখন পাপড়িগুলি যুক্ত হইয়া নলের মত হয়, সূর্যমুখীর মধ্যপুষ্পিকা (disc florets)।

৩। **ধুতুরাকার** (Funnel-shaped or infundibuliform)—পাপড়িগুলি যুক্ত হইয়া চুঙ্গির বা ফানেলের মত হয়, যথা ধুতুরা, কলমিশাক, কল্কেফুল।

৪। **চক্রাকার** (Wheel-shaped or rotate)—ইহা দেখিতে অনেকটা চাকার মত। ইহার দলের নালী ছোট এবং পাপড়ির ফলকগুলি নলের সহিত কোণ সৃষ্টি করে, যথা—নয়নতারা, শেফালিকা, বেগুন।

৫। **রঙ্গনাকার** (Salver-shaped or hypocrateriform)—দলের নলটি সরু ও দীর্ঘ এবং পাপড়ি ফলকগুলি ইহার সহিত লম্বভাবে থাকে, যথা—রঙ্গন, টগর।

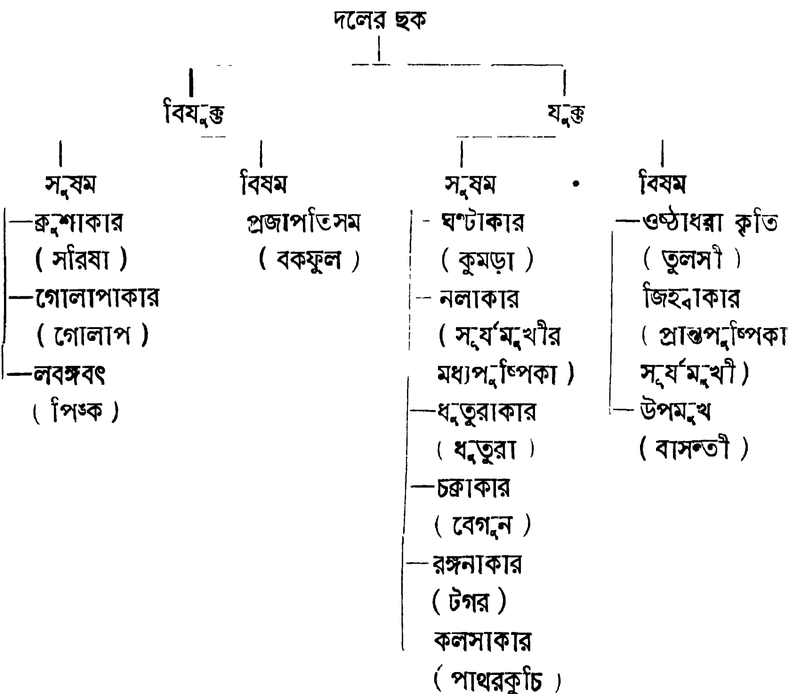
৬। **কলসাকার** (Urceolate), যদি দলের নলটি উপর ও নিচের দিক সরু কিন্তু মধ্যস্থল মোটা, যথা—পাথরকুচি।

দলযুক্ত ও বিষম (gamopetalous, irregular)

১। **ওষ্ঠাধরাকৃতি** (two-lipped or bilabiate)—এই প্রকার দলে দুইটি ওষ্ঠ বা ঠোঁট সৃষ্টি করে। উপরের ওষ্ঠে দুইটি পাপড়ি ও নিচের ওষ্ঠে তিনটি পাপড়ি থাকে, যথা—রক্তদ্রোণ, তুলসী, শ্বেত দ্রোণ, বাসক।

২। **জিহ্বাকার** (ligulate or strap-shaped)—এই প্রকার দলে নিচের দিক নলের মত কিন্তু উপরের দিক চ্যাপ্টা ও ফিতার মত, যথা—সূর্যমুখীর প্রান্ত পুষ্পিকা, গাঁদা ফুলের প্রান্ত পুষ্পিকা।

৩। **উপমুখ** (personate)—ইহা ওষ্ঠাধরাকৃতির মত কিন্তু নিচের ওষ্ঠ উপরদিকে উঠিয়া মুখের গর্ত বন্ধ করিয়া রাখে। এই উঁচু অংশকে **তালু** (palate) বলে, যথা বাসন্তী (Lindenbergia), স্ন্যাপ ড্রাগন (Snapdragon)।



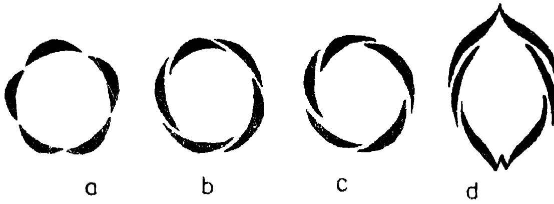
পুষ্পমুকুল পত্রবিন্যাস (Aestivation) পুষ্পমুকুলে (flower bud) বৃত্যংশ ও পাপড়িগুলি যেভাবে সাজান থাকে, তাহাকে মুকুলপত্র বিন্যাস বলে। নিম্নে ফুলের বিভিন্ন প্রকারের মুকুলপত্র বিন্যাস বর্ণিত হইল—

১। **প্রান্তস্পর্শী** (valvate) বা **ভালভেট**, যখন বৃত্যাংশগুলি ও পাপড়িগুলি পরস্পর পাশাপাশি থাকে অর্থাৎ কাহারও উপর থাকে না, তাহাকে ভালভেট বলে, যথা—আতা, কাঁঠালিচাঁপা, আকন্দ।

২। **পাকানো বা টুইস্টেড** (twisted)—বৃত্যংশ ও পাপড়িগুলি, একটির কিনারা পরের অংশকে ঢাকিয়া রাখে, ফলে পাকানো আকার ধারণ করে, যথা—জবা, তুলা, করবী, কল্কেফুল।

৩। **ইমব্রিকেট** (imbricate)—যখন বৃত্যংশ ও পাপড়িগুলি দুই প্রান্তেই আবৃত থাকে কেবল একটির কোন আবরণ থাকে না। যথা—কালকাসিন্দা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া।

৪। **কুইনকানশিয়াল** (quincuncial)—ইহার দুইটি পাপড়ি ভিতরে, দুইটি বাহিরে এবং একটি পাকানো, যথা—কলমী, পেয়ারা।



a প্রান্তস্পর্শী, b ইমব্রিকেট, c টুইস্টেড, d– ধ্বজক।

৫। **ধ্বজক** (Vexillary)—এই প্রকারে অক্ষমুখ বা পশ্চাৎভাগের বড় পাপড়ি অর্থাৎ ধবজা, দুইধারের পক্ষ দুইটিকে ঢাকিয়া রাখে এবং পক্ষদুইটি অক্ষ বিমুখ (anterior) তরীদলকে ঢাকিয়া রাখে। যথা—বক, অপরাজিতা, অতসী, মটর।

পুংস্তবক (Androecium)

ফুলের পুংস্তবকটি অত্যাবশ্যক স্তবক। ইহা কতকগুলি **পুংকেশর** (Stamen) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পুংকেশরের সরু সুতার মত অংশকে **সূত্র** (filament) এবং ওপরের ডিমের মত অংশকে পরাগ ধানী (anther) বলে। পরাগ ধানী দুইটি খণ্ড দ্বারা তৈয়ারী। খণ্ড দুইটি **যোজক** (connective) দ্বারা যুক্ত। সূত্রের প্রসারিত অংশটিই যোজক। প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে দুইটি করিয়া **পরাগথলি** (pollen-sac) থাকে। পরাগ থলির মধ্যে মিয়োসিস প্রণালীতে বিভাজিত হইয়া **পরাগ বা রেণু** (pollen) সৃষ্টি হয়। পরাগ পুংজনন কোষ নহে। পরাগ উপযুক্ত অবস্থায় পরে **পুংজনন কোষ** (sperm) সৃষ্টি করে। যে সকল ফুলের পরাগধানী থাকে না অথবা রেণু উৎপন্ন হয় না, সে সকল পুংকেশরকে **বন্ধ্যা পুংকেশর** (staminode) বলে, যথা—কেনা, কালকাসুন্দি। কেনা ফুলের বন্ধ্যা পুংকেশর পাপড়ি মত দেখিতে বলিয়া উহাকে **দলসদৃশ** (petaloid) বলা হয়।

সমসংযোগ ও অসমসংযোগ (Cohesion and Adhesion) **ফুলের** বৃত্যংশগুলি বা পাপড়িগুলি **অথবা পুংকেশরগুলি** বা গর্ভপত্রগুলি যদি পরস্পর অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যুক্ত থাকে, তাহাকে **সমসংযোগ** (Cohesion) বলে।

বৃত্যংশগুলি যুক্ত হইলে, তাহাকে সমসংযোগ বলে, যথা—জবা, ধুতুরা, বকফুল। এই প্রকার **বৃতিকে যুক্তবৃতি** বলে (gamosepalous) এবং নিচের নলের মত অংশকে **বৃতিনল** (Calyx tube) বলে। পাপড়িগুলি পরস্পর যুক্ত হইলে, উহাকে **যুক্তদল** (gamopetalous) বলা হয়, যথা—ধুতুরা, কুমড়া, নয়নতারা।

পুংকেশরের সমসংযোগ (cohesion of stamens), পুংকেশরের সূত্রগুলি যুক্ত হইতে পারে এবং পরাগধানীগুলি যদি পৃথক থাকে, তাহাকে **অগুচ্ছ** (adelphous) বলে। তিন প্রকার অগুচ্ছ সূত্র দেখা যায়—

একগুচ্ছ—(monadelphous) পুংকেশরের সূত্রগুলি যুক্ত হইয়া একটি গুচ্ছ তৈয়ারি করিলে, তাহাকে **একগুচ্ছপুংকেশর** (monadelphous) বলে, যথা—জবা, তূলা, ঢেঁড়স, মালভেসীগোত্রীয় উদ্ভিদ।

দ্বিগুচ্ছ (diadelphous)—যখন সূত্রগুলি যুক্ত হইয়া, দুইটি গুচ্ছ তৈয়ারি করে, তাহাকে **দ্বিগুচ্ছ** বলে, যথা বক, মটর, অপরাজিতা, অতসী, প্যাপিলিওনেসি গোষ্ঠীর উদ্ভিদ।

বহুগুচ্ছ (polyadelphous), যদি সূত্রগুলি দুইটির বেশী গুচ্ছ সৃষ্টি করে, তাহাকে **বহুগুচ্ছ** বলে, যথা—শিমুল, লেবু, রেড়ী।

বহুফুলে পরাগধানী (anther) যুক্ত হয় কিন্তু সূত্র পৃথক থাকে, তাহাকে **যুক্তপরাগধানী** (syngenesious) বলে, বথা –সূর্যমুখী, গাঁদার পুষ্পিকা (florets)।

যদি পুংকেশরের পরাগধানী ও সূত্র উভয়ই যুক্ত থাকে তাহাকে **যুক্তপুংকেশর** (synandrous) বলে, যথা কুমড়া, শশা, কচু, লাউ।

গর্ভকেশরের সমসংযোগ (Union or cohesion of carpels) গর্ভপত্রগুলি যুক্ত হইয়া গর্ভাশয় তৈয়ারি করে। যদি গর্ভপত্রগুলি যুক্ত হয়, তাহাকে **যুক্তগর্ভপত্রী** (syncarpous) বলে যথা কুমড়া, সরিষা, শশা।

একটি মাত্র গর্ভপত্র (carpel) হইতে গর্ভাশয় (ovary) তৈয়ারি হইতে পারে, ইহাকে **একগর্ভপত্রী** (monocarpellary) অথবা **সরল** (simple) **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium or Pistil) বলে। এই প্রকার স্ত্রীস্তবক মটর, বক, লজ্জাবতীতে পাওয়া যায়। কোন কোন ফুলে গর্ভপত্রগুলি পৃথক পৃথক গর্ভাশয় তৈয়ারি করে, ইহাকে **বিযুক্তগর্ভপত্রী** (apocarpous) বলে, যথা –গোলাপ, পদ্ম, চাঁপা।

প্রকৃতপক্ষে গর্ভপত্র পাতার রূপান্তর। **গর্ভপত্র** (megasporophyll) যে পাতা, তাহা মটরশুটির ফল পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়। **এই ফল একটি গর্ভপত্র মধ্যশিরার** দুইদিকের কিনারা ভাঁজ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। ডিম্বাশয়ের দুই কিনারার সংযোগ স্থলকে **অঙ্কীয় সন্ধি** (ventral suture) আর মধ্য শিরার অংশকে **পৃষ্ঠ সন্ধি** (dorsal suture) বলে। ডিম্বাশয়ের ভিতর অঙ্কীয় সন্ধিতে দানার মত **ডিম্বকগলি** যুক্ত থাকে। যে কলার দ্বারা **ডিম্বক** (Ovule) **ডিম্বাশয়ের** (Ovary) প্রাচীরে সংযুক্ত থাকে, তাহাকে **অমরা** (placenta) বলে।

গর্ভাশয়ের উপরে যে নলের মত অংশ, তাহাকে **গর্ভদণ্ড** এবং গর্ভদণ্ডের উপরে এক বা একাধিক **গর্ভমুণ্ড** (Stigma) থাকে।

যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয়ে সচরাচর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ (Loculi) থাকে। কখন কখন একটি প্রকোষ্ঠ থাকে, যথা—শশা, পেঁপে, আফিং। ইহাকে **এক প্রকোষ্ঠ ডিম্বাশয়** (unilocular) বলে। যখন ডিম্বাশয়ের ভিতর দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকে, তাহাকে, **দ্বিপ্রকোষ্ঠ ডিম্বাশয়** (bilocular) যথা—বেগুন, সরিষা, তুলসী। তিনটি প্রকোষ্ঠ হইলে, **ত্রিপ্রকোষ্ঠ ডিম্বাশয়** (trilocular) এবং **বহুপ্রকোষ্ঠ** থাকিলে **বহুপ্রকোষ্ঠ ডিম্বাশয়** (multilocular) বলে, যথা—জবা, ঢেঁড়স।

স্বাভাবিকভাবে ডিম্বাশয়ের উপরে গর্ভদণ্ড থাকিলে, তাহাকে **অগ্রস্থ** (terminal) বলে, যথা—বেগুন, জবা। ডিম্বাশয়ের পাশ হইতে জন্মাইলে, **পার্শ্বস্থ** (lateral) বলে, যথা—আম।

কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় ডিম্বাশয় চারিটি টুকরায় বিভক্ত এবং টুকরার মধ্যস্থল হইতে গর্ভদণ্ডটি উঠিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে একটি মধ্যস্থিত নিম্নস্থান হইতে গর্ভদণ্ডটি উঠে, ইহাকে **গাইনোবেসিক্ গর্ভদণ্ড** বলে, যথা—তুলসী, রক্তদ্রোণ, শ্বেতদ্রোণ। বহু উদ্ভিদের গর্ভদণ্ড খুব লম্বা হয়, যথা—ভুট্টা।

গর্ভমুণ্ড (Stigma)—ফুলে এক বা একাধিক গর্ভমুণ্ড থাকে। গর্ভমুণ্ডের উপর রেণু বা পরাগ এক প্রকার মণ্ড নিঃসৃত আঠায় লাগিয়া যায়।

গর্ভাশয়ের ছেদন লইয়া গর্ভাশয় কয়টি গর্ভপত্রের দ্বারা তৈয়ারি তাহা স্থির করা হয়। যুক্তগর্ভপত্রী ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠ (কয়টি) প্রস্থচ্ছেদ দ্বারা জানা যায়।

সম্পূর্ণ গর্ভকেশরই সংযুক্ত না হইতে পারে: জবার গর্ভমুণ্ডগুলি পৃথক থাকে। করবী ফুলের গর্ভদণ্ড অযুক্ত হয়। আকন্দ, নয়নতারায় ডিম্বাশয় পৃথক থাকে।

অসমসংযোগ (Adhesion of petals and stamens)—কোন কোন ফুলে পুংকেশর পাপড়ির সহিত যুক্ত থাকে ইহাকে **দললগ্ন পুংকেশর** (epipetalous) বলে, যথা ধুতুরা, তামাক। কোন কোন ফুলে পুংকেশর বা উহার পরাগধানী গর্ভকেশরের সহিত যুক্ত হয়, ইহাকে **গাইনেনড্রাস** (gynandrous) বলে, যথা—আকন্দ, অর্কিড।

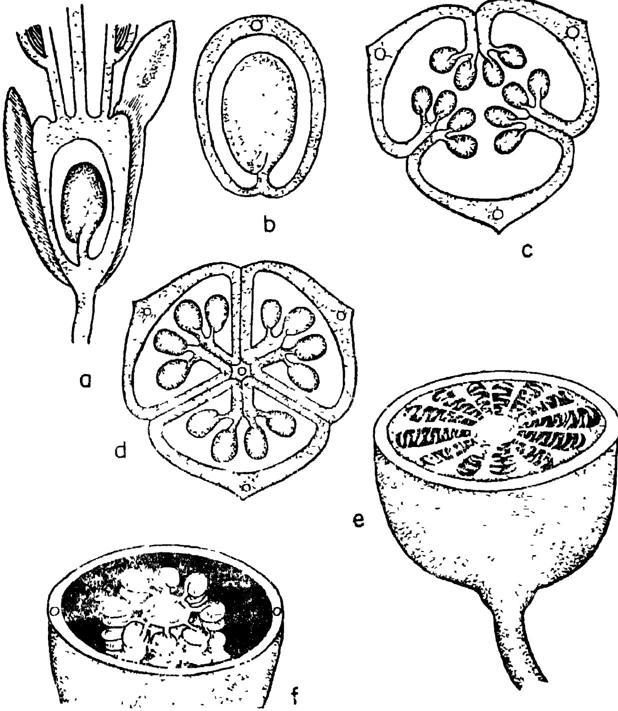
অমরা বিন্যাস (Placentation) ডিম্বকগুলি যে কলার দ্বারা ডিম্বাশয়ের প্রাচীর গাত্রে যুক্ত হয়, তাহাকে **অমরা** (placenta) বলে। নানা প্রকার অমরা বিন্যাস দেখা যায়—

১। **প্রান্তীয়** (marginal); ২। **প্যারায়টাল** (parietal); ৩। **অক্ষীয়** (axile); ৪। **উপরিগত** (superficial); ৫। **মুক্তমধ্য** (free central); ৬। **বেসাল** (basal)।

প্রান্তীয়—যদি একগর্ভপত্রী গর্ভাশয়ের অঙ্কীয় সন্ধিতে অমরা জন্মায়, তাহাকে প্রান্তীয় অমরা বিন্যাস বলে, যথা—মটর, বক, শিম, প্যাপিলিওনেসি গোষ্ঠী।

প্যারায়টাল—যদি এক প্রকোষ্ঠ নির্মিত গর্ভাশয়ে অমরা একাধিক গর্ভপত্রের সংযোগ স্থলে সাজান থাকে, তাহাকে প্যারায়টাল অমরা বিন্যাস বলে, যথা—কুমড়া, পেঁপে, শশা, শিয়ালকাঁটা।

অক্ষীয়—একাধিক গর্ভপত্র দ্বারা তৈয়ারি বহু প্রকোষ্ঠ যুক্ত গর্ভাশয়ের মধ্যস্থলে অক্ষের উপর অমরা সাজান থাকে, তাহাকে অক্ষীয় বলে, যথা—জবা, ধুতুরা, লেবু।
উপরিগত —ডিম্বাশয়ে বহু প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের চারিদিকে অমরা সাজান থাকে, যথা শালুক।



অমরা a বেসাল, b প্রান্তীয়, c—প্যারায়টাল, d—অক্ষীয়, e—উপরিগত, f—মুক্তমধ্য।

মুক্তমধ্য—ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থলে একটি অক্ষের চারিদিকে, ডিম্বকগুলি সাজান থাকিলে, তাহাকে মুক্তমধ্য বলে। ডিম্বাশয়ে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে যথা পিঙ্কফুল।
বেসাল –ফুলের মধ্যে পুষ্পাক্ষের উপর একটিমাত্র ডিম্বক থাকে। ডিম্বাশয়টি দুইটি গর্ভপত্রযুক্ত হইয়া তৈয়ারি হয়। ইহা সূর্যমুখীর পুষ্পিকায় পাওয়া যায়।

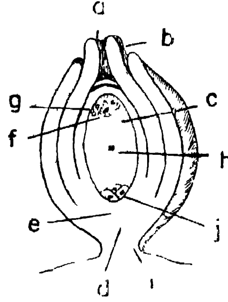
ডিম্বক (Ovule)

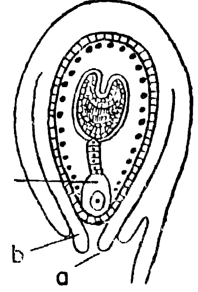
সচরাচর ডিম্বাশয়ের ভিতর যে দানার মত গোলাকার অংশ থাকে, তাহাকে ডিম্বক বলে। ডিম্বাশয়ের (Ovary) নিষেকের ফলে উত্তেজনা (stimulus) সৃষ্টি হয় এবং উহা ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বকটি বীজ সৃষ্টি করে। বীজের মধ্যে উদ্ভিদশিশু সুপ্তঅবস্থায় থাকে।

ডিম্বকের বিভিন্ন অংশ (Structure of ovule)

ডিম্বকের বাহিরে দুইটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একটি আবরণ থাকে। এই আবরণকে **ডিম্বক ত্বক** (integuments) বলে। বাহিরের ত্বকটি বহিঃডিম্বকত্বক এবং ইহার ভিতরে অন্তঃডিম্বকত্বক থাকে; ডিম্বকের বৃন্তকে **ডিম্বকনাড়ী** (funiculus) এবং

ডিম্বকনাড়ী যে কলার দ্বারা ডিম্বাশয়ের সহিত যুক্ত, তাহাকে **অমরা** (placenta) বলে। ডিম্বকের ভিতরের কলাকে **নিউসেলাস** বা **ভ্রূণপোষক** (nucellus) বলে। দুইটি ডিম্বক ত্বকের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে, ইহাকে **ডিম্বক-রন্ধ্র** (micropyle) বলে। ডিম্বকরন্ধ্রের বিপরীত দিকের অংশকে **ডিম্বকমূল** বা **চালাজা** (chalaza) বলা হয়। ডিম্বক-রন্ধ্রের নিচে, **ভ্রূণস্থলি** (embryosac) জন্মায়। ভ্রূণস্থলীর মধ্যে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় আটটি **নগ্ন-কোষ** জন্মায় (naked cells), ইহাদের কোষ প্রাচীর থাকে না। ডিম্বক-রন্ধ্রের নিকটে থাকে তিনটি কোষ, মধ্যস্থলের কোষটি **ডিম্বাণু** (ovum), ইহার দুইপাশে সাহায্যকারী **সহকারী কোষ** (synergids)। ডিম্বক-রন্ধ্রের বিপরীত দিকে তিনটি **প্রতিপাদ কোষ** (antipodal cells) এবং ভ্রূণ-স্থলির মধ্যস্থলে দুইটি কোষ মিলিত হইয়া, একটি **নির্নীত নিউক্লিয়াস** (secondary nucleus or definitive nucleus or polar body) বলে। ভ্রূণ-স্থলির ডিম্বাণু, সহকারী দুইটি কোষ এবং তিনটি প্রতিপাদ কোষের, নিউক্লিয়াস "n" বা হ্যাপলয়েড (haploid) কেবল ভ্রূণ-স্থলির মধ্যস্থলের নির্নীত-কোষ 2n বা ডিপলয়েড (diploid)।

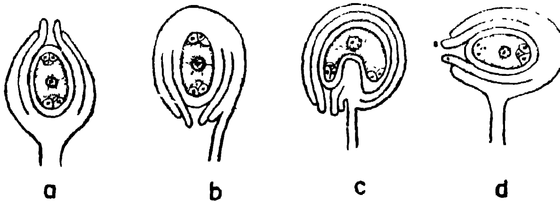




ডিম্বক a— ডিম্বক রন্ধ্র, b— ডিম্বক ত্বক, c – ভ্রূণ স্থলী, d—ডিম্বক নাড়ী, e—নিউসেলাস, f—ডিম্বাণু, g - সহকারী কোষ, h নির্ণীত নিউক্লিয়াস, i—অমরা, j—প্রতিপাদ কোষ। a - ডিম্বক রন্ধ্র, b ত্বক, c - ভ্রূণ।

বিভিন্ন প্রকারের ডিম্বক (Different types of ovules)

নিম্নলিখিত আকারের ডিম্বক পাওয়া যায়—১। **ঊর্ধ্বমুখী** (orthotropous), ২। **নিম্নমুখী** (anatropous), ৩। **পার্শ্বমুখী** (amphitropous) এবং ৪। **বক্রমুখী** (campylotropous)।



ডিম্বক a ঊর্ধ্বমুখী, b—নিম্নমুখী, c - বক্রমুখী, d – পার্শ্বমুখী।

ঊর্ধ্বমুখী—যদি ডিম্বক সোজাভাবে থাকে এবং ডিম্বক-রন্ধ্র, ডিম্বকমূল ও ডিম্বক নাড়ী একই সরল রেখায় জন্মায়, তাহাকে ঊর্ধ্বমুখী বলে, যথা পাণিমরিচ (polygonum), পান (piperaceae), অশ্বথ (urticaceae) গোত্রীয় উদ্ভিদ।

নিম্নমুখী—ডিম্বকটি বাঁকা থাকে এবং ডিম্বক-রন্ধ্রটি নিচের দিকে অবস্থিত। ডিম্বকবৃন্তের পাশে ডিম্বক রন্ধ্রটি থাকে, যথা মটর, ছোলা, রেড়ি।

পার্শ্বমুখী—এই প্রকার ডিম্বক, ডিম্বক বৃন্তের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে। ডিম্বকের লম্ব অক্ষটি, যাহাতে ডিমকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল থাকে, উহা বৃন্তের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে, যথা ক্ষুদিপানা, পপি।

বক্রমুখী—এই প্রকার ডিম্বকে, ডিম্বক রন্ধ্র, ডিম্বক-নাড়ী ও ডিম্বকমূল পাশাপাশি থাকে এবং ডিম্বকটি বাঁকিয়া ঘোড়ার খুরের মত দেখায়, যথা সরিষা, মূলা, কৃষ্ণকলি।

ফুল হইল রূপান্তরিত বিটপ (Flower is a modified shoot)

ফুলকে স্পোরবহনকারী রূপান্তরিত বিটপ বলা যাইতে পারে। সবুজ বিটপ, যে ভাবে পর্বে পাতা বহন করে, ফুলের মধ্যে স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষে সেই ভাবে সাজান থাকে। শালুক ও চাঁপা ফুলে পাপড়ি ইত্যাদি সর্পিল আকারে সাজান এবং বেশীর ভাগ ফুলের অংশগুলি চক্রাকারে সাজান থাকে।

ফুল যে রূপান্তরিত বিটপ তাহা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করে ঃ—

১। **সমগণীয় পুষ্প মুকুল** (homologous flower bud)—ফুলের মুকুল পত্রমুকুলের মত কাক্ষিক বা অগ্রস্থ হয়। অ্যাগেভ, আনারস ইত্যাদিতে ফুলের স্থানে বালবিল (bulbil) জন্মায়। বালবিল মাটিতে পড়িয়া নূতন গাছ সৃষ্টি করে।

২। পুষ্পাক্ষের কোন কোন ক্ষেত্রে পর্ব ও পর্বমধ্য দীর্ঘ হয়—শ্বেত হুড়হুড়ের ফুলে বৃতি ও দলের মধ্যে পর্বমধ্য ছোট কিন্তু দল ও পুংকেশরের মধ্যের পর্ব দীর্ঘ, ইহাকে **পুংধর** (androphore) বলে এবং পুংধরের পরের পর্ব অর্থাৎ পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মধ্যবর্তী পর্বও বেশ দীর্ঘ, ইহাকে **স্ত্রীধর** (Gynophore) বলে। পুংধর ও স্ত্রীধর উভয়কে একসঙ্গে বলে **পুং-স্ত্রীধর** (androgynophore)।

৩। হুড়হুড়ের ফুলে **স্ত্রীধর** (gynophore) দেখা যায় এবং গর্ভাশয়টি বেশ দীর্ঘ অক্ষের উপর অবস্থিত।

৪। কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে কান্ডটি ফুলের স্ত্রীস্তবকের মধ্য দিয়া বর্ধিত হইয়া উপরদিকে সবুজ পাতা বহন করে। ইহাতে প্রমাণিত হয় ফুল মধ্যস্থ অক্ষটি কান্ডের রূপান্তর ছাড়া কিছু নহে, যথা বন্য গোলাপ।

৫। পুষ্পাক্ষের উপর বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ইত্যাদির বিন্যাস, কান্ড বা শাখার পত্র বিন্যাসের মত। একান্তর বিন্যাস শালুক, চাঁপা ইত্যাদিতে দেখা যায়, আবর্ত বিন্যাস অধিকাংশ ফুলের বৃত্যংশ, পাপড়ি ইত্যাদিতে দেখা যায়।

পাতার সহিত বৃত্যংশ ও ফুলের অন্যান্য অংশের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখা যায় ঃ

বৃত্যংশ, পাপড়ি ইত্যাদির আকার, গঠন ও শিরা সবুজ পাতার মত।

মুসেন্ডা ফুলে একটি বৃত্যংশ বেশ বড় এবং পাতার মত।

পদ্মফুলে বৃত্যংশগুলি ভিতরদিকে পাপড়ি ও পাপড়িগুলি পুংকেশরে রূপান্তরিত হয়।

বন্য গোলাপে (wild rose) মাত্র পাঁচটি পাপড়ি কিন্তু চাষের ফলে বহু পুংকেশর পাপড়িতে পরিণত হয়।

বিশেষ প্রকার জবা ও পদ্মতে পুংকেশর (কতকগুলি) পাপড়িতে রূপান্তরিত হয়।

সর্বজয়ার পরাগধানীর কিছু অংশ এবং গর্ভদণ্ডটি পাপড়ির আকার ধারণ করে। ইহাকে দলসদৃশ বলে।

মটরশুঁটির গর্ভাশয় ভাঁজ করা পাতার মত দেখায়।

পরাগসংযোগ (pollination)

সুপক্ক পরাগধানী **ফাটিয়া পরাগ** বা রেণু (pollen) বাহির হয়। **পরাগধানী** হইতে **গর্ভমুণ্ডের** উপর পরাগ আসিয়া পড়ে। ইহাকে **পরাগসংযোগ** বলে। দুই প্রকার সংযোগ হয় —১। **স্বপরাগ সংযোগ** (self-pollination), ২। **ইতর পরাগ সংযোগ** (cross pollination)।

স্বপরাগ সংযোগ—যদি পরাগ বা রেণু একই ফুলের পরাগধানী হইতে সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়, অথবা একই গাছের উপর এক ফুলের পরাগ আর একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে, তাহাকে স্বপরাগ সংযোগ বলে।

ইতর পরাগ সংযোগ—যদি একই জাতের একটি ফুল হইতে পরাগ অন্য গাছের (সেই জাতের) গর্ভমুণ্ডে পড়ে, তাহাকে ইতর পরাগ সংযোগ বলে। ইতর পরাগ সংযোগ একলিঙ্গ (dioecious) ফুলে হয়, যথা তাল।

কয়েকটি উপায়ে স্বপরাগ সংযোগ উদ্ভিদে ঘটে (Contrivances for self-pollination)

সমপরিণতি (homogamy)—যখন একই সময়ে পুংকেশর ও গর্ভকেশর সুপক্ক হয়, তখন একই ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ হয়, ইহাকে সমপরিণতি বলে, যথা জবা, সূর্যমুখী। এই সকল ফুলের দীর্ঘ গর্ভদণ্ডটি বাঁকিয়া পরাগধানীর নিকটে আসে এবং পরাগ সংযোগ ঘটায়।

শিয়ালকাঁটার পাপড়িগুলি এমনভাবে ফুলকে বন্ধ রাখে যাহাতে বাহিরের পরাগ প্রবেশ করিতে পারে না এবং পাপড়ির ভিতর হইতে পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়িয়া স্বপরাগ সংযোগ হয়।

নয়নতারা, গন্ধরাজ, রঙ্গন ইত্যাদির দলের সরু নলের মধ্যে পরাগধানী যুক্ত থাকে। গর্ভকেশরটি দীর্ঘ হইয়া দলের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিবার সময় গর্ভমুণ্ডে পরাগ লাগিয়া যায়। এইভাবে ইহাদের স্বপরাগ সংযোগ হয়।

ক্লিষ্টগ্যামী (Cleistogamy)—কোন কোন ফুল কখনও খুলে না সুতরাং স্বপরাগ সংযোগ হয়। কমিলাইনার (কানসিরা) ভূনিম্নস্থ ফুল ও দোপাটিতে এইভাবে পরাগ সংযোগ হয়।

ইতর পরাগ সংযোগ ঘটাইবার উপায়: (Contrivances for cross pollination)

১। **একলিঙ্গতা** (unisexual flowers)—যে সকল উদ্ভিদের পুংপুষ্প অথবা কেবল স্ত্রীপুষ্প জন্মায় তাহাতে ইতর পরাগ সংযোগ হয়, যথা তাল, পেঁপে, তুঁত।

অনেক উদ্ভিদে একই গাছে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প জন্মায়, ইহাদের ইতর পরাগ সংযোগ হয় কিন্তু কিছু স্বপরাগ সংযোগও হইতে পারে, যথা ভুট্টা, কুমড়া, শশা, রেড়ি।

বিষম পরিণতি (dichogamy)—যখন দ্বিলিঙ্গ পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন সময়ে সুপক্ক হয়, তখন ইতর পরাগ সংযোগ হয়। যদি প্রথমে পুংকেশর পাকে এবং গর্ভকেশর কাঁচা থাকে (immature), তখন ঐ ফুলকে **প্র-পুংপরিণতি** বলে (protandry), যথা জবা, তুলা, গাঁদা, গোলাপ, সূর্যমুখী, ঢেঁড়স। যদি গর্ভকেশর আগে সুপক্ক হয় এবং পুকেশর কাঁচা থাকে তাহাকে **প্র-স্ত্রীপরিণতি** (protogyny) বলে, যথা কৃষ্ণকলি, চাঁপা, বট, অশ্বত্থ, বেগুন, সরিষা, আতা।

স্বসঙ্গম বিরোধী (Herkogamy) এই সকল ফুলের আকার এমন হয় যে স্বপরাগ সংযোগ হয় না। কোন ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দূরে দূরে থাকে, সুতরাং স্বপরাগ সংযোগ হয় না, যথা ঘেঁটু ফুল।

অর্কিড, আকন্দ ফুলে পরাগ একত্রে মিলিত হইয়া পলিনিয়া (pollinia) সৃষ্টি করে, ইহাতে মৌমাছি ছাড়া পরাগ সংযোগ হয় না।

অসম পুংকেশর (Heterostyly)—কোন কোন ফুলে দুই রকমের পুংকেশর হয়, কতকগুলি পুংকেশরের সূত্র লম্বা আর কতকগুলির সূত্র ছোট। গর্ভকেশরের গর্ভদণ্ড লম্বা ও ছোট হয়। লম্বা পুংকেশরের পরাগ লম্বা গর্ভকেশর ফুলে পড়ে এবং ছোট গর্ভকেশরের মুণ্ডে ছোট পুকেশরের পরাগ পড়ে। ইহাকে **দ্বিরূপতা** (dimorphism) বলে, যথা আমরুল, পাণিমরিচ। কয়েকটি ফুলে তিন প্রকার পুংকেশর থাকে, লম্বা, মধ্যম ও ছোট। ইহাকে **ত্রিরূপতা** (trimorphism) বলে, যথা আমরুল, কামরাঙা ফুল।

স্ব-বন্ধ্যা (self-sterility)—কয়েক প্রকার অর্কিড, চা-ফুল ও ঝুমকোলতায় স্বপরাগ সংযোগ বিফল হয় কিন্তু ইতর পরাগ সংযোগ কার্যকরী হয়। ইহাকে স্ব-বন্ধ্যা বলে।

স্বপরাগ সংযোগ ও ইতর পরাগ সংযোগের তুলনা (সুবিধা ও অসুবিধা) Demerits and merits of self and cross pollination.

স্বপরাগ সংযোগ	ইতর পরাগ সংযোগ
১। ইহার পরাগ সংযোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী	১। ইহার পরাগ সংযোগ বহু বাধা পায়। পতঙ্গ, বায়ু ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।
২। ইহার ফলে একই প্রকার গুণ শিশু উদ্ভিদ পাইয়া থাকে।	২। ভিন্ন উদ্ভিদের গুণ শিশু উদ্ভিদ লাভ করে।
৩। একই গুণলাভ করিয়া শিশু উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন হয়।	৩। ভিন্ন গুণ পাইয়া শিশু উদ্ভিদ অধিকতর শক্তি সম্পন্ন হয়।
৪। পতঙ্গ ইত্যাদিকে আকৃষ্ট করিতে হয় না বলিয়া দৈহিক ক্রিয়া খুব অধিক করিতে হয় না।	৪। পতঙ্গ বায়ু ইত্যাদির জন্য ফুলকে নানারূপ সাজ সজ্জা করিতে হয় এবং ইহাতে অধিক দৈহিক ক্রিয়া হয়।

পরাগ সংযোগের বাহক (Agencies for Pollination)

স্বপরাগ সংযোগ অথবা ইতর পরাগ সংযোগ দুইই হইবার জন্য বাহক আবশ্যক। পরাগ ধানী হইতে পরাগ স্বয়ং স্থানান্তরিত হয় না। প্রধান প্রধান বাহক হইল, বায়ু, পতঙ্গ, জল, পাখী ও কয়েকটি অন্য প্রাণী। বায়ু পরাগী (Anemophilous)—যে সকল ফুলের পরাগ সংযোগ বায়ুর সাহায্যে হয়, তাহাকে বায়ুপরাগী বলে। এই সকল ফুল, আকারে ছোট, রং থাকে না এবং গন্ধ ও মধু না থাকিতে পারে। পরাগধানী লম্বা সূত্রে থাকে এবং সর্বদিকে ঘুরিতে থাকে। বাতাস হইতে পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়ে।

এই সকল ফুলে পরাগ বা রেণু, আকারে ছোট, পরিমাণে প্রচুর এবং হালকা হয়। পাইন গাছের রেণুর বাতাসে ভাসিবার জন্য দুইটি ডানার মত অংশ থাকে। এই প্রকার ফুলের গর্ভমুণ্ড পালকের মত হইয়া বাতাস হইতে পরাগ ধরিয়া থাকে। ধান, ভুট্টা, ঘাস জাতীর উদ্ভিদ, বায়ুপরাগী। পতঙ্গপরাগী (entomophilous)—রঙীন, বড়ফুল বেশীর ভাগ, মৌমাছি, প্রজাপতি, বোলতা ইত্যাদি নানা রকমের পতঙ্গ দ্বারা পরাগ সংযোগ করিয়া থাকে। পতঙ্গ পরাগী ফুল পোকা, মাকড় পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার জন্য গন্ধ, মধু ইত্যাদি জন্মায়। দিনের বেলা রঙ ও বড় আকার দ্বারা পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় কিন্তু রাত্রি বেলা গন্ধ দ্বারা পতঙ্গ ফুলের মধ্যে আসে। এক ফুল হইতে অপর ফুলে যাইয়া' দেহ হইতে পতঙ্গ গর্ভমুণ্ডে পরাগ ত্যাগ করে। বেল ফুল, যুঁই, শেফালী, গন্ধরাজ, হাসনাহানা, রজনীগন্ধ্যা হইল পতঙ্গ পরাগী। বহু ক্ষেত্রে অনেক ছোট ফুল একত্রে পুষ্পমঞ্জরী সৃষ্টি করিয়া পতঙ্গ আকর্ষণ করে। বহুফুলে পতঙ্গ মধু খাইতে যাইয়া পরাগ সংযোগ করিয়া থাকে। পদ্ম, শালুক যদিও জলে জন্মায়, তাহারা পতঙ্গ পরাগী।

জলপরাগী (Hydrophilous)—কয়েকটি জলজ উদ্ভিদ জলের স্রোতের সাহায্যে পরাগ সংযোগ করিয়া থাকে। জলের উদ্ভিদ হইলেই যে জলপরাগী হইবে তাহা নহে, পূর্বে বলা হইয়াছে, পদ্ম, শালুক পতঙ্গপরাগী।

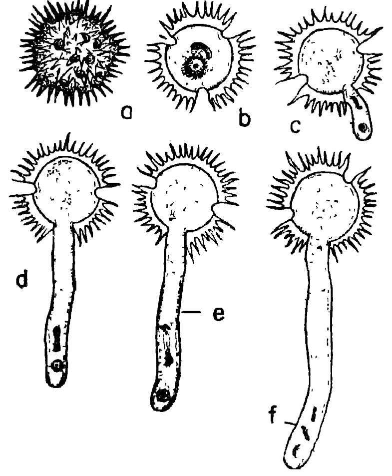
পাতাশেওলা (vallisneria) জলের ভিতর দুই রকমের একলিঙ্গ ফুল জন্মায়। পুং-পুষ্পের বৃন্ত পৃথক হইয়া ফুলগুলি জলে ভাসে এবং পরাগ বাহির হইয়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের বৃন্ত পাকানো থাকে এবং পরিণত অবস্থায় প্যাচ খুলিয়া স্ত্রীপুষ্প জলের উপর দিকে উঠে এবং জলের সাহায্যে গর্ভমুণ্ডে পরাগ পড়ে। পুনঃবার পরাগ সংযোগ হইয়া গেলে পুষ্পবৃন্ত প্যাচাইয়া নিচে যায় এবং ফল ও বীজ সৃষ্টি করে। ঝাঁজিও জলপরাগী উদ্ভিদ।

অন্যপ্রাণীর দ্বারা পরাগ সংযোগ—কচুগাছের পরাগ সংযোগ শামুকের দ্বারা হয়। শিমুল, পলাশ প্রভৃতি ফুলে ময়না ইত্যাদি পাখীর দ্বারা হয়। ইহা পক্ষীপরাগী বলে।

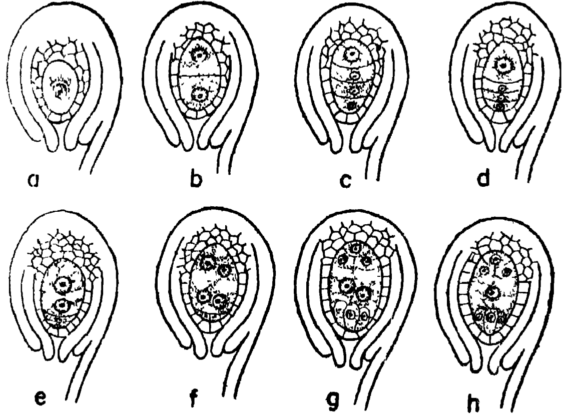
নিষেক (fertilization)

পরাগ সংযোগের পর **নিষেক** (fertilization) হয়। নিষেক প্রক্রিয়া একটি **পুং-জনন কোষ বা শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের** (Sperm nucleus or male gamete) সহিত **ডিম্বাণুর (ovum)** মিলন হইয়া থাকে। নিষেকের পূর্বে পরাগ গর্ভমুণ্ডে

পড়িলে পরাগ হইতে একটি সূক্ষ্ম নালিকা বাহির হয়। গর্ভমুণ্ড হইতে নিঃসৃত বস্তুর জন্য পরাগ উদ্দীপ্ত হয় এবং পরাগের উপর যে রেণুরন্ধ্র থাকে (germ pore) তাহা হইতে পরাগের অন্তস্তকটি একটি নালিকার সৃষ্টি করে। এই নালিকাকে **পরাগ-নালিকা** (pollen-tube) বলা হয়। পরাগের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস থাকে, তাহা পরাগ সংযোগের সময় বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। একটিকে **নালিকা-নিউক্লিয়াস** (tube nucleus) বলে। ইহা আকারে বড়। অপর নিউক্লিয়াসটি আকারে ছোট, ইহাকে **জনন নিউক্লিয়াস** (generative nucleus) বলে। পরাগ নালিকা গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং নালিকার ভিতর নালিকা নিউক্লিয়াস ও জনন নিউক্লিয়াস দুইটিও ডিম্বাশয়ের দিকে অগ্রসর হয়। নালিকা নিউক্লিয়াসটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয় কিন্তু জনন নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া দুইটি **শুক্রাণু নিউক্লিয়াস** (sperm nucleus) গঠন করে। পরাগ নালিকার অগ্রভাগ ডিম্বক রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। নালিকা প্রথমে ভ্রূণপোষক কলা বা নিউসেলাস ভেদ করিয়া ভ্রূণথলির প্রাচীর মধ্য দিয়া গর্ভযন্ত্রের সংস্পর্শে আসে। পরাগ নালিকার অগ্রভাগ মুক্ত হয় এবং শুক্রাণু জনন কোষ ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। এই মিলনকে নিষেক (fertilization) বলে। নিষেকের ফলে **উস্পোর** (oospore) জন্মায়। অপর শুক্রাণু নিউক্লিয়াসটি লুপ্ত হয় এবং ইহার ফলে যে বীজ জন্মায় তাহার বীজপত্র খাদ্য সঞ্চয় করিয়া বেশ মোটা হয়, যেমন ছোলা, মটর। ইহাকে **অসস্যলবীজ** (exalbuminous) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শুক্রাণু



মাইক্রোস্পোরজেনেসিস (Microsporogenesis)
a পরাগ, b—পরাগ হইতে, c, d, e, f—পুং জনন কোষ, পরাগ নলের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে।



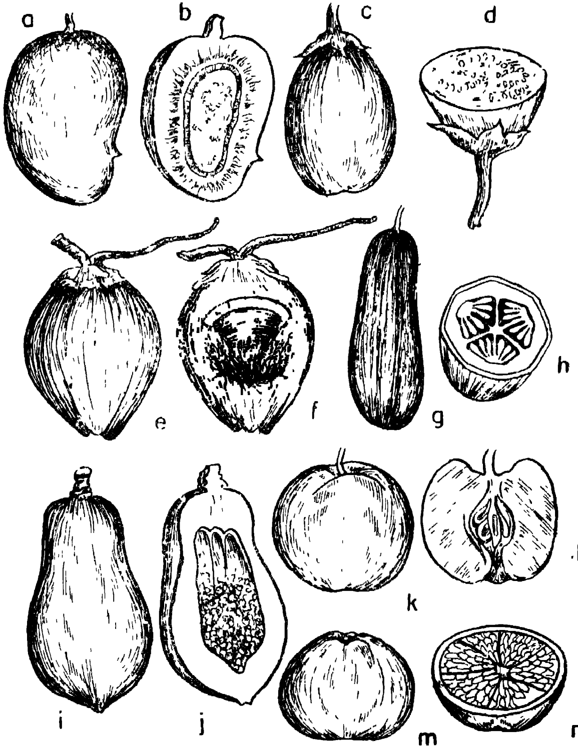
মেগাস্পোরোজেনেসিস (Megasporogenesis)
a, b, c, d, e, f, g, h—ভ্রূণ থলির মধ্যে ডিম্বাণু, সহকারী কোষ, প্রতিপাদ কোষ জন্মাইতেছে।

নিউক্লিয়াস ভ্রূণস্থলির মধ্যভাগের নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। ইহাকে দ্বৈত নিষেক (double fertilization) বলে। নির্ণীত নিউক্লিয়াস পূর্বেই (2n) ছিল এবং দ্বিতীয় নিষেকের ফলে, ইহার ক্রমোজোম সংখ্যা (3n) হয়। ইহা হইতে **সস্য নিউক্লিয়াস** (endosperm nucleus) জন্মায় এবং যে কলা উৎপন্ন হয় তাহাকে সস্য (endosperm) বলে। ইহার ফলে যে বীজ জন্মায়, তাহার খাদ্য বীজপত্রের বাহিরে থাকে এবং এইরূপ বীজকে বলে **সস্যল বীজ** (albuminous or endospermic), যথা রেড়ি, ধান, গম, ভুট্টা।

ভ্রূণথলির সহকারী কোষ দুইটি শুক্রাণুর মিলনে কেবলমাত্র সাহায্য করে এবং পরে লুপ্ত হয়। নিষেকের পরে ভ্রূণস্থলির প্রতিপাদ কোষগুলি লুপ্ত হয়। ইহাদের বিশেষ কোন কাজ নাই।

ফল (Fruits)

নিষেকের পর ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। ফলের ভিতর এক বা একাধিক বীজ



ফল: a=ড্রুপ ও b-ছেদ, c—বেরি ও d—ছেদ, e-ড্রুপের রূপান্তর ও f—ছেদ, g-পেপো, h—পেপোর ছেদ, i—বেরি, j-বেরির ছেদ, k—আপেলের পোম ও l—ছেদ, m—হেসপেরিডিয়াম, n—ছেদ।

জন্মায়। ডিম্বকটি (ovule) বীজে পরিণত হয়। ফল নানাপ্রকার দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ডিম্বাশয় ফল সৃষ্টি করে। ইহাকে **প্রকৃত ফল** (true fruit) বলে, যথা আম, জাম। যদি ডিম্বাশয়ের সহিত ফুলের অন্য অংশও ফল সৃষ্টি করে, তাহাকে **অপ্রকৃত** (false) ফল বলে, যথা বেগুন, টম্যাটো।

একটি আদর্শ ফলে, তিনটি অংশ লইয়া **ফলত্বক** গঠিত। ডিম্বাশয়ের প্রাচীর **ফলত্বক** (pericarp) সৃষ্টি করে। আমের ফলত্বকের বাহিরের খোসাকে **বহিঃত্বক** (epicarp), ভিতরের রসাল অংশ **মধ্যত্বক** (mesocarp) এবং কঠিন আঁটিকে **অন্তঃত্বক** (endocarp) বলে। অন্তঃত্বকের ভিতরে থাকে বীজ।

সকল প্রকার ফলে তিনটি ত্বক থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যত্বক ও অন্তঃত্বক মিলিত থাকে, যথা বেগুন, কুমড়া, লাউ।

সাধারণভাবে ফলকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়—(১) **সরল**, (২) **পুঞ্জীভূত** এবং (৩) **যৌগিক**।

সরল—যখন ফুলের ডিম্বাশয়টি রূপান্তরিত হইয়া একটি ফল সৃষ্টি করে, তাহাকে সরল ফল বলে। এই প্রকার ফলের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক। ফলত্বকের গঠন অনুসারে, ইহাদের দুইভাগে ভাগ করা হয়, যখন **ফলত্বক বা পেরিকার্প** শুষ্ক থাকে, তাহাকে **নীরস** বা ড্রাই ফল এবং যখন পেরিকার্প রসালো হয়, তাহাকে **সরস** বা **ফ্লেসি** ফল বলে। নীরস ফলকে আবার পরিণত অবস্থায়, ফলত্বকের বিদারণ অনুসারে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ফলত্বক ফাটিলে, উহা **বিদারী** বা **ডেহিসেন্ট** এবং ফলত্বক না ফাটিলে, **অবিদারী** বা **ইনডেহিসেন্ট** বলে।

সরল, নীরস, বিদারী-ফল—এই সকল ফল পাকিলে ফলত্বক এক বা একাধিক নির্দিষ্ট সন্ধিতে বিভক্ত হইয়া বীজের বিস্তারে সাহায্য করে—(১) **লেগুম বা পড** বা **শিম্ব**—মটরশুঁটি, বক, অপরাজিতা, শিম প্রভৃতি গাছের ফল এই প্রকার অর্থাৎ শিম্ব বা লেগুম। ইহারা এক গর্ভপত্রী, অধিগর্ভ, এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট গর্ভকোষ হইতে সৃষ্টি হয়। পাকিলে, এই ধরনের ফলে দুই ধারের দুই সন্ধি ধরিয়া বিদারণ হয়।

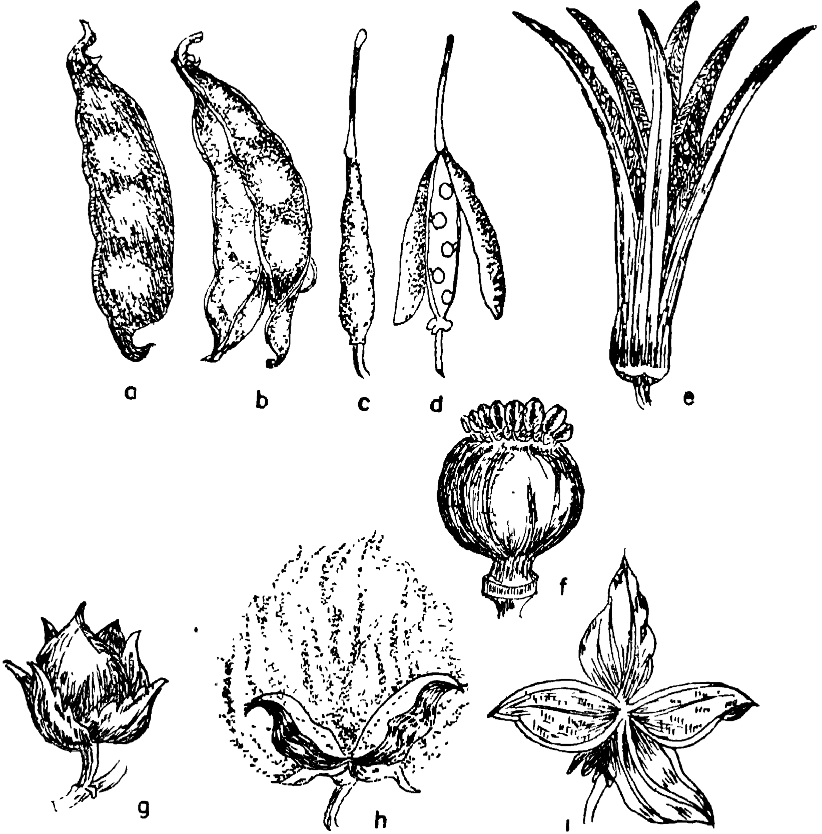
(২) **ফলিক্ল**—লেগুমের ন্যায় যদিও ইহারা একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু বিদারণ কেবলমাত্র একটি পুরঃসন্ধিতে হয়, যথা আকন্দ, চাঁপা।

(৩) **ক্যাপসুল**—ইহা দুই বা ততোধিক যুক্ত গর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে সৃষ্টি হয়; ইহার ডিম্বাশয়ের মধ্যে দুই বা ততোধিক প্রকোষ্ঠ থাকে। পরিণত অবস্থায় এই প্রকার ফল গর্ভপত্রের সংযোগস্থল বরাবর বিদারিত হয়, যথা ঢেঁড়শ, তূলা, ধুতুরা।

(৪) **সিলিক্যুয়া**—এই প্রকার ফল সরিষা জাতীয় উদ্ভিদে পাওয়া যায়। ইহা দুই যুক্তগর্ভ পত্রী ডিম্বাশর হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের ডিম্বাশয় দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত। পরিণত অবস্থায়, এই দুইটি গর্ভপত্রী নিচের দিক হইতে ক্রমশঃ উপরের দিকে বিদারিত হয়, কিন্তু মধ্যকার প্রাচীর থাকিয়া যায় এবং বীজগুলি দুই ধারের অমরায় লাগিয়া থাকে।

সিলিকুয়া জাতীয় ফল যখন ছোট ও বেশ চওড়া হয়, তখন ইহাকে **সিলিকিউলা** বলে, যথা আইবেরিস। সরল, নীরস, অবিদারী ফল—ইহাদের ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হয় না।

(১) **এ্যাকীন**—ইহারা ক্ষুদ্র, নীরস ও অবিদারী এবং ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। ইহারা একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ, ডিম্বাশয় হইতে জন্মায়, যথা কৃষ্ণকলি, সচরাচর ইহারা এক গোছা ফল সৃষ্টি করে।

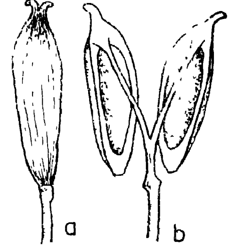


বিদারী. a—লেগুম, b—লেগুমের ছেদ, c—সিলিকুয়া, d—উহার ছেদ, e—ক্যাপসুল f—ক্যাপসুল, g—তুলার ক্যাপসুল, h—তুলা বাহির হইতেছে, i—ক্যাপসুল ফাটিয়াছে।

(২) **ক্যারিয়প্সিস**—ইহা এ্যাকীন জাতীয় ফল এবং বীজত্বক ফলত্বকের সহিত যুক্ত থাকে, যথা ধান, গম, ভুট্টা। ভুট্টার স্ত্রীপুষ্পমঞ্জুরির অক্ষের উপর প্রত্যেকটি দানাই হইল ক্যারিয়প্সিস ফল।

(৩) **সামারা**—ইহা প্রকৃতপক্ষে ডানাযুক্ত এ্যাকীন জাতীয় ফল। এই ডানা ফলত্বকের বাহিরের স্তর প্রসারিত হইয়া সৃষ্টি হয়। সচরাচর ইহার মধ্যে একটি বীজ থাকে, যথা মাধবীলতা, গর্জন গাছ।

(৪) **সাইজোকার্প**—এই জাতীয় ফলে দুইটি গর্ভপত্রের, প্রতিটির গর্ভকোষের প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ একটি বীজ থাকে। পরিণত অবস্থায় ফলত্বক ফাটিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়, যথা ধনিয়া, মৌরি।

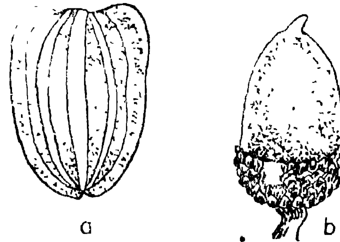


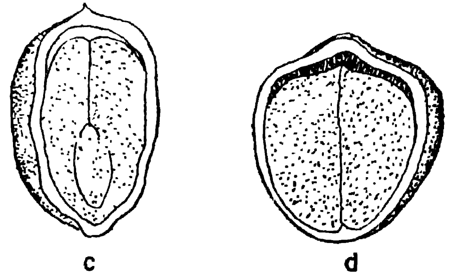
a— মৌরির ক্রীমোকার্প, b—ছেদ।

(৫) **নাট**—এই জাতীয় ফল যদিও বহুগর্ভপত্রী, অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু ইহার একটি গর্ভপত্র কার্যকরী থাকে এবং একটিমাত্র প্রকোষ্ঠে একটি বীজ থাকে, ইহার ফলত্বক শুষ্ক ও কাষ্ঠল হয়, যথা কাজুবাদাম, ওক, চেসনাট। চিনা বাদাম নাট নহে। লিচু নাট জাতীয় ফল কিন্তু লিচুর রসাল অংশ এরিল (aril), ইহা ডিম্বক নাড়ী হইতে গঠিত হইয়া বীজকে আবৃত করে।

সরল, সরস ফল—এই প্রকার ফলের ত্বক রসাল হয় এবং পরিণত অবস্থায় ফলত্বক ফাটে না। ইহাদের প্রধান প্রধান ফল দেওয়া হইল :—

(১) **ড্রুপ**—আম, পিচফল, জলপাই, কুল ইত্যাদি ফলের ত্বকের, বহিঃত্বক পাতলা ও খোসাকৃতি, মধ্যত্বক শাঁসালো (যাহা আমরা খাই) এবং অন্তঃত্বক শক্ত এবং কাষ্ঠল (আঁটি)। ইহারা একগর্ভপত্রী, অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয় এবং ডিম্বকোষে একটি মাত্র বীজের সৃষ্টি হয়। নারিকেল (ডাব) রূপান্তরিত ড্রুপ কারণ ইহার মধ্যত্বক তন্তুময় বা ছোবরা (fibrous) এবং নারিকেলের শাঁস হইল বীজের এনডসপ্রাম (endosperm)। ডাবকে ড্রুপের মত বা ড্রুপেসাস বলে।





a—সূর্যমুখীর সিপসেলা. b—নাট, c—সূর্যমুখীর ফলের ছেদ, d—নাটের ছেদ।

(২) **বেরি**—এই ফল একটি গর্ভ-পত্র অথবা একাধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে জন্মায়। ইহার বহিঃত্বক পাতলা, বহুবীজ মধ্যত্বক ও অন্তঃ-ত্বকের মিলিত অংশে থাকে ; যথা বেগুন, টম্যাটো, কলা, আঙুর। বেরি, যথা বেগুন, টম্যাটো পেঁপে, খেজুর ইত্যাদি অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে জন্মায়। কলা, পেয়ারা, অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে সৃষ্টি হয়।

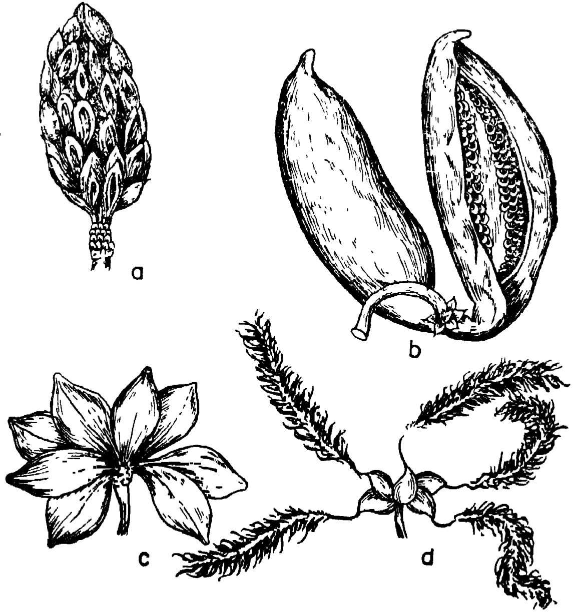
(৩) **পেপো** - ইহা বেরী জাতীয় ফল। বহিঃফলত্বক শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। ইহা অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয়, যথা কুমড়া, লাউ, তরমুজ।

(৪) **পোম**—দুই বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে উৎপন্ন হয়। পুষ্পাক্ষ বর্ধিত হইয়া ডিম্বকোষ ঘিরিয়া, এই প্রকার ফলের বাহিরের শাঁসালো অংশ জন্মায়। ফলত্বকের বাহিরের অংশ রসাল কিন্তু ভিতরের অংশ মোটামুটি শক্ত থাকে ; শক্ত অংশে বীজ থাকে, যথা আপেল, ন্যাসপাতি।

(৫) **হেসপেরিডিয়াম**—পাতিলেবু, কমলালেবু, বাতাবিলেবু প্রভৃতি ফলে বহিঃত্বক ও মধ্যত্বক একত্রিত হইয়া চামড়ার মত আবরণ সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে রসাল অন্তঃত্বক থাকে, যাহা মানুষ খাইয়া থাকে। ইহা যুক্তগর্ভপত্র, অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে লেবুর রসাল অংশ, ফলের অন্তঃত্বকের রোম (hairs)।

(৬) **ব্যালউষ্টা** বেদানা, ইত্যাদি ফল, বহু প্রকোষ্ঠ-যুক্ত, অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে জন্মায়। ফলত্বক কঠিন এবং দুই সারিতে গর্ভপত্র সাজান থাকে। বীজত্বক রসাল এবং ইহা আমরা খাইয়া থাকি।

(৭) **অ্যাম্ফিসারকা**—বেল ফল ইহার উদাহরণ। ইহা অধিগর্ভ, বহু প্রকোষ্ঠ যুক্ত ডিম্বাশয় হইতে জন্মায়। ইহার ফলত্বক কাষ্ঠল। অমরা ও অন্তঃফলত্বক রসাল ও খাদ্য রূপে ব্যবহার হয়।

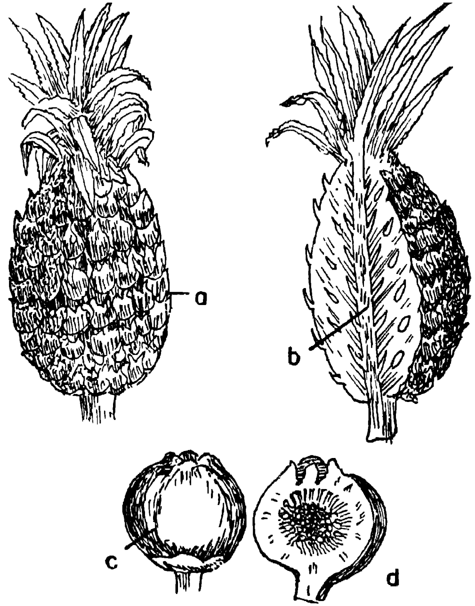


- চাঁপাফুলের ফল ফলিকল, b—আকন্দের ফলিকল, c—কাঁঠালিচাঁপার বেরি, d—এ্যাকীন।

পুঞ্জীভূত ফল—এই জাতীয় ফল একটি মাত্র ফুলের বহুমুক্ত গর্ভপত্রী ডিম্বাশয় (apocarpons gynaecium) হইতে জন্মায়। ইহার ফলে অনেকগুলি ছোট ছোট ফল গুচ্ছাকারে একত্রিত থাকে। বেশীর ভাগ পুঞ্জীভূত ফল শাঁসালো হয়। পুঞ্জীভূত ফলকে ইটারিও বলে। অ্যাকিনের ইটারিও, যথা ছাগলবটি। বেরির ইটারিও, যথা কাঁঠালি চাঁপা। ফলিকলের ইটারিও, যথা আকন্দ, চাঁপা। আতা ও নোনা ফল, পুঞ্জীভূত কিন্তু ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম কারণ একটি ফল জন্মায়।

যৌগিকফল—যখন বহু পুষ্পমঞ্জরীর ফুল, একটি ফল সৃষ্টি করে, তাহাকে যৌগিক ফল বলে। আনারসের অবৃন্তক ফুলগুলি মঞ্জরীদণ্ডে সাজান থাকে এবং ডিম্বাশয়গুলি ও মঞ্জরীদণ্ডটি, পুষ্ট ও শাঁসাল হইয়া ফলের সৃষ্টি করে। এই

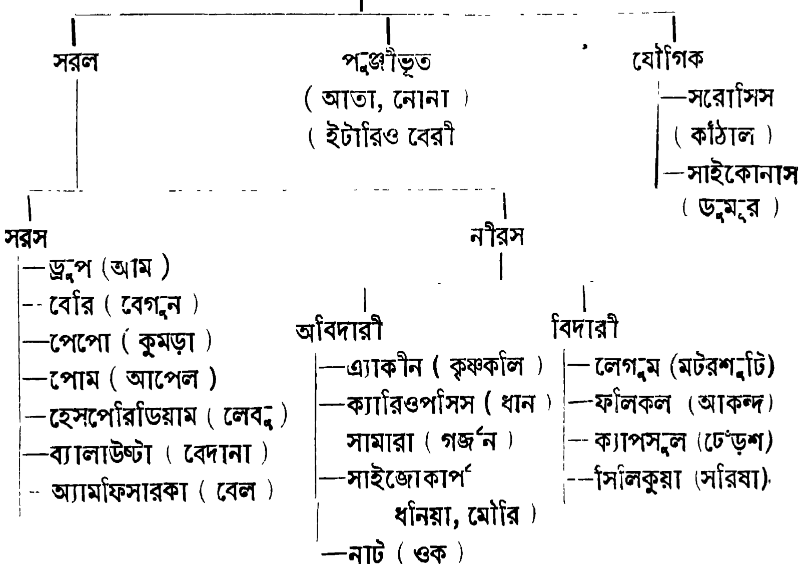
ফলকে **সরোসিস** বলে। ফলের উপরিভাগে ছয়কোণা দাগগুলি, এক একটি ফুলের চিহ্ন স্বরূপ।



যৌগিক · a—আনারসের সরোসিস, b—উহার ছেদ, c—ডুমুরের সাইকোনাস d—ডুমুরের ছেদ।

কাঁঠাল আর একটি সরোসিসের উদাহরণ। কাঁঠালের বহুফুলের **গর্ভকেশরের উপর** অংশগুলি একত্রে কণ্টকিত খোসা সৃষ্টি করে। পুষ্পদণ্ডটি **শক্ত** এবং মোটা। ইহার রসালো মঞ্জরীপত্রের কক্ষে উৎপন্ন ফুলের কোমল পেরিএন্হ (perianth) এক একটি প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করে। ইহার ভিতর (ডিম্বাশয়ের) একটি করিয়া বীজ থাকে। ডুমুরের **ফল** বহু ফুল হইতে জন্মায়। ইহার পুষ্পমঞ্জরীর আধার শাঁসালো হইয়া সমস্ত ফলগুলিকে ঘিরিয়া রাখে এবং বাহ্যতঃ একটি সরল ফল বলিয়া ভুল হয়। ইহাকে সাইকোনাস বলে। বট **ফলও** সাইকোনাস।

ফলের ছক



ভ্রূণ বা এমব্রাইও—বীজত্বকের মধ্যকার অংশগুলির মধ্যে ভ্রূণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। নিষেকের ফলে উৎপন্ন শিশু উদ্ভিদই বীজের মধ্যে ভ্রূণাকারে সুপ্ত থাকে। বিভিন্ন রকমের বীজে ভ্রূণ অল্পকাল বা দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সুপ্ত অবস্থা শত বৎসরও হইতে পারে তবে কিছুকাল পরে বীজের ভ্রূণ মরিয়া যায়। পরিণত বীজে ভ্রূণের দুইটি অংশ থাকে, একটি ছোট দণ্ডের ন্যায় অংশ বা ভ্রূণাক্ষ। ভ্রূণাক্ষকে **টাইজেলাম** (tigellum) বলে। টাইজেলাম বা ভ্রূণাক্ষের দুইধারে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে দুইটি বীজপত্র যুক্ত থাকে। এই বীজপত্রযুক্ত স্থানকে পর্ব (nodal zone) বলে। ইহার নিচের অংশকে হাইপোকটিল (hypocotyl) এবং উপরের অংশকে এপিকটিল (epicotyl) বলে। এপিকটিলের উপরদিকে **ভ্রূণমুকুল** বা প্লুমিউল (plumule) এবং হাইপোকটিলের নিচের দিকে ভ্রূণমূল বা র‍্যাডিকল থাকে। ভ্রূণমুকুল হইতে **বিটপ** (shoot) জন্মায় এবং ভ্রূণমূল হইতে প্রাথমিক মূল সৃষ্টি হয়।

বীজপত্রই উদ্ভিদের প্রথম পাতা। বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজপত্রের সংখ্যা ও আকার বিভিন্ন প্রকারের। বীজপত্রের সংখ্যানুসারে বীজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) **একবীজপত্রী**—যাহাদের একটি বীজপত্র থাকে, যথা ধান, গম, যব, ভুট্টা, ঘাস, নারিকেল, বাঁশ।

(২) **দ্বিবীজপত্রী**—যাহাদের দুইটি বীজপত্র থাকে, যথা আম, কাঁঠাল, জবা, নিম, তেঁতুল, বট, গোলাপ।

(৩) **বহুবীজপত্রী**—যাহাদের বীজপত্রের সংখ্যা দুইটির বেশী, যথা পাইন জাতীয় নগ্নবীজ বা ব্যক্তবীজ উদ্ভিদ।

বীজে সঞ্চিত খাদ্য—ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে অথবা বীজপত্রের বাহিরে **সস্য** বা এণ্ডোস্পারমের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বিভিন্ন প্রকার বীজে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বেশীর ভাগ বীজে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থাকে, যথা ধান, গম, ভুট্টা। রেড়ি, সরিষার বীজে তৈল থাকে এবং ছোলা, মটর, বিভিন্ন রকমের ডাইলে প্রোটিনও থাকে।

বীজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—**অসস্যল** বা **এক্সঅ্যালবিউমিন্যাস** বা **ননএণ্ডোস্পারমিক** ; ইহাদের খাদ্য বীজপত্রে থাকে যথা ছোলা, মটর, তেঁতুল।

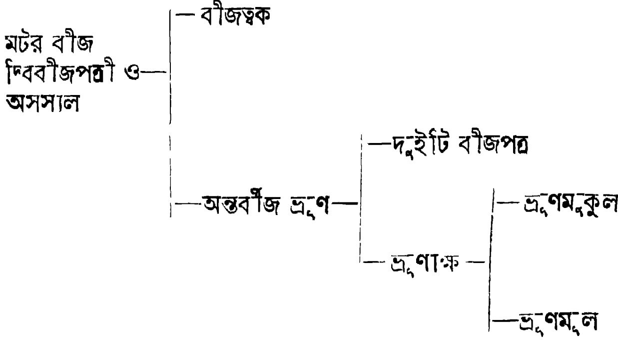
(২) **সস্যল** বা **অ্যালবিউমিন্যাস** বা **এণ্ডোস্পারমিক**—ইহাদের সস্য থাকে বীজপত্রের বাহিরে, ধান, গম, রেড়ি।

কোন কোন বীজে ভ্রূণ ও সস্য ছাড়াও, **পরিভ্রূণ** বা **পেরিস্পার্ম** (perisperm) নামে একটি অংশ থাকে, যাহার মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকিতে পারে যথা পদ্ম, শালুক।

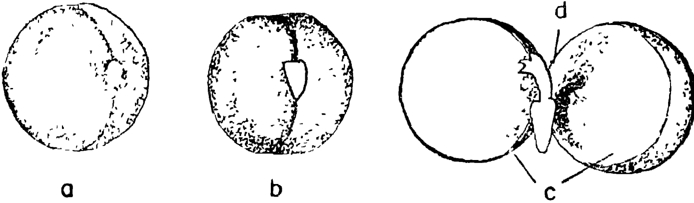
মটর—ইহা দ্বিবীজপত্রী অসস্যল বীজ। দুই দিন মটর বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিলে, ইহার বিভিন্ন অংশ পৃথক করা যায়। মটর বীজের উপরে বহিঃত্বক (testa) থাকে। ইহার অন্তঃত্বক বুঝা যায় না। গোলাকার বীজত্বকের উপরে একটি সূক্ষ্ম গর্ত, ইহাকে **ডিম্বকরন্ধ্র** বলে। ডিম্বকরন্ধ্র হইতে ভাবীমূল বাহিরে আসে। ইহার নিকটে একটি দাগ আছে, ইহাকে **ডিম্বকনাভী** (hilus) বলে। ডিম্বকনাড়ির সাহায্যে ডিম্বক একটি বৃন্তের সহিত ডিম্বাশয়ে যুক্ত থাকে। ইহাকে **ডিম্বকনাভিচিহ্নও**

hilus) বলে। বীজত্বক ছাড়াইলে, যে অংশ দেখা যায়, তাহাকে **অন্তর্বীজ** বা **কারনেল** (kernel) বলে। মটর বীজে কারনেল ও ভ্রূণ একইভাবে থাকে। ইহা দুইটি গোলাকার বীজপত্র খাদ্য জমা থাকার জন্য বেশ স্থূল। দুইটি বীজ পত্রের মধ্যস্থলে ভ্রূণাক্ষ বা টাইজেলাম। ভ্রূণাক্ষের নিম্নঅংশকে **ভ্রূণমূল** (radicle) এবং ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশকে ভ্রূণমুকুল বলে।

এই বীজের খাদ্য বীজপত্রে সঞ্চিত থাকে বলিয়া, ইহাকে অসস্যাল, দ্বিবীজপত্রী বলে।



ছোলা—ইহা দ্বিবীজপত্রী ও অসস্যাল ; ইহার একদিক সূঁচালো ও অপরদিক চওড়া। ইহার বীজত্বক দুইটি স্তরে ঘটিত, বাহিরে বহিঃত্বক এবং ভিতরে পাতলা অন্তঃত্বক। বহিঃত্বকের উপর হাইলাসও মাইক্রোপাইল ছাড়াও আর একটি দাগ থাকে। সূঁচালো



মটর ঃ a—মটর বীজ, b—কারনেল, c—বীজপত্র, d—ভ্রূণাক্ষ।

দিকের নিচে মাইক্রোপাইল ও উহার উপরে হাইলাস। বীজের প্রায় মাঝের দাগকে স্ট্রোফিওল (strophiole) বলে। বীজত্বকের ভিতরে অন্তর্বীজ। অন্তর্বীজই ইহার প্রাণ। ভ্রূণের দুইটি মোটাবীজ পত্র এবং ইহার মধ্যস্থলে ভ্রূণাক্ষ। ভ্রূণাক্ষের উপরদিকে ভ্রূণমুকুল এবং নিচের দিকে ভ্রূণমূল।

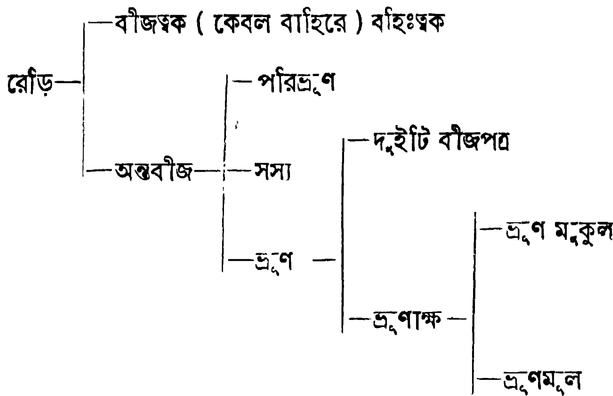
রেড়ি বীজ (Castor seed)

রেড়ি বীজ দুই-তিন দিন জলে ভিজাইবার পর পরীক্ষা করিলে, সহজে অংশগুলি বুঝা যায়। ইহার বহিঃত্বক **শক্ত** এবং রংযুক্ত এবং ইহার নিচে ক্যারাঙ্কল নামক অংশ থাকে। ক্যারাঙ্কল প্রায় ডিম্বক নাভিকে ঢাকিয়া রাখে। ক্যারাঙ্কল ছাড়াইলে **ডিম্বকরন্ধ্র** দেখা যায়। ইহার **অন্তঃত্বক নাই**। **বহিঃত্বক** সাবধানে সরাইলে **অন্তর্বীজ**

(kernel) বাহির হয়। অন্তবীজ পরিভ্রূণ বা পেরিস্প্রাম (perisperm) সস্য ও ভ্রূণ দ্বারা তৈয়ারি। সস্য ভ্রূণকে ঘিরিয়া থাকে। ইহাতে তৈল ও অন্য খাদ্য, কলার (tissue) মধ্যে সঞ্চিত থাকে। সস্যের বাহিরে পাতলা পর্দা বা **পরিভ্রূণ** আছে।

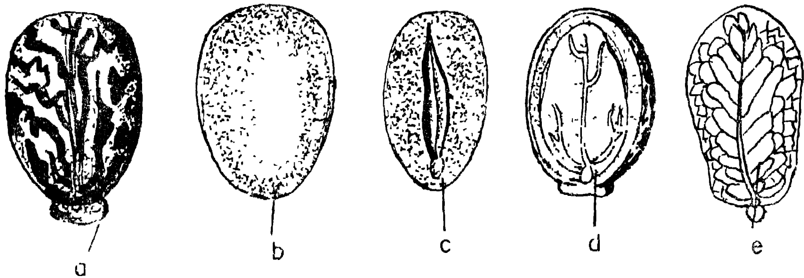
ভ্রূণ—ইহা ভ্রূণাক্ষ, ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল দ্বারা গঠিত। ভ্রূণাক্ষের দুইধারে দুইটি পাতার মত বীজপত্র। বীজপত্রে পাতার মত শিরা উপশিরা বুঝা যায়। এই বীজে, বীজপত্রের বাহিরে খাদ্য বা সস্য থাকে। ইহাকে দ্বিবীজপত্রী সস্যলবীজ বলে।

রেড়িবীজের ছক



ধান (Rice grain)

ধান ফলত্বক ও বীজত্বক দ্বারা গঠিত। ফলত্বকের বাহিরে চারিটি গ্লুম নামক অংশ ফলকে ঘিরিয়া থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্লুম ছোট ও নিচে থাকে। তৃতীয় গ্লুমটি বড় ও চতুর্থ গ্লুমকে সামান্য ঘিরিয়া থাকে।



রেড়ি : a—রেড়ির বীজ, b—কারনেল, c—সস্য, d– বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষ, e– বীজপত্র।

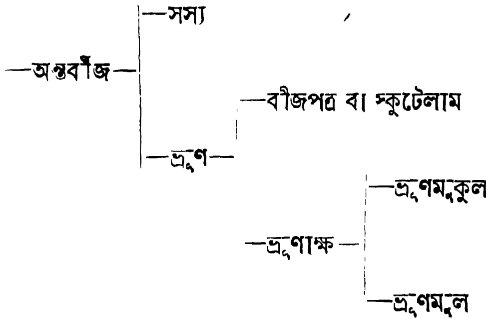
ধানের খোসা বা গ্লুমগুলি খুলিলে, ফলত্বক ও বীজত্বক একত্রে আবরণের মত দেখা যায়। এই দুইটি ত্বক ছাড়াইলে অন্তবীজ বাহির হয়। ইহা সস্য (যাহা আমরা খাইয়া থাকি) ও ভ্রূণ লইয়া তৈয়ারি। এই সস্য প্রধানতঃ শ্বেতসার দ্বারা গঠিত। সামান্য প্রোটিনও থাকে। সস্য ও ভ্রূণের সংযোগস্থলে ইহার **বীজপত্র বা স্কুটেলাম**

থাকে। ইহার একটিমাত্র বীজপত্র থাকে, সেই কারণে ইহাকে একবীজপত্রী বলে। স্কুটেলাম সস্য হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভ্রূণাক্ষকে পরিবেশন করে। স্কুটেলাম ও ভ্রূণাক্ষের মাঝে এপিথিলিয়াম কলা থাকে। খাদ্য পরিবেশনে ইহা সাহায্য করে। ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশ ভ্রূণমুকুল ও নিচের অংশ ভ্রূণমূল। ভ্রূণমুকুলের উপর একবীজপত্রী বীজে একটি আবরণ থাকে, ইহাকে কলিওপটাইল (coleoptile) বলে। ভ্রূণমূলের আবরণকে কলিওরাইজা (coleorhiza) বলে।

ধানের মত গম, ভুট্টার বীজ, একবীজপত্রী কারণ, ইহাদের একটিমাত্র বীজপত্র থাকে।

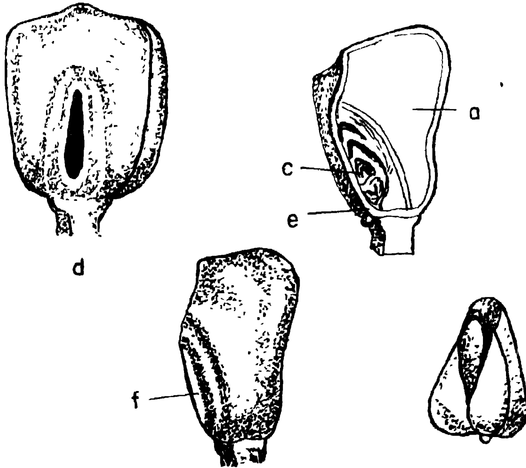
—ফলত্বক, বীজত্বক ও ৪টি গ্লুম

ধান—



ভুট্টা ও গম—ইহারা ধানের মত, একবীজপত্রী, সস্যল।

ভুট্টা ও গমের ওপর গ্লুম থাকে এবং ভিতরে ফলত্বক ও বীজত্বক সংযুক্ত। একটি



ভুট্টা ঃ a—সস্য, c—ভ্রূণমুকুল, d—ভুট্টা, e—ভ্রূণমূল, f—ভ্রূণাক্ষ।

ভুট্টার দানার দৈর্ঘ্যচ্ছেদ লইয়া দেখিলে —বাহিরে সংযুক্ত ফলত্বক ও বীজত্বক এবং ইহার ভিতরে সস্য। সস্যের এক অংশ উচু (ডেলটয়েড) এবং ইহাতে স্কুটেলাম, এপিথিলিয়াম ও ভ্রূণাক্ষ অবস্থিত। ভ্রূণাক্ষ, ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল দ্বারা তৈয়ারী।

অঙ্কুরোদগম

(Germination)

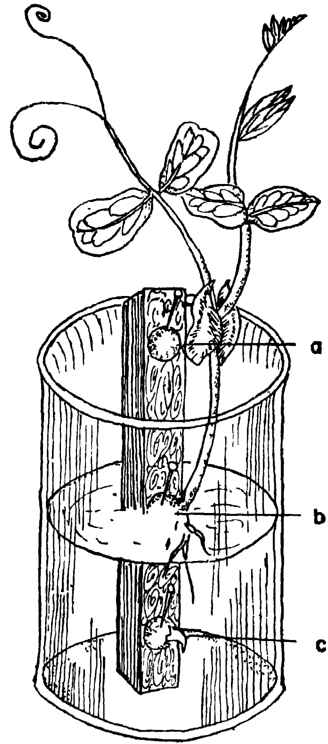
বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যে পদ্ধতিতে সুপ্ত ভ্রূণ জীবনের কার্য আরম্ভ করে, তাহাকে অঙ্কুরোদগম বলে। উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। উপযুক্ত অবস্থা তিনটি, যথা —বাতাস, উপযুক্ত তাপমাত্রা ও জল।

পরীক্ষার দ্বারা এই তিনটির আবশ্যকতা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা—

প্রয়োজন—তিনটি বীকার, গরম জল, বরফ জল ও সাধারণ জল, তিনটি কাঠের টুকরা, মোম, বুনসেন বার্ণার বা স্পিরিট ল্যাম্প, তিনটি করিয়া ৯টি মটর, ছোলা বা বীনের বীজ।

একটি বীকারে বরফ জল, আর একটিতে বেশ গরম জল ও তৃতীয় বীকারে সাধারণ জল। তিনটি কাঠের টুকরা মোম গরম করিয়া লাগান হইল। প্রত্যেক কাঠের টুকরায় তিনটি করিয়া বীজ আলপিন দিয়া আটকাইয়া, তিনটি বীকারে রাখা হইল। বীকার তিনটিতে ½ অংশ জলপূর্ণ করা হইয়াছে। একটি বীজ (প্রত্যেক বীকারে জলের অনেক উপরে, দ্বিতীয় বীজ জল স্পর্শ করিয়া থাকিবে এবং তৃতীয় বীজটি জলের নিচে। দুই তিন দিন, এইভাবে রাখিবার পর দেখা যাইবে—যে বীকারে বরফ জল তাহাতে কোন বীজ অঙ্কুর বাহির করে নাই। ইহাতে উপযুক্ত তাপ পায় নাই। দ্বিতীয় বীকারে গরম জল, ইহাতেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। তৃতীয় বীকারে মাঝের বীজে অঙ্কুরোদগম হইয়াছে।



পরীক্ষা : a—জলের উপরের বীজ, b - জল স্পর্শ করিয়া বীজ, c—জলের নিচের বীজ।

জলের উপরের বীজে অঙ্কুর বাহির হয় নাই কারণ জল পায় নাই, যদিও উপযুক্ত বাতাস ও তাপমাত্রা পাইয়াছে। জলের নিচের বীজ সামান্য অঙ্কুর বাহির করিতে পারে কিন্তু অঙ্কুর বৃদ্ধি লাভ করে না।

এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণ হইল, উপযুক্ত তাপ, বাতাস (O_2) ও জল পাইলে বীজ যদি সুস্থ (viable) হয়, তবেই অঙ্কুরোদগম হয়।

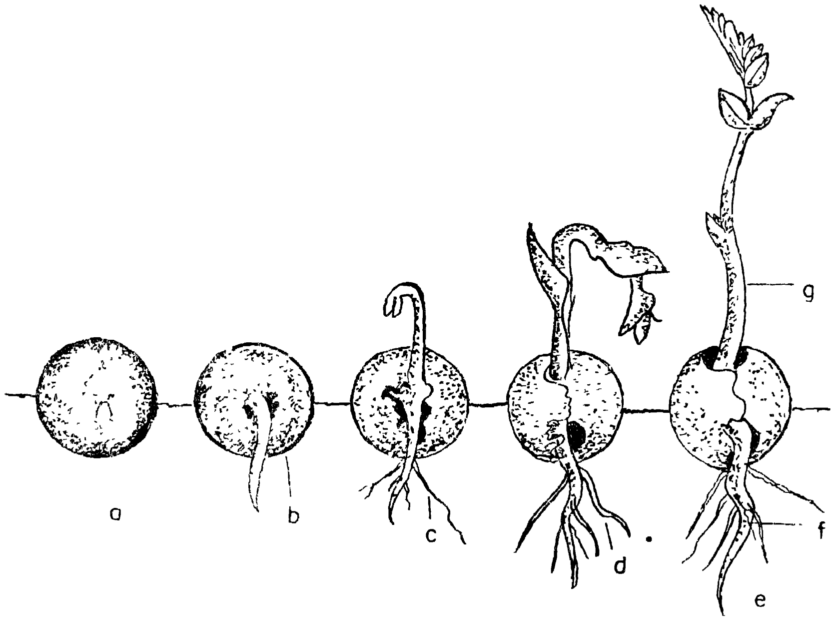
অঙ্কুরোদগমে জল, উপযুক্ত তাপ ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা

জল—জল পাইলে বীজের প্রোটোপ্লাজম জৈবনিক কার্য আরম্ভ করে ; ইহার অভাবে বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজের সঞ্চিত খাদ্য জল পাইলে তরল হয় এবং

তাহা ভ্রূণাক্ষ ব্যবহার করিতে পারে। জল বীজত্বক নরম করে এবং ভ্রূণ তাহা ভেদ করিতে সক্ষম হয়।

উপযুক্ত তাপ -বরফের মত ঠাণ্ডা অথবা অত্যধিক তাপে অংকুরোদগম হয় না। সাধারণ মাঝামাঝি তাপমাত্রায় অঙ্কুর বাহির হয়।

বাতাস—বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ভ্রূণের শ্বাসকার্য হয়। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকার্য সাধারণতঃ হয় না কারণ অক্সিজেন খাদ্যবস্তুকে মৃদু দহন করে এবং ইহার ফলে যে শক্তি বাহির হয়, তাহাতে ভ্রূণ জৈবনিক কার্য করে।



মটর মৃদগত ঃ a, b c—অঙ্কুরিত, d, e শিশু উদ্ভিদ, f—মূল, g—কাণ্ড।

আলোক—আলোক প্রথম অবস্থায় আবশ্যক হয় না। তামাকের মত বীজে আলোক অংকুরোদগমে সাহায্য করে। টোমেটোর বীজ অন্ধকার ছাড়া অঙ্কুর বাহির করে না। অংকুরোদগমের পর আলোক আবশ্যক হয়।

অঙ্কুরোদগম দুই প্রকার ঃ—

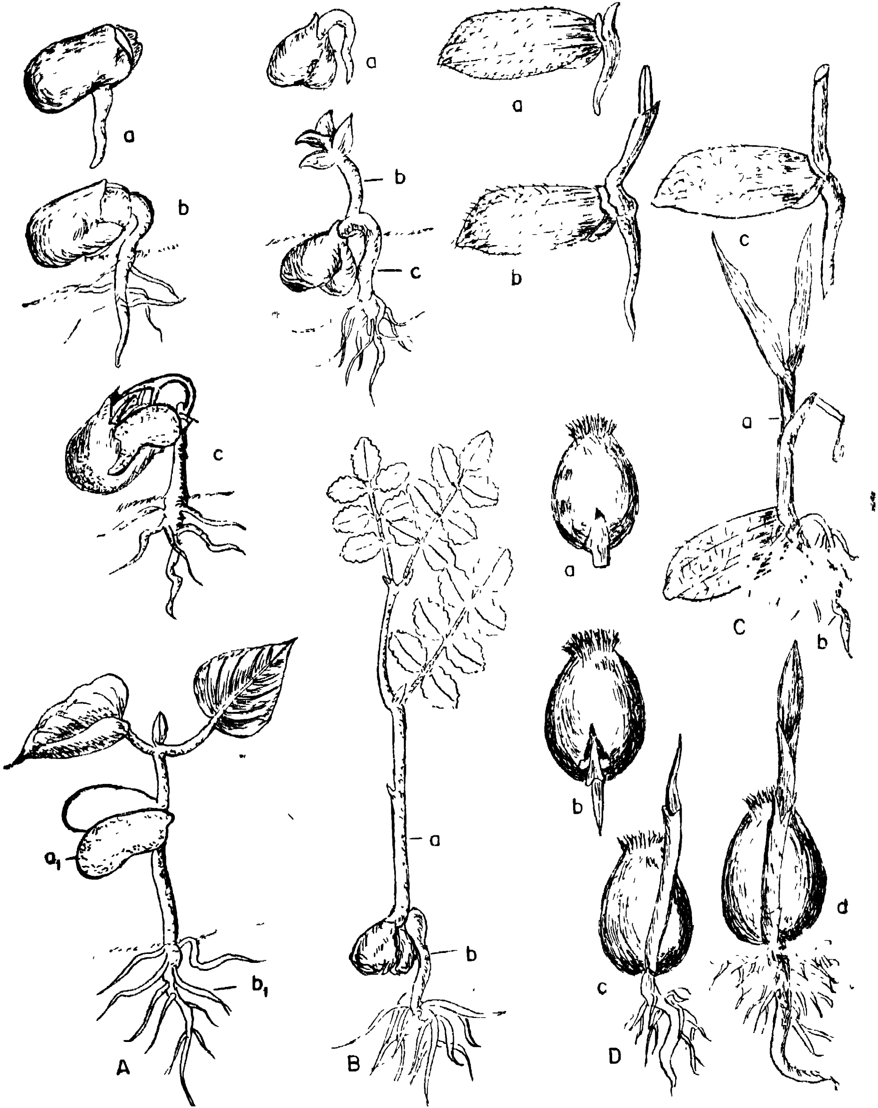
(১) মৃদগত বা মৃৎবর্তী, (২) মৃৎভেদী

মৃদগত অংকুরোদগম, মটর, ছোলা, ধান গম ইত্যাদিতে দেখা যায়। ইহাদের অঙ্কুর মাটির নিচে বাহির হয় এবং ভ্রূণমূল ধীরে ধীরে মাটির ভিতর প্রবেশ করে। ভ্রূণমুকুল মাটির উপরে উঠিয়া বিটপ সৃষ্টি করে।

ছোলা মটর অঙ্কুরোদগম করিয়া ডিম্মক রন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া ভ্রূণমূল মাটির ভিতর মূলে পরিণত হয় এবং এপিকটিল ভ্রূণ মুকুলকে উপরে তুলিয়া দেয়। ভ্রূণমুকুল

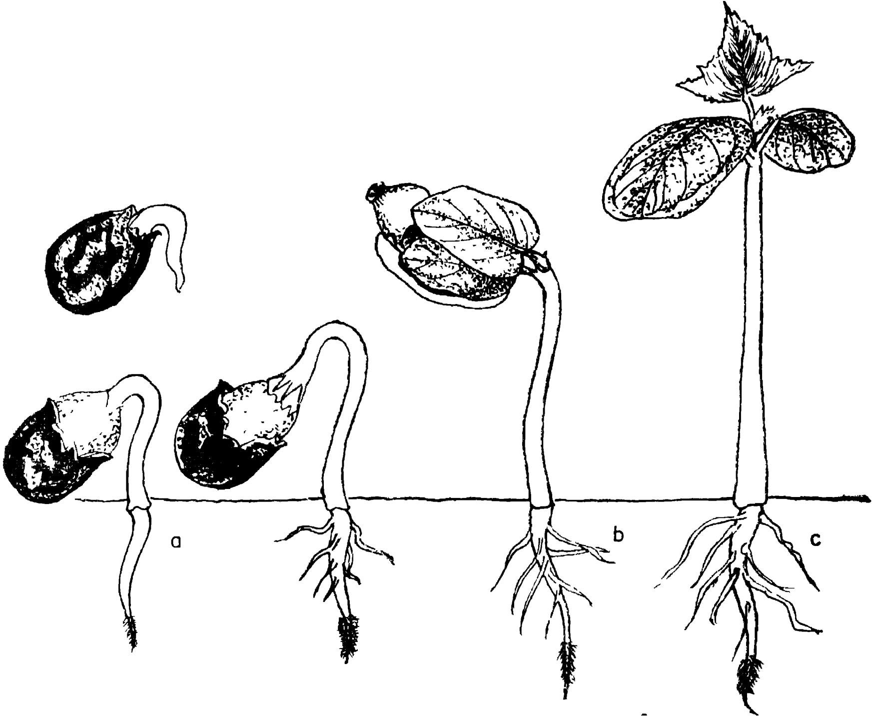
বিটপে পরিণত হইয়া কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি বহন করে। বীজপত্র দুইটি মাটির নিচে শুকাইয়া পড়িয়া যায়।

ধান, ভূট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদে মৃতগত অংকুরোদগম হয়।



মৃদগত ও মৃৎভেদী : A=a—শিমের অংকুর, b—ভ্রূণমূল: c—অংকুরিত, a_1—বীজপত্র, b_1—শাখামূল ; B - a—ছোলার অংকুর, b ভ্রূণমূকুল c—ভ্রূণমূল অংকুরিত ছোলাগাছ ; C=a—ধানের অংকুর, b—অংকুর হইতে ভ্রূণমূকুল ও মূল ; D=গমের অংকুরোদগম, a—অঙ্কুর, b—ভ্রূণমূল. c, d—অংকুরিত শিশু উদ্ভিদ।

ইহাদের ভ্রূণমূল কলিওরাইজা ভেদ করিয়া মাটির মধ্যে প্রাথমিক মূল সৃষ্টি করে কিন্তু প্রাথমিক মূল বৃদ্ধিলাভ করে না। মূলের চারিপাশ হইতে অস্থানিক গুচ্ছমূল বাহির হয়। ভ্রূণমুকুল কলিওপটাইল ভেদ করিয়া মাটির উপরে উঠে এবং ক্রমে বিটপ গঠন করে।



রেড়ির অঙ্কুরোদগম—দুইটি বীজপত্র উপর দিকে উঠিয়াছে
a—ভ্রূণমূল, b—মূল, c—প্রধান ও শাখামূল।

পিঁয়াজের অঙ্কুরোদগম কেবল মৃৎভেদী।

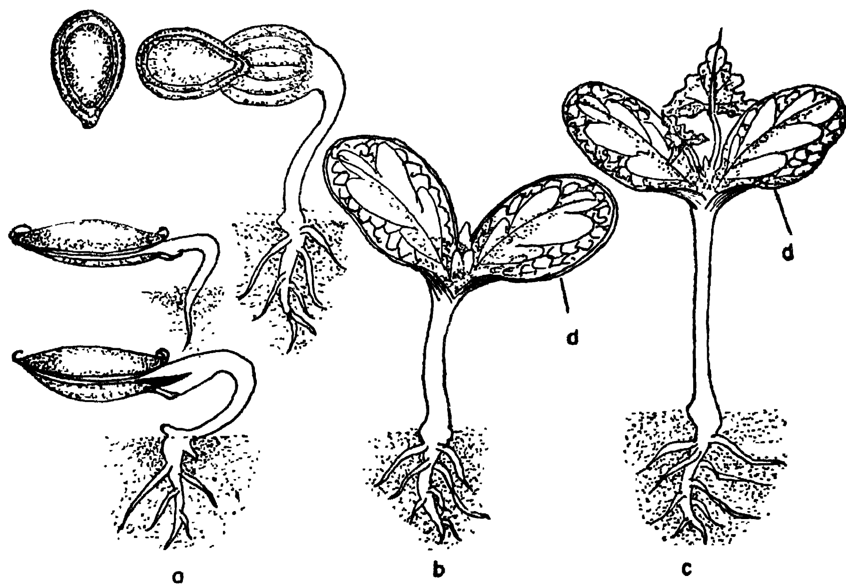
মৃৎভেদী অঙ্কুরোদগম—এই ক্ষেত্রে বীজপত্র মাটি ত্যাগ করিয়া উপরে উঠে। তেঁতুল, কুমড়া, রেড়ি, শশার বীজের অঙ্কুরোদগম কালে বীজপত্র দুটি উপরে উঠিয়া সবুজ পাতায় পরিণত হয়, অবশ্য পরে ইহা শুকাইয়া পড়িয়া যায়। হাইপোকটিল বীজটিকে মাটির উপরে টানিয়া লইয়া যায় এবং ভ্রূণমুকুল প্রথমে সস্যের মধ্যে থাকে এবং পরে ভ্রূণমুকুল বিটপ গঠন করে। ভ্রূণমূল অপর প্রান্তে মূলে পরিণত হয়।

জরায়ুজ—অঙ্কুরোদগম (Viviparous germination)

লবণাক্ত মাটিতে কোন কোন গাছের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়। সুন্দরী, গরান ইত্যাদি হ্যালোফাইট জাতীয় উদ্ভিদে, ফল মাটিতে পড়িবার আগেই ফলের বীজের অঙ্কুর বাহির হয়। মূলটি বাহির হইয়া বীজপত্রকে লবণাক্ত জলে পড়িতে দেয় না, মূলটি মাটিতে পড়িয়া বীজপত্রকে মাটির উপরে রাখে এবং ভ্রূণমুকুল নিরাপদে বিটপ সৃষ্টি করে।

a b c d e

ভুট্টার অঙ্কুরোদগম ঃ a—ভ্রূণমূল, b, c, d—ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল, e—উদ্ভিদ।



কুমড়া ঃ a—অঙ্কুর, b—ভ্রূণমূল, c—মূল, d—বীজপত্র।